

## প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মু— বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন যে পাঠ্যবহু প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা রিট করা হয়। যু—যু—সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে সেইসঙ্গে। যু— হয়েছে অধ্যয়ন বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণের লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং তাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে। তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেপ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপেই স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখবে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

উপাচার্য

ତୃତୀୟ ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ : ଅଗାଷ୍ଟ, 2012

---

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

## পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাংলা

স্নাতক পাঠ্যক্রম (সাবসিডিয়ারি)

পাঠ্যক্রম : পর্যায়  
SBG : 02 : 06-10

### রচনা

- পর্যায় 6-7  অধ্যাপক সুধীনচন্দ্র দেবনাথ  
পর্যায় 8  অধ্যাপক সুকুমার দেব  
পর্যায় 9-10  অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী

### সম্পাদনা

বাংলা স্নাতক বিষয় সমিতির পক্ষে :

- ড. দিলীপকুমার নন্দী  
ড. শি—নাথ বা  
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল  
ড. বাণীমঞ্জরী দাস  
ড. মননকুমার মণ্ডল  
আব্দুল কাফি

পরিমার্জন, বিন্যাস ও সম্পাদনা :

ড. মননকুমার মণ্ডল  
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ  
স্কুল অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস

### ঘোষণা

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মু— বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৐ঐঐঐঐ ঐঐঐঐ  
নিবন্ধক



## নেতাজি সুভাষ মু— বিশ্ববিদ্যালয়

### SBG—2

(স্নাতক পাঠ্যক্রম - সাবসিডিয়ারি - বাংলা)

#### পর্যায়

6

একক 23	<input type="checkbox"/> বাংলা ছন্দের পরিভাষা (প্রাথমিক পর্যায়)	9-39
একক 24	<input type="checkbox"/> বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ	40-50
একক 25	<input type="checkbox"/> বাংলা ছন্দোবন্ধ	51-73

#### পর্যায়

7

একক 26	<input type="checkbox"/> অলংকার	76-78
একক 27	<input type="checkbox"/> শব্দালংকার	79-94
একক 28	<input type="checkbox"/> অর্থালংকার	95-125

#### পর্যায়

8

একক 29	<input type="checkbox"/> বৈষ্ণব পদাবলী-চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস	126-146
একক 30	<input type="checkbox"/> রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড কৃত্তিবাস ওঝা	147-209

## পর্যায়

### 9

একক 31	□ কাব্য পাঠের ভূমিকা	210-221
একক 32	□ আধুনিক বাংলা কাব্য	222-229
একক 33	□ মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য ষষ্ঠ সর্গ	230-271

## পর্যায়

### 10

একক 34	□ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুটি কবিতা	272-287
একক 35	□ কাজী নজরুল ইসলাম : দুটি কবিতা	288-312
একক 36	□ জীবনানন্দ দাশ : একটি কবিতা	313-328

## ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৮টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-১ পর্যায়। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাংলা কবিতার ছন্দ। আলোচনা মূলত ২টি ভাগ—ছন্দতত্ত্ব আর ছন্দ-বিশ্লেষণ। ছন্দতত্ত্বকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হল, চতুর্থ ভাগে রইল ছন্দ-বিশ্লেষণ। গোটা পর্যায়টিও ৪টি এককে বিভক্ত। প্রথম ৩টি এককে ছন্দতত্ত্ব, চতুর্থ এককে ছন্দ-বিশ্লেষণ। প্রতিটি এককের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এই রকম :

**একক ২৩ :** বাংলা ছন্দের পরিভাষা এই এককের আলোচনার বিষয়। বাংলার দুই প্রথম সারির ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালীন ছন্দচর্চার ফসল থেকে তুলে আনা হয়েছে ৩৬টি পরিভাষা এর মধ্য থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষা বেছে নিয়ে দৃষ্টান্তসহ এদের ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল এই এককে। বাকি ১৩টি পরিভাষা ব্যবহারিক পর্যায়ের—প্রয়োগসূত্রে তাদের ব্যাখ্যা রয়েছে পরের এককগুলিতে।

**একক ২৪ :** বাংলা ছন্দের ৩টি রীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল এই এককে। সবারকমের বাংলা কবিতার ছন্দ যে শেষপর্যন্ত ৩টি রীতির মধ্যে আবদ্ধ, এ বিষয়ে বিতর্ক না থাকলেও এদের নাম নিয়ে বিতর্ক এখনো টিকে আছে। সেই কারণে প্রবোধচন্দ্রের আর অমূল্যধনের দেওয়া চূড়ান্ত নামকরণ-দুটিই প্রতিটি রীতির ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হল, এই এককে দৃষ্টান্তসহ সেসব ব্যাখ্যাও করা হল সেইমতো।

**একক ২৫ :** বাংলা কবিতার ছন্দবন্ধ এই এককে আলোচিত। ছন্দের রীতি কবিতার ছন্দের ভেতরকার পরিচয়, তার আলোচনা থাকবে একক-২এ। ছন্দবন্ধ ছন্দের বাইরের পরিচয়। বাংলা কবিতায় ছন্দের এই বাইরের রূপটি কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে একঘেয়ে প্রথার শাসন থেকে মুক্তি পেল, ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠল, তার দুটি-একটি দিক তুলে ধরা হল এই এককে। আলোচনা অবশ্য সীমিত রাখতে হল পয়ার, অমিত্রাক্ষর, আর চতুর্দশপদীর গড়ির মধ্যে।

একক তিনটি মনোযোগ আর সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে বাংলা কবিতার ছন্দতত্ত্ব আর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হতে পারবে, ছন্দবোধ আরো সমৃদ্ধ হতে পারবে, ছন্দ জিজ্ঞাসা বাড়বে এবং বাংলা ছন্দের খুঁটিনাটি নিয়ে জমে-ওঠা বিতর্ক-বিভ্রান্তি থেকে শিক্ষার্থীরা দূরে সরে থাকতে পারবেন।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে বিস্তর সাহায্য করছে এই ৩টি বই :

১. প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৮৬)।
২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৮৩)।
৩. পবিত্র সরকার : ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ (১৯৯৯)।

---

## একক ২৩ □ বাংলা ছন্দের পরিভাষা (প্রাথমিক পর্যায়)

---

গঠন

- ২৩.১ উদ্দেশ্য
- ২৩.২ প্রস্তাবনা
- ২৩.৩ মূলপাঠ-১ : ছন্দ, তার উপাদান
  - ২৩.৩.১ ছন্দ
  - ২৩.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি
  - ২৩.৩.৩ অক্ষর, দল
  - ২৩.৩.৪ মাত্রা, কলা
  - ২৩.৩.৫ ছেদ, যতি
- ২৩.৪ সারাংশ-১
- ২৩.৫ অনুশীলনী-১
- ২৩.৬ মূলপাঠ-২ : ছন্দের নানাবিভাগ
  - ২৩.৬.১ পর্ব, পদ
  - ২৩.৬.২ পর্বাজা, উপপর্ব
  - ২৩.৬.৩ চরণ, পঙ্ক্তি
  - ২৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক
- ২৩.৭ সারাংশ-২
- ২৩.৮ অনুশীলনী-২
- ২৩.৯ মূলপাঠ-৩ : উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব
  - ২৩.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ
  - ২৩.৯.২ শ্বাসঘাত, প্রস্বর
  - ২৩.৯.৩ তান, মিল
- ২৩.১০ সারাংশ-৩
- ২৩.১১ অনুশীলনী-৩
- ২৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি-৩

---

### ২৩.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন তাহলে—

- বাংলা কবিতার আশ্রয়ে গড়ে-ওঠা বাংলা ছন্দের তত্ত্ব যে আধুনিক বিজ্ঞানেরই আর-একটি শাখা হয়ে উঠতে পারে এ-রকম বিশ্বাস আপনার মনে তৈরি হবে।

- বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পথে বাংলা ছন্দতত্ত্বের সামনে যেসব তর্কের বাধা আছে, তা কমিয়ে আনার জন্য যুক্তি তথ্য খুঁজে নিতে পারবেন।
- বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরিভাষা প্রয়োগ করতে পারবেন।

## ২৩.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ নিয়ে আলোচনার অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় ছন্দ নিয়ে বিতর্ক বাড়ানো, বিভ্রান্তি ছড়ানো। এর কারণ, বাংলা ছন্দতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি। সেই ফাঁকে ছন্দ-ভাবকেরা নতুন নতুন কথা বলেন, নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করে এর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেন। এতে করে ছন্দ-ভাবনার আয়তন ক্রমশ বাড়ে এ কথা ঠিক, কিন্তু সেই বাড়তে থাকা আয়তনে নতুন শিক্ষার্থীরা দিশাহার হয়ে পড়েন, পথ হারিয়ে ফেলেন। এ সমস্যার সমাধান—ছন্দকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করানো। এটা করতে গেলে আবশ্যিক এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা, যা সবার কাছে মান্য হতে পারে, যার প্রয়োগে বাংলা ছন্দের সূত্র এবং তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে একটিমাত্র রূপ নিয়ে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, অন্তর্বর্তী কালের ব্যবস্থা হিসেবে ততক্ষণ শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হতে পারেন বাংলা ছন্দচর্চায় অগ্রণী ছন্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এঁদের তৈরি এবং বাবহার করা অনেকগুলি পরিভাষা বাঙালি ছন্দ-জিজ্ঞাসুর কাছে এখনো শ্রদ্ধেয়। এঁদের ছন্দ-ভাবনা দুটি পৃথক শ্রোতে প্রবাহিত হলেও কিছু কিছু পরিভাষা দুজনের কাছেই গ্রাহ্য, অবশ্য অনেকগুলিই রূপে বা অর্থে পৃথক। এর মধ্যে যেসব পরিভাষা তর্ক এড়িয়ে এঁদের শেখানো পদ্ধতিকেই বুঝতে সাহায্য করে, তেমন কয়েকটি নেওয়া হল।

অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগে রয়েছে প্রায় ৫০টি প্রধান পরিভাষা (শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে)। দুজনের ভাগ প্রায় সমান সমান। এ থেকে বেছে নেওয়া হল ৩৬টি—কেবল অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ১০টি, কেবল প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ১৪টি, আর দুজনের মিলিত প্রয়োগ থেকে ১২টি। পরিভাষাগুলির মধ্যে আবার ২টি ভাগ—২৩টি প্রাথমিক পর্যায়ের, বাকি ১৩টি ব্যাবহারিক পর্যায়ের। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রথম এককের বিষয়। ব্যাবহারিক পর্যায়ের ১৩টি পরিভাষা ব্যাখ্যাসহ সরাসরি ব্যবহার করা হবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় এককে। প্রথম এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করা হল ৩টি পৃথক নামে। প্রথম অংশের নাম ‘ছন্দ, তার উপাদান’—এতে আছে ৯টি পরিভাষা, দ্বিতীয় অংশ ‘ছন্দের নানাবিভাগ’—এতে রয়েছে ৮টি, তৃতীয় অংশ ‘উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব’—এ আছে বাকি ৬টি পরিভাষার পরিচয়।

নির্বাচিত পরিভাষার তালিকাটি এইরকম (মোট ৩৬টি)—

১। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি :

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৯টি—দল, কলা, উপপর্ব, পদ, পঙ্ক্তি, শ্লোক, প্রস্বর, সংশ্লেষ, বিশ্লেষ।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৬টি—অক্ষর, ছেদ, পর্বাঙ্গ, চরণ, শ্বাসাঘাত, তান।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৮টি—ছন্দ, বর্ণ, ধ্বনি, মাত্রা, যতি, পর্ব, স্তবক, মিল।



২। ব্যাবহারিক পর্যায়ে ১৩টি :

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৫টি—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, প্রবহমানতা, মুক্তক।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৪টি—শ্বাসঘাতপ্রধান, ধনিপ্রধান, তানপ্রধান, চতুর্দশপদী।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৪টি—ছন্দরীতি, ছন্দবন্ধ, পয়ার, অমিত্রাক্ষর।

## ২৩.৩ মূলপাঠ-১ : ছন্দ, তার উপাদান

ধরুন, আপনি একটি পাকা বাড়ি তৈরির কথা ভাবছেন। এর জন্য আবশ্যিক চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, লোহা—এ সব মাল-মশলা বা উপাদান। সঠিক অনুপাতে আর সঠিক পরিমাণে এদের মিশ্রণ আর সঠিক কৌশলে এদের প্রয়োগ ঘটলেই ক্রমশ গড়ে উঠবে একটি মজবুত বাড়ি। তেমনি, কবিতা লেখার উপাদান বর্ণ, কবিতা উচ্চারণের উপাদান ধ্বনি, অক্ষর বা দল। কবিতার ছন্দ নিয়ে যখন ভাবব, তখন কবিতার উপাদান হয়ে ওঠে ছন্দেরও উপাদান। কবিতার উপাদান ছাড়াও ছন্দ-গঠনের জন্য আবশ্যিক হয় ছন্দের নিজস্ব আরো কয়েকটি উপাদান—মাত্রা বা কলা আর যতি, প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ছন্দ-এর ভূমিকা। সেই কারণে, ছন্দ আর তার উপাদানগুলির পরিভাষা হবে প্রথম এককের মূলপাঠের প্রথম অংশের বিষয়। মূলত একই উপাদানকে নির্দেশ করে—এ রকম ১টি করে পরিভাষা বেছে নেওয়া হবে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে। প্রয়োগের দিক থেকে প্রতি জোড়া পরিভাষার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় পার্থক্য, তা আপনাদের দেখানো হবে দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে। ছন্দ-ই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়, অতএব শুরুতেই একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পরিভাষাটি বুঝে নিন। তারপর ক্রমশ জেনে নিন ছন্দের ৮টি উপাদানের পরিভাষা আর তাদের পরিচয়।

### ২৩.৩.১ ছন্দ

‘ছন্দ’ কাকে বলব, এই নিয়ে দুজন ছান্দসিকের দু-রকমের কথা শোনা যাক।

১। ‘যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়’ তাকে ‘ছন্দ’ বলতে চান অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২। ‘উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল ও আবর্তনময় বিন্যাসকে ‘ছন্দ’ বলতে চান পবিত্র সরকার।

প্রথম কথাটির অর্থ—যেভাবে কথার পর কথা সাজালে শুনতে ভালো লাগে, তারই নাম ছন্দ। অর্থাৎ, কথা নয়, কথা সাজানোও নয়, ছন্দ আসলে কথা সাজানোর এমন একটি কৌশল বা শৃঙ্খলা যার গুণে কথা মধুর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ—কথার উচ্চারণ, একটু থামা, আবার উচ্চারণ, আবার থামা—কথাগুলি আলাদা হলেও কথার উচ্চারণ আর বিরাম যদি পরপর একইভাবে বিশেষ একটি নিয়মে বা শৃঙ্খলায় ঘুরে ঘুরে আসে, তাহলে কথার এই বিশেষ নিয়মে ঘুরে-ঘুরে-আসা-টাই হবে ছন্দ।

তাহলে দেখছি, কেউ বলেন—কথা সাজানোর শৃঙ্খলাটাই ছন্দ, আবার কেউ বলতে চান—শৃঙ্খলার সঙ্গে কথা সাজানোটাই (বিন্যাসটাই) ছন্দ। মুখের ছন্দ বললে বুঝি কেবল মুখের গড়নটুকু, চলার ছন্দ বললে বোঝায় চলার ভঙ্গিটাই। কিন্তু, কবিতার ছন্দ বলতে বুঝব কথা সাজানো আর সাজানোর শৃঙ্খলা একই সঙ্গে।

কথার এই ছন্দ বক্তৃতায় থাকতে পারে, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের গদ্যে থাকতে পারে, কবিতায় তো থাকেই। আমরা যে ছন্দ নিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা করব, তা কেবল কবিতারই ছন্দ—আরো নির্দিষ্ট করে বলতে তা হবে কেবল বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

এবারে বাংলা কবিতার একটি অংশ পড়ে পড়ে বুঝে নিই, কথার উচ্চারণ আর বিরামের এই খেলাটি কী রকম—

নৌকা ফি সন		ডুবিছে ভীষণ		রেলো কলিশন		হয়	
হাঁটিতে সর্প		কুকুর আর		গাড়ি-চাপা-পড়া		ভয়	

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা ‘হাসির গান’ কাব্যের ‘নন্দলাল’ কবিতা থেকে নেওয়া এই দুটি ছত্রের প্রথম ছত্রটি পড়তে পড়তে ৪-বার থামলেন। ‘নৌকা ফি সন’ কথাটুকু উচ্চারণ করে একটু থামা, তারপর ‘ডুবিছে ভীষণ’ উচ্চারণ করে আর একটু থামা, এরপর ‘রেলো কলিশন’ উচ্চারণ ও আবার থামা, এবং সবশেষে ছোট্ট কথা ‘হয়’ উচ্চারণের পর একটু বেহাশি থামা (|- চিহ্নের জায়গায় কম থামা আর ||-চিহ্নের জায়গায় বেশি থামা)। এবারে দ্বিতীয় ছত্রটি পড়ুন। লক্ষ করুন, একইভাবে ‘হাঁটিতে সর্প’ ‘কুকুর আর’ ‘গাড়ি-চাপা-পড়া’—এই ৩টি কথার উচ্চারণের পর ৩ বার একটুখানি করে থামা, শেষ কথা ছোট্ট ‘ভয়’-এর উচ্চারণ করেই পুরোপুরি থামা।

এখন আন্দাজ করুন এক-একটি কথার উচ্চারণের মাপ। উচ্চারণ শুনতে শুনতে কানে খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে—প্রথম ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (নৌকা ফি সন, ডুবিছে ভীষণ, রেলো কলিশন) সমান মাপের, শেষ কথাটি (হয়) মাপে বেশ ছোটো। একইভাবে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর, গাড়ি-চাপা-পড়া) পাশাপাশি সমান মাপের, শেষ কথাটি (‘ভয়’) ছোটো। এবারে ওপরে-নীচে মিলিয়ে দেখুন, প্রথম ছত্রের কথাগুলি পরপর নীচের ছত্রের কথাগুলির সঙ্গে সমান মাপের (‘নৌকা ফি সন’ আর ‘হাঁটিতে সর্প’, ‘ডুবিছে ভীষণ’ আর ‘কুকুর আর’, ‘রেলো কলিশন’ আর ‘গাড়ি-চাপা-পড়া’, ‘হয়’ আর ‘ভয়’)। মাপগুলি অবশ্যই ইঞ্চি-সেন্টিমিটার বা মিনিট-সেকেন্ড ধরে নয়, কবিতার উচ্চারণ শুনে শুনে কান অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সহজেই আমাদের বোধে তখন তৈরি হয়ে যায় কথার মাপের আন্দাজ।

বাংলা কবিতার উদ্ভূত ছত্র দুটিতে আমরা এতক্ষণ কী দেখলাম? দেখা গেল, এখানে ৮টি কথা এমনভাবে সমাজানো যে প্রতিটি ছত্রেই সমান মাপের এক-একটি কথার উচ্চারণের পর একটি করে ছোটো মাপের বিরাম পর পর ৩-বার একইভাবে (উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম) ঘুরে ঘুরে আসে, শেষে ছোটো মাপের একটি কথার উচ্চারণের পর একটি বড়ো মাপের বিরাম। উচ্চারণ আর বিরামের এই ঘুরে ঘুরে আসা দুটি ছত্রে একইভাবে ঘটছে। কবি এমনি করে সাজিয়েছেন কথার উচ্চারণ আর বিরাম—একইভাবে পরপর ঘুরে ঘুরে আসার শৃঙ্খলায়। এই বিন্যাস আর শৃঙ্খলার গুণেই ছত্র দুটির অন্তর্গত কথাগুলি মধুর হয়ে শ্রোতার কানে বাজতে থাকে। তখনই তৈরি হয়ে যায় ছন্দ—কবিতার কথা শুনতে ভালোলাগার জাদু।

## ২৩.৩.২. বর্ণ, ধ্বনি

আমরা যা উচ্চারণ করি, তা লিখতে গেলেই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। এই চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। কবিকেও কবিতা লিখতে হয় চিহ্নের পর চিহ্ন—বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়ে। অতএব, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস। যিনি কবিতা পড়েন, তিনি সাজানো বর্ণগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেই সেগুলি একটার পর একটা উচ্চারণ করতে থাকেন, ক্রমে ক্রমে গোটা কবিতাই পড়া হয়ে যায়।

তাহলে দেখা গেল, কবি তাঁর কবিতা লেখেন বর্ণ বিন্যাস করে, পাঠক সেই কবিতা পড়েন বর্ণের পর বর্ণ উচ্চারণ করে। বর্ণের এই উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। অতএব, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। পাঠক বর্ণ চোখে দেখে উচ্চারণ করেন, শ্রোতা সেই উচ্চারণ থেকে ধ্বনি শুনতে থাকেন।

অর্থাৎ, কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, ছাপাও হয় বর্ণ দিয়ে। কিন্তু, যখন তা পড়া হয়, তখন সেই কবিতা ধ্বনির সমষ্টি হয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছয়। সেই ধ্বনির বিন্যাস থেকেই তৈরি হয়ে যায় কবিতার ছন্দ, এবং তা ধরা পড়ে শ্রোতার কানে।

বাংলায় আমরা ব্যবহার করি ১১টি স্বরবর্ণ ('ঈ' ব্যবহার করি না), কিন্তু উচ্চারণ করি ৭টি স্বরধ্বনি (অ আ ই উ এ্যা এ ও) ; ব্যবহার করি ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণ করি মাত্র ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি। তার অর্থ, আমাদের কবিরাও বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করে থাকেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ (মোট ৫১টি)। কিন্তু, পাঠকের উচ্চারণে আর শ্রোতার কানে ধরা পড়ে ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি (মোট ৩৬টি)। বাংলা কবিতার ছন্দ তৈরি হয় এই ৩৬টি ধ্বনির নানারকম বিন্যাস থেকে। অতএব, ছন্দের হিসেব করতে গিয়ে আমরা কানের সাক্ষ্যই মানব, চোখের সাক্ষ্য (অর্থাৎ বর্ণ, বানান এসব) যেন বিভ্রান্ত না করে—সেদিকে সতর্ক থাকব।

এবারে শূনি বর্ণ আর ধ্বনি নিয়ে ছন্দসিকেরা কী কী বলেন। বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, আর ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ—এ কথা প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানেন। কিন্তু, 'ধ্বনি' বোঝাতে দুজনেই অনেক সময় 'বর্ণ' কথাটি প্রয়োগ করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র বর্ণকে বা ধ্বনিকে সরাসরি স্বর-ব্যঞ্জে ভাগ করেননি। তাঁর বর্ণ-বিভাগ এই রকম : বাংলা বর্ণের সব মিলিটে ৪টি শ্রেণি—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুধস্বর, আর ব্যঞ্জন। এটি আসলে তাঁর ধ্বনি বিভাগও, 'বর্ণ' কথাটির বদলে 'ধ্বনি' বসালেই হল। মুক্তস্বর ছ-টি—অ আ ই উ এ ও। যে কোনো মুক্তস্বর বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অন্য স্বরের সহায়তা ছাড়াই এদের উচ্চারণ সম্ভব। ই উ এ ও—এই চারটি স্বর কখনও কখনও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। তখনই তারা খণ্ডস্বর। তখন তাদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়। মুক্ত 'আ'-এর পাশে খণ্ড 'ই' আশ্রয় নিলেই তৈরি হয় 'আ-ই' (খাই, নাই)। সঞ্জে সঞ্জে মুক্তস্বরের দরজাটি রুধ হয়ে যায়, তৈরি হয় রুধস্বর 'আই'। রুধস্বর হচ্ছে একটি মুক্তস্বর আর একটি খণ্ডস্বরের যৌথ উচ্চারণ। এমনি করে ৬টি মুক্তস্বর আর ৪টি খণ্ডস্বরের নানারকম মিলনে তৈরি হয় অন্ততপক্ষে ১৬টি রুধস্বর—অই (কই, সই), অউ (বউ) আও (যাও, খাও), ইউ (মিউ), উই (দুই), এই (সেই), ওএ (শোয়) ইত্যাদি। এই ১৬টি রুধস্বরধ্বনির মধ্যে কেবলমাত্র 'অই' আর 'অউ' ধ্বনির জন্য বরাদ্দ আছে 'ঐ' আর 'ঔ' বর্ণ। রইল বাকি ব্যঞ্জন। এদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়—হয় আগে

মুক্তস্বর পরে ব্যঞ্জন (অপ, আখ, ইট, উট), না হয় আগে ব্যঞ্জন পরে মুক্তস্বর (প, খা, টি, টু), অথবা আগে-পরে দুদিকেই মুক্তস্বর মাঝখানে ব্যঞ্জন (আদা = আ-দ্-আ, ইনি = ই-ন্-ই)। ব্যঞ্জন যখন উচ্চারণ করব, তখন তা হবে ব্যঞ্জনধ্বনি, আর যখন লিখবে, তখন তার নাম ব্যঞ্জনবর্ণ।

অমূল্যধনের বিচারে ‘বর্ণ’ হচ্ছে ‘লিখিত হরফ’। বর্ণকে বা ধ্বনিক তিনি অবশ্য পরোক্ষে স্বর আর ব্যঞ্জনেই ভাগ করেছেন। স্বরধ্বনি তাঁর কাছে দুটি জাতিতে বিভক্ত—মৌলিক আর যৌগিক। অ আ ই উ অ্যা এ ও—এই ৭টি মৌলিক স্বর, ওই আই আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর। দেখা গেল, প্রবোধচন্দ্রের ৬টি মুক্তস্বরই অমূল্যধনের কাছে মৌলিক স্বরধ্বনি, অমূল্যধনের ‘অ্যা’-স্বরধ্বনিটি কেবল প্রবোধচন্দ্রের তালিকার বাইরে। আর, প্রবোধচন্দ্রের বৃন্দস্বরের সঙ্গেও অমূল্যধনের যৌগিক স্বরের পার্থক্য খুব বেশি নেই।

### ২৩.৩.৩ অক্ষর, দল

‘ধ্বনিবিজ্ঞান’-এর পাঠ থেকে আপনারা বাগ্যন্ত্র আর ধ্বনির কথা আগেই জেনেছিলেন (FBG : একক ৭ পৃ. ৪-৫), ধ্বনির কথা একটু আগে আরো বিশদভাবে জানলেন। আমাদের এক একটা ধ্বনির উচ্চারণ আসলে বাগ্যন্ত্রের নানা অংশের মিলিত চেষ্টার ফল। তবে ধ্বনির উচ্চারণ সাধারণত একটা একটা করে হয় না। একটানা কথা বলতে গেলে ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে আমাদের কানে ধরা পড়ে না। বাগ্যন্ত্রের অংশগুলির একেবারের মিলিত চেষ্টার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২-টি-৩টি ধ্বনির একসঙ্গে উচ্চারণ হয়ে যায়, কখনো-সখনো একটি ধ্বনিরই উচ্চারণ হয়। একেবারের চেষ্টার যে-কটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, ইংরেজিতে তার নাম Syllable (beau-ti-ful), বাংলায় একে কেউ বলেন অক্ষর, কেউ বলেন দল।

একে অক্ষর বলেন অমূল্যধন। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি এই রকম : ‘বাগ্যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।’ ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে অক্ষর হচ্ছে বাক্যের অণু। একটি শব্দ ভাঙলে তা থেকে পাওয়া যাবে কয়েকটি অক্ষর। ‘জননী’ শব্দে অক্ষর আছে ৩টি—জ-ন-নী, ‘শরৎ’ শব্দে আছে ২টি অক্ষর—শ-রৎ। ‘গুঞ্জন’ শব্দেও ২টি অক্ষর—গুন্-জন। এই ৩টি শব্দ ভেঙে যেসব টুকরো পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটিতেই আছে দুটি বা তিনটি করে ধ্বনি এবং তার উচ্চারণ হচ্ছে এককোঁকে (জ = জ-অ, ন = ন্-অ, নী = ন্-ই, শ = শ্-অ, রৎ = র্-অ-ৎ, গুন্ = গ্-উ-ন্, জন্ = জ্-অ-ন্)। এই ৭টি অক্ষরের মধ্যে ২টি শ্রেণি লক্ষ্য করুন। জ-ন-নী-শ—এদের শেষ ধ্বনিটি স্বরধ্বনি (অ-অ-ই-অ), রৎ-গুন্-জন্—এদের শেষে আছে ব্যঞ্জনধ্বনি (ৎ-ন্-ন্)। অমূল্যধন শ্রেণিদুটির নাম দিলেন ‘স্বরান্ত’ (শেষে স্বরধ্বনি আছে বলে) আর ‘হলন্ত’ (শেষে যার ব্যঞ্জনধ্বনি)। তবে অক্ষরের শেষধ্বনি যৌগিক স্বর হলেও তাকে হলন্ত-ই বলা হবে। যেমন ‘ভাসাই’ = ভাসাই—এখানে ‘ভা’-র শেষধ্বনি মৌলিক স্বর (আ) বলে এটি স্বরান্ত, আর ‘সাই’-এর শেষধ্বনি যৌগিক স্বর (আই) বলে এটি হলন্ত। অতএব, স্বরান্ত অক্ষরের শেষধ্বনি কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যৌগিক স্বর।

প্রবোধচন্দ্র Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘অক্ষর’ কথাটির বদলে ‘দল’ কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে ‘বাক্যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড’। ‘দল’ ‘ছন্দ’ আর ‘ছান্দসিক’ শব্দতিনটি ভেঙে তিনি দেখালেন ১টি (দল), ২টি (ছন্দ-দ) আর ৩টি (ছান্দ-দ-সিক) দল। প্রতিটি দলে থাকবে

একটিমাত্র স্বরধ্বনি (মুক্ত বা বৃন্দ যা-ই হোক), ব্যঞ্জন থাক বা না-থাক। ‘অসি’, ‘আতা’, ‘ইতি’—এই ৩টি শব্দের প্রথমেই আছে একটিমাত্র মুক্তস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (অ-আ-ই), ‘ঐকান্তিক’ ‘ঔদরিক’ ‘আইবুড়ো’—এই ৩টি শব্দের প্রথমে রয়েছে একটিমাত্র বৃন্দস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (ঐ-ঔ-আই) ‘অগ্-নি’, ‘আল্-তা’, ‘ইন্-দু’ শব্দের প্রথম দলে (অগ্-আল্-ইন্) রয়েছে ১টি মুক্ত স্বরধ্বনি (অ-আ-ই) আর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (গ্-ল্-ন্)। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম মুক্তদল ; আর, যে দলের শেষে বৃন্দস্বর (বে = ব্-ঐ, গৌ = গ্-ঔ, সাই = স্-আই) বা ব্যঞ্জনধ্বনি (অ-গ্, আ-ল্, ই-ন্), তার নাম বৃন্দদল।

লক্ষ্য করুন, অমূল্যধনের ‘অক্ষর’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘দল’ একই। অমূল্যধনের ‘স্বরাস্ত্র অক্ষর’-ই প্রবোধচন্দ্রের ‘মুক্তদল’, আর অমূল্যধনের ‘হলস্ত্র অক্ষর’ প্রবোধচন্দ্রের কাছে ‘বৃন্দদল’। কাজের সুবিধার জন্য আমরা ‘দল’ কথাটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, এবং সাধ্যমতো সব বৃন্দদলই মোটা হরফে দেখানো হবে।

## ২৩.৩.৪. মাত্রা, কলা

১. দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে
২. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসী ঘুম দিয়ে যাও
৩. বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
৪. ঈশানের পুঞ্জমেঘ অশ্ববেগে ধেয়ে চলে আসে
৫. জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা

৫টি কবিতা থেকে ৫টি ছত্র নেওয়া হল। প্রথম ছত্রটি উচ্চারণ করতে থাকুন। উচ্চারণ হবে এইরকম—‘দু-নদুভি বেজে ওঠে ডি-ম্ ডি-ম্ রবে’। অর্থাৎস ‘দুন্’ ‘ডিম্’ ‘ডিম্’—এই ৩টি হলস্ত্র অক্ষর বা বৃন্দদলের উচ্চারণ হবে টেনে টেনে, আর দু ভি বে জে ও ঠৈ র বে — এই ৮টি স্বরাস্ত্র অক্ষর বা মুক্তদলের উচ্চারণ হবে কেটে কেটে। এবার দ্বিতীয় ছত্রটি উচ্চারণ করুন। একই বৃন্দদল ‘ঘুম্’-এর দুবার উচ্চারণ হচ্ছে দুভাবে—প্রথম ‘ঘুম্’-এর উচ্চারণ পা ডা নি মুক্তদল তিনটির মতোই কেটে কেটে—ঘুম্-পা-ডা-নি, দ্বিতীয় ‘ঘুম্’-এর উচ্চারণ ‘ঘু-ম্’ বা ‘ঘুউম্’—অর্থাৎ খানিকটা টেনে। তৃতীয় ছত্রে দলগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করুন বিষ-টি প-ড়ে টা-পূর্ টু-পূর্ ন-দেয় এ-ল বান্—১৩টি দলই উচ্চারিত হল একইভাবে কেটে কেটে, এর মধ্যে বিষ্ পূর্ পূর্ দেয় বান্—এই ৫টি বৃন্দদল, বাকি ৮টি মুক্তদল। চতুর্থ ছত্রে দেখুন ঃ নে-র্ মে-ঘ্ দলদুটি বৃন্দদল, উচ্চারণ টেনে টেনে ; পুন্ অন্ দলদুটিও বৃন্দদল, কিন্তু উচ্চারণ কেটে কেটে (পুন্-জ্, অন্-ধ) ; প্রতিটি মুক্তদলেরই কাটা-কাটা উচ্চারণ। পঞ্চম ছত্রে একমাত্র বৃন্দদল ‘ভাগ্’ বাদে আর প্রতিটি দলই মুক্তদল (বা স্বরাস্ত্র অক্ষর)। কিন্তু, ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে দেখুন—না হে ভা ধা তা মুক্তদল হলেও তাদের উচ্চারণ টেনে টেনে, বাকি মুক্তদলগুলির উচ্চারণ কেটে কেটে। ‘ভাগ্’ অবশ্য বৃন্দদল (ভা-গ্ গ) এবং তার উচ্চারণ টেনে।

দেখা গেল, উদ্ভূত ৫টি ছত্রে সব শব্দ ১৬টি বৃন্দদল (বা হলস্ত্র অক্ষর), এর মধ্যে ৯টির উচ্চারণ কেটে

কেটে, ৭টির উচ্চারণ টেনে টেনে ; অন্যদিকে সর্বমোট ৫৮টি মুক্তদলের (বা স্বরাস্ত্র অক্ষরের) মধ্যে ৫৩টির উচ্চারণ কেটে কেটে, মাত্র ৫টির উচ্চারণ একটুখানি টেনে। এই হিসেব থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, মুক্তদলের সাধারণ কাটা-কাটা উচ্চারণ, কিন্তু বৃন্দদের উচ্চারণ দুভাবেই হতে পারে। কোন্ দলের উচ্চারণ কীরকম হবে, সে কথায় আমরা পরে আসব। তার আগে বুঝে নিই, এই দু-রকমের উচ্চারণে আসল তফাত-টা কী।

প্রথম ছত্রের ‘দুন্দুভি’ কথাটি আর একবার উচ্চারণ করে দেখুন। এর ৩টি দলের উচ্চারণ দু-ন্ দু ভি—‘দু-ন্’ এর এই টানা উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগে, ‘দু’ বা ‘ভি’-র উচ্চারণে সময় লাগে তার চেয়ে কম। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ‘ঘুম’-এর কাটা-কাটা উচ্চারণ যেন একটু আচমকা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তুলনায় দ্বিতীয় ‘ঘু-ম্’-এর উচ্চারণ হয় একটু টেনে, খানিকটা বাড়তি সময় নিয়ে। দল মুক্ত হোক বা বৃন্দ হোক, কেটে কেটে উচ্চারণ সব ক্ষেত্রেই সব কম সময় নিয়ে, আর টেনে টেনে উচ্চারণ হলেই সময়ের ব্যয় হবে একটু বেশি। দলের উচ্চারণ-কালের এই কম-বেশিকে একটা হিসেবের মধ্যে ধরার জন্য এক ধরনের একক (Unit) তো চাই অনেকটা সেকেন্ড মিনিটের মতো। ছন্দ-বিজ্ঞানে এই এককই হল মাত্রা। এর অর্থ পরিমাণ বা মাপ, ছন্দের আলোচনায় এর অর্থ দল-উচ্চারণের মাপ। দলের উচ্চারণ যেখানে কাটা-কাটা, সময়ের ব্যয় সেখানে তুলনায় কম—দল সেখানে ১-মাত্রার। আর দলের উচ্চারণ সেখানে টেনে টেনে, তুলনায় একটু বেশি সময় নিয়ে,—সেখানে দল ২-মাত্রার।

এবারে চলুন ছান্দসিকদের দরবারে। অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনিপরিমাণ। ‘মাত্রা’ নিয়ে দুই শীর্ষ ছান্দসিকের বিতর্ক যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন বিতর্ক এড়িয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার ‘মাত্রা’-কে দলের ‘ওজন’ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। আমরা অবশ্য খানিকটা অমূল্যধন-ঘেঁষা সময়ের মাপের দিকেই ঝুঁকছি, তবে সেই সঙ্গে দলের উচ্চারণের চরিত্রটিও মাথায় রাখছি (কেটে-কেটে উচ্চারণ আর টেনে-টেনে উচ্চারণ)। কেটে-কেটে উচ্চারণে সময় কম লাগে, টেনে-টেনে উচ্চারণে সময় লাগে বেশি।

একটু আগে বলেছিলাম, মুক্তদলের উচ্চারণ সাধারণত কাটা-কাটা, আর বৃন্দদের উচ্চারণ কেটে কেটেও হয়, টেনে টেনেও হয়। এ কথার অর্থ—মুক্তদল সাধারণত ১-মাত্রার, আর বৃন্দদল ১-মাত্রার বা ২-মাত্রার। ঠিক কোন্ বৃন্দদলে ১-মাত্রা বা ২-মাত্রা, অথবা কোন্ অবস্থায় মুক্তদলে ২-মাত্রা, এসব নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। তবে, কোন্ অক্ষরে বা দলে কত মাত্রা, এ নিয়ে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্র কার্যত কোনও বিরোধ নেই।

‘মাত্রা’র কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই যে ৫টি ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তর্গত দলগুলি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি এবং প্রতিটি দলের মাথায় মাত্রা-চিহ্ন বসিয়ে দিচ্ছি (যে-দলের উচ্চারণ ১-মাত্রায় তার মাথায় ১, যে-দলের উচ্চারণ ২-মাত্রায় তার মাথায় ২)। দলের ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে (হয় কেটে কেটে না-হয় টেনে টেনে) তার মাথায় বসানো মাত্রা সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে ছত্রগুলি একটা-একটা করে পড়তে চেষ্টা করুন।

১.	২	১	১	১	১	১	১	২	২	১	১			
	দু-ন্	দু	ভি	বে	জে	ও	ঠে	ডি-ন্	ডি-ন্	র	বে			
২.	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১			
	ঘুন্	পা	ড়া	নি	মা	সী	পি	সী	ঘু-ন্	দি	য়ে	যাও		
৩.	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১	১		
	বিষ্	টি	প	ড়ে	টা	পুর্	টু	পুর্	ন	দেয়	এ	ল	বান্	
৪.	১	১	২	১	১	২	১	১	১	১	১			
	ঈ	শা	নে-র্	পুন্	জ	মে-ঘ	অন্	ধ	বে	গে				
				১	১	১	১	১	১	১				
				ধে	য়ে	চ	লে	আ	সে					
৫.	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	২			
	জ	ন	গ	ণ	ম	ন	অ	ধি	না	য়	ক	জ	য়	হে
				২	১	১	২	১				১	২	২
				ভা	র	ত	ভা-গ্	গ				বি	ধা	তা

চেনার সুবিধার জন্য বুদ্ধদলগুলি মোটা হরফে ছেপে দেওয়া হল।

এবারে লক্ষ্য করুন—

প্রথম ছত্রে প্রতিটি মুক্ত দলে ১-মাত্রা, প্রতিটি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

দ্বিতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ১টি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

তৃতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, প্রতিটি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

চতুর্থ ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

পঞ্চম ছত্রে প্রতিটি হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

‘মাত্রা’র আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, মুক্তদল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১-মাত্রার, কম ক্ষেত্রেই ২-মাত্রার। বুদ্ধদল ১-মাত্রার হতে পারে, ২-মাত্রারও হতে পারে। ১-মাত্রার দলে হ্রস্ব উচ্চারণ, ২-মাত্রার দলে দীর্ঘ উচ্চারণ—সে দল মুক্ত হোক বা বুদ্ধ রোগ। অর্থাৎ, মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, দুটি-একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ হতে পারে, বুদ্ধদল হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিই, উচ্চারণ করে বুঝে নিন—

	১ ১	১ ১	২	২	১ ১	১ ১	২
১.	চলি	চলি	পা	পা	টলি	টলি	যায়
	১ ১ ১ ১	১ ১ ২			১ ১ ২		১ ১
২.	ভালোমন্দ	দুখসুখ			অন্ধকার		আলো

প্রথম দৃষ্টান্তে চ লি চ লি ট লি ট লি—প্রতিটি মুক্তদল হ্রস্ব, কিন্তু পা পা—দুটি মুক্তদল দীর্ঘ। আবার, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মন্ দুক্ অন্—তিনটি বৃন্দদল হ্রস্ব, কিন্তু সুখ কার—দুটি বৃন্দদলই দীর্ঘ।

দল হ্রস্ব হয় তখনই, যখন তার ভেতরকার ধ্বনি একটুখানি কুঁচকে যায়। আর, দলের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ ধ্বনিগুলির আয়তনে বেড়ে যাওয়া। এইরকম একটি কোঁচকানো বা হ্রস্ব দলের সমপরিমাণ ধ্বনির নাম প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন কলা। অর্থাৎ একটি হ্রস্বদলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, একটি দীর্ঘদলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। ওপরের দৃষ্টান্ত-দুটিতে ১-মাত্রার প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, মাত্রা আর কলার সম্পর্কটা দাঁড়াল এই রকম—প্রতিটি হ্রস্ব দলে থাকে প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ১-কলা, অমূল্যধনের হিসেবে ১-মাত্রা ; প্রতি দীর্ঘ দলে এঁদের হিসেবে ২-কলা বা ২-মাত্রা। অর্থাৎ, মাত্রা আর কলা কার্যত একই।

### ২৩.৩.৫ ছেদ, যতি

গোড়ার দিকে ছন্দের সংজ্ঞা নিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের কথাটি আর একবার শুনো নিন। তাতে আছে ‘উচ্চারণ’ আর ‘বিরাম’-এর উল্লেখ। এই ‘বিরাম’ বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে থামাটাই কখনো ছেদ, কখনো যতি। গদ্য-পদ্য যা-ই হোক, পড়তে পড়তে বা উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে কম বা বেশি থামতে হয় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণ—না থামলে কথার অর্থ শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, দ্বিতীয় কারণ—না থামলে দমে কুলোয় না, তৃতীয় কারণ—থামলে কথা শুনতে ভালো লাগে। প্রথম আর দ্বিতীয় কারণ মূলত গদ্য পড়ার ক্ষেত্রে, কখনো কখনো পদ্যের ক্ষেত্রে খাটে, তৃতীয় কারণটি খাটে মূলত পদ্য পড়ার ক্ষেত্রে। প্রথম দুটি কারণে যে-থামা, তার নাম ছেদ, তৃতীয় কারণে থামার নাম যতি। তার মানে, গদ্য পড়তে পড়তে অর্থ-বুঝে-নেওয়া আর দম-ঠিক-রাখার দায়িত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে অনিয়মিত থামা—এর নাম ছেদ, আর কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম যতি।

নীচের গদ্যটুকু পড়ুন—

‘এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চারমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বানপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকতে,



সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ থেকে নেওয়া এই গদ্য অংশ এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কতটা কষ্টসাধ্য, তা একটিবার পরীক্ষা করে দেখুন। আর, তেমন পড়ায় এ অংশে প্রসবণগিরির যে বর্ণনা রয়েছে, তাও স্পষ্ট হবে না। সেই কারণে লেখক নিজেই দাঁড়ি-সেমিকোলন-কমা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কোথায় কতটুকু থামতে হবে। কমা কম থামার চিহ্ন আর দাঁড়ি সেমিকোলন পুরো থামার চিহ্ন। এই থামাটাই ছেদ। ছেদচিহ্নগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় ছেদগুলি কতটা অনিয়মিত। ছেদের দ্বারা বিভক্ত ৭টি অংশ মাপে অনেকখানি ছোটো-বড়ো।

এবারে নীচের পদ্যটুকু পড়ুন—

দিনের আলো | নিবে এল | সূর্যি ডোবে | ডোবে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | চাঁদের লোভে | লোভে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

প্রথম ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম-থামা, শেষে পুরো থামা।

দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম থামা, শেষে পুরো থামা।

প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ৩-বার করে থামার ফলে ৪টি করে টুকরো হল। প্রথম ৩টি টুকরো সমান মাপের (প্রতিটি ৪-মাত্রার), শেষেরটি ছোট (২-মাত্রার)। অর্থাৎ, এক-একটি ছত্র উচ্চারণ করার ফাঁকে ফাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে (এখানে ৪-মাত্রার পরে) নিয়মিত থামছি, শেষে আরো ২-মাত্রার উচ্চারণের পর পুরোপুরি থামছি। এই থামাটাই যতি। যতির পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন, শুনতে ভালোলাগার আকাঙ্ক্ষা। অতএব, ছন্দ বুঝতে গেলে ‘যতি’-কেই নিখুঁতভাবে চিনতে হবে, ‘ছেদ’-কে তোয়াক্কা না করলেও চলবে।

অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। এক-একটি ছত্রের মাঝখানে একদাঁড়ি (।)-চিহ্ন দিয়ে দেখানো কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি, জোড়াদাঁড়ি (।।)-চিহ্নে দেখানো পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি। প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির ১০টি নাম—অনুযতি বা দলযতি, উপযতি বা উপপর্বযতি, লঘুযতি বা পর্বযতি, অর্ধযতি বা পদযতি, পূর্ণযতি বা পঙ্ক্তিযতি। এর মধ্যে ৩টি নাম আমাদের কাজে ব্যবহার করা হবে—পর্বযতি (অমূল্যধনের অর্ধযতি), পদযতি আর পঙ্ক্তিযতি (পূর্ণযতি)। এদের পরিচয় ক্রমশ জানবেন।

### ২৩.১.৪. সারাংশ-১

**ছন্দ :** বাংলা কবিতার পদ্যে কথার পর কথা এমনভাবে সাজানো থাকে যে, কথার উচ্চারণ আর বিরাম পর পর একইভাবে ঘুরে ঘুরে আসে। এই কথা-সাজানো আর সাজানোর কৌশল বা শৃঙ্খলা—এই নিয়েই তৈরি হয় বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

**বর্ণ, ধ্বনি :** লিখতে গিয়ে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়, তার নাম হরফ বা বর্ণ। আর, বর্ণের উচ্চারিত রূপের নাম ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। অর্থাৎ, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, পড়া হয় ধ্বনি দিয়ে।

বাংলা কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, পাঠক উচ্চারণ করেন ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রবোধচন্দ্র বাংলা বর্ণ আর ধ্বনিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, বৃন্দস্বর আর ব্যঞ্জন। অমূল্যধন ভাগ করেছেন ২টি শ্রেণিতে—স্বর আর ব্যঞ্জন, স্বরের ২টি ভাগ—মৌলিক আর যৌগিক। প্রবোধচন্দ্রের মুক্তস্বর আর অমূল্যধনের মৌলিক স্বর প্রায় এক, বৃন্দস্বর আর যৌগিক স্বরেও তেমন পার্থক্য নেই।

**অক্ষর, দল :** বাগ্যন্ত্রের একেবারের চেষ্ঠায় যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, অমূল্যধন তাকে বলেন ‘অক্ষর’, প্রবোধচন্দ্র বলেন ‘দল’। যেসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তার নাম অমূল্যধনের ভাষায় ‘স্বরান্ত অক্ষর’। অক্ষরের শেষধ্বনি ব্যঞ্জন বা যৌগিক স্বর হলে তিনি তাকে বলেন ‘হলন্ত অক্ষর’। অন্যদিকে, প্রবোধচন্দ্রের ভাষায়—দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর হলে তা ‘মুক্তদল’, আর বৃন্দস্বর বা ব্যঞ্জন বলে তার নাম ‘বৃন্দদল’। অতএব, যা ‘অক্ষর’ তা-ই ‘দল’, যা ‘স্বরান্ত অক্ষর’ তা-ই ‘মুক্তদল’, যা ‘হলন্ত অক্ষর’ তাই ‘বৃন্দদল’।

**মাত্রা, কলা :** ‘মাত্রা’ কথাটির সাধারণ অর্থ পরিমাণ বা মাপ। ছন্দের আলোচনায় এর অর্থ দল বা অক্ষর উচ্চারণের মাপ, অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভাষায় ‘দলের ওজন’। যে দলের উচ্চারণ কেটে কেটে, তার মাপ বা ওজন কম—দল সেখানে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার। যে দলের উচ্চারণ টেনে টেনে, তার মাপ বা ওজন তুলনায় বেশি—দল সেখানে দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর সাধারণত ১-মাত্রার, বৃন্দদল বা হলন্ত অক্ষর কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার।

অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কাল পরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনি-পরিমাণ। দলের ভেতরকার ধ্বনি কুঁচকে গেলে দল হয় হ্রস্ব। এই রকম হ্রস্ব দলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা। দলের ধ্বনি আয়তনে বাড়লে দল হয় দীর্ঘ, এ রকম দলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, অমূল্যধনের ‘মাত্রা’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘কলা’-র মধ্যে কার্যত কোনও পার্থক্য নেই।

**ছেদ, যতি :** কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝে নেওয়া আর দাম ঠিক রাখা—এই ২টি প্রয়োজনে গদ্য বা পদ্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে অনিয়মিত যে থামা, তার নাম ‘ছেদ’। আর, কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নিয়মিত যে থামা, তরা নাম ‘যতি’। ছেদের জায়গা বোঝানোর জন্য

২-রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়—কম থামার চিহ্ন কমা (,) আর পুরো থামার চিহ্ন দাঁড়ি ;  
সেমিকোলন (।;) ইত্যাদি। অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—কম থামার নাম  
অর্ধযতি, পুরো থামার নাম পূর্ণযতি। অর্ধযতির চিহ্ন (।), পূর্ণযতির চিহ্ন (।।)।

### ২৩.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৩ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন :

ছন্দ, দল, মাত্রা।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন :

বর্ণ আর ধ্বনি, মাত্রা আর কলা, ছেদ আর যতি।

২. (ক) ছন্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(খ) ছন্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(গ) প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কীভাবে দল বা অক্ষরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা লিখুন :

স্বরান্ত অক্ষর, হলন্ত অক্ষর, মৌলিক স্বর, যৌগিক স্বর।

(খ) নীচের ৪টি ছত্রে প্রতিটি দল পৃথক করে দেখান এবং জলের মাথায় মাত্রা-সংখ্যা বসিয়ে দিন :

i) বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান

ii) সান্দ্য বসুধরা তন্দ্রা হারায়

iii) ঝর্ণা, ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা

iv) বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়

(গ) অর্ধযতি আর পূর্ণযতির চিহ্ন বসিয়ে দিন :

i) কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল

মঞ্জুরী চীরহি ঝাঁপি

ii) আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে

মুঞ্চললিত অশ্রুগলিত গীতে

- iii) হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
- iv) যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
- (ঘ) শূন্যস্থান পূরণ করুন :
- i) \_\_\_\_\_ চোখে দেখার জিনিস, \_\_\_\_\_ কানে শোনার জিনিস।
- ii) মাত্রাকে অমূল্যধন বলেন \_\_\_\_\_, প্রবোধচন্দ্র বলেন \_\_\_\_\_।
- iii) \_\_\_\_\_ র সমপরিমাণ ধ্বনির নাম কলা।
- iv) \_\_\_\_\_ র পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন।
- v) কথার অর্থ শ্রোতার কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য যে থামা, তার নাম \_\_\_\_\_।

## ২৩.৬ মূলপাঠ : ছন্দের নানা বিভাগ

এত সমুদ্র জল টুকরো করতে করতে শেষপর্যন্ত এক ফোঁটা জল হাতে তুলে নেওয়া হয়। নোনা জলের নুনটুকু সরিয়ে বিশুদ্ধ জলের ফোঁটাকেও ভাঙতে ভাঙতে জলের অণু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেনা। এমন কী, ঐ অণুটিকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণুও পেয়ে যেতে পারেন। একইভাবে একটি কবিতাকে যদি টুকরো করতে থাকেন, তাহলে পৌঁছে যাবেন একটি অক্ষর বা দলের (Syllable) উচ্চারণে, আর, দলটিকেও ভাঙলে পাওয়া যাবে কয়েকটি ধ্বনি। দল যেন কবিতার অণু, ধ্বনি তাহলে পরমাণু। উল্টোদিক থেকে ভাষা যায় কয়েকটি পরমাণু মিলেমিশে যেমন অণুর গঠন, অসংখ্য অণুর জোড় লেগে যেমন এক-একটি পদার্থ তৈরি হতে পারে, তেমনি করে কয়েকটি ধ্বনির এক ঝাঁকে উচ্চারণে দল, আর দলের পর দলের উচ্চারণ হতে হতেই অবশেষে একটি গোটা কবিতার উচ্চারণ কানে বেজে ওঠে। এই ধ্বনির উচ্চারণ থেকে কবিতার উচ্চারণ হয়ে ওঠার পথে নানারকম ছন্দ-বিভাগ পেরোনোর ঘটনা ঘটে যায়। এই বিভাগগুলি চিনে নেওয়াই আমাদের এখনকার কাজ। উচ্চারণে প্রথম ধাপে ‘ধ্বনি’ আর ‘দল’ (বা ‘অক্ষর’)-কে ছন্দের মূল উপাদান হিসেবে আপনারা জেনেছেন। এবারে ক্রমে ক্রমে জেনে নিন পরের বিভাগগুলির কথা—ছন্দসিকেরা যাদের নাম দিয়েছেন, পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব, পর্ব বা পদ, চরণ বা পঙ্ক্তি, শ্লোক বা স্তবক। সেইসঙ্গে ক্রমশ বুঝে নিন—যাতে কীভাবে উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দ-বিভাগ বলে চিনিয়ে নেয়।

### ২৩.৬.১ পর্ব, পদ

রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্য থেকে ‘বিস্তি পড়ে টাপুর টুপুর’ কবিতার প্রথম ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

দিনের আলো । নিবে এল । সূর্য্য ডোবে । ডোবে ॥ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

পর পর ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে কম-থামার জায়গাগুলি আর শেষে একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) দিয়ে পুরো-থামার জায়গাটি চিহ্নিত করা হল। এর ফলে কবিতার ছত্রটি ৪টি টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল—৩টি সমান, শেষেরটি ছোটো। এই এক-একটি টুকরোই এক-একটি পর্ব। ‘পর্ব’ নিয়ে আরো বিশদ আলোচনায় একটু পরে আসছি। যে ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে ছত্রটিকে ৪টি পর্বে ভাগ করা হল তাকে অমূল্যধন বলেন ‘অর্ধযতি’-র চিহ্ন, প্রবোধচন্দ্র বলেন ‘পর্বযতি’-র চিহ্ন। ছত্রশেষের একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) অমূল্যধনের দেওয়া নাম ‘পূর্ণযতি’-র চিহ্ন। পরপর ২টি যতির মাঝখানে রয়েছে এক-একটি পর্ব।

প্রথম ৩টি পর্ব যে সমান তার কারণ, প্রতিটি পর্বেই আছে ৪টি করে মাত্রা। প্রতিটি দলের মাথায় ১ বসিয়ে মাত্রা নির্দেশ করছি, উচ্চারণ করে করে প্রতিটি দলের ১-মাত্রা বুঝে নিতে চেষ্টা করুন—



কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি আর পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি—অমূল্যধনের হিসেবমতো এই ২-রকম থামা বা যতির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ্য করলেন আর এক রকমের থামা বা যতি, যা কম-থামার চেয়ে একটু বেশি, অথচ পুরো-থামার চেয়ে একটু কম। এর নাম ‘পদযতি’। অমূল্যধনের অর্ধযতিকে প্রবোধচন্দ্র বলেন পর্বযতি। অর্ধযতি বা পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখায়। তেমনি পদযতির কাজ পদ-বিভাগ করে দেখানো। পদযতি পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামায়। একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে অমূল্যধন দেখান পূর্ণযতি, প্রবোধচন্দ্র দেখান পদযতি। ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’-এর ছত্রটিতে (।) চিহ্ন দিয়ে দেখানো পদযতিটি চিনে নিন। ক্রমশ বুঝে নিন পদ-বিভাগের তত্ত্ব, পর্ব আর পদের পার্থক্য—

$$\begin{array}{c} ১ ১ \quad ১ ১ \quad | \quad ১ \quad ১ \quad ১ \quad ১ \quad || \quad ১ \quad ১ \quad | \quad ১ \quad ১ \quad | \quad ১ \quad ১ \\ \text{দিনের অলো} \quad | \quad \text{নিবে এল} \quad || \quad \text{সুজ্ জি} \quad | \quad \text{ডোবে} \quad | \quad \text{ডোবে} \quad = (৪ + ৪) + (৪ + ২) \end{array}$$

পদযতি (||) এখানে ছত্রটিকে ২টি খণ্ডে ভাগ করেছে, এক-একটি খণ্ড এক-একটি ‘পদ’। প্রথম পদ তৈরি হয়েছে ২টি সমান মাপের পর্ব নিয়ে (৪+৪), দ্বিতীয় পদ তৈরি হয়েছে ২টি ছোটো-বড়ো পর্ব নিয়ে (৪+২)। অতএব, পর্বের চেয়ে ‘পদ’ বড়ো মাপের খণ্ড। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয়ে এক-একটি ‘পদ’। ছত্রটিতে আছে ৪টি পর্ব, কিন্তু ২টি পদ।

লক্ষ্য করুন, ওপরের ছত্রটিতে পর্বের মাপ অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবমতো একই (প্রথম ৩টি ৪-মাত্রার, শেষেরটি ২-মাত্রার)। অতএব, অমূল্যধনের ২টি করে ‘পর্ব’ নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রবোধচন্দ্রের এক-একটি ‘পদ’।

এবারে পড়ুন ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যেরই আর-একটি কবিতা ‘প্রাণ’-এর দ্বিতীয় ছত্রটি—

‘মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’।

ছত্রটির পর্ব-বিভাগ আর পদ-বিভাগ প্রবোধচন্দ্র করবেন এইভাবে—

$$\begin{array}{c} ১ ১ ২ \quad | \quad ১ ১ \quad ১ ১ \quad || \quad ১ ১ ১ ১ \quad | \quad ২ \\ \text{মানবের} \quad | \quad \text{মাঝে} \quad \text{আমি} \quad || \quad \text{বাঁচিবারে} \quad | \quad \text{চাই} \quad = (৪+৪) + (৪+২) \end{array}$$

প্রথম ৩টি পর্বের মাপ ৪-মাত্রা করে, শেষপর্ব ২-মাত্রার। আর প্রথম পদটির মাপ ৮-মাত্রা (৪+৪), দ্বিতীয় পদের মাপ ৬-মাত্রা (৪+২)।

অন্যদিকে, অমূল্যধনের পর্ব-বিভাগ হবে এইরকম—

$$\text{মানবের} \quad \text{মাঝে} \quad \text{আমি} \quad | \quad \text{বাঁচিবারে} \quad \text{চাই} \quad || \quad = ৮+৬$$

প্রথম পর্ব ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ৬-মাত্রার।

ওপরের ছত্রটির ছন্দ-বিভাগ থেকে প্রবোধচন্দ্রের ‘পর্ব’ আর ‘পদ’-এর সঙ্গে অমূল্যধনের পর্বের সম্পর্ক বিষয়ে ২টি কথা লক্ষ করুন :

- (১) পূর্ণপর্ব প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে এখানে ৪-মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ৮-মাত্রার। অর্থাৎ, দুই ছন্দসিকের পর্বের মাপ দু-রকম।
- (২) প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২ টি পদ ৮ আর ৬ মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ২ টি পর্ব ৮ আর ৬ মাত্রার। অর্থাৎ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে যা ‘পদ’, অমূল্যধনের কাছে তা ‘পর্ব’।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই : ‘পর্ব’ আর ‘পদ’ নিয়ে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের হিসেবে আছে কিছু মিল, কিছু গরমিল। দুজনের ‘পর্ব’ কখনও সমান, কখনো ছোটো-বড়ো। সেই কারণে, প্রবোধচন্দ্রের ‘পদ’ কখনো অমূল্যধনের ‘পর্বের সমান, কখনো বড়ো। ‘পদ’-এর কথা অমূল্যধন ভাবেননি।

### ২৩.৬.২ পর্বাঙ্গ, উপপর্ব

‘পর্ব’, সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে গেল। বোঝা গেল, কবিতার একটি ছত্র উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে যে যতি পড়ে (অর্থাৎ থামতে হয়), সেই যতির জায়গাটিতে এক-একটি পর্ব তৈরি হতে থাকে। পর্বগুলি পাশাপাশি সমান হবার কথা, তবে শেষপর্ব ছোটো (বা বড়ো) হতে পারে।

এই ‘পর্ব’-কে মাঝখানে রেখে ছন্দসিকেরা একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে ছোটো, আর একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে বড়ো ছন্দ-বিভাগের কথাও ভেবেছেন। ছোটো মাপের বিভাগচাই আগে দেখুন। ‘দিনের আলো’ দিয়ে শুরু-করা ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

১ ১      ১ ১      |      ১ ১      ১ ১      |      ১ ১      ১ ১      |      ১ ১      ||  
 দিনের      আলো      |      নিবে      এল      |      সুজ্জি      ডোবে      |      ডোবে      ||

‘দিনের আলো’ পর্বটির ‘দিনের’ ‘আলো’—এই দুটি অংশে ভাগ হয়ে উচ্চারণ হচ্ছে। ফলে ৪-মাত্রার পর্বটি ২ + ২ মাত্রায় আবার ২ টি টুকরো হচ্ছে। একইভাবে ‘নিবে এল’ আর ‘সুজ্জি ডোবে’ পর্বদুটিও ২ + ২ মাত্রায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শেষের ‘ডোবে’ পর্বটি অবশ্য ২-মাত্রাতেই থেকে গেল, ভাগ হল না। পর্বের এই ভাগগুলিকে অমূল্যধন বলেন ‘পর্বাঙ্গ’ (= পর্বের অঙ্গ), প্রবোধচন্দ্র বলেন উপপর্ব (= পর্বের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বিভাগ)। ‘পর্বাঙ্গে’র চিহ্ন (:), ‘উপপর্বের চিহ্ন (::)। এই চিহ্ন দিয়ে ছত্রটি সাজিয়ে দেখুন—

পর্বাঙ্গ : দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্জি : ডোবে । ডোবে

উপপর্ব : দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্জি : ডোবে । ডোবে

অমূল্যধনের ‘পর্বাঙ্গ’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘উপপর্ব’ পর্বেরই এক-একটি ভাগ। কিন্তু, পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সবসময় হুবহু এক নয়। এর কারণ, অমূল্যধনের ‘পর্ব’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘পর্ব’ সবসময় মাপে এক হয় না। কেন হয় না তা আমরা পরে দেখব। ‘দিনের আলো’-র ছত্রটিতে অবশ্য প্রথম ৩ টি পর্ব দুজনের হিসেবেই সমান



মাপের (৪-মাত্রার), সে-কারণে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও সমান হতে পেরেছে (২-মাত্রার)। কিন্তু নীচের ছত্রটিতে দেখুন—

পর্বাঙ্গ : একা দেখি : কুল বধু | কে বট : আপনি || = (৪+৪) + (৩ + ৩)

উপপর্ব : একা : দেখি | কুল : বধু || কে বট : আপনি = (২+ ২) + (২+ ২) + (৩+ ৩)

অমূল্যধনের হিসেবে ছত্রটিতে ২ টি পর্ব, প্রথমটি ৮-মাত্রার। ৮-মাত্রার প্রথম পর্বে পাওয়া গেল ৪-মাত্রার ২ টি পর্বাঙ্গ। অথচ, ৮-মাত্রার এই পর্বটিই প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২ টি ৪-মাত্রার পর্বে ভাগ হল, ৪-মাত্রার এক-একটি পর্বে পাওয়া গেল ২-মাত্রার ২ টি করে উপপর্ব। ‘কে বট আপনি’-অংশটি অমূল্যধনের কাছে ৬-মাত্রার পর্ব, ভাগ হল ৩-মাত্রার ২ টি পর্বাঙ্গে। আর, এ অংশটি প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৬-মাত্রার একটি পদ, কিন্তু, সরাসরি এর ভাগ হল ৩-মাত্রার ২-টি উপপর্বে (পদটিকে পর্বে পর্বে ভাগ করা সম্ভব নয় বলে)। পর্বাঙ্গ-উপপর্বের মাপটাও সেই কারণেই সমান (৩-মাত্রার)। অতএব দেখলেন, একই কবিতার একই ছত্রে সব পর্বে মাপ ছান্দসিকদের কাছে সমান হয় না, তার ফলে পর্ব কেটে-কেটে-পাওয়া পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও অসমান হয়ে পড়ে।

এক-একটা পর্ব যে ২ টি-৩ টি টুকরোয় ভাগ হতে পারে, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে, পর্বের মাঝখানে সত্যিই থামতে হয় কিনা—অর্থাৎ যতি পড়ে কিনা এ বিষয়ে ছান্দসিকেরা একমত নন। অমূল্যধনের মতে পর্বের মাঝখানে যতি নেই, (:) চিহ্নটিও যতিচিহ্ন নয়)। প্রবোধচন্দ্রের মতে যতি অবশ্যই আছে, যতিই পর্বকে উপপর্বে ভাগ করে এবং সে-যতির নাম উপযতি।

### ২৩.৬.৩. চরণ, পঙ্ক্তি

পর্বের চেয়ে ছোটো ছন্দ-বিভাগের কথা হল। এবারে বড়ো বিভাগের কথা। একটু আগেই আমরা দেখলাম খতির আঘাতে ‘দিনের আলো’-র ছত্রটির ৪ টি পর্বে ভাগ হওয়ার এবং ছত্রটির শেষে পুরো থেমে যাওয়ার ঘটনা। এই পুরো থামার যতিকে বলা হয় ‘পূর্ণযতি’, আর শুরু থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম অমূল্যধনের কাছে চরণ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে পঙ্ক্তি। অর্থাৎ, পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকেই অমূল্যধন বলছেন ‘চরণ’, প্রবোধচন্দ্র বলেছেন ‘পঙ্ক্তি’। প্রবোধচন্দ্র এই কারণে ‘পূর্ণযতি’-কে আরো নির্দিষ্ট করে বললেন ‘পঙ্ক্তিযতি’। সেদিক থেকে ‘চরণ’ আর ‘পঙ্ক্তি’-র মধ্যে তফাত থাকার কথা ছিল না। কিন্তু, ‘চরণ’ বা ‘পঙ্ক্তি’র মাপ যে নির্দিষ্ট করে দেয়, সেই পূর্ণযতিই ঠিক কোথায় পড়বে (অর্থাৎ, পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে কোন্ পর্বের শেষে পুরোপুরি থামতে হবে)—এই নিয়ে ছান্দসিক দুজন সব সময় একমত নন। তার ফলেই ‘চরণ’ আর ‘পঙ্ক্তি’ কখনো কখনো পৃথক হয়ে যায়।

‘দিনের আলো’র ছত্রটি চরণ বটে, পঙ্ক্তিও বটে—এটা আমরা দেখলাম। সমান মাপের চরণ-পঙ্ক্তি আরো দুটি-একটি দেখা যাক।

১ম চরণ	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১		১ ২	১ ১ ১		= ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার
	মরিতে	চাহিনা	আমি		সুন্দর	ভূবনে		
২য় চরণ	১ ১ ২	১ ১	১ ১		১ ১ ১ ১	২		= ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার
	মানবের	মাঝে	আমি		বাঁচিবারে	চাই		
১ম পঙ্ক্তি	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১		১ ২	১ ১ ১		= ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার
	মরিতে	চাহিনা	আমি		সুন্দর	ভূবনে		
২য় পঙ্ক্তি	১ ১ ২		১ ১	১ ১		১ ১ ১ ১	২	= ৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪ মাত্রার
	মানবের		মাঝে	আমি		বাঁচিবারে	চাই	

এখানে মাত্রা বসেছে এই নিয়মে—প্রতি মুক্তদলে (বা স্বরাস্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের-প্রথমে-থাকা ‘সুন্’ বৃন্দদলেও (বা হ্রস্ব অক্ষরে) ১-মাত্রা, শব্দের-শেষে-থাকা প্রতি বৃন্দদলে ২-মাত্রা। লক্ষ করুন, ২টি ক্ষেত্রেই পূর্ণযতি (পুরো থেমে-যাওয়া) পড়ছে ছত্রের শেষে ১৪-মাত্রার পরে। অতএব, চরণ আর পঙ্ক্তির মাপে কোনো পার্থক্য রইল না। পার্থক্য কেবল এদের ছন্দ-বিভাগে। প্রথম চরণ ৮ + ৬ মাত্রার ২টি পর্বে ভাগ হয়ে গেছে, আর প্রথম পঙ্ক্তির ভাগ হয়েছে ৮ + ৬ মাত্রায় ২টি পদে। দ্বিতীয় চরণে ২টি পর্ব (৮ + ৬), কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ৪টি পর্ব (৪+৪+ ৪+২)।

এবারে দেখুন একটি পৃথক্ মাপের চরণ পঙ্ক্তির দৃষ্টান্ত—

১	১ ১	১ ২		১ ১ ২ ২		২ ১ ১	
এ	নহে	মুখর্		বনমর্মর্		গুন্জিত	
১	১	১ ১ ২		১ ১ ১	১ ২		১ ১ ১
এ	যে	অজাগর্		গরজে	সাগর্		ফুলিছে

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ২-বার পূর্ণযতি, তাই ২-টি চরণ। কিন্তু, প্রবোধচন্দ্র প্রথম ছত্রের শেষে পূর্ণযতি মানেন না, মানেন পদযতি। ২টি ছত্র পুরোপুরি উচ্চারণ করার পরে তিনি পুরো থামতে চান (কেবল ‘ফুলিছে’-র পর), তার আগে নয়। অতএব তাঁর হিসেবে ২টি ছত্র মিলে এখানে ২টি পঙ্ক্তি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য চরণ-পঙ্ক্তি সমান। যেখানে সমান নয়, সেখানে দেখা যাবে পঙ্ক্তির মাপ চরণের চেয়ে বড়ো। এর কারণ, পর্ব আর পঙ্ক্তির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র যে অতিরিক্ত ছন্দ-বিভাগ ‘পদ’ কল্পনা করে নিয়েছে, তা কখনো কখনো ‘চরণ’-এর সমান হয়ে যায়। আপনারা জানেন, কয়েকটি পর্ব মিলে তৈরি হয় ‘পদ’। তেমনি, কয়েকটি ‘পদ’ জুড়ে তৈরি হয় পঙ্ক্তি। একটু আগে ‘এ নহে মুখর্’-এর ২টি ছত্র মিলে যে একটি মাত্র পঙ্ক্তি তৈরি হল, তার কারণ এক-একটি ছত্র প্রবোধচন্দ্রের কাছে এক-একটি ‘পদ’ বলেই মনে হয়েছে, তার বেশি নয়। অর্থাৎ, প্রথম ছত্রের শেষে অমূল্যধন পুরোপুরি থামলেও (পূর্ণযতি) প্রবোধচন্দ্র পুরো

থামছেন না, পর্বের শেষে যতটুকু থামতে হয় (পর্বযতি) তার চেয়ে একটু বেশি থামছেন (পদযতি)।

ফলে এখানে অমূল্যধনের 'চরণ' হয়ে যাচ্ছে প্রবোধচন্দ্রের 'পদ'-এর সমান। অতএব, ২ টি 'পদ' নিয়ে তৈরি 'পঙ্ক্তি'

এখানে ২ টি 'চরণে'রই যোগ ফল। নীচে লক্ষ করুন—

২	১ ১	২	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১		= ৬ + ৬ + ৩ = ১৫
ঐ	আসে	ঐ	অতি	ভৈরব	হরষে		
১ ১ ২ ১ ১		১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১			
জলসিন্চিত		ক্ষিতি	সৌরভ	রভসে			= ৬ + ৬ + ৩ = ১৫
১ ১ ২ ১ ১		১ ১ ২ ১ ১		১ ১ ১			= ৬ + ৬ + ৩ = ১৫
ঘনগৌরব		নবযৌবনা		বরষা			
		১ ১ ২ ১ ১		১ ১ ১			= ৬ + ৩ = ৯
		শ্যামগম্ভীর		সরষা			

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ৪ টি ছত্রই ৪ টি চরণ। আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ৪ টি ছত্রে আছে ৪ টি পদ মিলে একটিমাত্র পঙ্ক্তি। প্রথম ৩ টি চরণের মাপ ১৫-মাত্রা করে, চতুর্থটি ৯-মাত্রার। পঙ্ক্তিটির মাপ ১৫ + ১৫ + ১৫ = ৪৫ মাত্রা। চরণ আর পদ সমান হলে প্রবোধচন্দ্রের একপদী পঙ্ক্তি ছাড়া আর সব পঙ্ক্তিই মাপে চরণের চেয়ে বড়ো হবে গণিতের নিয়ম মেনে।

### ২৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক

ছন্দ-বিভাগ নিয়ে যেটুকু কথা হল, তা থেকে এটা বোঝা যাবে, পর্ব আর চরণ এই ২ রকম মাপের বিভাগ থেকেই উচ্চারণ আর বিরামের বিন্যাসের শৃঙ্খলাটা ধরা পড়ে যায়। কবিতার পদ্য পড়তে গেলেই চলতে থাকে পর্বের পর পর্ব উচ্চারণ, মাঝখানে অর্ধযতি। পরপর কয়েকটি পর্বের উচ্চারণ হলেই পড়ে পূর্ণযতি, শেষ হয় একটি চরণের উচ্চারণ। আবার চলতে থাকে একইভাবে পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে আর-একটি চরণের উচ্চারণ আর-একটি পূর্ণযতি পর্যন্ত। এর সঙ্গে বাড়তি যে ২ টি বিভাগের কথা আপনারা জানলেন (পর্বের চেয়ে ছোটো মাপের 'পর্বাঙ্গ' বা 'উপপর্ব' আর পর্বের চেয়ে বড়ো মাপের 'পদ'), ছন্দের মূল চরিত্র এদের বাদ দিলেও বুঝে নেওয়া যাবে। আর, 'পদ' বাদ পড়লে 'পঙ্ক্তি'ও অবাস্তর হয়ে পড়ে। কেননা, 'পঙ্ক্তি'র ধারণা তৈরি হয় কয়েকটি 'পদে'র যোগফল হিসেবেই।

অতএব, কবিতা যখন পড়ি, তখন আমরা পর পর নির্দিষ্ট মাপের (মাত্রা সংখ্যার) চরণই একের পর এক উচ্চারণ করে যেতে থাকি। মনে রাখবেন, একটি কবিতার গোটা শরীরে যতগুলি চরণ ছড়ানো আছে, তাদের

ছন্দ-স্বভাব একটাই। সে-কারণে, কোনও কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য গোটা কবিতাই পড়ে পড়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কবিতার একটি অংশ এর জন্য বেছে নিলেই চলে। তবে, অংশটি এমন হওয়া চাই, যাতে থাকে মাপ বা মাত্রা সংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা পরপর কয়েকটি চরণ। এই রকম কয়েকটি চরণের গুচ্ছকে ছন্দসিকেরা বলেন স্তবক।

সাধারণভাবে 'স্তবক'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকী তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে, এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র একটু ভিন্ন কথা বলতে চান। তাঁর মতে 'স্তবক'র পঙ্ক্তি-সংখ্যা কমপক্ষে ৫ হওয়া চাই-ই। তার চেয়ে কম হলে তার নাম হবে শ্লোক, 'স্তবক' নয়। ৫ বা তার বেশি সংখ্যার পঙ্ক্তির গুচ্ছও তাঁর কাছে বড়ো মাপের শ্লোক-ই, কেবল তার বিকল্প নাম 'স্তবক'। আমরা অবশ্য চরণের যেকোনো গুচ্ছকেই বলব 'স্তবক'। নীচের 'স্তবক'গুলি উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন, পরপর সাজানো চরণগুলি মাত্রা সংখ্যায় শৃঙ্খলায় কিভাবে পরপর বাঁধা পড়ল এক-একটি 'স্তবক' তৈরি করেছে—

১. এ জগতে হয় | সেই বেশি চায় | আছে যার ভূরি | ভূরি || = ৬+৬+৬+২ = ২০  
রাজার হস্ত | করে সমস্ত | কাঙালের ধন | চুরি || = ৬+৬+৬+২ = ২০

২. নিত্ত তোমায় | চিত্ত ভরিয়া | স্মরণ করি || = ৬+৬+৬+২ = ২০  
অন্তবিহীন | বিজনে বসিয়া | বরণ করি || = ৬+৬+৫ = ১৭  
তুমি আছ মোর | জীবন-মরণ | হরণ করি || = ৬+৬+৫ = ১৭

৩. মরিতে চাহি না | আমি সুন্দর ভুবনে || ৮+৬ = ১৪  
মানবের মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই || ৮+৬ = ১৪  
এই সুরযকরে এই | পুষ্পিত কাননে || ৮+৬ = ১৪  
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে | যদি স্থান পাই || ৮+৬ = ১৪

৪. দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে || = ১০  
জাগিয়া উঠিল হাহারবে || = ১০

বুধ নিজ ভক্তগণে | শুধালেন জনে জনে।

ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা || = ৮+৮+১০ = ২৬

তোমরা লইবে বল কেবা || = ১০

১ম স্তবকে ২টি চরণ (৬+৬+৬+২ মাত্রার), ২য় স্তবকে ৩টি চরণ (৬+৬+৫ মাত্রার),

৩য় স্তবকে ৪টি চরণ (৮+ ৬ মাত্রার), ৪র্থ স্তবকে ৪টি চরণ (১০ মাত্রার ৩টি, ৮+৮+১০ মাত্রার ১টি)।

## ২৩.৭ সারাংশ-২

**পর্ব, পদ :** কবিতার ছত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে একটুখানি থামতে থামতে পুরো ছত্র পড়ে ফেলি। ফলে পুরো ছত্রটি কয়েকটি টুকরোয় ভাগ হয়ে যায়। এক-একটি টুকরোর নাম 'পর্ব'। সমান সমান মাত্রার পর থামলে পর্বের মাপও পরপর সমান হবে। এ রকম একই মাপের পর্ব পরপর ঘুরে ঘুরে এলে তার নাম 'পূর্ণপর্ব'। 'পূর্ণপর্বে'-র চেয়ে ছোটো মাপের পর্বের নাম 'অপূর্ণপর্ব', আর বড়ো মাপের পর্বের নাম 'অতিপূর্ণপর্ব'। কবিতার ছত্রের শুরুতে, কখনো কখনো মাঝখানে ছোটো মাপের এমন পর্ব মাঝে মাঝে কবিরা ব্যবহার করেন, যা ছন্দের হিসেবের বাইরে। এ রকম অতিরিক্ত এবং প্রায় অনাবশ্যিক পর্বের নাম 'অতিপর্ব'।

অমূল্যধনের অর্ধযতি বা প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে। এই অর্ধযতি বা পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামা, অথচ পূর্ণযতির চেয়ে একটু কম থামা প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করে তার নাম দিলেন পদযতি। এই পদযতি ছত্রকে যেসব খণ্ডে ভাগ করে, তার নাম 'পদ'। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয় 'পদ'।

কবিতার একই ছত্রে অমূল্যধনের পর্বের মাপ কখনো প্রবোধচন্দ্রের পর্বের সমান, কখনো তার চেয়ে বড়ো। তাই, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের পর্বের সমান, কখনো বড়ো।

## পর্বাঙ্গ, উপপর্ব :

১টি পর্বকে ২টি-৩টি ভাগে উচ্চারণ করে এক-একটি ভাগকে অমূল্যধন বলেন 'পর্বাঙ্গ', আর প্রবোধচন্দ্র বলেন 'উপপর্ব'। দুজনের পর্বের মাপ যখন সমান থাকে, সেই পর্বের পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও তখন সমান। কিন্তু, দুজনের পর্ব ছোটো-বড়ো হলে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও হবে ছোটো-বড়ো। আবার, পর্বে পর্বে ভাগ না-হয়ে সরাসরি কয়েকটি উপপর্বে ভাগ হয়ে যায়, প্রবোধচন্দ্রের এ রকম ১টি পদ যদি অমূল্যধনের পর্বের সঙ্গে সমান মাপের হয়, তাহলেও পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সমান হবে।

## চরণ, পঙক্তি :

পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকে অমূল্যধন বলেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পঙক্তি'। কবিতার কোনো কোনো ছত্রের শুরু থেকে সেই ছত্রের বা পরের কোনো ছত্রের শেষে-থাকা পূর্ণযতি পর্যন্ত যে ছন্দ-বিভাগ, তার নাম 'চরণ' বা 'পঙক্তি'। অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের পূর্ণযতি একই ছত্রের শেষে পড়লে 'চরণ' আর 'পঙক্তি' একই হবে, ভিন্ন ভিন্ন ছত্রের শেষে পড়লে চরণ-পঙক্তি পৃথক হবে।

প্রবোধচন্দ্রের পর্ব আর পঙক্তির মাঝামাঝি মাপের ছন্দ-বিভাগ পদ। কয়েকটি পদ জুড়ে তৈরি

হয় 'পঙ্ক্তি'। কখনো কখনো কবিতার এক-একটি ছত্র অমূল্যধনের কাছে তরণ হলেও প্রবোধচন্দ্রের কাছে তা এক-একটি পদ বলে গণ্য হতে পারে। তখনই পঙ্ক্তি হয়ে পড়ে চরণের চেয়ে বড়ো মাপের পৃথক ছন্দ-বিভাগ।

**স্তবক, শ্লোক :**

কোনো কবিতার এমন একটি অংশ, যেখানে পরপর ২, ৩, ৪, ৫, ৬, বা ৮-টি চরণের গুচ্ছ মাত্রাসংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা, তার নাম 'স্তবক'। প্রবোধচন্দ্রের বিচারে কমপক্ষে ৫টি পঙ্ক্তির গুচ্ছ হবে 'স্তবক'।

২, ৩ বা ৪টি পঙ্ক্তির গুচ্ছকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'শ্লোক'।

---

## ২৩.৮ অনুশীলনী—২

---

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৩ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন :

পর্ব, চরণ, স্তবক।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন :

পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব, পর্ব আর পদ, চরণ আর পঙ্ক্তি।

(গ) অর্ধযতি পূর্ণযতি পর্ব স্তবক—এই ৪টি পরিভাষা অমূল্যধন প্রবোধচন্দ্র দুজনেই ব্যবহার করতেন। প্রতিটি পরিভাষার ব্যবহারে ছন্দসিক দুজনের কোথায় মিল, কোথায় গরমিল—দেখান।

২. (ক) 'আম্রের মঞ্জুরী গন্ধ বিলায়'—এই ছত্রটিতে দলগুলিকে পৃথক করে দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে নিন।

এরপর—

i) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে পর্বাঙ্গ পর্ব আর চরণের বিভাগগুলি দেখান।

ii) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে উপপর্ব আর পদের বিভাগগুলি দেখান।

iii) ওপরের দু রকমের ছন্দ-বিভাগ থেকে অমূল্যধনের পর্বাঙ্গে-পর্ব-চরণের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের উপপর্ব-পর্ব-পদ-পঙ্ক্তির মাপের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটাব তিমির রাত

বাধার বিন্দ্যাচল ?

প্রশ্ন-২ (ক)-এর পদ্ধতিতে i) ওপরের ৪টি ছত্রে পরপর দু'রকমের ছন্দ-বিভাগ করুন।

ii) তা থেকে ঐ দু'রকমের বিভাগের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) পর পর এমন ৩টি পদ্যছত্রের দৃষ্টান্ত লিখুন যার—

i) প্রথমটিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার।

ii) দ্বিতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৬-মাত্রার।

iii) তৃতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৮-মাত্রার।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপর্ব থাকবে।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপূর্ণ পর্ব থাকবে।

যেকোনো দুটিতে ১টি করে অপূর্ণপর্ব থাকবে।

(ছত্রের শেষে পর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন। কোনটি অতিপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অতিপূর্ণপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অপূর্ণপর্ব প্রতিটি দৃষ্টান্তের নীচে লিখুন।)

৩. (ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

- i) \_\_\_\_\_ উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দবিভাগ বলে চিনিয়ে দেয়।
- ii) অমূল্যধন (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
- iii) প্রবোধচন্দ্র (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
- iv) অমূল্যধন (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
- v) প্রবোধচন্দ্র (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
- vi) প্রবোধচন্দ্র চিহ্ন \_\_\_\_\_, উপপর্বের চিহ্ন \_\_\_\_\_।
- vii) ৪-ছত্রের কবিতাগুচ্ছকে অমূল্যধন বলেন \_\_\_\_\_, প্রবোধচন্দ্র বলেন \_\_\_\_\_।
- viii) অমূল্যধনের স্তবকের জন্য আবশ্যিক \_\_\_\_\_ টি চরণ, প্রবোধচন্দ্রের স্তবকের জন্য আবশ্যিক \_\_\_\_\_ টি পঙ্ক্তি।

(খ) পর্বের মাঝখানে যতি পড়ে কিনা, পড়লে সে-যতি দিয়ে তৈরি ছন্দ-বিভাগের নাম কী, লিখুন।

## ২৩.৯ মূলপাঠ-৩ : উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব

উচ্চারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ধ্বনির উচ্চারণ থেকে, এটা আপনারা জেনেছেন। তবে, ছন্দের হিসেব শুরু হয় দলের (অক্ষরের) উচ্চারণ আর উচ্চারণ-বিরতি থেকে—দলের মাত্রাগোনা আর যতি থেকে। দলের মাত্রা ১ না ২, ক-মাত্রার পর কতটুকু থামব—এর ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে ছন্দের চরিত্র। অথচ, বাংলা কবিতা উচ্চারণের এমন কয়েকটি স্বভাব রয়েছে, যা দুদিক থেকেই ছন্দের এই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। দলের উচ্চারণ কখনো হয় কেটে কেটে, কখনো টেনে টেনে, কখনো বাড়তি ঝাঁক দিয়ে, উচ্চারণ হয় কখনো সুর টেনে, কখনো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। উচ্চারণের এই কটি স্বভাব বোঝার জন্য ৬টি পরিভাষার পরিচয় প্রথম এককের এই অংশে তুলে ধরা হচ্ছে।

### ২৩.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ

দলের বা অক্ষরের মাত্রা চিনতে গিয়ে জেনেছেন ‘কেটে কেটে’ আর ‘টেনে টেনে’ উচ্চারণের কথা। কেটে কেটে উচ্চারণে দল হয় ছোটো বা হ্রস্ব, মাত্রা যায় কমে (১-মাত্রা), আর, টেনে টেনে উচ্চারণে দল হয় একটু বড়ো বা দীর্ঘ, মাত্রা যায় বেড়ে (২-মাত্রা)। এই হ্রস্ব বা দীর্ঘ হওয়া দলের একটি স্বভাব, এবং তা ধরা পড়ে উচ্চারণ করার সময়। মুক্তদলের (স্বরাস্ত্র অক্ষর) মূল স্বভাব হ্রস্ব উচ্চারণ, বৃন্দদলের (হলস্ত্র অক্ষর) দীর্ঘ উচ্চারণ। সেই কারণেই, মুক্তদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ ২-মাত্রায়। হ্রস্ব উচ্চারণে দলের হয় সংকোচন, দীর্ঘ উচ্চারণে প্রসারণ। মুক্তদলের উচ্চারণে সংকোচনটাই স্বাভাবিক, ১-মাত্রাও প্রায় নির্দিষ্ট। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই তার প্রসারণও হয়, তখন তার উচ্চারণ হয় ২-মাত্রায়। যেমন—

১ ১	১ ১		২ ২
হাঁটি	হাঁটি		পা পা

এখানে ‘হাঁটি হাঁটি’-র ৪-টি মুক্তদলের উচ্চারণই হ্রস্ব, সংকুচিত, মাত্রা-ও ৪-টি। কিন্তু, ‘পা পা’ ২টি মুক্তদলেরই দীর্ঘ প্রসারিত উচ্চারণ, মাত্রা  $২ + ২ = ৪$ । মুক্তদলের এ-রকম প্রসারণ আপনারা লক্ষ করবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, জনগণমনঅধিনায়ক-সংগীতে, আরো দুটি-একটি আধুনিক কালের কবিতায়।

অন্যদিকে, বৃন্দদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ দীর্ঘ বা প্রসারিত হলেও আবশ্যিকমতো এর সংকোচনে বাধা নেই। আপনারা ক্রমে ক্রমে দেখবেন, কোনো কবিতার উচ্চারণে প্রতিটি বৃন্দদল পায় ২-মাত্রা, কোনো কবিতায় ১-মাত্রা, আবার কোনো কবিতার একই স্তবকে একটি বৃন্দদলে ১-মাত্রা, আর-একটিতে ২-মাত্রা। যেখানে বৃন্দদলে ১-মাত্রা, সেখানে তার হ্রস্ব উচ্চারণ, সেখানে তার সংকোচন; যেখানে বৃন্দদলে ২-মাত্রা, সেখানে তার দীর্ঘ উচ্চারণ, সেখানে তার প্রসারণ। বাংলা কবিতায় বৃন্দদলের এই সংকোচন-প্রসারণ অত্যন্ত ব্যাপক—এটা ক্রমশ



লক্ষ করবেন। উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম সংশ্লেষ, আর প্রসারণের নাম বিশ্লেষ। অতএব, এখানে ‘সংশ্লেষ’ এর অর্থ বৃদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, আর ‘বিশ্লেষ’-এর অর্থ বৃদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ। নীচের তিনটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন—

১.	১ ২	২ ১		১ ১	১ ২ ১		১ ১ ২	২		১ ১		
	রাজার্	হসত্		করে	সমসত্		কাঙালের	ধন্		চুরি		=৬+৬+৬+২
২.	১ ১	১ ১		১ ১	১ ১		১ ১	১ ১		১		=৪+৪+৪+১
	আঁধার	রাতে		বাধার্	পথে		যাত্রা	নাঙ্গা		পায়্		=৪+৪+৪+১
৩.	১ ১ ১ ১	১ ১ ২		১ ১ ২	১ ১							=৪+৪+৪+২ (প্রবোধচন্দ্র)
	ভালোমন্দ	দুখ্-সুখ্		অন্ধকার্	আলো							=৪+৪+৪+২ (প্রবোধচন্দ্র)

১ম উদাহরণে প্রতিটি বৃদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষর) ২-মাত্রা ; অর্থাৎ, প্রতিটি বৃদ্ধদলেরই বিশ্লেষ, ২য় উদাহরণে প্রতিটি বৃদ্ধদলে ১-মাত্রা, অর্থাৎ, প্রতিটি বৃদ্ধদলেরই সংশ্লেষ ; ৩য় উদাহরণে মন্ দুখ্ অন্—এই ৩টি বৃদ্ধদলের ১-মাত্রা—এদের সংশ্লেষ, আর, সুখ্ কার্ ২-মাত্রার এদের বিশ্লেষ।

### ২৩.৯.২ স্বাসাঘাত, প্রস্বর

বিনুর বয়স | তেইশ তখন | রোগে ধরল | তারে  
 ওষুধে ডাক্ | তারে  
 বাঁধির্ চেয়ে | আধি হল | বড়ো

ওপরের স্তবক থেকে প্রতিট পর্ব একটা একটা করে উচ্চারণ করে দেখুন—

প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (বৃদ্ধদলের) উচ্চারণে একটু বাড়তি ঝাঁক পড়ছে অন্য অক্ষরের দলের তুলনায়। প্রতিটি অক্ষরেই থাকে একটি করে স্বরধ্বনি। অমূল্যধনের মতে, পর্বের অন্তর্গত কোনো অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনির তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলেই ঐ অক্ষরের ওপর বাড়তি ঝাঁক পড়ে। এরকম ঝাঁকের নাম তিনি দিলেন স্বাসাঘাত। অমূল্যধনের বিচারে ‘স্বাসাঘাত’ বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকের প্রতি পর্বেই থাকবে, থাকবে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের ওপর। তবে যে পর্বে হলন্ত অক্ষর নেই, সেখানে তা পড়বে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর। ওপরের স্তবকটিতে মোটা হরফে দেখানো প্রতিটি হলন্ত অক্ষরেই পড়ছে বাড়তি ঝাঁক বা ‘স্বাসাঘাত’। লক্ষ করুন, ছত্রশেষের অপূর্ণপর্বে (‘তারে’ ‘তারে’ ‘বড়ো’) আর শেষ ছত্রের দ্বিতীয় পর্বে (‘আধি হল’) হলন্ত অক্ষর নেই, কিন্তু ঝাঁক বা স্বাসাঘাত আছে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে।

প্রবোধচন্দ্র ও দলের উচ্চারণে ঝাঁকের কথা মানেন। তবে তাঁর বিচারে সে-ঝাঁক তীব্র হয়ে পড়ে কেবল পর্বের প্রথম দলে। এই ঝাঁকের নাম প্রস্বর। পর্বের শেষে দিকে দুর্বল ঝাঁকের ঘা থাকলেও তার গুরুত্ব কম। প্রবোধচন্দ্রের উচ্চারণে ওপরের স্তবকটিতে ‘প্রস্বর’ পড়বে *বি তে রো তা ও তা ব্যা আ ব*—এইসব মুক্তদলের ওপর, পর্বের প্রথম দল হবার কারণে। যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকেই ‘প্রস্বর’ থাকবে পর্বের প্রথম দলে।

তাহলে, ‘স্বাসাঘাত’ আর ‘প্রস্বরের’ মধ্যে মিল শুধু এইটুকু—উচ্চারণের এই দুটি স্বভাবই আসলে কোনো অক্ষর বা দলের ওপর বাড়তি ঝাঁক পড়া। আর, গরমিল এই—‘স্বাসাঘাত’ পড়ে বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে (বুদ্ধদলে), পর্বে হলন্ত অক্ষর না-থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরাস্ত অক্ষরে (মুক্তদলে)। কিন্তু, ‘প্রস্বর’ পড়ে যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের কেবল প্রথম দলে (মুক্ত বা বুদ্ধ যা-ই হোক)।

### ২৩.৯.৩ তান, মিল

মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে বাংলা কবিতা পাঠের এমন একটি বিশেষ রীতি, যেখানে অক্ষরের (দলের) উচ্চারণ হতে হতে অক্ষরের অন্তর্গত ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকে অথবা ধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠতে থাকে একটা টানা সুর। একালে অবশ্য সে-রীতির পাঠ অনেক কবিতার পক্ষেই অচল। তবু, বিশেষ এক-শ্রেণির কবিতার চরণ উচ্চারণ করতে গিয়ে অমূল্যধন এইরকম একটা সুরের টান লক্ষ করেছিলেন। সুরের এই টানটুকু তিনি বোঝাতে চাইলেন সংগীত থেকে তুলে-আনা তান কথাটি দিয়ে। অক্ষরের পর অক্ষরের উচ্চারণ যখন চলতে থাকে, তখন শ্রোতার কানে যেন চলতে থাকে ধ্বনির একটা প্রবাহ। নীচের দুটি ছত্র পড়ে পড়ে লক্ষ করুন কোথায় ‘তান’ আছে, আর কোথায় নেই :

	১ ১ ১ ১ ২		১ ১		১ ১ ১		১ ২				= ৮ + ৬
১.	মহাভারতের	কথা	অমৃত	সমান							
	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১		১ ২ ১ ২		১ ১ ২				= ৮ + ১০
২.	একথা	জানিতে	তুমি	ভারত-ঈশ্বর	শাজাহান						

দেখা যাচ্ছে, ২ টি চরণেই রয়েছে ২ টি করে পর্ব। প্রথম পর্বের পথ ধরে ধ্বনির প্রবাহ চলতে থাকে দ্বিতীয় পর্বের দিকে। দুটি পর্বের মাঝখানে থাকা যতির জায়গায় ধ্বনির উচ্চারণ থেমে গেলেও একটু সুর কিন্তু থেকেই যায়। এই সুর বা তান পর্বদুটিকে যুক্ত করে ফেলে এবং দ্বিতীয় পর্বের ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়। রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে, চরণ শেষ হবার পরেও।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় মিল-এর বিশেষ করে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব ছান্দসিকেরা স্বীকার করে থাকেন। মিল হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক পৃথক অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি দুটি পর্বের শেষে হতে পারে, দুটি পদের শেষে হতে পারে, দুটি পঙ্ক্তির

বা চরণের শেষেও হতে পারে। পর্ব-পদ-পঙ্ক্তি-চরণ যায় শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে বলে তার চলতি নাম অন্ত্যমিল—পর্বান্ত্য পঙ্ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল। নীচের দৃষ্টান্ত-কটি লক্ষ করুন—

১. পর্বান্ত্য মিল : রণধারা বাহি | জয়গান গাহি | উন্মাদ কর | রবে

২. পদান্ত্য মিল : পালিবে যে | রাজধর্ম || জেনো তাহা | মোর কর্ম ||  
রাজ্য লয়ে | রবে রাজ্য | হীন

৩. পঙ্ক্তি-অন্তক মিল : ওরে কবি | সন্ধ্যা হয়ে | এল  
কেশে তোমার | ধরেছে যে | পাক  
বসে বসে | উর্ধ্ব-পানে | চেয়ে ||  
শুনতেছ কি | পরকালের | ডাক

৪. চরণান্ত্য মিল : ঝর্ণা ঝর্ণা | সুন্দরী ঝর্ণা ||  
তরলিত চন্দ্রিকা | চন্দন ঝর্ণা ||

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পর্বের শেষে ‘বাহি-গাহি’-তে ‘আহি’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, তা থেকে পেলেন পর্বান্ত্যমিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পদের শেষে ‘ধর্ম-কর্ম’-তে ‘অর্ম’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, পাওয়া গেল পদান্ত্যমিল। তৃতীয় দৃষ্টান্তে পঙ্ক্তিদুটির শেষে ‘পাক-ডাক’-এ ‘আক্’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে তৈরি হল পঙ্ক্তি-অন্তক মিল। সবশেষে চতুর্থ দৃষ্টান্তে চরণদুটির শেষে ‘ঝর্ণা-ঝর্ণা’-তে ‘অর্ণা’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি এনে দিল চরণান্ত্য মিল।

---

## ২৩.১০ সারাংশ-৩

---

সংশ্লেষ, বিশ্লেষ :

কেটে কেটে উচ্চারণের হ্রস্ব হওয়া, আর টেনে টেনে উচ্চারণে দীর্ঘ হওয়া দল বা অক্ষরের একটি স্বভাব। হ্রস্ব উচ্চারণে হয় দলের সংকোচন এবং ১-মাত্রা, দীর্ঘ উচ্চারণে হয় দলের প্রসারণ এবং ২-মাত্রা। মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষর) উচ্চারণে সংকোচনই স্বাভাবিক এবং ১-মাত্রায় প্রায় নির্দিষ্ট। কোনো কোনো কবিতায় মুক্তদলের উচ্চারণে ঘটে প্রসারণ, তখন তার ২-মাত্রা।

বৃন্দদলের (হলন্ত অক্ষর) উচ্চারণে প্রসারণই স্বাভাবিক, তখন তার ২-মাত্রা। তবে, সংকোচনে বাধা নেই, তখন বৃন্দদলের ১-মাত্রা। বৃন্দদলের উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম ‘সংশ্লেষ’, প্রসারণের নাম ‘বিশ্লেষ’। অর্থাৎ-এর অর্থ বৃন্দদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, ‘বিশ্লেষ’-এর অর্থ বৃন্দদলের দীর্ঘ উচ্চারণ।

শ্বাসাঘাত, প্রস্বর :

পর্বের মাঝখানে কোনো অক্ষরের (দলের) স্বরধ্বনি অন্য অক্ষরের তুলনায় বেশি গভীর হয়ে উঠলে সেই অক্ষরের ওপর যে বাড়তি ঝাঁক পড়ে, তাকে অমূল্যধন বলেন ‘শ্বাসাঘাত’। বিশেষ এক শ্রেণির

কবিতার স্তবকে পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (বুদ্ধদলের) ওপর, হলন্ত অক্ষর না-থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর 'স্বাসাঘাত' পড়ে।  
প্রবোধচন্দ্রের মতে, যে কোনো কবিতার স্তবকে প্রতি পর্বের প্রথম দলের ওপর যে তীব্র ঝাঁক পড়ে, তার নাম 'প্রস্বর'।

তান, মিল :

বিশেষ এক শ্রেণির কবিতায় চরণের উচ্চারণে শ্রোতার কানে চলতে থাকে ধ্বনির প্রবাহ, চরণ শেষ হবার পরেও সুরের রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে। সুরের এই টানটুকুকে অমূল্যধন বলেন 'তান'। একই স্তবকের মাঝখানে পৃথক পৃথক পর্ব চরণ পদ বা পঙ্ক্তির শেষে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসাকে বলে মিল।

## ২৩.১১ অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৩ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে লিখুন :

তান, মিল।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন :

স্বাসাঘাত আর প্রস্বর, সংশ্লেষ আর বিশ্লেষ।

২. সঠিক ছন্দবিভাগ করে পর্বাস্ত্য পদাস্ত্য পঙ্ক্তি-অন্তক আর চরণান্ত্যক মিলের ১টি করে দৃষ্টান্ত দিন।

৩. (ক) দলগুলিকে পৃথক করুন, দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিয়ে পর্ব-বিভাগ করুন, সঠিক মাত্রার ওপর স্বাসাঘাত-চিহ্ন বসিয়ে দিন :

i) এপার গজ্জা ওপার গজ্জা মধ্যখানে চর

তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর

ii) ময়রা মুদি চক্ষু মুদি

পাটায় বসে তুলছে কসে

iii) আর কেঁদো না আর কেঁদো না ছোলাভাজা দেব

আবার যদি কাঁদ তবে তুলে আছাড় দেব

iv) মেঘের উপর, মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ

(খ) দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিন, সঠিক মাত্রার ওপর প্রস্বর-চিহ্ন বসিয়ে দিন :

i) কোথায় ফলে সোনার ফসল সোনার কমল ফোটে রে

ii) সবমুখে অজানা পথ ইঞ্জিত মেলে দেয় দূরে

iii) রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি

iv) হে আদিজননী সিঁধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার

## ২৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৮৬)
২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৮৩)
৩. পবিত্র সরকার : ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ (১৯৯৯)

প্রাথমিক পর্যায়ের পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার : ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দ	পৃ-২৪০-৪২	পৃ-২১-২২	পৃ-৯-১৫
বর্ণ	পৃ-১, ২৪-২৭, ২৬০	পৃ-২৩-২৪	পৃ-৩০-৩৩
ধ্বনি	পৃ-২৪-২৭, ২৬৫-৬৭, ৩০৫	পৃ-২৩-২৪	পৃ-৩০-৩৩
অক্ষর	×	পৃ-৫, ১৪, ১৫, ২২-২৩, ১৬৭	×
দল	পৃ-১, ২৭-২৯, ২৪৫-৪৬,	×	পৃ-৩৪-৩৭
মাত্রা	পৃ-১, ২৬১	পৃ-৫, ৭, ৩১	পৃ-২৪-২৬
কলা	পৃ-১, ২৩৬-৩৭	×	পৃ-৮৭-৮৮
ছেদ	×	পৃ-৭, ২৪-২৭, ১৪১-৪৭	পৃ-৪০-৪১
যতি	পৃ-৯, ১৬-১৭, ২৬৯-৭০	পৃ-১-৩, ২৭-২৮	পৃ-৪০, ৪১
পর্ব	পৃ-৯৫-১১১, ২৫২-৫৩	পৃ-২৭-২৮	পৃ-৪১-৪৮
পদ	পৃ-১১১-২১, ২৪৯	×	পৃ-৫২-৫৯
পর্বাঙ্গা	×	পৃ-৯-১২, ৩০, ৩১, ৫২	×
উপপর্ব	পৃ-৯৪-৯৫, ২৩৫-৩৬	×	পৃ-৪৮
চরণ	×	পৃ-১, ৬৭, ৬৮	×
পঙ্ক্তি	পৃ-১২১-৬৫, ২৪৭-৪৮	×	পৃ-৫৯-৬০
স্তবক	পৃ-১৬৫-৭০	পৃ-৬৮, ৬৯, ৮১-৮৪	×
শ্লোক	পৃ-১৬৫-১৭০	×	×
শ্বাসঘাত	×	পৃ-৪৪-৫০	×
প্রসঙ্গ	পৃ-৮-৯, ১৫, ২৫৭-৫৮	×	পৃ-৬০-৬১
সংশ্লেষ	পৃ-২৬০, ২৯৬	×	×
বিশ্লেষ	পৃ-২৬০	×	×
তান	×	পৃ-১০০	×
মিল	পৃ-৫৫-৬৩, ২৬৪	পৃ-৬৯	পৃ-১৩৯-৪৫

---

## একক ২৪ □ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

---

গঠন

- ২৪.১ উদ্দেশ্য
- ২৪.২ প্রস্তাবনা
- ২৪.৩ মূলপাঠ
  - ২৪.৩.১ দলবৃত্ত বা স্বাসাঘাতপ্রধান রীতি
  - ২৪.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি
  - ২৪.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি
- ২৪.৪ সারাংশ
- ২৪.৫ অনুশীলনী
- ২৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ২৪.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি মন দিয়ে পড়লে—

- বুঝে নিতে পারবেন, কীভাবে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীরের গঠন অঙ্কের হিসেবের মধ্যে ধরা পড়ে যায়।
- বাংলায় লেখা অসংখ্য কবিতার উচ্চারণে ভজি যে কেবলমাত্র ৩-রকমের ছন্দরীতিতেই ভাগ হয়ে যায়, এই তথ্য আপনার কাছে স্পষ্ট হবে, এবং কোন কবিতা কোন ছন্দ রীতিতে লেখা, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তা আপনার কানে ধরা পড়বে।
- যেকোনো বাংলা কবিতা সঠিক ভজিতে নির্দিষ্ট জায়গায় থামা আর সঠিক সময় ধরে উচ্চারণ করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।
- অজানতে হোক বা জেনেশুনে হোক, ছন্দের কোনো-কোনো নিয়ম মেনে চলতে কবিরা যে বাধ্য, এই সত্য বুঝে নিয়ে যেকোনো কবিতার ছন্দ বিচার করতে পারবেন।
- ছন্দের নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝে নিয়ে ছন্দের দিক থেকে নিখুঁত কবিতা লেখা সহজ হতে পারে।

---

### ২৪.২ প্রস্তাবনা

---

সব কবিতা ছন্দের দিক থেকে একই রীতি বা পদ্ধতিতে লেখা হয় না, একই কবির লেখা হলেও নয়, একই বিষয় নিয়ে লেখা হলেও না হতে পারে। এই রীতি বা পদ্ধতি কী ধরনের হবে, তা নির্ভর করে কবি যে নীতিতে

ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে কবিতাটি লিখবেন, তার ওপর। বাংলা কবিতার ছন্দরীতি ক-রকমের হতে পারে, এ নিয়ে বহু বছর ধরে বিস্তারিত চালিয়ে অবশেষে ছান্দসিকেরা মোটামুটি একমত হলেন, বাংলা কবিতায় কবিরা প্রধানত ৩-ধরনের ছন্দরীতিই ব্যবহার করে থাকেন। সংখ্যার বিতর্ক কেটে গেলেও নামের বিতর্ক এখনো কাটেনি। তবে, বিতর্ক থাকলেও প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের তৈরি ৩-জোড়া নামই ছন্দজিজ্ঞাসুদের কাছে প্রিয়। এই এককের মূলপাঠ থেকে বাংলা কবিতার ছন্দরীতি বুঝে নিয়ে আপনারাই স্থির করতে পারবেন—কোন নাম কতখানি সার্থক।

## ২৪.৩ মূলপাঠ

বাংলা কবিতার ছন্দরীতি যে ৩টিই, এটা স্থির হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক ছান্দসিক পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে ৩টি ছন্দরীতির ৩টি করে নাম সুপারিশ করে গেলেন। শেষপর্যন্ত মোটামুটি বহাল রইল প্রবোধচন্দ্র অমূল্যধনের তৈরি নাম। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা স্বাসাঘাতপ্রধান; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক। কখনো দুজনের পদ্ধতি মেনে, কখনো একটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরপর ৩টি ছন্দরীতির আলোচনা করা হচ্ছে এই এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করে। এক-একটি অংশে পাবেন এক-একটি রীতির সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য দলের মাত্রা, সঙ্গে থাকবে দৃষ্টান্ত।

### ২৪.৩.১ দলবৃত্ত বা স্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

দলবৃত্ত আর স্বাসাঘাতপ্রধান একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, সে-দল মুক্ত বা বন্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখলেন দলবৃত্ত। আবার, অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্ততপক্ষে ১টি করে স্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল স্বাসাঘাতপ্রধান। নীচের দৃষ্টান্তগুলি একটা-একটা করে উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন :

(১) প্রতিটি দলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে কেটে)।

(২) যে দলের মাথায় মাত্রাচিহ্নের (১) ওপর রেফ-চিহ্ন দেওয়া হল, তার উচ্চারণে আশপাশের অন্য দলের তুলনায় বাড়তি ঝাঁক বা স্বাসাঘাত পড়েছে।

১.    হা়    রে    কবে    |    কেটে    গেছে    |    কালিদাসের্    |    কাল    || = ৪ + ৪ + ৪ + ১

১ ১ ১ ১    |    ১ ১    ১ ১    |    ১ ১    ১ ১    |    ১    || = ৪ + ৪ + ৪ + ১

পন্ডিতিরা    |    বিবাদ্    করে    |    লয়ে    তারিখ্    |    সাল্    ||

$$২. \quad \begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{ইলশে} \quad \text{গুঁড়ি} \end{array} \left| \begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{ইলশে} \quad \text{গুঁড়ি} \end{array} \right| \begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{ইলিশ্} \quad \text{মাছের} \end{array} \left| \begin{array}{c} ১ \\ \text{ডিম্} \end{array} \right| \parallel = ৪ + ৪ + ৪ + ১$$

$$\begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{ইলশে} \quad \text{গুঁড়ি} \end{array} \left| \begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{ইলশে} \quad \text{গুঁড়ি} \end{array} \right| \begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{দিনের} \quad \text{বেলায়} \end{array} \left| \begin{array}{c} ১ \\ \text{হিম্} \end{array} \right| \parallel = ৪ + ৪ + ৪ + ১$$

লক্ষ করুন, ২ টি দৃষ্টান্তেই প্রতিটি দল বা অক্ষরের মাথায় ১টি করে মাত্রার সংকেত। এটাও লক্ষ করুন, স্বাসাঘাত পড়ছে প্রতিটি বুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষরের ওপর, যে-পর্বে বুদ্ধদল নেই সেখানে অবশ্য স্বাসাঘাত পড়ছে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) ওপর।

প্রতিটি চরণের ডানদিকে দেওয়া অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন—

প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার, শেষে অপূর্ণ পর্ব ১-মাত্রার। এ ছন্দরীতিতে প্রায় সব পূর্ণপর্বই ৪-মাত্রার হয়ে থাকে। তবে, প্রবোধচন্দ্র দলবৃত্ত রীতির কোনো কোনো পর্বে ৭মাত্রা ধার্য করে থাকেন। দেখুন এই দৃষ্টান্ত দুটি—

$$১. \quad \begin{array}{c} ১ \ ১ \ ১ \\ \text{আগুনের্} \end{array} \quad \begin{array}{c} ১ \ ১ \ ১ \ ১ \\ \text{পরশ্মণি} \end{array} \left| \begin{array}{c} ১ \ ১ \\ \text{ছোঁয়াও} \end{array} \right| \begin{array}{c} ১ \ ১ \\ \text{প্রাণে} \end{array} = ৭ + ৪$$

$$\begin{array}{c} ১ \ ১ \ ১ \\ \text{এ জীবন্} \end{array} \quad \begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{পুণ্য} \quad \text{করো} \end{array} \left| \begin{array}{c} ১ \ ১ \\ \text{দহন্} \end{array} \right| \begin{array}{c} ১ \ ১ \\ \text{দানে} \end{array} = ৭ + ৪$$

$$২. \quad \begin{array}{c} ১ \ ১ \ ১ \\ \text{বাবুদের্} \end{array} \quad \begin{array}{c} ১ \ ১ \ ১ \ ১ \\ \text{তাল্পুকুরে} \end{array} = ৭$$

$$\begin{array}{c} ১ \ ১ \ ১ \\ \text{হাবুদের্} \end{array} \quad \begin{array}{c} ১ \ ১ \ ১ \ ১ \\ \text{ডাল্পুকুরে} \end{array} = ৭$$

$$\begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \quad ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{সে কি বাস্ করলে তাড়া} \end{array} = ৭$$

$$\begin{array}{c} ১ \ ১ \quad ১ \quad ১ \ ১ \quad ১ \ ১ \\ \text{বলি থাম্ একটু দাঁড়া} \end{array} = ৭$$

অমূল্যধন ৭-মাত্রার প্রতিটি পর্বই দুভাগে ভাগ করে নেবেন—হয় ৩+৪ মাত্রার ২টি পর্বে, না-হয় ৩-মাত্রার প্রথম পর্বটিকে অতিপর্ব হিসেবে গণ্য করে, ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব বের করে আনবেনই।



## ২৪.৩.২ : কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

যে ছন্দ-রীতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে কলাবৃত্ত, তা-ই অমূল্যধনের কাছে ধ্বনিপ্রধান। প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে আগেই জেনেছেন—১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। এখন যে ছন্দ রীতির আলোচনা করছি, সেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি ; প্রতিটি বুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ ‘কলা’-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম কলাবৃত্ত।

প্রবোধচন্দ্র শেখালেন—‘কলা’ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিপরিমাণ, অতএব, ‘কলাবৃত্ত’ রীতিতে প্রতিটি দলের অন্তর্গত ধ্বনিপরিমাণের হিসেব নির্দিষ্ট, দলের মাত্রা-ও নির্দিষ্ট। অমূল্যধনও এ কথাই বলেন একটু অন্যরকম ভাষায়। তাঁর কথাতেও, এ-রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি ধ্বনির হিসেব এখানে রাখতে হয়। এই কারণে, স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল) এ-রীতিতে হ্রস্ব হলেও হলন্ত অক্ষর (বুদ্ধদল) দীর্ঘ হতে চায়। অর্থাৎ, স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা আর হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা নির্দিষ্ট। অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণ বা ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলেই এ রীতির নাম ধ্বনিপ্রধান।

নীচের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করুন :

(১) প্রতিটি মুক্তদলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে-কেটে)।

(২) প্রতিটি বুদ্ধদলের উচ্চারণ দীর্ঘ, ২-মাত্রার (টেনে-টেনে)।

১.	খ্যাতি	আছে	সুন্দরী	বলে	তার	= ৪+৪ +৪
	১ ১	১ ১	২ ১ ১	১ ১	২	
	ত্রুটি	ঘটে	নুন্ দিতে	ঝোলে	তার	= ৪+৪ +৪
	১ ১	১ ১	২ ১ ১	১ ১	২	

(প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

২.	নূতন	জাগা	কুন্জবনে	কুহরি	উঠে	পিক্	= ৫+৫+৫+২
	১ ২	১ ১	২ ১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	২	
	বসন্তের		চুম্বনেতে	বিবশ্	দশ্	দিক্	= ৫+৫+৫+২
	১ ২	২	২ ১ ১ ১	১ ২	২	২	
৩.	ঐ আসে	ঐ	অতি	ভৈরব	হরষে		= ৫+৫+৫+২
	২ ১ ১	২	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১		
	জলসিন্চিত		ক্ষিতি	সৌরভ	রভসে		= ৬+৬+৩
	১ ১	২ ১ ১	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১		

$$8. \begin{array}{c|c|c|c} ২ ১ & ১ & ১ & ১ ১ \\ \hline \text{মন্ত্রে} & \text{সে} & \text{যে} & \text{পূত} \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ১ ২ & ১ ১ & ১ ১ & \\ \hline \text{রাখীর} & \text{রাঙা} & \text{সুতো} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ১ ২ & ১ & ১ ১ ১ & \\ \hline \text{বাঁধন্} & \text{দিয়েছিন্} & \text{হাতে} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} ১ ১ \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

$$= ৭+৭+৭+২$$

$$৫. \begin{array}{c|c|c|c} ১ ১ ১ & ১ ১ ১ & ১ ১ & \\ \hline \text{তোমারে} & \text{ডাকিনু} & \text{যবে} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ২ ১ ১ ১ & & & \\ \hline \text{কুন্জবনে} & & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} = ৮+৫ \\ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} ১ ১ ১ & ১ ১ ১ & ১ ১ & \\ \hline \text{তখনো} & \text{আমের্} & \text{বনে} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ২ ১ & ১ ১ & & \\ \hline \text{গন্ধ} & \text{ছিল} & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} = ৮+৫ \\ \\ \hline \end{array}$$

(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

$$৬. \begin{array}{c|c|c|c} \text{আম্‌রের্} & \text{মন্‌জরী} & \text{গন্ধ} & \text{বিলায়} \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} ২ ২ & ২ ২ & ২ ১ & \\ \hline \text{চম্পার} & \text{সৌরভ} & \text{শূন্যে} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ১ ২ & & & \\ \hline \text{মিলায়} & & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} = ৮+৬ \\ \\ \hline \end{array}$$

(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

দেখা গেল, কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্লরধান রীতিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রা থেকে ৮-মাত্রা পর্যন্ত যেকোনো মাপের হতে পারে। তবে, অমূল্যধন অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্তে ৮-মাত্রার পূর্ণপর্বই পাবেন (‘খ্যাতি আছে সুন্দরী’ আর ‘ত্রুটি ঘটে নুন্ দিতে’), এ রীতিতে ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব তিনি মানেন না। অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র পঞ্চম দৃষ্টান্তে পাবেন ৮ আর ৫-মাত্রায় ২-টি জোড়া-পর্বের পদ, আর ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে পাবেন ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব, ৮-মাত্রার পর্ব তিনি পারতপক্ষে মানেন না।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, এ কথা জানলেন। এরপর এই রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখবেন। ২-মাত্রার মুক্তদল পাবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, ‘জনগণমন অধিনায়ক’ কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। দৃষ্টান্ত দেখুন—

$$১. \begin{array}{c|c|c|c} ২ ১ ১ & ২ ১ ১ & & \\ \hline \text{মন্‌দির} & \text{বাহির} & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ১ ১ ১ & ১ ২ ১ & & \\ \hline \text{কঠিন} & \text{কপাট} & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

$$২. \begin{array}{c|c|c|c} ১ ১ & ১ ১ & ২ ২ & \\ \hline \text{তব শুভ} & & \text{নামে} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ২ ২ & & & \\ \hline & & \text{জাগে} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} ১ ১ & ১ ১ & ২ ১ ১ & \\ \hline \text{তব শুভ} & & \text{আশিস} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ২ ২ & & & \\ \hline & & \text{মাগে} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} ২ ২ & & ১ ১ ১ ১ & \\ \hline \text{গাহে} & & \text{তব জয়} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c} ২ ২ & & & \\ \hline & & \text{গাথা} & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

(প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

২	১ ১	২	১ ১		২ ১ ১	১ ১ ১ ১	
৩.	রে	সতি	রে	সতি	কাঁদিল	পশুপতি	
					২ ১ ১	১ ১	১ ১ ২
					পাগল	শিব	প্রমথেশ্
	২ ১	২ ১ ১ ১		২ ১	১ ১ ১ ১		
৪.	নীল	সিন্ধুজল		ধৌত	চরণতল		
	১ ১ ১	১ ২ ১ ১		২ ১ ১	২ ১ ১		
	অনিল-বিকম্পিত			শ্যামল	অন্চল		

মোটা হরফের প্রতিটি দলই মুক্তদল, তবু এদের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। লক্ষ্য করুন, দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়া প্রতিটি মুক্তদল এখানে বানানেও দীর্ঘস্বরাস্ত (অর্থাৎ দলের শেষে আ-কার ঙ্গ-কার এ-কার)। বানানে হ্রস্বস্বরাস্ত দলগুলি ১-মাত্রাই পেল। তাহলে ওপরের দৃষ্টান্তকটিতে দলের মাত্রাগোনার নিয়মটা এইরকম দাঁড়ায় :

- (১) প্রতিটি হ্রস্বস্বরাস্ত মুক্তদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, ১-মাত্রা।
- (২) প্রতিটি দীর্ঘস্বরাস্ত মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।
- (৩) প্রতিটি বৃদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

তবে, ব্যতিক্রম কিছু কিছু থাকবেই, যেখানে মুক্তদল বানানো হ্রস্বস্বরাস্ত হয়েও উচ্চারণে দীর্ঘ বা বানানে দীর্ঘস্বরাস্ত হয়েও উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে। এমনকী, বৃদ্ধদলও কখনো কখনো উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে পড়ে। তাহলেও হ্রস্ব উচ্চারণে ১-মাত্রা আর দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রা—এ নিয়ম সব সময় বহাল থাকবে। ছন্দরীতি অবশ্যই কলাবৃত্ত, তবু আগেকার দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় এদের মাত্রারীতি একটু অন্যরকম, বিশেষ করে মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়ার ক্ষেত্রে। সংস্কৃত কাব্য কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে চর্যাপদে, এবং ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এ রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। এই কারণে প্রবোধচন্দ্র একে বলেন প্রাচীন কলাবৃত্ত। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্রত্ন কলাবৃত্ত'। তবে আধুনিক কালের কবিতায় এর প্রয়োগ কিছু কিছু যে হয়েছে, শেষ ৩টি দৃষ্টান্ত তারই নমুনা।

### ২৪.৩.৩ মিশ্রণ বা তানপ্রধান রীতি

বাংলা ছন্দের আর-একটি রীতিরও দুটি নাম পাশাপাশি চলছে—মিশ্রবৃত্ত আর তানপ্রধান। আমরা জেনেছি—দলবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, বৃদ্ধদলও ১-মাত্রার। কলাবৃত্তে মুক্তদল ১-মাত্রার, কিন্তু বৃদ্ধদল ২-মাত্রার। আর, আমাদের আলোচ্য রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট হলেও বৃদ্ধদল কিন্তু ১-মাত্রার হতে পারে, আবার ২ মাত্রারও হতে পারে। এটা নির্ভর করে বৃদ্ধদলটি শব্দের (word) শুরুতে আছে, না মাঝখানে, না

শেষে—তার ওপর। শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে বৃন্দদল হবে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার আপনার আগেই জেনেছেন,—বৃন্দদলের ১-মাত্রা হয় দলবৃত্ত রীতিতে, ২-মাত্রা হয় কলাবৃত্ত রীতিতে। আলোচ্য রীতিতে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করলেন বৃন্দদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল মিশ্রবৃত্ত। ধরুন ‘বৃন্দদল’ শব্দটি। এতে আছে ৩টি দল—বুদ্-ধ-দল্। ‘বুদ্’ আর ‘দল্’—দলবৃত্ত রীতিতে ১-মাত্রার, কলাবৃত্ত রীতিতে ২-মাত্রার। কিন্তু, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ‘বুদ্’ ১ মাত্রা পায় শব্দের শুরুতে আছে বলে, আর, ‘দল্’ ২-মাত্রা পায় শব্দের শেষে আছে বলে। ‘বুদ্’-এর ১-মাত্রা পাওয়াটা যেমন দলবৃত্ত স্বভাব, ‘দল্’-এর ২-মাত্রা পাওয়াটাও তেমনি কলাবৃত্ত-স্বভাব।

‘তান’ কথাটি অমূল্যধন কী অর্থে ব্যবহার করেন, তা আপনারা আগেই জেনেছেন। এইমাত্র জানলেন, বৃন্দদলের (হলন্ত অক্ষরের) মিশ্র স্বভাব দেখে এক শ্রেণির কবিতার ছন্দ-রীতিকে প্রবোধচন্দ্র বললেন ‘মিশ্রবৃত্ত’। সেই একই শ্রেণির কবিতা পড়তে পড়তে অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে একটা টানা সুর। এই টানা সুর বা সুরের টান বা ‘তান’-কেই এ ছন্দরীতির বিশেষ লক্ষণ বলে তাঁর কাছে মনে হল। সেই কারণেই এ-রীতিকে তিনি বললেন তানপ্রধান।

এ ‘তান’ বা সুর সব শ্রোতার কানে না-ও বাজতে পারে। এ-রীতির ‘তানপ্রধান’ নামটিও তেমন পাঠক-শ্রোতার কাছে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। তবে, দলের মাত্রা নিয়ে একটু আগে যা লেখা হল, সে-বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

অতএব, যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, বৃন্দদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে থাকলে ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। স্ববক পড়তে পড়তে কানে সুর বাজুক বা না-ই বাজুক, ঐ মিশ্রবৃত্তেরই অন্য নাম তানপ্রধান।

ধরণ নীচের দৃষ্টান্তটি—

$$\begin{array}{ccccccc}
 ১ ১ & ১ ১ & & ১ ২ ১ ১ ১ & || & & \\
 শুধু & তব & & অন্তরবেদনা & || & & = ০ + ১০ \\
 ১ ১ ২ & ১ ১ & ২ & | ১ ১ ২ & ১ ১ & ১ & ১ ১ ১ || \\
 চিরন্তন & হয়ে & থাক্ & | সম্রাটের & ছিল & এ & সাধনা || & = ৮ + ১০
 \end{array}$$

লক্ষ করুন,

- (১) শুধু ত ব ইত্যাদি প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রা।
- (২) শব্দের শুরুতে থাকা অন্ সম্ বৃন্দদল-দুটি ১-মাত্রার।
- (৩) শব্দের মাঝখানে-থাকা রন্ (চি-রন্-তন্) বৃন্দদলটি ১-মাত্রার।
- (৪) শব্দের শেষে থাকা তর্ (অন্-তর্), তন্, টের বৃন্দদল-তিনটি ২-মাত্রার।
- (৫) একটিমাত্র বৃন্দদল দিয়ে তৈরি ‘থাক্’ শব্দটিও ২-মাত্রার।

এখানে ২ টি কথা মনে রাখবেন—

(১) ‘অন্তর্বেদনা’ কথাটি ভাঙলে পাবেন ২ টি পৃথক্ শব্দ ‘অন্তর্’ আর ‘বেদনা’। ‘তর্’ বৃদ্ধদলটি ‘অন্তর্’ শব্দের শেষে আছে, তাই ২-মাত্রার। এ রকম ২ টি বা ৩ টি শব্দের সমাজে তৈরি জোড়-লাগা কথা ভেঙে নেবেন।

(২) ‘থাক্’ বৃদ্ধদলটি শব্দের একমাত্র দল। এ রকম বৃদ্ধদলে ২-মাত্রাই ধরবেন।

এবারে নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ করুন :

(১) প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা।

(২) বৃদ্ধদলে ১-মাত্রা শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে।

(৩) বৃদ্ধদলে ২-মাত্রা শব্দের শেষে

(৪) শব্দের একমাত্র বৃদ্ধদলে ২-মাত্রা।

১. এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে = ৮+৬  
১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

জীবন্ত হৃদয়-মাবে যদি স্থান্ পাই = ৮+৬  
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

২. এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান্ = ৮+১০  
১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২

কালশ্রোতে ভেসে যায় জীবন্ যৌবন্ ধনমান্ = ৮+১০  
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৩. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার্ আঁচল্-খসা হাতে দীপশিখা = ৮+৮+৬  
১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১

দিনের্ কল্লোর পর্ টানি দিল ঝিল্লিস্ফর্ ঘন যবনিকা = ৮+৮+৬  
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২

৪. পৃথিবী ডাকিছে আপন্ সন্তানে বাতাস্ ছুটিছে তাই = ৬+৬+৬+২  
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের্ সন্ধানে চলিয়াছে কত ভাই = ৬+৬+৬+২  
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

এই দৃষ্টান্ত-কটি থেকে লক্ষ করলেন, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে, পূর্ণপর্ব ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে।

### ২৪.৩.৩ সারাংশ

বাংলা কবিতার ৩টি ছন্দরীতির চলতি নাম দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত-মিশ্রবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান তান প্রধান। প্রথম ৩টি নাম প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া, পরের ৩টি অমূল্যধনের।

#### দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি :

যে ছন্দরীতিতে দল-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'দলবৃত্ত'। এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত লক্ষ করে অমূল্যধন এর নাম দিলেন 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি দলের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অমূল্যধনের বিবেচনায় এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে হলন্ত অক্ষরের (বুদ্ধদল) ওপর, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর।

#### কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি :

যে ছন্দরীতিতে কলা-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'কলাবৃত্ত'। যেহেতু, এ রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান, এবং ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে অক্ষরের মাত্রাও নির্দিষ্ট হয়, সেই কারণে অমূল্যধন একে বলেন 'ধ্বনিপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) হ্রস্ব উচ্চারণ ১-মাত্রা, বুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা ; পূর্ণপর্বে ৪ থেকে ৭ মাত্রা প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে, ৫ থেকে ৮ মাত্রা অমূল্যধনের হিসেবে।

সংস্কৃত কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলাভাষায় লেখা চর্যাপদে আর ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এমন এক ধরনের 'কলাবৃত্ত' ছন্দরীতি প্রয়োগ করা হত, সেখানে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল ২-মাত্রা পায়। হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের ১-মাত্রা আর বুদ্ধদলের ২-মাত্রা অবশ্য বহাল থাকে। প্রবোধচন্দ্রের কথায় এ ছন্দরীতির নাম 'প্রাচীন কলাবৃত্ত'। আধুনিক কালের কিছু কিছু কবিতায় এ রীতির প্রয়োগ রয়েছে।

#### মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি :

বুদ্ধদলের মাত্রার হিসেব দিয়েই প্রবোধচন্দ্র ছন্দরীতি নির্ধারণ করেন। প্রতিটি বুদ্ধদল যেখানে ১-মাত্রার, বুদ্ধদলের সেখানে দলবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে দলবৃত্ত। প্রতিটি বুদ্ধদল যেখানে ২-মাত্রার, বুদ্ধদলের সেখানে কলাবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে কলাবৃত্ত। কিন্তু, বুদ্ধদল যেখানে শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে ২-মাত্রার, সেখানে তার দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—১ মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব আর ২-মাত্রার কলাবৃত্ত-স্বভাব। ছন্দরীতিও তখন দুটি রীতির মিশ্রণে তৈরি। অতএব, এ রীতির নাম 'মিশ্রবৃত্ত'।

একই রীতির কবিতা পড়তে পড়তে একটা টানা সুর অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে বলে এই সুরের টানা বা 'তান'-কেই তাঁর এ রীতির বিশেষ লক্ষণ বলে মনে হত। অতএব, এ ছন্দরীতির নাম হল 'তানপ্রধান'। এ রীতেতে পূর্ণপর্বে সাধারণ ৬, ৮ বা ১০ মাত্রা।

---

## ২৪.৫ অনুশীলনী

---

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৪ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন :

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত

(খ) কেন এই নামকরণ, বুঝিয়ে দিন :

স্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান।

২. (ক) নীচের ছন্দরীতিতে কোন দলে কত মাত্রা, লিখুন : দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিন, পূর্ণযতির পরে প্রতিপর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন, নীচে ছন্দরীতির নাম লিখুন :

i) বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা

লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপ-মালা

ii) এ গৌঁফ যদি আমার বলিস করবো তোদের জবাই,

এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।

iii) আকাশে অসংখ্য তারা

চিন্তাহারা ক্লাস্তিহারা,

হৃদয় বিস্ময়ে সারা

হেরি একদিঠি

iv) হাথক দরপণ মাথক ফুল।

নয়নক অঞ্জল মুখক তাশুল।।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে সাধারণত কত মাত্রার পূর্ণপর্ব থাকে, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা কী, লিখুন :

দলবৃত্ত, তানপ্রধান, কলাবৃত্ত

(খ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি বৃন্দদলে ১-মাত্রা, লিখুন।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি বৃন্দদলে ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঘ) কোন ছন্দরীতিতে বৃন্দদলে কখনো ১-মাত্রা, কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঙ) কোন ছন্দরীতিতে মুক্তদলে কখনো ১-মাত্রা কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

## ২৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার : ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দরীতি	পৃ-৩১, ৩২	পৃ-৯৮	×
দলবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৪৬	×	পৃ-৬৫, ৭১-৮৬
স্বাসঘাতপ্রধান	×	পৃ-১০৯-১২	পৃ-৬৯
কলাবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৩৭	×	পৃ-৬৫, ৬৬, ৮৭-৯৮
ধ্বনিপ্রধান	×	পৃ-১০৬-০৮	পৃ-৬৮
মিশ্রবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৬৫	×	পৃ-৬৬-৬৯, ১০০-০৮
তানপ্রধান	×	পৃ-৯৯-১০৬	পৃ-৬৮



---

## একক ২৫ □ বাংলা ছন্দোবন্ধ

---

গঠন

- ২৫.১ উদ্দেশ্য
- ২৫.২ প্রস্তাবনা
- ২৫.৩ মূলপাঠ-১ : পয়ার
- ২৫.৪ সারাংশ-১
- ২৫.৫ অনুশীলনী-১
- ২৫.৬ মূলপাঠ-২ : অমিত্রাক্ষর
- ২৫.৭ সারাংশ-২
- ২৫.৮ অনুশীলনী-২
- ২৫.৯ মূলপাঠ-৩ : চতুর্দশপদী
- ২৫.১০ সারাংশ-৩
- ২৫.১১ অনুশীলনী-৩
- ২৫.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী
- ২৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ২৫.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ার পর—

- এমন একটি কৌশল আয়ত্ত হওয়া সম্ভব, যার সাহায্যে বুঝে নিতে পারবেন—একটি কবিতায় ছত্রের পর ছত্র ধরে ছন্দ আর অর্থ পাশাপাশি কীভাবে চলতে থাকে, চলতে চলতে এরা কে কোথায় সীমানা খুঁজে পায় আর থামে, এবং এই চলা আর থাা থেকে ছন্দ-অর্থের কী সম্পর্ক তৈরি হয়।
- ছত্রের পর ছত্র সাজাতে গিয়ে ছন্দ আর অর্থের সম্পর্ককে কবি কোন শাসনে বাঁধলেন, তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।
- ছত্রের বিন্যাসে আর ছন্দ-অর্থকে পাশাপাশি চালানোতে কবির দক্ষতা কতখানি, তার পরিমাপ করতে পারবেন।
- প্রথার একঘেয়ে শাসন থেকে কবিরা ক্রমশ বাংলা কবিতার ছন্দকে কীভাবে মুক্ত করে আনলেন, তা আন্দাজ করতে পারবেন।

## ২৫.২ প্রস্তাবনা

ছত্রনির্মাণ ছত্রবিন্যাস মিলের ব্যবহার আর ছত্রের পর ছত্র ধরে চলতে-থাকা ছন্দ-অর্থের সম্পর্ক—এসব নিয়ে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীর গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় নির্দিষ্ট বাঁধা ছিল বহুকাল। প্রথার শাসনকে অমান্য করার মতো জোরা বাঙালি কবির ছিলই না। ছন্দের এই বাইরের বন্ধন কী ধরনের ছিল, তা থেকে বাংলা কবিতার মুক্তির পথ কীভাবে তৈরি হল, সেইসঙ্গে বিরক্তিকর একঘেয়েমি কাটিয়ে কবিতার শরীর গঠনে ক্রমশ বৈচিত্র্য কীভাবে এল—তার খানিকটা আভাস এই এককের পাঠে তুলে ধরা হল।

ছন্দরীতির আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, দলের (বা অক্ষরের) সঠিক উচ্চারণ (টেনে-টেনে বা কেটে-কেটে) থেকে বেরিয়ে আসে দলের সঠিক মাত্রা, পর্বের মধ্যে সেই মাত্রার বিন্যাস থেকেই ক্রমশ ধরা পড়ে পর্বের পঙ্ক্তির (বা চরণের) স্তবকের, অবশেষে একটি গোটা কবিতার ছন্দ-স্বভাব—ছন্দের ভেতরকার পরিচয়। এবারে এগিয়ে চলুন ছন্দের বাইরের একটা পরিচয়ের দিকে, ছান্দসিকেরা যাকে বলেন ছন্দোবন্ধ। ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, আর ‘ছন্দোবন্ধ’ ছন্দের আকৃতি। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, ‘ছন্দোবন্ধ’ নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। কোন্ দল কত মাত্রা ধরে উচ্চারণ করবে—এর ওপর নির্ভর করে ছন্দরীতি। মাত্রাবিন্যাসের পর যতি কোথায় পড়বে, অর্থাৎ পর্বের মাপ কত মাত্রার হবে, পর্বের পর পর্ব সাজিয়ে কীভাবে পঙ্ক্তি বা চরণ তৈরি করবে—এর ওপর নির্ভর করে ‘ছন্দোবন্ধ’

নীচের দৃষ্টান্ত-দুটি দেখুন—

$$1. \begin{array}{cc|cc} ২ ১ ১ & ২ ১ ১ & ২ ১ ১ ২ & \\ \text{তাল্গাছে} & \text{তাল্গাছে} & \text{পল্লবচয়} & \end{array} \parallel = ৮ + ৬$$

$$\begin{array}{cc|cc} ২ ২ & ২ ১ ১ & ২ ১ ১ ২ & \\ \text{চনচল্} & \text{হিল্লোলে} & \text{কল্লোলময়} & \end{array} \parallel = ৮ + ৬$$

$$2. \begin{array}{cccc|cc} ১ ১ & ১ ১ & ১ ১ & ১ ১ & ১ ১ ১ & ১ ১ ১ \\ \text{পুণ্ণে} & \text{পাপে} & \text{দুক্ষে} & \text{সুখে} & \text{পতনে} & \text{উত্থানে} \end{array} \parallel = ৮ + ৬$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} ১ ২ & ১ ১ ১ & ২ & ১ ২ & ১ ১ ১ & \\ \text{মানুষ} & \text{হইতে} & \text{দাও} & \text{তোমার} & \text{সন্তানে} & \end{array} \parallel = ৮ + ৬$$

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রতিটি বৃন্দদলের উচ্চারণ ২-মাত্রায়—অতএব, রীতি কলাবৃত্ত (বা ধ্বনিপ্রধান)। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বৃন্দদল শব্দের প্রথমে ১-মাত্রার (পুণ্ দুক্ উত্ সন), শব্দের শেষে ২-মাত্রার (নুষ্ মার্)—অতএব, রীতি মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। ২ টি দৃষ্টান্তে পৃথক্ ছন্দরীতি। এবারে যতিচিহ্ন, পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের দিকে তাকান।

২ টি দৃষ্টান্তেই—

(১) অর্ধযতি (বা পর্বযতি) পড়েছে ৮-মাত্রার পর।

- (২) পূর্ণবতি (পঙ্ক্টিয়তি) পড়েছে ৮ + ৬ বা ১৪-মাত্রার পর  
 (৩) পূর্ণযতি (পঙ্ক্টিয়তি) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার।  
 (৪) প্রতি চরণে (বা পঙ্ক্টিতে) ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাস (বা পদবিন্যাস)।

২ টি দৃষ্টান্তের এই মিল আসলে চরণ বা পঙ্ক্টি-গঠনের মিল। এ মিল বাইরের, এ পরিচয় বাইরের। এরই নাম ‘ছন্দোবন্ধ’। ভেতরকার পরিচয়ে ভিন্ন হলেও বাইরের পরিচয়ে স্তবক-দুটি এক। ছন্দরীতি পৃথক্ হলেও এদের ‘ছন্দোবন্ধ’ এক।

এই এককে বাংলা কবিতার তিনরকম ছন্দোবন্ধ নিয়ে তিনটি ভাগে আলোচনা হবে—পয়ার, অমিত্রাক্ষর আর চতুর্দশপদী।

## ২৫.৩ মূলপাঠ-১ : পয়ার

পয়ার একটি ‘ছন্দোবন্ধের’ নাম। ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাসে চরণ (বা ৮ + ৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্ক্টি) তৈরি হলে তার ছন্দোবন্ধের নাম ‘পয়ার’। হয়তো ‘পদাকার’ (পদ + আকার) কথাটি থেকে ‘পয়ারে এসেছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যের ৮ + ৮ মাত্রার চরণ ক্রমশ ৮ + ৭ এবং তা থেকে ৮ + ৬-এ নেমে এসে ‘পয়ারে’-র বাঁধা নিয়মে স্থির হয়ে রইল আধুনিক বাংলা কাব্য পর্যন্ত। একটু আগে যে-দুটি দৃষ্টান্ত থেকে ‘ছন্দোবন্ধের’ পরিচয় পেলেন, সেই দৃষ্টান্ত-দুটি ‘পয়ার’ ছন্দোবন্ধের। ‘পয়ার’ নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। একাবলি ত্রিপদী চৌপদী—এইসব প্রাচীন ছন্দোবন্ধ বাংলা কবিতা থেকে ক্রমশ সরে গেছে অথবা সরে যাবার পথে। কিন্তু, ‘পয়ার’ এখনো টিকে আছে। অবশ্য তার রূপে বৈচিত্র্য এসেছে। সে বৈচিত্র্যের পরিচয় ক্রমশ পাবেন, দেখবেন—‘পয়ার’ কীভাবে একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে তার নামেরও বদল ঘটেছে।

প্রাচীন ছন্দোবন্ধ হিসেবে পয়ারের মূল শর্ত ৪টি—

১. প্রতি স্তবকে ২ টি চরণ (বা পঙ্ক্টি) থাকবে।
২. চরণ-দটির অন্ত্যমিল থাকবে (মিত্রাক্ষর)।
৩. প্রতি চরণে (বা পঙ্ক্টিতে) ২ টি করে পর্ব (বা পদ) থাকবে।
৪. প্রথম পর্ব (বা পদ) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার হবে।

নীচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ করুন—

$$\begin{array}{ccc} ১ ১ ১ ১ ২ & ১ ১ & \left| \begin{array}{c} ১ ১ ১ \\ ১ ১ ১ \end{array} \right. \parallel \begin{array}{c} ১ ২ \\ ১ ২ \end{array} \\ \text{মহাভারতের} & \text{কথা} & \text{অমৃত} \parallel \text{সমান} \end{array} = ৮ + ৬$$

$$\begin{array}{ccc} ১ ১ ২ & ২ & ১ ১ & \left| \begin{array}{c} ১ ১ \\ ১ ১ \end{array} \right. \parallel \begin{array}{c} ১ ১ ২ \\ ১ ১ ২ \end{array} \\ \text{কাশীরাম} & \text{দাস} & \text{কহে} & \text{শুনে} \parallel \text{পুণ্ণবান} \end{array} = ৮ + ৬$$

স্ববকটিতে পয়ারের ৪টি শর্তেরই পূরণ হয়েছে। এটাও জেনে রাখা ভালো—পয়ার ছন্দাবন্ধে লেখা সব পুরোনো কবিতারই ছন্দ-রীতি ছিল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। আসলে ছন্দ-রীতির এসব আধুনিক নাম চালু হবার আগে পর্যন্ত অমূল্যধন তো তানপ্রধান রীতির পরিচয় দিতেন পয়ারজাতীয় ছন্দ হিসেবেই।

ক্রমশ বৈচিত্র্য এল আধুনিক কবিতার পয়ারের রূপে। প্রবোধচন্দ্র তিনি দিক থেকে এ বৈচিত্র্য তুলে ধরলেন—আয়তনের দিক থেকে, ছন্দ-রীতির দিক থেকে, গতিভঙ্গির দিক থেকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে পর পর পয়ারের বৈচিত্র্য লক্ষ করুন—

- আয়তনের দিক থেকে পয়ারের ২টি রূপ : পয়ারের যে ৪টি মূল শর্তের কথা আগে জেনেছে, তার চতুর্থ শর্তে ছিল পয়ারের একটিমাত্র আয়তন বা দৈর্ঘ্যের উল্লেখ। পয়ারের আয়তন ছিল নির্দিষ্ট—৮ + ৬ মাত্র। প্রথম পর্বের (বা পদের) ৮-মাত্রা ঠিক রেখে দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) দৈর্ঘ্য কোনো কোনো পয়ারে বাড়ানো হল—৬-মাত্রার বদলে ১০-মাত্রা। এর নাম হল বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার। অতএব, ৮ + ৬ মাত্রার পয়ার যেমনটি ছিল, তেমনই রইল, এর সঙ্গে যুক্ত হল ৮ + ১০ মাত্রার ‘মহাপয়ার’। ৮ + ৬ মাত্রার ‘ছোটো পয়ারের’ দৃষ্টান্ত (‘মহাভারতের কথা....’) একটু আগে দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার ‘মহাপয়ারের’ দৃষ্টান্ত—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ || = ৮ + ১০  
 একথা জানিতে তুমি | ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান্ ||

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ | ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ || = ৮ + ১০  
 কালশ্রোতে ভেসে যায় | জীবন্ - যৌবন্ ধনমান্ ||

- ছন্দ-রীতির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ : পয়ার-বন্ধে লেখা পুরোনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, এ কথা একটু আগে জেনেছেন। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) হতে পারে, কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান) হতে পারে, মিশ্রবৃত্তও (তানপ্রধান) হতে পারে। দৃষ্টান্ত দেখুন—দলবৃত্ত পয়ার।

১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১  
 আজ বিকালে | কোকিল্ ডাকে || শূনে মনে লাগে = ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || ১ ১ ১ ১ | ১ ১  
 বাংলাদেশে | ছিলাম্ যেন || তিন শো বছর | আগে = ৮ + ৬

(প্রবোধচন্দ্রের পদ-বিভাগ)

কলাবৃত্তের পয়ার :

২ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ || = ৮ + ৬  
 নিম্নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল্ ||

$$\begin{array}{ccc|ccc} ২ & ১ & ১ & ২ & ২ & ২ & ১ & ১ & ২ \\ \text{উর্ধ্বে} & \text{পাষণ্-তট্} & & & & \text{শ্যাম্} & \text{শিলাতল্} & & \\ \hline & & & & & & & & = ৮ + ৬ \end{array}$$

মিশ্রবৃত্ত পয়ার :

$$\begin{array}{ccc|ccc} ১ & ১ & ১ & ১ & ২ & ১ & ১ & ১ & ১ & ২ \\ \text{দুয়ারে} & \text{প্রস্তুত্} & \text{গাড়ি} & & & \text{বেলা} & \text{দ্বিপ্রহর} & & & \\ \hline & & & & & & & & = ৮ + ৬ \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} ১ & ১ & ২ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ২ \\ \text{শরতের্} & \text{রৌদ্র} & \text{ক্রমে} & & & \text{হতেছে} & \text{প্রখর্} & & & \\ \hline & & & & & & & & = ৮ + ৬ \end{array}$$

লক্ষ করছেন, ৩-রকম ছন্দরীতির ৩টি দৃষ্টান্তই পয়ারের প্রতিটি শর্ত (৮ + ৬ মাত্রার অন্ত্যমিল-থাকা ২টি চরণ বা পঙ্ক্তি) মেনে চলেছে। কেবল ভেঙে দিয়েছে মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়ে প্রথার দেয়ালটি।

৩. গতিভঞ্জির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ :

পয়ার-বন্ধের চতুর্থ শর্তকে (৮ + ৬ মাত্রার চরণ) খানিকটা শিথিল করে ৮ + ১০ মাত্রার ‘মহাপয়ার’ তৈরি হল কীভাবে, তা লক্ষ করেছেন। এবার প্রথম শর্তের ওপর আঘাত। পয়ার-বন্ধের প্রথম শর্ত—২টি চরণ (বা পঙ্ক্তি) নিয়ে স্তবক তৈরি হবে। এই শর্তটির অর্থ ১টি চরণে না হলে ২টি চরণের মধ্যে একটি বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে কবি বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ, একটি বক্তব্যের মাপ ২-চরণের বেশি নয়। অন্য ৩টি শর্তের সঙ্গে পয়ারের এই শাসনও বাংলা কবিতার কবিরা মেনে চললেন উনিশ শতক পর্যন্ত। এর পর থেকে কোনো কোনো পয়ার সব শর্ত মেনে তৈরি হল, কোনো কোনো পয়ার প্রথম শর্ত পুরোপুরি মানল না। এমনি করে গড়ে উঠল পয়ারের ৩টি রূপ—অপ্রবহমান, প্রবহমান আর মুক্তক। পুরোনো সব শর্ত মেনে ২-চরণের সীমানায় বক্তব্যকে ধরে রেখে যেসব পয়ার লেখা হল সেখানে নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়ে ঐ বক্তব্য বা ভাব পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল না। এ-ধরনের পয়ারকে বলা হল অপ্রবহমান পয়ার। এ পর্যন্ত পয়ারের যে-কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তার সবই অপ্রবহমান পয়ার-এর।

যে-পয়ারে চরণের মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০ মাত্রায় স্থির রেখে, চরণের অন্ত্যমিল রেখে বা না-রেখে কোনো বক্তব্য বা ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হতে পারে, ২-চরণের সীমানার মধ্যেও অবধে চলতে পারে, তার নাম হল প্রবহমান পয়ার। নীচের দৃষ্টান্তটিতে ভাবের এই প্রবাহ লক্ষ করুন—

$$\begin{array}{ccc|ccc} ১ & ১ & ২ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ \\ \text{কবিবর্,} & \text{কবে} & \text{কোন্} & \text{বিস্মৃত} & \text{বরষে} & & & & \\ \hline & & & & & & & & = ৮ + ৬ \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} ২ & ১ & ১ & ১ & ২ & ১ & ১ & ১ \\ \text{কোন্} & \text{পুণ্ণ} & \text{আষাঢ়ের} & \text{প্রথম্} & \text{দিবসে} & & & \\ \hline & & & & & & & & = ৮ + ৬ \end{array}$$

লিখেছিলে মেঘদূত। .....

ব্যাকরণের নিয়মে একটি বস্তুব্যকে পুরোপুরি ধরে রাখার জন্য চাই কমপক্ষে একটি বাক্য। অথচ, ওপরের ২টি চরণ মিলেও পূর্ণ বাক্য তৈরি হল না। ‘কোন’ শব্দটিতে একটা প্রশ্নের সংকেত আছে, কিন্তু কী নিয়ে এ-প্রশ্ন তার উল্লেখ চরণ-দুটিতে নেই। তার পরে ভাব অসম্পূর্ণই থাকল। মেঘদূত-লেখার উল্লেখ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্য পূর্ণ হল, বস্তুব্যও পুরোপুরি ধরা পড়ল। ভাব ততক্ষণে ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবাহিত হল তৃতীয় চরণের দিকে। অতএব, স্তবকটি হয়ে উঠল প্রবহমান পয়ারের দৃষ্টান্ত। দেখাই যাচ্ছে, দৃষ্টান্তটি ৮ : ৬ মাত্রার—ছোটো পয়ারের। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার প্রবহমান মহাপয়ারের—

১ ১ ১    ১ ২    ১ ১    |    ১ ১ ২    ১ ১    ১ ১    ১ ১    ||  
সংসারে    সবাই    যাবে    |    সারাক্ষণ    শত    কর্মে    রত    ||    = ৮ + ১০

২    ১ ১    ১ ১ ১ ১    |    ১ ১ ২    ১ ১ ২    ১ ১    ||  
তুই    শুধু    ছিন্‌নবাধা    |    পলাতক    বালকের    মতো    ||    = ৮ + ১০

১    ১    ২    ১    ২    ১ ১    |    ১ ১ ১    ১ ১ ১    ১ ১ ১ ১    ||  
মধ্যান্নে    মাঠের    মাঝে    |    একাকী    বিষণ্ণ    তরুচ্ছায়ে    ||    = ৮ + ১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১    ||    ১ ১ ১ ১    ১ ১    ১ ১    ১ ১    ||  
দুরবনগধবহ    ||    মন্দগতি    ক্লান্ত    তপ্ত    বায়ে    ||    = ৮ + ১০

১ ১ ২    ১ ১ ১ ১    ১ ১  
সারাদিন    বাজাইলি    বাঁশি !.....

একটি বস্তুব্য বা ভাব পরপর ৪টি চরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে অবশেষে পঞ্চম চরণের মাঝামাঝি গিয়ে থামল।

এতক্ষণ ধরে আপনারা লক্ষ করেছেন—‘অপ্রবহমান পয়ার’ পয়ারের সব শর্ত মেনে চলে, ‘প্রবহমান পয়ার’ কেবল ২-চরণের সীমানায় ভাবকে ধরে রাখার শাসনটুকু মানে না, আর সব শর্ত মেনে নিতে বাধা নেই। তবে, পয়ারের এই ২টি রূপেই প্রতিটি চরণের মাপ নির্দিষ্ট— ৮ + ৬ মাত্রা বা ৮ + ১০ মাত্রা। ক্রমশ পদ্যের স্তবক-রচনায় কবির চরণের এই নির্দিষ্ট আয়তন অস্বীকার করতে চাইলেন। ভাবকে ২-চরণের সীমানার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে আনা ত হল-ই, সেইসঙ্গে চরণের মাপও নানারকম হতে লাগল, কখনো কখনো একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে স্তব তৈরি করা হল। প্রতি চরণে ২টি পর্ব রাখার শর্তও ভেঙে গেল, ১টি পর্বেই তৈরি হল চরণ। তবে স্তবকটি যে মূলত পয়ারের, এটা বোঝা যাবে সবচেয়ে বড়ো চরণটির মাপ দেখে (৮ + ৬ বা ৮ + ১০)। কোনো-না-কোনো চরণের এই মাপ থাকবেই। অন্য সব চরণের মাপ এর সমান হতে পারে, এর চেয়ে ছোটোও হতে পারে (৬, ৮ বা ১০-মাত্রা—যা পয়ারের ১টি পর্ব বা পদের মাপ)। এ-ধরনের পয়ারের নাম হল মুক্তক পয়ার। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—



আমরা দেখলাম, ‘পয়ার’ নামের একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ ৮+৬ মাত্রার মাপের ২ টি মিত্রাক্ষর (অস্ত্যমিল-থাকা) চরণের শরীর নিয়ে মধ্যযুগের রামায়ণ-মহাভারত-মঞ্জলকাব্যের দীর্ঘ পথ ধরে ক্রমশ পৌঁছল বাংলা কাব্য-কবিতার আধুনিক ঠিকানায়। পৌঁছল বটে, কিন্তু ততদিনে পুরোনো শর্তের শাসন একটি করে অমান্য করা চলল, প্রাচীন চেহারার একটু একটু করে বদল শুরু হল, মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের মতো কবির হাতে পড়ে নানা রূপের পয়ার তৈরি হতে লাগল। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট মাপের ছোটো পয়ারের পাশাপাশি এল ৮+১০ মাত্রার বড়ো মাপের মহাপয়ার, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়েমি কাটিয়ে গড়ে উঠল দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত রীতির পয়ার, ২-চরণের বাঁধন ছিড়ে ভাব মুক্তি খুঁজে পেল প্রবহমান আর মুক্তক পয়ারে। এমনি করে প্রাচীন পরিচয়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল ‘পয়ার’ নামের একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ।

## ২৫.৪ সারাংশ-১

ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, ভেতরকার পরিচয় ছন্দোবন্ধ ছন্দের আকৃতি—বাইরের পরিচয়। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, ‘ছন্দোবন্ধ’ নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্বনিব্যাসের ওপর।

পয়ার একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। কিন্তু, রূপের বৈচিত্র্য নিয়ে ‘পয়ার’ ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠেছে। তবে বহাল রেখেছে তার ৮+৬ মাত্রার প্রাচীন শরীরটি। প্রাচীন পয়ারে ৪টি শর্ত—স্ববকে ২টি চরণ, চরণশেষে মিল, প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব, ৮+৬ মাত্রার/এ পয়ারের একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

আধুনিক পয়ার বৈচিত্র্য পেল আয়তন ছন্দরীতি আর গতিভঙ্গির দিক থেকে। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট আয়তনের পাশে এল ৮+১০ মাত্রার ‘বড়ো পয়ার’ বা ‘মহাপয়ার’। মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির পাশাপাশি তৈরি হতে লাগল দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) আর কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান) রীতির পয়ার। যে পয়ারে ভাবের গতি ছিল একটি-দুটি চরণে বন্ধ—‘অপ্রবহমান’, তা ক্রমশ ‘প্রবহমান’ হল ঐ সীমানা পেরিয়ে। চরণে ৮ + ৬ বা ৮+১০ মাত্রার নির্দিষ্ট ছকও এরপর ভেঙে যেতে লাগল। একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে তৈরি করা স্ববকে পয়ারকে চিনতে হল সবচেয়ে বড়ো চরণের মাপ দেখে। সে মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০, স্ববকের অন্য সব চরণ ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে, (যা পয়ার চরণের একটি পর্ব)। এমনি করে তৈরি হল ‘মুক্তক’ পয়ার।

## ২৫.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ১০৪ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন : মহাপয়ার, অপ্রবহমান পয়ার।  
(খ) প্রবহমান পয়ার আর মুক্তক — এদের মধ্যে কোথায় মিল কোথায় পার্থক্য, বুঝিয়ে দিন।
২. (ক) কমপক্ষে ২টি ছত্রের ২টি করে দৃষ্টান্ত লিখুন :  
কলাবৃত্ত পয়ার, প্রবহমান পয়ার, মহাপয়ার।  
(খ) আধুনিক পয়ারের কী কী রূপ, লিখুন।



৩. (ক) নীচের দৃষ্টান্তে প্রবহমানতা আছে কিনা, বুঝিয়ে লিখুন :

- (i) কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশ,  
অহল্যা, পাষণরূপে ধরাতলে মিশি,  
(ii) তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়।  
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তে পয়ারের কোন রূপ রয়েছে, লিখুন :

- (i) সমুখে অজানা পথ ইঞ্জিত মেলে দেয় দূরে  
(ii) চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে শূনি ;  
(iii) বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।  
(iv) তাই তন্দ্রা নাহি আর  
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,  
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা

## ২৫.৬ মূলপাঠ-২ : অমিত্রাক্ষর

‘প্রবহমান পয়ার’-এর কথায় ফিরে চলুন। এখানে চরণের মাপ সাধারণত ৮+৬ (মহাপয়ার হলে ৮+১০) মাত্রা, ভাব বা বস্তুব্য ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যায়, চরণশেষের মিল সাধারণত থাকে, না-থাকলেও চলে। এই চরণশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান প্রবোধচন্দ্রে বলতেন অমিল প্রবহমান পয়ার। এই পয়ারেরই সবচেয়ে পরিচিতি নাম অমিত্রাক্ষর। আর, বাংলা কবিতায় শরীরে ‘অমিত্রাক্ষর’-এর পোষাকটি প্রথম পরিয়ে দিলেন মধুসূদন দত্ত, তাঁর তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে মেঘনাদবধকাব্যে বীরাঙ্গনাকাব্যে। মেঘনাদবধকাব্যের শুরু কীভাবে লক্ষ করুন :

সম্মুখ সমরে পড়ি, | বীরচূড়ামণি || = ৮ + ৬  
বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে || = ৮+ ৬  
অকালে, কহ, হে দেবি | অমৃতভাষিণি, || = ৮ + ৬  
কোন্ বীরবরে বরি | সেনাপতি-পদে || = ৮ + ৬  
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষঃ কুলনিধি || = ৮ + ৬  
রাঘবারি ? . . . . . (দৃষ্টান্ত - ১)

পদ্য উচ্চারণের অভ্যাস থেকে আপনারা সহজেই আন্দাজ করছেন—ওপরের স্তবকটির প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ১টি অর্ধযতি, ছত্রশেষে পূর্ণযতি। যতিস্থাপনের পর যে ৫টি চরণ পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটির মাপ ৮ + ৬ মাত্রা। স্তবকটিতে, ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে তো বটেই, এমনকী ৫টি চরণে প্রবাহিত হতে হতে ষষ্ঠ চরণ ছুঁয়ে একটি ভাব সম্পূর্ণ হয়েছে। উদ্ভূত স্তবকটির ছন্দোবন্ধ নিঃসন্দেহে প্রবহমান পয়ার। এবারে দেখুন, চরণশেষে মিল নেই কোনো জোড়া-চরণে (মনি-পুরে, ষিণি-পদে, নিধি)। অতএব, স্তবকটি প্রবোধচন্দ্রে অমিল প্রবহমান পয়ার, আমাদের ‘অমিত্রাক্ষর’

প্রতি জোড়া-চরণের শেষে মিল থাকলেই যদি পদ্যকে বলি ‘মিত্রাক্ষর’, তাহলে মিল না-থাকা যেকোনো পদ্যকেই তো বলতে পারি ‘অমিত্রাক্ষর’, তা সে পয়ার হোক বা না-হোক প্রবহমান হোক বা না-হোক। কিন্তু, ‘অমিত্রাক্ষর’-এর পরিচয় এ-রকম সংকীর্ণ নয়। ‘অমিত্রাক্ষর’ হবার জন্য কোনো পদ্যের অন্ততপক্ষে এই ৪টি গুণ থাকা জরুরি :

- (১) প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ।
- (২) প্রতিটি চরণের মাপ ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার।
- (৩) একটি ভাব বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া।
- (৪) চরণশেষে কোনো মিল না-থাকা।

প্রথম ২টি গুণ থাকলেই পদ্য হয় পয়ার, তৃতীয় গুণটির জোরে তা হয়ে ওঠে প্রবহমান পয়ার, চতুর্থ গুণটি তাকে করে দেয় অমিল প্রবহমান পয়ার বা ‘অমিত্রাক্ষর’।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন —

ইন্দ্রানী নামেতে দেশে | পূর্বাপর স্থিতি। || = ৮ + ৬

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা | বৈসে ভাগীরথী || = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-২)

এখানে ২টি ছত্র। প্রতি ছত্রের শেষে পূর্ণযতি, অতএব প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ। প্রতিটি চরণ ৮ + ৬ মাত্রার। সন্দেহ নেই, দৃষ্টান্তটি পয়ারের। এর অন্তর্গত বক্তব্যটি ২টি চরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ, ২-চরণের সীমানা তাকে পেরতে হয়নি। তাই পয়ারটি প্রবহমান হল না, এই কারণে ‘অমিত্রাক্ষর’ হবার সম্ভাবনাও তার তৈরি হল না। ধরা যাক, চরণশেষের মিলটুকু মুছে দিয়ে পয়ারটিকে ‘অমিল’ করে দেওয়া হল এইভাবে—

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা ভাগীরথী বৈসে।।

পয়ারটি এখন ‘মিত্রাক্ষর’ রইল না, ‘অমিত্রাক্ষর’ও হল না, হয়ে রইল শুধু ‘অমিল’ পয়ার। কেননা, ‘অমিত্রাক্ষর’ হবার জন্য আবশ্যিক তৃতীয় গুণটি (বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরনোর সাহস) এখনো সে অর্জন করে নি। এবার দেখুন নীচের দৃষ্টান্তটি—

ধবল নামেতে গিরি | হিমাদ্রির শিরে— || = ৮ + ৬

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, | ভীষণ দর্শন ; || = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-৩)

এটি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম ২টি চরণ। ‘অমিত্রাক্ষর’-এর স্রষ্টা মধুসূদনের হাতে শুরুটা এ-রকমই হল। কিন্তু একটি বক্তব্য বা ভাব স্থির হয়ে রইল ২টি চরণেরই সীমানায়। অতএব, এ দৃষ্টান্তটি একান্তই ‘অমিল’ পয়ারের, ‘অমিত্রাক্ষর’ নয়।

একই কাব্যের কয়েকটি ছত্র পেরিয়ে দেখুন—

যেন মরকতময় | কনককিরীট || = ৮ + ৬

না পরে এ গিরি, সবে | করি অবহেলা, || = ৮ + ৬

বিমুখ পৃথিবীপতি | পৃথ্বীসুখ যেন || = ৮ + ৬

জিতেদ্রিয় !..... (দৃষ্টান্ত - ৪)

এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত ‘অমিল’ পয়ারের নয়। এর সঙ্গে লেগেছে তৃতীয় গুণটির ছোঁয়া। লক্ষ করুন, এর নিহিত বস্তুব্য পর পর ৩টি চরণ অতিক্রম করে চতুর্থ চরণে প্রবেশ করার সাহস দেখাল। এই সাহসের জোরেই এ পয়ার ‘অমিত্রাক্ষর’ হয়ে উঠল। তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের শুরু থেকে উদ্ধার-করা এই অংশটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন একটু আগে মেঘনাদবধকাব্যের শুরু থেকে নেওয়া অংশটুকু (সম্মুখ সমরে পড়ি...)। আন্দাজ করা যাবে, ‘অমিত্রাক্ষর’ের তৃতীয় গুণটির (একটি বস্তুব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া) জোর কতটা বাড়ল, কীভাবে বাড়ল।

ভাবের বা বস্তুব্যের সীমানা পেরিয়ে যাবার এই গুণটিকে সংক্ষেপে বলুন প্রবহমানতা। এর সঙ্গে ভাবুন ছেদ আর যতির পার্থক্যটি। ছেদের সঙ্গে অর্থের যোগ, যতির সঙ্গে ছন্দে—এটা গোড়া থেকেই আপনারা জানেন। এ-ও আপনারা জানা, একটি ভাব বা বস্তুব্য অর্থকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। সেই কারণে, বাব বা বস্তুব্যকে যেখানে অপূর্ণ রেখে একটুখানি থামতে হয় সেখানে পড়ে অর্ধছেদ, যেখানে তাকে সম্পূর্ণ করে পুরোপুরি থামতে হয় সেখানে পড়ে পূর্ণছেদ। অর্ধছেদের একমাত্র চিহ্ন কমা, (,), পূর্ণছেদের চিহ্ন দাঁড়ি (।) জোড়া-দাঁড়ি (।।) বিস্ময়চিহ্ন (!) প্রশ্নচিহ্ন (?) ডাস্ (—), কোলন (:) সেমিকোলন (;)। অন্যদিকে, সমান সমান মাত্রার পরে নিয়মিত থামার জায়গায় পড়ে যদি—পর্বের পরে অর্ধযতি (|) চরণের পূর্ণযতি (।।)। যে ৪টি পয়ার-স্বকের দৃষ্টান্ত এর আগে দেওয়া হল, তাদের প্রত্যেকটিতে যতির স্থান নির্দিষ্ট—৮-মাত্রায় অর্ধযতি, ১৪-মাত্রায় পূর্ণযতি। পয়ারে এ-রকমই হয়। কিন্তু, ছেদের স্থান কোথাও নির্দিষ্ট, কোথাও অনির্দিষ্ট।

লক্ষ করুন : (১) দৃষ্টান্ত-২ আর দৃষ্টান্ত-৩ স্বকে ভাব বা বস্তুব্য ২-চরণেই বাঁধা, প্রবহমান নয়। ২টি স্বকের প্রতিটি ছত্রেই পূর্ণছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে এক জায়গায় মিলেছে। এমনকী, অর্ধছেদ-অর্ধযতিও মিলেছে দৃষ্টান্ত-৩ স্বকের দ্বিতীয় ছত্রে। অর্থাৎ, পূর্ণযতির সঙ্গে পূর্ণছেদেরও স্থান এসব ক্ষেত্রে ছত্রশেষে নির্দিষ্ট (১৪-মাত্রায়)।

(২) এবার তাকান দৃষ্টান্ত-৪ আর দৃষ্টান্ত-১ স্বকের দিকে। স্বকদুটিতে ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবহমান ২টি স্বকের মধ্যে কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-৪ স্বকের দ্বিতীয় ছত্রে আর দৃষ্টান্ত-১ এর তৃতীয় ছত্রে অর্ধছেদ-পূর্ণযতির মিলন, আর সব জায়গাতেই ছেদ আর যতির বিচ্ছেদ। অর্থাৎ, ছেদ-যতি আর কোথাও এক জায়গায় মেলেনি।

তাহলে, ওপরের (১)-অনুচ্ছেদ থেকে বুঝতে পারি, ভাব যেখানে ২-চরণের সীমানায় বাঁধা, ছেদ-যতির সেখানে মিলন। অন্ততপক্ষে পূর্ণছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে মিলবেই। আর, (২)-অনুচ্ছেদ থেকে জানা গেল, ভাব যেখানে প্রবহমান, ছেদ আর যতির সেখানে বিচ্ছেদ। অন্ততপক্ষে পূর্ণছেদ-পূর্ণযতি কখনো মিলবে না। অর্থাৎ, পয়ার প্রবহমান হলে পয়ার-স্বকে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ থাকবেই। ‘অমিত্রাক্ষর’ মূলত প্রবহমান পয়ার, অতএব, এখানেও ছেদ-যতির বিচ্ছেদ অনিবার্য। তবে এটা কোনো পদ্যের ‘অমিত্রাক্ষর’ হবার পক্ষে বাড়তি কোনো গুণ নয়, এটা প্রবহমানতরাই একটা লক্ষণ। এ লক্ষণ চোখ দিয়েও চেনা যায় ছেদ-যতির চিহ্নি দেখে।

আপনারা জানেন, পয়ারের দু-রকম আয়তন—৮+৬ মাত্রা আর ৮+১০ মাত্রা। ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার কীভাবে অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠে, দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের অমিত্রাক্ষর-রূপ। একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ‘প্রান্তিক’ কাব্য থেকে নেওয়া হল—

পুরস্কার প্রত্যাশায়   পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত	= ৮ + ১০
যেতে যেতে ; জীবনে যা   কিছু তব সত্য ছিল দান	= ৮ + ১০
মূল্য চেয়ে অপমান   করিয়ো না তারে ; এ জনমে	= ৮ + ১০
শেষ ত্যাগ হোক তব   ভিক্ষাবুলি, নবববসন্তের	= ৮ + ১০
আগমনে . . . . .	

৮+১০ মাত্রার মাপের এক-একটি বড়ো পয়ার বা মহাপয়ারের চরণ ২ টি করে যতিচিহ্ন নিয়ে এক-একটি ছত্র জুড়ে রয়েছে। লক্ষ করুন : প্রথম চরণে কোনো ছেদচিহ্ন নেই, দ্বিতীয় চরণে পূর্ণচ্ছেদ ( ; ) ৪-মাত্রায়, তৃতীয় চরণে পূর্ণচ্ছেদ ( ; ) ১৪-মাত্রায়, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ ( , ) ১২-মাত্রায়। অথচ, যতিচিহ্ন প্রতি চরণে ৮ আর ১৪-মাত্রায় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, প্রতিটি ছেদই যতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির এই বিচ্ছেদ থেকে ধরা পড়ে স্তবকটিরে অঙ্গগত ভাবের প্রবহমানতা। ভাব প্রবাহিত হয়ে চলেছে আগের চরণ থেকে পরের চরণে, থেমে যাচ্ছে চরণের যেখানে-সেখানে। এবার প্রতিটি চরণের শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখুন—মিল নেই (হাত্-দান্ নমে-তের্)। অতএব, ৮ + ১০ মাত্রার ৪টি চরণ নিয়ে তৈরি পয়ার-স্তবকটি ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর চরণশেষে মিলের অভাব নিয়ে অমিত্রাক্ষর হয়ে উঠেছে।

আয়তনের দিক থেকে ছোটো পয়ার আর বড়ো পয়ার—দু-রকম অমিত্রাক্ষরই আপনারা দেখলেন। কিন্তু রীতির দিক থেকে প্রতিটি পয়ারই ছিল মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। একমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতির হাত ধরেই বাংলা কবিতার অমিত্রাক্ষর পয়ার শতায়ু হয়েছে। কলাবৃত্ত (বা ধনিপ্রধান) অমিত্রাক্ষর কোনোকালে চালু হয়নি। তবে দলবৃত্ত রীতির অমিত্রাক্ষর চালু না হলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র নমুনা তৈরি করে খানিকটা চমক উপহার দিলেন ছন্দ-ভাবুক বাঙালিকে। নমুনাটি পড়ুন—

যুদ্ধ তখন সাজা হল   বীরবাহু বীর যবে	= ৮ + ৬
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ   গেলেন মৃত্যুপুরে	= ৮ + ৬
যৌবনকাল পার না হতেই   কত মা সরস্বতী,	= ৮ + ৬
অমৃতময় বাক্য তোমার,   সেনাধ্যক্ষপদে	= ৮ + ৬
কোন বীরকে বরণ করে   পাঠিয়ে দিলেন রণে	= ৮ + ৬
রঘুকুলের পরম শত্রু,   রক্ষঃকুলের নিধি	= ৮ + ৬

একটু আগে অমিত্রাক্ষরের প্রথম দৃষ্টান্তে মেঘনাদবধকাব্যের যে ৬টি ছত্র ব্যবহার করা হয়েছে, (সম্মুখ সমরে পড়ি.....) তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন ওপরের ৬টি ছত্র। লক্ষ করুন—২টি স্তবকের অঙ্গগত বস্তুব্য হুবহু এক, ভাষা দু-রকম। দৃষ্টান্ত-১ এর ভাষা সাধু, দৃষ্টান্ত-৫ এর চলতি। ২টি স্তবকের ছন্দরীতি মিলিয়ে দেখুন—দৃষ্টান্ত-১ এ মিশ্রবৃত্ত, দৃষ্টান্ত-৫ এ দলবৃত্ত। এবারে ২টি স্তবকেই দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে দেখুন, প্রতিটি ছত্রে আছে ১৪ মাত্রা। দৃষ্টান্ত-১ এ যতি স্থাপন করে আগেই দেখা গেছে, স্তবকটি ৮ + ৬ মাত্রার ৫টি ছোটো পয়ারের চরণে তৈরি। দৃষ্টান্ত-৫ দলবৃত্ত। অতএব এর প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার হবার কথা, প্রতিটি চরণে ১৪-মাত্রার বিভাজন হবার কথা ৪ + ৪ + ২। প্রবোধচন্দ্র এর বদলে ১৪-মাত্রাকে ৮ + ৬ মাথায় ভাগ করে

বলেছেন, দৃষ্টান্ত-৫ এর স্তবকটিও পয়ারের। তাহলে মেনে নিন, এটি দলবৃত্ত রীতির পয়ার। এখন দেখুন, স্তবকটির শরীরে ছেদ-যতি কোথায় এক বিন্দুতে মিলেছে, আর কোথায় বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির মিলন-স্থল এই কটি—৩য় চরণে পূর্ণচ্ছেদ-অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণযতি, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি, ষষ্ঠ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি আর পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি। দেখা গেল, প্রথম ৫টি চরণে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন-বিন্দু একটিও নেই। এর অর্থ, স্তবকটির শরীরে রয়েছে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ, ভেতরে চলছে ভাবের প্রবাহ। এর সঙ্গে মিলেছে চরণশেষে মিলের অভাব (যবে-পুরে স্বতী-পদে রণে-নিধি)। অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠার সব-কটি গুণই এ-স্তবকে দেখতে পেলেন। অথচ, স্তবকটি কিন্তু দলবৃত্ত রীতিতেই লেখা। এখনো পর্যন্ত এটিই দলবৃত্ত রীতিতে লেখা অমিত্রাক্ষরের একমাত্র পরিচিত দৃষ্টান্ত।

জেনে রাখুন, বাংলা কবিতায় কলাবৃত্তে অমিত্রাক্ষর হয়নি, দলবৃত্তে অমিত্রাক্ষর চলেনি, আর মিশ্রবৃত্তে অমিত্রাক্ষরের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ৪০ বছর আগে।

## ২৫.৭ সারাংশ-২

চরণশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান পয়ারকে প্রবোধচন্দ্র বলেন ‘অমিল প্রবহমান পয়ার’। এই পয়ারেরই অন্য নাম ‘অমিত্রাক্ষর’। অমিত্রাক্ষরের প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত, ‘প্রথম কাব্য ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’। একটি পদ্যের পক্ষে ‘অমিত্রাক্ষর’ হবার মূল শর্ত প্রতিটি ছত্রকে ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার মাপের চরণ হিসেবে পাওয়া এবং চরণশেষে মিল না-রাখা। কিন্তু, সবচেয়ে জরুরি শর্ত—একটি ভাব বা বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া। এই শর্তের জোরেই মধুসূদনের ‘তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের’ তুলনায় ‘মেঘনাদবধকাব্যের’ অমিত্রাক্ষর অনেক বেশি সমর্থক। ভারের এই সীমানা-পেরোনা বা প্রবহমানতার লক্ষণ চরণ-শেষে ছেদ না-থাকা, চরণের মাঝখানেও ৮-মাত্রার শেষে অর্ধযতির সঙ্গে অর্ধচ্ছেদ না-থাকা। ছেদ-যতির বিচ্ছেদে প্রবহমানতা, মিলনে প্রবহমানতার অভাব।

মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষরে’ কেবল ৮+৬ মাত্রার পয়ার, ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের কাঠামোয় তৈরি ‘অমিত্রাক্ষর’ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘প্রান্তিক’ কাব্যে। ‘অমিত্রাক্ষর’-এর ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথের তৈরি ৬-চরণের একটি দলবৃত্ত (স্বাসাঘাতপ্রধান) রীতির স্তবক, যা ‘মেঘনাদবধকাব্যের’ প্রথম ৬টি চরণের রূপান্তর—দলবৃত্ত রীতিতে ‘অমিত্রাক্ষর’ তৈরির পরীক্ষানিরীক্ষা।

## ২৫.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

- একটি অমিত্রাক্ষর স্তবক বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিন যে ঐ স্তবকে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধের সবকটি গুণই আছে।
- নীচের দৃষ্টান্ত অমিত্রাক্ষরের কিনা, কারণ জানিয়ে লিখুন :  
(ক) ধবল নামেতে গিরি হিমাঙ্গির শিরে—  
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ;

- (খ) যেন মরকতময় কনককিরীট  
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,  
বিমুখ পৃথিবীপতি, পৃথ্বীসুখে যেন  
জিতেদ্রিয় !
- (গ) বৃষ্টিক্রান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততরাশশী  
আষাঢ়সম্ভায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি  
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ  
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন ।
- (ঘ) যুদ্ধ তখন সাজ্জ হল বীরবাহু বীর যবে  
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে  
যৌবনকাল পার না হতেই ।

৩. নীচের দৃষ্টান্তে কোন ছন্দে কত মাত্রার পরে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর মিলন, লিখুন :

শুনেছি সরযুতীরে বসতি তাহার—  
ক্ষুদ্র নর । তব হৈমসিংহাসন-আশে  
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া  
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ?  
স্তবকটি অমিত্রাক্ষর কিনা জানান ।

## ২৫.৯ মূলপাঠ—৩

আপনারা দেখলেন, ‘অমিত্রাক্ষর’ পয়ারেরই একটি বিশেষ রূপ । এবারে দেখবেন, চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে । আবার, অমিত্রাক্ষরের মতো ‘চতুর্দশপদী’ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে যুরোপীয় ছন্দাবন্ধের আদলে । দুটি ছন্দাবন্ধই অনেকটা দেশি টবে ফুটে-ওঠা বিদেশি ফুলের মতো, এদেশে ফুটিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত । ইতালীয়—ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দাবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল চতুর্দশপদী । তবে, বিকল্প নাম হিসেবে ‘সনেট’ শব্দটিও বাংলায় চালু ।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কী সনেটের প্রথম কবি । যোলো শতকের ফরাসি কবি ফ্রঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা । প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি সেক্সপিয়রের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্সপিরীয় সনেট । এমনি করে তৈরি হল যুরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্সপিরীয় । এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা ‘চতুর্দশপদী’র আশ্রয় হয়ে উঠল ।

‘চতুর্দশপদী’ কথাটির সরল অর্থ ‘১৪টি পদ দিয়ে তৈরি’ কবিতা । কিন্তু, বাংলায় যে ধরনের কবিতা ‘চতুর্দশপদী’ নামে চিহ্নিত, তার শরীর ১৪টি চরণ দিয়ে গড়া, ১৪টি পদ দিয়ে নয় । ‘পদ’ কথাটির বিশেষ অর্থ

এখানে ‘চরণ’। এক সময়ে কোনো কোনো ছন্দশাস্ত্রে অবশ্য ‘পদ’ আর ‘চরণ’ একই অর্থে প্রয়োগ করা হত। এই ১৪টি চরণের সমষ্টি হওয়া ‘চতুর্দশপদী’ কবিতার প্রথম শর্ত, তবে একমাত্র নয়। একটি কবিতাকে ‘চতুর্দশপদী’ হবার জন্য কমপক্ষে আরো ৪টি শর্ত মানতেই হয় :

- (১) প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। বাংলা সনেট বা ‘চতুর্দশপদী’র প্রথম কবি মধুসূদনের মোট ১০৮টি কবিতার প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল মজুমদার ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারও প্রয়োগ করেছিলেন ‘চতুর্দশপদী’তে।
- (২) গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে।
- (৩) স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রাকীর্ষ ফরাসি সেক্সপিরীয়।

পেত্রাকীর্ষ আদর্শে একটি কবিতায় স্তবক থাকবে ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষটক)। ফরাসি আদর্শে ৩টি স্তবক—প্রথম স্তবক ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ২-চরণের (যুগ্মক), তৃতীয়টি ৪-চরণের (চতুষ্ক)। সেক্সপিরীয় আদর্শে স্তবকের সংখ্যা ৪ — প্রথম ৩টি ৪-চরণের (চতুষ্ক), শেষেরটি ২-চরণের (যুগ্মক)।

এ সব বিভাগ রূপের দিক থেকেও, ভাবের দিক থেকেও।

- (৪) চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল প্রতি ২-চরণের একঘেয়ে অন্ত্যমিল নয়। মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে, সে ছক উঠে আসবে নীচের ৩টি যুরোপীয় আদর্শের যেকোনো ১টি থেকে।

পেত্রাকীর্ষ মিল—কখখখ-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক + ষটক

ফরাসি মিল—কখখখ-কখখক গগ চছচছ = অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক

সেক্সপিরীয় মিল—কখকখ-গঘগঘ পফপফ চচ = চতুষ্ক + চতুষ্ক + চতুষ্ক + যুগ্মক

চরণের শেষ দলের (বা অক্ষরের) উচ্চারণ থেকেই সাধারণ অন্ত্যমিল তৈরি হয়। ক খ গ ঘ চ ছ জ প ফ—এক-একটি বর্ণ ‘চতুর্দশপদী’ এক-একটি চরণের শেষ দলের উচ্চারণের চিহ্ন। পরের দৃষ্টান্তগুলিতে চরণশেষে এসব চিহ্ন পরপর সাজিয়ে মিলের ছক নিজেসই বুঝে নিতে পারবেন। তখন দেখবেন, প্রতিটি ‘চতুর্দশপদী’র মিলের ছক কোনো-না-কোনো আদর্শের আদলে তৈরি। তবে দুটি-একটি এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়বে, যেখানে নির্দিষ্ট আদর্শ পুরোপুরি মানা হয় নি। বাঙালি কবিরা ‘চতুর্দশপদী’ লিখতে গিয়ে একটু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাই কেবল ৭টি যুগ্মকের সমষ্টি—অর্থাৎ, ২-চরণের ৭টি অন্ত্যমিল সাজানো এক-একটি ‘চতুর্দশপদী’।

অতএব, একটি ১৪-চরণের কবিতা ওপরের ৪-টি শর্ত মানলে তবেই হয়ে ওঠে ‘চতুর্দশপদী’। এর অন্তর্গত ভাব প্রবহমান হতে পারে, না-ও হতে পারে। অর্থাৎ, ছেদ-যতির মিলন থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে।

এবারে পর পর ৩টি দৃষ্টান্ত সতর্কতার সঙ্গে পড়ুন। লক্ষ করুন, কীভাবে এক-একটি কবিতা ‘চতুর্দশপদী’ হয়ে উঠেছে।

দৃষ্টান্ত-১.	কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে	ক	] অষ্টক
	কালিদহে । বসি বামা শতদল-দলে	খ	
	(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে	খ	
	মনোহরা !) বাম করে সাপটি হেলনে	ক	
	গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে ।	ক	
	গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,	খ	
	বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে ।	খ	
	কার না ভোলে রে মন ঃ, এ হেন ছিলনে !	ক	

	কবিতা-পঙ্কজে রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,	চ	] ষট্ক
	ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুখাদানে	ছ	
	অমর করিলা তোমা অমরকারিণী	জ	
	বাগদেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,	চ	
	এব কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?	ছ	
	বঙ্গ-হৃদ-হৃদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥	জ	

[কমলে কামিনী ঃ মধুসূদন দত্ত]

১৪-চরণের এই কবিতার প্রতিটি চরণ উচ্চারণ করে করে মনে মনে অর্ধযতি-পূর্ণযতির জায়গা খুঁজে বের করুন, দলের মাত্রা আন্দাজ করুন, তা থেকে এক-একটি পর্বের মাপ স্থির করুন। দেখবেন, মুক্তদল যেখানেই থাকুক ১-মাত্রার, বৃন্দদল শব্দের শুরুর্তে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার হচ্ছে। বোঝা গেল কবিতাটি মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে লেখা। যতির অবস্থান দেখে এও বোঝা যাবে, প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে বাঁধা।

এবারে লক্ষ করুন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছক ওপরে-নীচে লেখা চরণশেষের বর্ণ-চিহ্নগুলি পাশাপাশি সাজালে অন্ত্যমিলের এইরকম একটা ছক পাওয়া যাবে—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ

একটু আগেই আপনারা দেখলেন, এটা পেত্রাকীয় মিলের ছক। তাহলে ধরে নিতে পারেন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগও হবে পেত্রাকীয় আদর্শে। অর্থাৎ, এর স্তবক ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষট্ক)। রূপের দিক থেকে কবিতাটি যে এ-রম ২টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে, তা বোঝা যায় অন্ত্যমিলের ছক থেকেই—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক্ + ষট্ক 'কখ' মিলদুটি ৪-বার ঘুরে ঘুরে এসে ৮-চরণের (অষ্টক) প্রথম স্তবকটি গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় স্তবক তৈরি হয়েছে 'চছজ' মিল-তিনটির ২-বারের আবর্তনে, ৬টি চরণ নিয়ে (ষট্ক)।

এবারে কবিতাটির অন্তর্গত বস্তুব্য বা ভাবের দিকটা দেখুন। ৮-চরণের প্রথম স্তবকে চণ্ডীমঞ্জাল-কাব্যের মূলচরিত্র ধনপতি সদাগত-প্রসঙ্গ, ৬-চরণের দ্বিতীয় স্তবকে চণ্ডীমঞ্জালের কবি প্রসঙ্গ। অতএব, ভাবের দিক থেকেও ২টি স্তবকে কবিতাটি ভাগ হয়ে গেছে সহজেই।



ছেদ-যতির সম্পর্ক লক্ষ্য করুন। ছেদের যত্রতত্র প্রয়োগ (চরণের ৩, ৪, ৮, ১১, ১৪ মাত্রার পরে) ভাবের প্রবহমানতার লক্ষণ হয়ে আছে। পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন ৫টি চরণের শেষে ঘটলেও বাকি ৯টি চরণেই তো বিচ্ছেদ। অতএব, কবিতাটি প্রবহমান পয়ারেই লেখা।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই—সব শর্ত মেনে নিয়ে কবিতাটি পৈত্রাকীয় লেখা একটি ‘চতুর্দশপদী’।

দৃষ্টান্ত-২.

নয়ন-গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল	ক
বুলবুলের সুরে আজি বেঁধেছি সেতার।	খ
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার	খ
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল।	ক
যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল,	ক
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার।	খ
মম গীতে নত তব চোখের পাতার	খ
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল।	ক

বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব,	গ
পাইনি সে সুরে তব প্রাণের জবাব।	গ

আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার	চ
টুটুকিতে রাখি সব আশা ভালোবাসা	ছ
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার—	চ
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা-ভাসা।	ছ

[গজল ঃ প্রমথ চৌধুরী]

এইমাত্র দৃষ্টান্ত-১ বিশ্লেষণ করলেন। একই পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত-২ বিশ্লেষণ করুন। দেখা যাবে, এ কবিতার ১৪টি চরণও আগের মতোই ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে নিবন্ধ, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। অবশ্য, স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছকে একটুখানি ফারাক রয়েছে। এই ফারাকটি লক্ষ্য করুন—

কবিতা	মিলের ছক	স্তবক-বিভাগের ছক	যুরোপীয় আদর্শ
দৃষ্টান্ত-১	কখখক-কখখক চছজ-চছজ	অষ্টক + ষট্ক	পৈত্রাকীয়
দৃষ্টান্ত-২	কখখক-কখখক গগ-চছচছ	অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক	ফরাসি

২ টি দৃষ্টান্তেই অষ্টক পুরোপুরি এক। কেবল, দৃষ্টান্ত-১ এর ষট্‌ক (৬ টি চরণের দ্বিতীয় স্তবক) দু-টুকরোয় ভেঙে দৃষ্টান্ত-২-এর যুগ্মক (২-চরণের দ্বিতীয় স্তবক) আর চতুষ্ক (৪-চরণের তৃতীয় স্তবক) তৈরি করেছে। এর ফলে দৃষ্টান্ত-২ এর কবিতায় স্তবক পেলাম ৩টি, দৃষ্টান্ত-১ এ ছিল ২টি স্তবক। ফারাক এইটুকুই। কিন্তু, এইটুকুতেই আদর্শের ফারাক ঘটে গেল অনেকখানি। দৃষ্টান্ত-২ এর আদর্শ ছিল পেন্দ্রাকীয়, দৃষ্টান্ত-৩ এর আদর্শ হয়ে গেল ফরাসি। স্তবক-বিভাগ আর মিলের ছক—দুদিক থেকেই এ কবিতায় পুরোপুরি ফরাসি আদর্শের ছাপ।

ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে লঘু গজলের সুর রচনার উদ্যোগ গোটা কবিতার বস্তু বা ভাব। এই ভাবটিকে ৩টি ভাগে ভাগ করে ৩টি স্তবকে কবি সাজালেন, সহায়ক হিসেবে পেলেন ফরাসি মিলের ছকটি। প্রথম স্তবকের অষ্টক লঘু গজলের সুরে সেতার বাঁধার কথা, দ্বিতীয় স্তবকের ২টি চরণে বীণা-রবারের ব্যর্থতার কথা, আর তৃতীয় স্তবকের চতুষ্কে অনিচ্ছার সঙ্গেই ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তের কথা—স্তবক-বিন্যাসের এই পদ্ধতি পুরোপুরি ফরাসি সনেটের পদ্ধতি।

অতএব, দৃষ্টান্ত-২ এর কবিতাটি নিঃসন্দেহে ফরাসি আদর্শে লেখা একটি নিটোল ‘চতুর্দশপদী’। ছেদ-যতির অবস্থানে প্রবহমানতার কোনো লক্ষণ কবিতায় নেই।

দৃষ্টান্ত-৩.	তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,	ক
	সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে	খ
	হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি—	ক
	ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।	খ
	তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,	গ
	নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন	খ
	দেখো না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি-	গ
	পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।	ঘ
	তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে	প
	উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা	ফ
	অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে	প
	অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা	ফ
	তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর	চ
	আঁখিপ্ৰান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধারা	চ

[তবু/ মানসী : রবীন্দ্রনাথ]

দৃষ্টান্ত-১-এর পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করুন। ১৪-চরণের এ কবিতাতেও পাবেন ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার, মিশ্রবৃত্ত রীতি। তবে, পুরোপুরি অন্যরকম এর মিলের ছক আর স্তবক-বিভাগ। মিলের ছক কখকখ গঘগঘ

পফপফ চচ ; ৩টি চতুষ্ক আর ১টি যুগ্মক—এই ৪টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে কবিতাটি। রূপের পাশাপাশি ভাবের দিকটাও দেখুন। ‘তবু মনে রেখো’ কথাটি দিয়ে শুরু-হওয়া প্রতিটি স্তবকে একটি করে আবেদনের করুণ সুর বাজছে। এমনি করি কবিতাটির ভাগ হল সেক্সপিরীয় মিলের ছকে ৪টি স্তবকে। অতএব, এটি নিখুঁত সেক্সপিরীয় আদর্শে তৈরি ‘চতুর্দশপদী’।

‘চতুর্দশপদী’-র ৩টি নিখুঁত দৃষ্টান্ত পরপর দেখলেন। এবার দেখুন শর্ত-না-মানা এমন ৩টি দৃষ্টান্ত, যার কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মিশ্রবৃত্ত পয়্যারে বাঁধা ১৪টি চরণের কাঠামো ছাড়া ‘চতুর্দশপদী’ হবার মতো আর কোনো গুণ কবিতা তিনটির নেই।

দৃষ্টান্ত-১.	বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়	ক
	অসংখ্য বন্ধন-মারো মহানন্দময়	ক
	লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার	খ
	মুক্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার	খ
	তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত	গ
	নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো	গ
	সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়	ঘ
	জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়	ঘ
	তোমার মন্দির-মারো	
	ইন্দিয়ের দ্বার	চ
	বুন্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।	চ
	যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে	ছ
	তোমার আনন্দ হবে তার মাঝখানে	ছ
	মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,	জ
	শ্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।	জ

[মুক্তি : নৈবেদ্য]

দৃষ্টান্ত-২.	কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছে কার লাগি,	ক
	প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন,	খ
	কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,	খ
	চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি।	ক
	অসীম অতৃপ্তি লয়ে মারো মারো ফেলিছ নিশ্বাস,	গ
	আকাশপ্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস,	গ
	জগতের উর্নাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি।	ক

অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিস দোসর,	ঘ
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,	গ
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর।	ঘ
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,	গ
সহস্র শরদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর—	ঘ
হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া—	চ
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া ॥	চ

দৃষ্টান্ত-৩. এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের সূত্র যবে  
 ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে  
 অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঞ্জোর দেশে  
 নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা  
 ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।  
 অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতামাঝে  
 মেলিনু নয়ন ; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,  
 ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,  
 লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঞ্জিতে।  
 বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান  
 বিরাট নেপথ্যালোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।  
 পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মিলন জীর্ণতা  
 ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে  
 নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

[প্রাস্তিক-৩]

দৃষ্টান্ত-১ এর কবিতাটিতে ১৪টি চরণ আছে, প্রতিটি চরণে ৮+৬ মাত্রা আছে, ছন্দরীতিও মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক কক খখ গগ ঘঘ চচ ছছ জজ। অর্থাৎ, ৭-রকমের অন্ত্যমিলে তৈরি ৭-জোড়া চরণ বা ৭টি যুগ্মকে কবিতাটি ভাগ হয়ে আছে। অথচ, ভাবের দিক থেকে কবি নিজেই কবিতাটিকে ভাগ করেছেন ৩টি স্তবকে—প্রথম স্তবকে ৮.৫টি, দ্বিতীয় স্তবকে ৩.৫ টি আর শেষ স্তবকে ২টি চরণ। এ-রকম অদ্ভুত স্তবক-বিভাগ ‘চতুর্দশপদী’র ইতিহাসে কেবল রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। অন্যমিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো আদর্শ বা প্রথাকে এ কবিতায় গ্রাহ্যই করা হয়নি।

দৃষ্টান্ত-২ এ ১৪ চরণের এমন একটি কবিতা এই প্রথম পেলেন, যার প্রতিটি চরণ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারে বাঁধা। ছন্দরীতি অবশ্য আগের মতোই মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক কখখক গগকঘ গঘগঘ চচ যা এতকাল ধরে চালু ৩টি আদর্শের ১টিকেও মানছে না। ছকটি দেখে মনে হবে, পরপর ৩টি চতুষ্ক আর ১টি

যুগ্মক নিয়ে সেক্সপিরীয় আদর্শের স্তবক-বিভাগ। অথচ, ভাবের দিক থেকে স্তবক-চারটি এইরকম—প্রথমে ১টি চতুষ্ক, মাঝখানে পরপর ২টি ত্রিতক (৩-চরণ), শেষে ১টি চতুষ্ক। এর অর্থ, স্তবক-বিভাগও কোনো আদর্শের তোয়াক্কা করে না।

দৃষ্টান্ত-৩-এর কবিতাটি ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের আর-একটি নমুনা। ১৪-চরণের আয়তনে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ারের বাঁধন ছাড়া আর কোনো গুণ এর নেই, যার ওপর ভর করে কবিতাটি ‘চতুর্দশপদী’ হবার দাবি তুলতে পারে। প্রথমে ২টি দৃষ্টান্তে মিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো-না-কোনো ছক ছিল-ই। আলোচ্য দৃষ্টান্তে লক্ষ করুন—চরণশেষে মিল নেই, স্তবক-সাজানোর দায় নেই।

## ২৫.১০ সারাংশ-৩

ইতালি-ইংরেজ-ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম চতুর্দশপদী।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কা পেত্রার্কী, ষোলো শতকের ফরাসি কবি ফ্লেঁসে মারো, আর সতেরো ইংরেজ কবি সেক্সপিয়র—এঁদের হাতে তৈরি হল সনেটের ৩টি আদর্শ। এই ৩টি আদর্শেই লেখা হতে লাগল বাংলা সনেট বা ‘চতুর্দশপদী’, প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত।

‘চতুর্দশপদী’ কবিতাকে ১৪-চরণের কাঠামো নিয়ে আরো ৪টি শর্ত মেনে চলতে হয়—প্রতিটি চরণ পয়ারের, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, পেত্রার্কীয় ফরাসি বা সেক্সপিরীয় ছকে স্তবক-বিভাগ, একই ছকে চরণ-শেষের মিল। ছক-তিনটি এইরকম—

ছক	স্তবক-বিভাগ	চরণশেষের মিল
পেত্রার্কীয়	৮-চরণ (অষ্টক) + ৬-চরণ (ষটক)	কখখক-কখখক চছজ-চছজ
ফরাসি	৮-চরণ (অষ্টক) + ২-চরণ (যুগ্মক) + ৪-চরণ (চতুষ্ক)	কখখক-কখখক গগ চছচছ
সেক্সপিরীয়	৪-চরণ (চতুষ্ক) + ৪-চরণ + ৪-চরণ + ২-চরণ (যুগ্মক)	কখখক-গঘগঘ পফপফ চচ

ক খ গ ঘ প ফ চ ছ জ — এগুলি চরণশেষের মিলের চিহ্ন।

তবে যুরোপীয় আদর্শের ছক বাঙালি সনেট-কারেরা সবসময় মেনে চলেন নি। এমনকী, রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু কবিতা কেবল ১৪-চরণের মিশ্রবৃত্ত পয়ার, অথচ ‘চতুর্দশপদী’ নামেই চালু।

## ২৫.১১ অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৫ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. চতুর্দশপদী-ছন্দোবন্ধের ‘চতুর্দশপদী’ নাম সংগত কিনা, কথাটির অর্থ এবং এ ছন্দোবন্ধের পক্ষে আবশ্যিক শর্তগুলি উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

২. (ক) চতুর্দশপদীর আশ্রয় কী কী আদর্শ, লিখুন।  
 (খ) চতুর্দশপদীর স্তবক-গঠনের ছক কী কী রকমের, লিখুন।  
 (গ) চতুর্দশপদীর মিলের ছক কী কী রকমের, লিখুন।
৩. (ক) নীচের স্তবকগুলির প্রতিটি ছত্রের শেষে মিল-চিহ্ন (ক খ গ ঘ ইত্যাদি) বসান, তারপর দৃষ্টান্তটি চতুর্দশপদীর কী ধরনের স্তবক আর মিলের ছক হতে পারে, লিখুন :
- (i) স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,  
 ‘ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,  
 এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?  
 যা ফিরি, অঞ্জলি তুই, যারে ফিরি ঘরে।’
- (ii) হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর-সনেট  
 কি সরল ! নারিজির সুরভি সমীরে,  
 মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,  
 ফেলিছে বিরহস্বাস যেন গো সুধীরে।
- (iii) মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।  
 হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান।
- (খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন :
- (i) যুরোপীয় সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম \_\_\_\_\_, বাংলায় তারই নাম চতুর্দশপদী।  
 (ii) \_\_\_\_\_ শতকের ইতালীয় কবি \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ শতকের ফরাসি কবি \_\_\_\_\_ আর \_\_\_\_\_ শতকের ইংরেজ কবি \_\_\_\_\_ এর হাতেই গড়ে উঠল চতুর্দশপদীর মূল যুরোপীয় আদর্শ।

## ২৫.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৫ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন : পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।  
 (খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন :  
 ছন্দরীতি আর ছন্দোবন্ধ, সাধারণ (অপ্রবহমান) পয়ার আর অমিত্রাক্ষর।  
 (গ) নীচের ছন্দোবন্ধে কী কী গুণ থাকা জবুরি, লিখুন : পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।
২. নীচের দৃষ্টান্ত কোন শ্রেণির ছন্দোবন্ধের, কারণ জানিয়ে লিখুন :
- (ক) তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,  
 তাই তব জীবনের রথ  
 পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার  
 বারম্বার।

- (খ) জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !  
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,  
কিন্তু এ স্নেহের তৃণা মিটে কার জলে ?  
দুশ্খ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
- (গ) প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি  
তাঁর কথা । ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,  
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী  
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ?
- (ঘ) যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দ্বীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো  
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা-কালো  
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা  
তাদের প্রাণের বরণা—স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার ধারা

### ২৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার : ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দোবন্ধ	পৃ-২৪১	পৃ-১৮	পৃ-৫৪
পয়ার	পৃ-২৪৯, ৫০, ১৭০-৮৯	পৃ-১৮, ৭৬	×
প্রবহমানতা	পৃ-২৫৭	×	পৃ-১০৭, ১১২
মুক্তক	পৃ-১৮০-৮৯, ২৬৮	×	পৃ-১২, ১৩, ১০৭, ১১৭-২০, ১৪৭
অমিত্রাক্ষর	পৃ-২৩২, ২৩৩, ১৭৬-৮০	পৃ-১৯, ৭০-৭২	পৃ-১১১-১৫
চতুর্দশপদী	×	পৃ-৮৫, ৮৬	পৃ-১৪৫, ১৪৬





## বাংলা অলংকার ও তার পরিচয়

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৪টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-২ পর্যায়। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাংলা কবিতার অলংকার। আলোচনার মূল বিভাগ দুটি—অলংকারের পরিচয় আর অলংকার-নির্ণয়। পরিচয় পর্বটি সম্পূর্ণ হয়েছে তিনটি এককে, নির্ণয় পর্বের জন্য বরাদ্দ হয়েছে পুরো একটি একক। এই চারটি থেকে গোটা পর্যায়টি বিভক্ত। প্রতিটি এককের আশ্রিত বিষয়বস্তু এইরকম :

- একক ২৬ : এই এককে কবিতার অলংকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটুকু শিক্ষার্থীর মনে সহজে তৈরি করে দেবার জন্য ‘অলংকার’ কথাটির চেনা অর্থের সঙ্গে কবিতার অলংকারের অচেনা অর্থের সংযোগটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে অতি সংক্ষেপে জানানো হল প্রাচীন ভারতের অলংকার ভাবনার কথা, অলংকারের তাৎপর্য নিয়ে কথা, আর অলংকারের মূল বিভাগের কথা।
- একক ২৭ : অলংকারের দুটি মূল বিভাগের একটি শব্দালংকার। শব্দালংকার এই এককের বিষয়। ‘শব্দ’ কথাটির দুটি অর্থের (ধ্বনি, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি) মধ্যে একমাত্র ধ্বনির মাধুর্যই যে শব্দালংকার, আবশ্যিকমতো উদাহরণের সাহায্য নিয়ে তার আলোচনা এখানে করা হল। এরপর সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য চারটি শব্দালংকারের (অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষ-বক্রোক্তি) বিশদ বিশ্লেষণ করা হল সংজ্ঞায়, উদাহরণে ব্যাখ্যায়।
- একক ২৮ : অলংকারের বড়ো বিভাগটির নাম অর্থালংকার। বড়ো বলেই বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে তার বিশদ আলোচনা করে দেওয়া হল এই এককে। প্রথমভাগে অর্থালংকারের কথা সাধারণভাবে, পরের দুটি ভাগে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হল। এই পাঁচটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল এগারোটি অলংকার—সাদৃশ্যমূলক ‘উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি-অতিশয়োক্তি-ব্যতিরেক’ বিরোধমূলক ‘বিরোধভাস’, শৃঙ্খলামূলক ‘একাবলি’, ন্যায়মূলক ‘অর্থান্তরন্যাস’, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক ‘ব্যাজমুতি-স্বভাবোক্তি’।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে এই ৩টি বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১. অলংকার চন্দ্রিকা : শ্যামাপদ চক্রবর্তী।
২. বাঙলা অলঙ্কার : জীবেন্দ্র সিংহ রায়।
৩. বাংলা কবিতার অলংকার : সুধীন্দ্র দেবনাথ।

---

## একক ২৬ □ অলংকার

---

গঠন

২৬.১ উদ্দেশ্য

২৬.২ প্রস্তাবনা

২৬.৩ মূলপাঠ

২৬.৪ সারাংশ

২৬.৫ অনুশীলনী

---

### ২৬.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লে—

- বাংলা কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, এ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আপনার মনে তৈরি হবে।
  - কাব্যের অলংকার নিয়ে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারাবাহিক চিন্তাভাবনা বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানবার জন্য আপনি আগ্রহী হবেন।
  - কবিতার অলংকারের মূল বিভাগ এবং তাদের ভেতরকার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন।
- 

### ২৬.২ প্রস্তাবনা

---

কবিতার সৌন্দর্য অনুভব করার পাশাপাশি উৎসুক পাঠকের, আগ্রহী শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত দায়িত্ব সেই সৌন্দর্যের রহস্য কী, তা ধাপে ধাপে বুঝে নেবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ কবিতায় অলংকার স্থান। ভারতীয় অলংকার চর্চার ধারা থেকেই বাংলা কবিতার অলংকারের ভাবনা এসেছে, আবশ্যিক পরিভাষা নেওয়া হয়েছে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র থেকেই। অলংকার সম্পর্কে আপনার মনে প্রাথমিক ধারণাটুকু তৈরি করে দেবার জন্য যেটুকু আবশ্যিক, সংক্ষেপে তাই করা হল একক ৩৭-এ।

---

### ২৬.৩ মূলপাঠ

---

সংস্কৃত ‘অলম’-এর একটি অর্থ ‘ভূষণ’ বা সাজসজ্জা। ‘অলংকার’ তাহলে সাজসজ্জার কাজ। শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য শরীরকে সাজানো হয় গয়না দিয়ে, তাই গয়না শরীরের অলংকার। রচনাকে সুন্দর করার জন্য যে আয়োজন, তাও অলংকার। সেই অলংকারে সাজানো হলে তবেই কোনো রচনা হবে কাব্য।

ভরতমুনির ‘নাট্যশাস্ত্রে’ অলংকারের উল্লেখ হয়েছিল দু-হাজার এক-শ বছর আগে—উপমা দীপক রূপক যমক, এই চারটি অলংকার। ভারতবর্ষে অলংকার-চর্চার এই হল সূচনা। দেড় হাজার বছর আগে থেকে শুরু

হয়েছিল অলংকার নিয়ে নানা বিতর্ক। ছ-শতকের আচার্য দণ্ডীর ‘কাব্যাদর্শে’ ভরতমুনির চারটি অলংকার বেড়ে হল ছত্রিশটি। তাঁর মতে, যেসব ধর্ম কাব্যে শোভা এনে দেয় তার নাম অলংকার (‘কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে’)। সাত-শতকেরক আচার্য ভামহের ‘কাব্যালঙ্কার’ গ্রন্থের বক্রোক্তি-তত্ত্ব পেরিয়ে যখন আট শতকে পৌঁছই, তখন দেখি, বামনাচার্য অলংকার সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করছেন তাঁর ‘কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি’ গ্রন্থে—কোনো রচনা মানুষের কাছে উপাদেয় এবং কাব্য বলে গ্রাহ্য হয় অলংকারের জন্যই, আর সৌন্দর্যই হচ্ছে সেই অলংকার (‘কাব্যং গ্রাহ্যং হালঙ্কারং। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ’)। বামনাচার্যের এই সূত্রটি আজকের বাংলা কবিতার অলংকার বুঝতেও অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার নিয়ে আলোচনা পাঁচটা আলোচনা চলেছে সতেরো-শতক পর্যন্ত। বামনাচার্যের সূত্রটি ক্রমশ দুটি মাত্রা পেল—এক, অলংকার কাব্যের সাধারণ (আত্মভূত) সৌন্দর্য; দুই অলংকার কাব্যের বিশেষ (অজ্ঞাভূত) সৌন্দর্য। চৌদ্দ-শতকের বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকারের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে ছিয়ান্তরটি অলংকারের আলোচনা করলেন তাঁর ‘সাহিত্যদর্পণ’ গ্রন্থে।

সেই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সম্মান কিছুকাল ধরে চলছে। এখানে আমরাও তাই করব—বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যিকমতো উদাহরণ সংগ্রহ করে অলংকার নির্ণয় করে যাব। তবে তার সীমানা পনেরোটি অলংকার।

কবিতার মতো অলংকারের আয়তনও অনির্দিষ্ট। একটি অলংকার একটিমাত্র শব্দকে আশ্রয় করতে পারে, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য জুড়ে থাকতে পারে, কবিতার একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার শরীরেও ছড়াতে পারে। কবিতা বা তার অন্তর্গত স্তবক-চরণ বাক্য শব্দের দুটি রূপ—একটি ধ্বনিরূপ, আর একটি অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, তার আবেদন শ্রুতির কাছে; অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে, তার আবেদন বোধের কাছে। কবিতা স্তবক-চরণ বাক্য বা শব্দ উচ্চারিত হলে উচ্চারণজনিত ধ্বনির মাধুর্য সরাসরি শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করতে পারে, অথবা অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতার বোধকে উদ্দীপিত করতে পারে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম, শব্দালংকার আর অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

## ২৬.৪ সারাংশ

শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য গয়না দিয়ে শরীরকে সাজানো হয়। তাই, গয়না শরীরের অলংকার। তেমনি, কথাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য যে আয়োজন, তা কথার অলংকার। আর, এই অলংকার দিয়ে সাজানো কথাই কাব্য বা কবিতা।

ভারতবর্ষে অলংকারের ইতিহাস ২১০০ বছরের। প্রথমে ভরতমুনি জানালেন ৪টি অলংকারের কথা, তারপর আচার্য দণ্ডী ৩৬টি এবং ভামহ বামনাচার্যের যুগ পেরিয়ে সবশেষে বিশ্বনাথ কবিরাজ ৭৬টি অলংকারের আলোচনা করলেন। বামনাচার্যের একটি মত, অলংকার হচ্ছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অর্থ ধরেই অলংকার ব্যাখ্যা করলেন, আমরাও এই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সম্মান করব।

একটিমাত্র শব্দ অথবা একটি-দুটি চরণ বা একটি স্তবক, এমনকী একটি গোটা কবিতা জুড়েও থাকতে পারে অলংকার। কবিতা বা স্তবক-চরণ শব্দের দুটি রূপ—ধ্বনিরূপ আর অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম শব্দালংকার, অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

---

## ২৬.৫ অনুশীলনী

---

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬০-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, লিখুন।
২. (ক) পাঁচজন প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকের নাম, তাঁদের গ্রন্থের নাম আর অলংকার-চর্চার কাল (শতক) উল্লেখ করেন।  
(খ) কোন আলংকারিকের কোন সূত্রের কী অর্থ ধরে বাংলা কবিতায় অলংকার স্থান করা হয় লিখুন।
৩. (ক) একটি কবিতার কতটুকু আয়তন জুড়ে একটি অলংকার থাকতে পারে, লিখুন।  
(খ) উচ্চারিত কবিতা বা তার অংশের কী কী রূপ, কোন রূপ শ্রোতার কোন ইন্দ্রিয়ের ধরা পড়ে লিখুন।
৪. অলংকারের মূল বিভাগ কী কী, কবিতা বা তার অংশের উচ্চারণ থেকে অলংকার কীভাবে তৈরি হয়—লিখুন।

---

## একক ২৭ □ শব্দালংকার

---

গঠন

২৭.১ উদ্দেশ্য

২৭.২ প্রস্তাবনা

২৭.৩ মূলপাঠ

২৭.৩.১ অনুপ্রাস

২৭.৩.২ যমক

২৭.৩.৩ শ্লেষ

২৭.৩.৪ বক্রোক্তি

২৭.৪ সারাংশ

২৭.৫ অনুশীলনী

---

### ২৭.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লে—

- আপনি বাংলা কবিতার উচ্চারণ থেকে ধ্বনিমাধুর্য আন্বাদন করার সমর্থ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারবেন।
  - বাংলা কবিতায় ধ্বনির প্রয়োগে বা সমাবেশে কবির দক্ষতা বিচার করার ক্ষমতা ক্রমশ আপনার মধ্যে তৈরি হবে।
  - বাংলা কবিতায় ধ্বনিপ্রয়োগের নানারকম কৌশল বুঝে নেওয়া ক্রমশ আপনার পক্ষে সহজ হবে।
- 

### ২৭.২ প্রস্তাবনা

---

একক ৫ থেকে জানলেন বাংলা কবিতার অলংকারের দুটি মূল বিভাগের কথা। এর প্রথমটি শব্দালংকার। এ অলংকার তৈরি হয় শ্রোতার কানে, কবিতার উচ্চারণ থেকে মধুর ধ্বনি শুনতে শুনতে। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যিকমতো দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে অলংকারের এই বিভাগটির পরিচয় আপনার কাছে তুলে ধরা হল। কিছু কিছু সূক্ষ্ম কৌশলগত পার্থক্যের কারণে শব্দালংকারেও যে ধরনের বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাও দেখানো হল।

---

### ২৭.৩ মূলপাঠ

---

বাংলায় ‘শব্দ’ কথাটির দুটি অর্থ—একটি ধ্বনি, অন্যটি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টি (লেখায়) বা ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। প্রথমটি ইংরেজি Sound অর্থে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি Word অর্থে। ‘শব্দালংকার’-এর ‘শব্দ’ তাহলে কোন অর্থে? চারটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে অর্থটি বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম উদাহরণ, ‘কথিত কনক কান্তি কমনীয় কায়’—এই ছত্রটিতে পাঁচটি শব্দ (Word) আছে, আবার পাঁচটি ক-ধ্বনিও আছে। পাঁচটি পৃথক শব্দ, কিন্তু একই ক-ধ্বনি পাঁচবার। ছত্রটি উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনিটিই পরপর পাঁচবার কানে মৃদু আঘাত দেয়, একই ধ্বনি বারে বারে আবৃত্ত হয়ে মাধুর্য সৃষ্টি করে, তৈরি হয় ধ্বনির অলংকার—শব্দালংকার। পৃথক পৃথক শব্দ (Word) এখানে কোনো অলংকার তৈরি করে না।

ওপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা গেল, অলংকার তৈরি করে যে শব্দ তা Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি নয়, Sound বা ধ্বনি। অর্থাৎ, শব্দালংকারের ‘শব্দ’ ধ্বনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তর্ক আছে। আরও দুটি উদাহরণ থেকে তর্কও উঠবে, সে তর্কের মীমাংসাও হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ,

আটপাণে কিনিয়াছি আধসের চিনি।

অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

এখানে ‘চিনি’ শব্দটি দুটি ছত্রে দুবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম ‘চিনি’ এক ধরনের মিষ্টি, দ্বিতীয় ‘চিনি’-র অর্থ ‘জানি’ বা ‘বুঝি’। একই শব্দ ‘চিনি’ দুবার উচ্চারিত হল দুটি পৃথক অর্থ নিয়ে। ‘চিনি’-র পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ কানে মধুর লাগে, কানকে তৃপ্ত করে। এই মাধুর্যের সঙ্গে একটুখানি চমক লাগে ‘চিনি’ শব্দটি দুবার দুটি পৃথক অর্থ পাচ্ছে বলে। একই অর্থে দুবার উচ্চারণে ওই আত্মদটুকু পাওয়া যাবে না, যেমন পাওয়া যায় না যদি বলি—‘তোমাকে ত চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে!’ অথবা ‘ছেলেটা চিনি চিনি করে চোঁচায় শুধু, বেশি খেতে পারে না!’ ‘চিনি’ শব্দের দুটি পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ থেকে যে মাধুর্য তৈরি হল তা-ও শব্দালংকার। এ অলংকার তো ‘চিনি’ শব্দটাকে ঘিরেই তৈরি হল এবং ‘শব্দ’ এখানে Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, sound বা ধ্বনি নয়।

তৃতীয় উদাহরণ,

‘পূজাশেষে কুমারী বললে, ‘ঠাকুর, আমাকে মনের মতো

একটি বর দাও।’

‘বর’ শব্দটি একবার মাত্র উচ্চারিত হল উদ্ভূত বাক্যে। এতে চমকবার মতো কিছুই থাকত না, যদি ‘বর’ সাধারণভাবে একটিমাত্র অর্থই বোঝাত। কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতা জানেন, ‘বর’-এর দুটি অর্থ—‘আশীর্বাদ’ আর ‘স্বামী’। কুমারী মেয়ে ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চাইতে পারে, ‘মনের মতো’ স্বামীও চাইতে পারে। ‘বর’ শব্দটি যখন দুটি অর্থের ইজ্জিত নিয়ে শ্রোতার কানে বেজে ওঠে, তখন সেই উচ্চারণে তৈরি হয় চমক আর মাধুর্য। চকমসহ এই মাধুর্যই শব্দালংকার। এ-অলংকারের কেন্দ্রে আছে ‘বর’ শব্দটি, একটিমাত্র উচ্চারণে দুটি অর্থ নিয়ে। ‘শব্দ’ এখানেও Word, Sound নয়।

তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, শব্দালংকারের ‘শব্দ’ ধ্বনি (sound) হতে পারে, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিও (Word) হতে পারে? ধরে নেওয়াই যায়, ওপরের তিনটি উদাহরণ তো সে-কথাই বলে। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় উদাহরণ অন্য কথাও বলে এবং সেই কথাই চূড়ান্ত। ধ্বনি আর শব্দের (Sound আর Word) এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত আছে আর একটি কথা। সেটি হল ‘অর্থের ভূমিকা’। শব্দ Word যখন অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, তখন শব্দে ধ্বনিও আছে, অর্থও আছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণের ‘চিনি’ আর ‘বর’ যখন শব্দালংকার সৃষ্টি করে, তখন ওই শব্দদুটির ধ্বনি আর অর্থই অলংকার-সৃষ্টির কাজ করে যায়। ‘চিনি’র দুবার উচ্চারণে দুটি অর্থ আর

‘বর’-এর একবার উচ্চারণে দুটি অর্থ—এই অর্থের চমকেই তো এদের অলংকার। তবু এরা অর্থালংকার নয়, শব্দালংকারই। এর কারণ, উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি বা ধ্বনিগুচ্ছই শ্রোতার কানে মাধুর্য সঞ্চার করে, অলংকার তৈরি করে। আর, সে অলংকার-সৃষ্টিতে কেবল সহায়তা করে একই ধ্বনিগুচ্ছের দুটি অর্থ—ধ্বনির মধ্যে চমক জাগিয়ে। অতএব, ‘চিনি’ আর ‘বর’-এর অলংকার নির্মাণে ধ্বনি দেয় মাধুর্য, অর্থ দেয় চমক। ধ্বনিমাধুর্যই তো শব্দালংকার, অর্থ তার সহায়কমাত্র। ধ্বনির এখানে মুখ্য ভূমিকা, অর্থ নিতান্ত গৌণ। অন্যদিকে, প্রথম উদাহরণের অলংকার নির্মাণে একমাত্র ধ্বনিরই ভূমিকা (ক-ধ্বনি)।

ওপরের তিনটি উদাহরণের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এই সত্যটিই বেরিয়ে এল—শব্দালংকার মূলত ধ্বনি নির্ভর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে অর্থের সহায়তা নিতে হয়। এ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, শব্দের (Word) উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। অর্থাৎ, শব্দালংকারের ‘শব্দ’ কখনো বর্ণধ্বনি (প্রথম উদাহরণে), কখনো শব্দধ্বনি (দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণে)। চতুর্থ উদাহরণের সাহায্য নিয়ে দেখব, ‘শব্দ’ কখনো কখনো বাক্যধ্বনি।

যেমন,

‘রজনীগন্ধা বাস বিলালো,  
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো?’

—এখানে দুটি বাক্য। দুটি বাক্যেরই গোটা শরীরে ছড়ানো রয়েছে এই ধ্বনিগুলি : ‘অজনী-অস্থা-আসবি-আলো’। অতএব এটি বাক্যধ্বনি, এবং একই বাক্যধ্বনির দুবার আবর্তনে শব্দালংকার।

সুতরাং শব্দালংকারের ‘শব্দ’ মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বাক্যধ্বনি, যা-ই হোক (‘শব্দধ্বনি’র ‘শব্দ’ অবশ্যই Word)। তবে, শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার। কবিতার একটি স্তবকের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (Word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগ বা সমাবেশের কৌশলে মধুর শোনায়, এবং সেই মাধুর্য যদি শ্রোতার কানে তৃপ্তিদায়ক ঠেকে, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার।

বাংলা কাব্য-কবিতায় প্রয়োগ-পরিমাণের দিক থেকে প্রথম চারটি শব্দালংকার—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ আর বক্রোক্তি।

### ২৭.৩.১ অনুপ্রাস

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনধ্বনির বা সমব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের একাধিকবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে, অথবা বাগ্যন্তের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অনুপ্রাস অলংকার।

(একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস।)

বৈশিষ্ট্য :

- ১। একই ব্যঞ্জনের দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।
- ২। সমব্যঞ্জনের (জ-য, শ-ষ-স, ণ-ন) দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

- ৩। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত (ষ-ষ, ঙ্গ-ঙ্গ) বা বিযুক্ত (শিষের-শিশির, শাখার-শিখরে) উচ্চারণ।
- ৪। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত (বরী-রবী, বাক্-কাব্) উচ্চারণ।
- ৫। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণ।
- ৬। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার (ক-খ, চ-ছ, ট-ঠ) বা বহুবার (ত-থ-দ-ধ-ন) উচ্চারণ।
- ৭। স্বরধ্বনির সাম্য থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। একমাত্র প্রয়োগস্থানগত অনুপ্রাসে (আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস) স্বরধ্বনির সাম্য আবশ্যিক।

#### বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—
  - (ক) বৃত্ত্যানুপ্রাস (বৃত্তি + অনুপ্রাস) ;
  - (খ) ছেকানুপ্রাস (ছেক + অনুপ্রাস) ;
  - (গ) শ্রুত্যানুপ্রাস (শ্রুতি + অনুপ্রাস)।
- প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—
  - (ঘ) আদ্যানুপ্রাস (আদ্য + অনুপ্রাস) ;
  - (ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস (অন্ত্য + অনুপ্রাস) ;
  - (চ) সর্বানুপ্রাস (সর্ব + অনুপ্রাস)।

#### বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

- (ক) বৃত্ত্যানুপ্রাস :
 

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্ত্যানুপ্রাস।

  ১. একই ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—
 

বিদায়বিষাদশাস্ত সঙ্ঘ্যার বাতাস —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনের ‘ব’ দুবার (বিদায়, বিষাদ) ধ্বনিত হওয়ায় বৃত্ত্যানুপ্রাস।
  ২. সমব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—
 

জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে। —শ্যামাপদ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন ‘জ’ ‘য’ দুবার উচ্চারিত হওয়ায় বৃত্ত্যানুপ্রাস।
  ৩. একই ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—
 

চলচপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জন ‘চ’-এর ছয়বার এবং ‘র’-এর চারবার উচ্চারণে বৃত্ত্যানুপ্রাস হয়েছে।
  ৪. সমব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—
 

শরতের শেষে সরিয়া রো। —খনার বচন

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন ‘শ’ ‘য’ ‘স’ পাঁচবার ধ্বনিত হয়ে বৃত্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।



৫. ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)–

(i) কবরী দিল করবীমালে ঢাকি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : ‘কবরী’ আর ‘করবী’ শব্দদুটিতে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘বর’-এর বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে দুবার—প্রথমবার ‘বরী’ এবং দ্বিতীয়বার ‘রবী’। ‘ব-র’-এর বিন্যাস বদলে যাওয়ার (বরী > রবী)-এর উচ্চারণ ক্রম অনুসারে হয়নি, হয়েছে স্বরূপ অনুসারে। অতএব, কবরী-করবী উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

(ii) বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।

সংকেত : বাক্য > কাব্য।

৬. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ–

(i) কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী। —জগদানন্দ

সংকেত : ‘ঞ-জ’-এর যুক্ত উচ্চারণ (ঞ্জ) তিনবার।

(ii) দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : একই স্বরধ্বনিসমেত ‘ন্-ত্’-এর যুক্ত উচ্চারণ (আন্তে) তিনবার।

৭. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ–

(i) ভুলোক দুলোক গোলোক ভেদিয়া। —নজরুল

সংকেত : ‘লক’-এর তিনবার উচ্চারণ স্বরধ্বনিসমেত (‘লোক’)।

(ii) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

সংকেত : ‘কল’-এর চারবার উচ্চারণ (স্বরসাম্য নেই—‘কল’, ‘কিল’ - ‘কুল’ - ‘কুল’)।

● (খ) ছেকানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস।

(‘ছেক’ শব্দের অর্থ বিদগ্ধ পণ্ডিত। ছেকানুপ্রাস বিদগ্ধজনের প্রিয় অনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত উচ্চারণ–

(i) উড়িল কলস্কুল অম্বর প্রদেশে। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘ম্-ব্’-এর ক্রম অনুসারে যুক্ত উচ্চারণ (ম্ব) হয়েছে দুবার (কলস্ক, অম্বর)। অতএব, ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

(ii) কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গম্ব অম্ব হয়ে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : ‘ন্-ধ্’-এর যুক্ত উচ্চারণ (ম্ব) দুবার।

২. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)–

একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘শ-ষ-র’-এর ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে ‘শিষের’ ও ‘শিশির’ শব্দ দুটিতে। লক্ষণীয়, এখানে স্বরসাম্য নেই (ই-এ, ই-ই)। তবু ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

মন্তব্য : ‘শ-ষ-র’ এবং ‘শ-শ-র’ ধ্বনিগতভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ। ‘শ-ষ’-এর বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এরা একই রকম ধ্বনি। ধ্বনিদুটিকে সমব্যঞ্জন বলা যায়।

৩. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত এবং বিযুক্ত উচ্চারণ–

(i) মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘প-ঞ-জ-র’ ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হয়েছে ‘পঞ্জর’ ও ‘পিঞ্জরে’ শব্দদুটিতে। এখানে ‘প-র’ ব্যঞ্জনদুটির উচ্চারণ বিযুক্তভাবে হলেও ‘ঞ-জ’-এর উচ্চারণ হয়েছে যুক্তভাবে। স্বরধ্বনির সাম্যও এখানে নেই (পঞ্জর-পিঞ্জরে > অ-অ-অ > ই-অ-এ)। কিন্তু, ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থাকার কারণে এখানে ছেকানুপ্রাসই হয়েছে।

(ii) আমি কবি ভাই কর্মের ও ঘর্মের। —শ্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত উদাহরণে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘র্-ম-র’ ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে নিঃসন্দেহে (প্রথম উচ্চারণ ‘কর্মের > ‘র্মের’, দ্বিতীয় উচ্চারণ ‘ঘর্মের > ‘র্মের’)। কিন্তু লক্ষণীয়, ‘র্ম’-এর উচ্চারণ যুক্ত আর ‘মের’-এর উচ্চারণ ‘এ’ স্বরধ্বনির দ্বারা বিযুক্ত।

● (গ) শ্রুত্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যানুপ্রাস।

(একই ধ্বনির অনুপ্রাস নয়, তবে একই স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি বলে তারা শ্রুতিতে বা শুনতে একইরকম। শ্রুতিতে অনুপ্রাস বলেই এর নাম শ্রুত্যানুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. একই স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ–

(i) বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।

ব্যাখ্যা : ‘গ-ঘ’ ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জন হলেও তারা বাগযন্ত্রের একই স্থান কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। ফলে, ওই দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনুয়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে ‘বেগে’ আর ‘মেঘে’ শব্দদুটিতে। এ অনুপ্রাস শ্রুতিগত বলে এটি শ্রুত্যানুপ্রাস।

(ii) চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : ‘ক-খ’ (কণ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যানুপ্রাস ‘চিকন’-‘লিখন’-‘লিখন’ শব্দটিতে

(iii) নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে।

—রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : ‘ব-ভ’ (ওষ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যানুপ্রাস ‘নিরাবরণ’ আর ‘নিরাভরণ’ শব্দদুটিতে।

২. একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

ছন্দোবন্ধগ্রন্থীগীত, এসো তুমি প্রিয়ে।

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত উদাহরণের ‘ছন্দোবন্ধগ্রন্থীগীত’ অংশে ‘দ-ন্-ধ-থ-ত’ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশ মূলত চারটি ধ্বনির—ত-থ-দ-ধ। এদের উচ্চারণস্থান দন্তমূল। ধ্বনিগতভাবে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ পৃথক হলেও শ্রুতিতে এরা একইরকম। সেই কারণে, মিলিতভাবে পাঁচবার উচ্চারিত হয়ে এরা শ্রুত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

■ (ঘ) আদ্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) বড়ো কথা শূনি, বড়ো কথা কই

জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই।

—রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : চরণের আদিতে ‘বড়ো’-‘জড়ো’ শব্দে ‘আড়ো’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে আদ্যানুপ্রাস।

(ii) নিত্য তোমায় চিন্ত ভরিয়া স্মরণ করি।

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত চরণের প্রথম পর্বের আদিতে ‘নিত্য’ এবং দ্বিতীয় পর্বের আদিতে ‘চিন্ত’—এই দুটি শব্দে ‘ইত্ত’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ‘ইত্ত’ ধ্বনিগুচ্ছ আছে স্বরধ্বনি ‘ই-অ’ সমেত ব্যঞ্জনধ্বনি ‘ত্ত’ (ই-ত-ত-অ)। অতএব, এখানে আদ্যানুপ্রাস হয়েছে।

■ (ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমন-কী পঙক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) অজানু গোপন গঞ্জে পুলকে চমকি

দাঁড়াবে থমকি।

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এ উদাহরণে প্রথম চরণটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় চরণ অপূর্ণ। প্রথম চরণের শেষে ‘চমকি’ আর দ্বিতীয় চরণের শেষে ‘থমকি’—এই দুটি শব্দে ‘অমকি’ ধ্বনিগুচ্ছের (অ-ম্-অ-ক্-ই) অন্তর্গত তিনটি স্বরধ্বনিসমেত ‘ম্-ক্’ ব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরাবৃত্তি হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

(ii) অমি নাব মহাকাব্য সংরচনে।

—রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : প্রথম দুটি পর্বের শেষে ‘আর্ব’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

মন্তব্য : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘ব্-ব’-এর ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থেকে ছেকানুপ্রাসও হয়েছে।

(i) তবে

একদিন কবে

—রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : এ উদাহরণে আছে দুটি পঙক্তি (line)। এর কোনোটিই চরণ নয়, পদ বা পর্বও নয়। এদের শেষে ‘অবে’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

(‘বলাকা’ কাব্যে এ-ধরনের কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো পঙক্তি সাজিয়ে পঙক্তিশেষে অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করে গেছেন।)

■ (চ) সর্বানুপ্রাস :

সংজ্ঞা : পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) গগনে ছড়িয়ে এলোচুল

চরণে জড়িয়ে বনফুল।

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এখানে প্রতিটি চরণে তিনটি করে শব্দ। প্রথম শব্দযুগল ‘গগনে-চরণে’, দ্বিতীয় শব্দযুগল ‘ছড়িয়ে জড়িয়ে’ এবং তৃতীয় শব্দযুগল ‘এলোচুল-বনফুল’—এই তিনটি শব্দযুগলে যথাক্রমে ‘অঅনে’, ‘অড়িয়ে’ এবং ‘উল’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে সর্বানুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

(ii) সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,

বন্দ্যাবুকের গৌরবী আশা।

—যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : ‘অন্ধ্যা’, ‘উকের’, ‘গৌরবী’, ‘আশা’ ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি।

২৭.৩.২ যমক

সংজ্ঞা : একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার।

(ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। ধ্বনিগুচ্ছ স্বরধ্বনি থাকবে, ব্যঞ্জনধ্বনিও থাকবে।

২। বাংলায় সমধ্বনির (ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, শ-ষ-স) উচ্চারণে পার্থক্য নেই। অতএব যমকে সমধ্বনির প্রয়োগ হতে পারে। যেমন—রবি-রবী, বঁধু-বধু, ঋণী-রিণী, জেতে-যেতে, আশা-আসা।

৩। ধ্বনির পরিবর্তন হলে যমক থাকবে না, অনুপ্রাস হয়ে যেতে পারে। যেমন—‘ধানের শীষে আগুনের শীষ’ যমক (শীষ-শীষ), কিন্তু ‘ধানের শিষের উপরে শিশির’ অনুপ্রাস (শিষের-শিশির—স্বরধ্বনির পরিবর্তন), ‘পূরবীর রবি’ যমক (রবী-রবি), কিন্তু ‘পূরবীর ছবি’ অনুপ্রাস (রবী-ছবি—ব্যঞ্জনের পরিবর্তন)।

৪। ধ্বনিগুচ্ছের একাধিক উচ্চারণ হবে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে। বিন্যাস-ক্রমের পরিবর্তন হলে যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন—‘যৌবন বন’ যমক, কিন্তু ‘যৌবন নব’ অনুপ্রাস।

৫। ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিক উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অর্থযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের নাম শব্দ। অতএব এটি হবে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ, কিন্তু একই অর্থে নয়। এর নাম সার্থক যমক।

৬। ধ্বনিগুচ্ছের সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিক উচ্চারণ হতে পারে। এর অর্থ, ধ্বনিগুচ্ছের একবার সার্থক বা অর্থযুক্ত উচ্চারণ, অন্যবার নিরর্থক বা অর্থহীন উচ্চারণ। অর্থাৎ, একবার শব্দের উচ্চারণ, অন্যবার শব্দাংশের উচ্চারণ। এর নাম নিরর্থক যমক।

৭। ৫ম-৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা গেল, ধ্বনিগুচ্ছের একটি প্রয়োগ অর্থযুক্ত হবেই, অন্যপ্রয়োগ অর্থযুক্ত বা অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রয়োগেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থহীন হতে পারে না, হলে তা যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন, ‘সৌরভ-রভসে’। এখানে ‘রভ’ ধ্বনিগুচ্ছ দুবারই উচ্চারিত হয়েছে নিরর্থক শব্দাংশ হিসেবে। অতএব, এটি যমক নয়, অনুপ্রাস।

#### বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—  
(ক) সার্থক যমক ; (খ) নিরর্থক যমক।
- প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—  
(গ) আদ্যযমক ; (ঘ) মধ্যযমক ; (ঙ) অন্ত্যযমক ; (চ) সর্বযমক।

#### বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

##### ■ (ক) সার্থক যমক :

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক।

উদাহরণ :

১. একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার।—মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই শব্দ ‘কীর্তিবাস’ দুবার উচ্চারিত। প্রথম ‘কীর্তিবাস’ এখানে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস অর্থে ভুল বানানে লেখা, দ্বিতীয় ‘কীর্তিবাস’ অর্থ কীর্তির বসতি যেখানে। অতএব, এটি সার্থক যমক।

(ii) টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস বার্নিস ?

দাম চাস্ ? আজ নয়, মঞ্জাল-বার নিস্। —উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সংকেত : ‘বার্নিস’ (চকচকে করার জন্য প্রলেপ) আর ‘বার নিস্’ (ওই দিনে নিয়ে যাস) একই শব্দ না হলেও উচ্চারণে এক, অথচ অর্থে ভিন্ন।

২. সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) যেতে নারি জেতে নারী আমি হে —ঈশ্বর গুপ্ত

ব্যাখ্যা : ‘যেতে নারি’ ‘জেতে নারী’—এই দুটি শব্দযুগল সমধ্বনিযুক্ত, একই শব্দযুগলের পুনরাবৃত্তি নয়। ‘জেতে-যেতে’ শব্দদুটিতে জ-য সমব্যঞ্জন, আবার ‘নারি-নারী’ শব্দদুটিতে ই-ঈ সমস্বর। এই সমস্বর আর সমব্যঞ্জনের সহযোগে উচ্চারিত শব্দযুগল উচ্চারণে এক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে—‘যেতে নারি’ অর্থ ‘যেতে পারি না’, ‘জেতে নারী’ অর্থ ‘জাতিতে স্ত্রীলোক’। অতএব, এটি সার্থক যমকের উদাহরণ।

(ii) তিনখানা নোট আনে সে ‘দশ টাকার’

কিছুতে বুঝিতে পারে না দোষটা কার। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : ‘দশ টাকার’ (অর্থমূল্য) আর ‘দোষটা কার’ (কার দোষ)। ‘অশ্’ (দশ) আর ‘ওষ্’ (দোষ) সমধ্বনিযুক্ত (অ-ও সমস্বর, শ-ষ সমব্যঞ্জন) দুটি শব্দযুগল। এদের উচ্চারণ এক, অর্থ আলাদা।

■ (খ) নিরর্থক যমক :

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম নিরর্থক যমক।

উদাহরণ :

(i) যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘বন’ প্রথমে উচ্চারিত হয়েছে ‘যৌবন’ শব্দের অংশ হিসেবে। এখানে তার উচ্চারণ অর্থহীন বা নিরর্থক। ঐ ‘বন’ পরে উচ্চারিত হল একটি পূর্ণশব্দের মর্যাদা নিয়ে, যখন তার অর্থ হল ‘অরণ্য’। এখানে তার উচ্চারণ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অতএব, এ উদাহরণ নিরর্থক যমকের।

(ii) বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : ‘রবি’ ধ্বনিগুচ্ছ ‘পুরবী’ শব্দের অংশ, অতএব নিরর্থক। ‘রবি’ স্বতন্ত্র শব্দ, অতএব সার্থক। ‘রবি: আর ‘রবি’ মূলত একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ (র-ব), সমস্বরধ্বনি ‘ঈ’ আর ‘ই’-র সহযোগে তাদের গঠন। এই দুটি ধ্বনিগুচ্ছের একই উচ্চারণ। সুতরাং, এটি নিরর্থক যমক।

■ (গ) আদ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : ‘ভারত’ শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ‘কবি ভারতচন্দ্র রায়’ অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগ ‘ভারতবর্ষ’ অর্থে। অতএব এটি সার্থক যমক। যমকটি হয়েছে উদ্ভূত চরণের আদিতে। অতএব, এটি আদ্যযমক।

■ (ঘ) মধ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : প্রথম ‘তরি’ অর্থ নৌকা, দ্বিতীয় ‘তরি’ অর্থ পার হই। এটি সার্থক যমক। যমকটি চরণের মাঝখানে রয়েছে। অতএব, এটি মধ্যযমকের উদাহরণ।

■ (ঙ) অন্ত্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে একটি বা পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ :

মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : একই শব্দ ‘হয়’ চরণের শেষে দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথম অর্থ ঘোড়া, দ্বিতীয় অর্থ ‘হয়ে যায়’। অতএব এটি সার্থক যমক, এবং চরণের শেষে রয়েছে বলে অন্ত্যযমক।

■ (চ) সর্বযমক :

সংজ্ঞা : একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ চরণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারিত হলে যে বাক্যগত শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সর্বযমক।

উদাহরণ :

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।

কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।

ব্যাখ্যা : প্রথম চরণে ‘কান্তার’ অর্থ বনভূমি, ‘আমোদ’ অর্থ সৌরভ, ‘কান্ত’ অর্থ বসন্তকাল আর ‘সহকারে’ অর্থ সমাগমে। দ্বিতীয় চরণে ‘কান্তার’ অর্থ প্রিয়তমার, ‘আমোদ’ অর্থ আনন্দ, ‘কান্ত’ অর্থ প্রিয়তম, ‘সহকারে’ অর্থ সজ্জা। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারণে প্রতিটি শব্দেই একটি করে সার্থক যমক হয়েছে। আবার সামগ্রিকভাবে প্রথম চরণের অর্থ—বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ, দ্বিতীয় চরণের অর্থ—প্রিয়তমের সজ্জালাভে প্রিয়তমার আনন্দ সম্পূর্ণ। অতএব, এটি বাক্যগত সার্থক যমক এবং সর্বযমক।

২৭.৩.৩ সংশ্লেষ (শব্দশ্লেষ)

সংজ্ঞা : একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ (শব্দশ্লেষ) অলঙ্কার।

(একটি শব্দের একবার ব্যবহারে একাধিক অর্থ বোঝালে শ্লেষ।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

২। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

প্রকারভেদ

● বাংলায় শ্লেষ বলতে শব্দ শ্লেষকেই বোঝায়। এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের—

(ক) অভঙ্গ শ্লেষ

(খ) সভঙ্গ শ্লেষ।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ (ক) অভঙ্গ শ্লেষ :

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গ শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা থেকে উদ্ভূত এই চরণটিতে বিদায়-মুহূর্তে কবি মধুসূদন মাতৃভূমির কাছে বিস্মৃত না হবার যে আবেদন রাখছেন, সেই প্রসঙ্গে ‘মধু’ শব্দটিকে দুটি অর্থে তিনি প্রয়োগ করেছেন। প্রথম অর্থ ‘কবি মধুসূদন দত্ত’, দ্বিতীয় অর্থ ‘মউ’। একটি প্রয়োগে শব্দটিকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল। অতএব, এটি অভঙ্গ শ্লেষ।

(i) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত উদাহরণের ষাট-বছর পেরিয়ে যাওয়া কবি তাঁর আয়ুষ্কার ফুরিয়ে আসার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পূরবী’ আর ‘রবি’ শব্দ দুটি করে করে অর্থে প্রয়োগ করেছেন। ‘পূরবী’র একটি অর্থ কবির নিজের লেখা ‘পূরবী’ কাব্য, আর-একটি অর্থ ‘সূর্য’। দুটি শব্দেরই দুটি করে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে শব্দদুটিকে না ভেঙে এবং একবার মাত্র উচ্চারণ করে। অতএব, এখানকার অলংকার অভঙ্গ শ্লেষ।

মন্তব্য : ‘পূরবী আর ‘রবি’ শব্দের শ্লেষ গোটা বাক্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাক্যটির প্রথম অর্থ, ‘পূরবী-কাব্যের ছন্দে রবীন্দ্রনাথের জীবন-শেষ হয়ে আসার করুণ ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে।’ দ্বিতীয় অর্থ, ‘পূরবী রাগিনীর করুণ সুরে বীণা বাজছে সূর্যাস্তের মুহূর্তে’। অন্যদিকে, ‘পূরবী’র নিরর্থক অংশ ‘রবি’ আর সার্থক ‘রবি’—এই দুটি শব্দ শব্দাংশ দিয়ে নিরর্থক যমক অলংকারও তৈরি হয়েছে।

■ (খ) সভঙ্গ শ্লেষ :

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গ শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে  
গুঞ্জন তার রবে চিরনি, ভুলে যাবে তার মানে।



ব্যাখ্যা : ‘রোগশয্যায়’ কাব্য থেকে উদ্ভূত অংশের প্রথম চরণে ‘মূলতান’ শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থ ‘সূর্যাস্তকালীন রাগিণীবিশেষ’—এটি অখণ্ড ‘মূলতান’ শব্দেরই অর্থ। ‘মূলতান’ শব্দটিকে ‘মূল’ আর ‘তান’ এই দুটি অংশে ভাঙলে যে অর্থটি মেলে তা এই—‘বিশ্ববীণার মূল বা উৎস-তন্ত্রীতে আনন্দের যে তান বা সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে।’ প্রথমে না ভেঙে একটি অর্থ, পরে ভেঙে আর-একটি অর্থ ‘মূলতান’ শব্দটি থেকে পাওয়া গেল। অতএব, এটি সভঙ্গা শ্লেষের উদাহরণ।

(ii) অপরূপ রূপ কেশবে

—দাশরথি রায়

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত চরণে ‘কেশবে’ শব্দটিকে না ভাঙলে এর অর্থ কৃষ্ণ। শব্দটিকে ‘কে’ - ‘শবে’ এই দুটি অংশে ভাঙলে এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়—‘মৃতদেহের ওপর কে?’ এর নিহিত অর্থ ‘শবরূপী শিবের ওপর দাঁড়িয়ে যে নারী, তিনি কে?’ এর উত্তর ‘কালী’। আর ‘কেশবে’ অর্থ কৃষ্ণ। ‘কেশবে’ শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ আর ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া গেল বলে এটি সভঙ্গা শ্লেষ।

### ২৭.৩.৪ বক্রোক্তি

সংজ্ঞা : যেখানে বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা হয়, অথবা বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কণ্ঠভঙ্গি অথবা শ্লেষের কারণে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এর নাম বক্রোক্তি অলংকার।

(বক্তা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। ‘বক্রোক্তি’ (বক্র + উক্তি) অর্থ বাঁকা কথা। কথায় সৌন্দর্য ফোটানোর লক্ষ্যেই এ বক্রতা আবশ্যিক। উক্তির এই বক্রতা সৃষ্টির জন্য কবিরা দুটি কৌশল প্রয়োগ করেন—একটি ‘কাকু’ বা কণ্ঠভঙ্গি, আর একটি ‘শ্লেষ’ বা দ্ব্যর্থকতা (কথাটির দুটি অর্থ)।

২। বক্রোক্তির প্রথম লক্ষণ, বক্তার তরফে বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা। ‘কাকু’ বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যেই কথায় বক্রতা আনা যেতে পারে। ভঙ্গিটা যদি এমন হয় যে, হাঁ-প্রশ্নবাক্য দিয়ে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্য দিয়ে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তাহলে হবে কাকু-বক্রোক্তি।

৩। বক্রোক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ, শ্রোতার তরফে বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বক্তা যে কথাটি প্রয়োগ করেছেন তার দুটি অর্থ—একটি বক্তার অভিপ্রেত অর্থ, অন্যটি শ্রোতার গৃহীত অর্থ। অতএব, কথাটির প্রয়োগে শ্লেষ আছে। দেখা যায়, শ্লেষের সুযোগ নিয়ে শ্রোতা প্রতিবারই কথাটিকে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের দিকে টেনে নিচ্ছেন, অভিপ্রেত অর্থটি বারে বারে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বক্তা এবং শ্রোতার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্য তৈরি হতে থাকে। এরই নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

প্রকারভেদ

● বক্রোক্তি দু-রকমের—

(ক) কাকু-বক্রোক্তি ;

(খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি।

■ (ক) কাকু বক্রোক্তি :

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবাক্যে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

(i) রাবণ স্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,

আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : ‘মেঘনাদবধকাব্য’ থেকে উদ্ভূত এই চরণদুটি হাঁ-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত। এর উত্তরে শ্রোতাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, প্রমীলা ভিখারী রাঘবকে একটুও ভয় করে না। উপলব্ধিটি না-বোধক। বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত হাঁ-প্রশ্নবোধক না-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পেল বলে এখানে কাকু-বক্রোক্তি হয়েছে।

(ii) মাতা আমি নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা

জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ? —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : ‘গান্ধারীর আবেদন’ থেকে উদ্ভূত গান্ধারীর এই উক্তি না-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত (‘নহি’ ‘বহি নাই’)। স্নেহ-দুর্বল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর বক্তব্য—তিনিও মা, দুর্যোধনকে গর্ভে বহন করার দুঃখ তিনি বরণ করেছেন। বক্তব্যটি হাঁ-বোধক। কিন্তু এটি প্রকাশ পেল বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত না-প্রশ্নবাক্য থেকে। অতএব, অলংকার এখানে কাকু-বক্রোক্তি।

■ (খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি :

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

বক্তা—দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন ?

শ্রোতা—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

বক্তা—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?

শ্রোতা—সুরে না সেবিলে বল মুক্তি কিসে হয় ?

ব্যাখ্যা : বক্তার প্রথম কথায় ‘দ্বিজ’ এবং ‘বারুণী’ শব্দের দুটি করে অর্থ। ‘দ্বিজ’ শব্দের একটি অর্থ ব্রাহ্মণ এবং ‘বারুণী’-র একটি অর্থ মদ। অতএব বক্তার অভিপ্রেত অর্থ—ব্রাহ্মণ হয়ে মদ খাও কেন ? ‘দ্বিজ’ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ চাঁদ, ‘বারুণী’-র অর্থ পশ্চিমদিক। শ্রোতার গৃহীত অর্থটি এইরকম—চাঁদ পশ্চিমদিকে যাচ্ছে কেন ? এই অর্থ ধরেই তার উত্তর—সূর্য উঠছে, তাই চাঁদ ডুবছে। এটি বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। এইভাবে শ্রোতা শ্লেষের সুযোগে বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অনভিপ্রেত অন্য অর্থটি গ্রহণ করায় শ্লেষ-বক্রোক্তি হয়েছে।

বক্তার দ্বিতীয় বাক্যেও একইভাবে ‘সুরাসক্ত’ শব্দটিকে কেন্দ্র করে বক্রোক্তি হয়েছে। ‘সুরাসক্ত’ থেকে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ ‘সুরায় আসক্ত’ বা মদখোর (সুরা + আসক্ত), কিন্তু শ্রোতার গৃহীত অর্থ ‘সুরে আসক্ত’ বা দেবভক্ত (সুর + আসক্ত)। বক্তার এই অনভিপ্রেত অর্থটি ধরেই শ্রোতার উত্তর—দেবসেবা ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব, এখানেও শ্লেষ-বক্রোক্তি।

## ২৭.৪ সারাংশ

বাংলায় ‘শব্দ’ কথাটির দুটির অর্থ—‘ধ্বনি’ (sound) ‘অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি’ (word)। শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, ধ্বনিমাধুর্যই শব্দালংকার। তবে অর্থের চমক কখনো কখনো ধ্বনিমাধুর্যকে সহায়তা করে। যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ মধুর হয়ে উঠলে ধ্বনিমাধুর্য বা শব্দালংকার তৈরি হয়, তা একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি শব্দ (word) বা ‘অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি’র উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি বাক্যের উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। সুতরাং, শব্দালংকারের ‘শব্দ’ মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বা বাক্যধ্বনি। কবিতার একটি স্তবক বা একটি চরণের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগের কৌশলে মধুর শোনায়, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার। বাংলা কবিতায় প্রধান শব্দালংকার চারটি—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি।

**অনুপ্রাস :** একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের একবারের বেশি উচ্চারণ অনুপ্রাস। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—বৃত্তানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যানুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনধ্বনির একবারের বেশি উচ্চারণে (বিদায় বিষাদশাস্ত্র, চলচপলার চকিত চমকে), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম না মেনে দুবার উচ্চারণে (কবরী-করবী), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবারের বেশি উচ্চারণে (কুঞ্জর-গঞ্জি-মঞ্জুল, কল-কিল-কুল) বৃত্তানুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস (গন্ধ-অন্ধ, শিষের-শিশির)। শুনতে একই রকম কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে শ্রুত্যানুপ্রাস (চিকন-লিখন, ছন্দোবন্ধগ্রন্থ)।

প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকেও অনুপ্রাস তিন রকমের—আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস। কবিতার চরণের বা পর্বের শুরুতে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে আদ্যানুপ্রাস (বড়ো কথা শূনি...../জড়ো করে নিয়ে ....., নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া .....।) ছত্রের, চরণের বা পর্বের শেষে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে অন্ত্যানুপ্রাস (তবে/একদিন কবে,..... পুলকে চমকি/দাঁড়াবে থমকি, আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে)। দুটি চরণের প্রতিটি শব্দে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সর্বানুপ্রাস (গগনে ছড়িয়ে এলোচুল/চরণে জড়িয়ে বনফুল)।

**যমক :** একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা একবার অর্থযুক্ত আর অন্যবার অর্থহীন উচ্চারণে যমক অলংকার। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—সার্থক যমক, নিরর্থক যমক। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উচ্চারণে সার্থক যমক (‘কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি .....।’ প্রথম ‘কীর্তিবাস’ = কৃতিবাস, দ্বিতীয় ‘কীর্তিবাস’ = যশস্বী)। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে একবার অর্থযুক্ত আর একবার অর্থহীন উচ্চারণে নিরর্থক যমক (যৌবনের বনে.....।’ প্রথম ‘বনে’ অর্থহীন শব্দাংশ, দ্বিতীয় ‘বনে’ অর্থযুক্ত শব্দ)।

প্রয়োগ স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক, সর্বযমক। কবিতার চরণের শুরুতে থাকলে আদ্যযমক (ভারত ভারতখ্যাত.....), মাঝখানে থাকলে মধ্যযমক (পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা), শেষে থাকলে অন্ত্যযমক (মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়), গোটা চরণ জুড়ে থাকলে সর্বযমক (কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে / কান্তারে আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে)।

**শ্লেষ :** একটি শব্দের একবার উচ্চারণে একের বেশি অর্থ বোঝালে শ্লেষ। শ্লেষ দু-রকমের—অভঙ্গ শ্লেষ, সভঙ্গ শ্লেষ। শব্দ না ভেঙে একের বেশি অর্থ পাওয়া গেলে অভঙ্গ শ্লেষ (মধুহীন করো নাগো তব মনঃ কোকনদে। ‘মধু’ = কবি মধুসূদন দত্ত, মউ।) শব্দ না ভেঙে একটি অর্থ, ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া গেলে সভঙ্গ শ্লেষ (অপরূপ রূপ কেশবে। ‘কেশবে’ = কুলে, ‘কে শবে’ = ‘মৃতদেহের ওপর কে?’)।

**বক্রোক্তি :** কোনো কথা বাঁকাভাবে বললে অথবা কথার অর্থ বাঁকাভাবে ধরলে বক্রোক্তি। বক্রোক্তি দু-রকমের—কাকু-বক্রোক্তি, শ্লেষ-বক্রোক্তি। ‘কাকু’ বা কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে ‘হাঁ’ বোঝাতে ‘না’ অথবা ‘না’ বোঝাতে ‘হাঁ’, বললে কাকু-বক্রোক্তি (‘মাতা আমি নহি?’ = আমিও তো মা, ‘আমি কি ডরাই?’ = আমি মোটেই ডরাই না)। শ্লেষের (কথার দুটি অর্থের) সুযোগ নিয়ে সুবিধাজনক অর্থটি ধরলে শ্লেষ-বক্রোক্তি (‘বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন’ = ‘বামুন হয়ে মদের নেশা কেন,’ ‘ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবভক্তি কেন।’ সুবিধাজনক দ্বিতীয় অর্থটি ধরে মদখোর ব্রাহ্মণের জবাব—‘দেবসেবা ছাড়া কারো মুক্তি নেই’)।

## ২৭.৫ অনুশীলনী

১. শব্দালংকার বলতে কী বোঝায়, সংক্ষেপে লিখুন।
২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—শব্দালংকার ধরনিরই অলংকার, অর্থের অলংকার নয়।
৩. প্রধান চারটি শব্দালংকারের নাম এবং তাদের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করুন।
৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—হেকানুপ্রাস, নিরর্থক যমক, অভঙ্গ শ্লেষ, কাকু-বক্রোক্তি।
৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—
  - (ক) পৃথিবী টাকার বশ!
  - (খ) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।
  - (গ) ধরি তার কর দুটি আদেশ পাইলে উঠি।
  - (ঘ) লজ্জার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।
  - (ঙ) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।
৬. সঠিক অলংকার কোনটি, লিখুন—
  - (ক) কবির বৃকের দুখের কাব্য—হেকানুপ্রাস না বৃত্ত্যানুপ্রাস?
  - (খ) আর কি শুধু আসার আশায় থাকি—যমক না হেকানুপ্রাস?
  - (গ) একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু—যমক না হেকানুপ্রাস?

---

## একক ২৮ □ অর্থালংকার

---

গঠন

- ২৮.১ উদ্দেশ্য
- ২৮.২ প্রস্তাবনা
- ২৮.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়
- ২৮.৪ সারাংশ-১
- ২৮.৫ অনুশীলনী-১
- ২৮.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার
  - ২৮.৬.১ উপমা
  - ২৮.৬.২ রূপক
  - ২৮.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা
  - ২৮.৬.৪ সমাসোক্তি
  - ২৮.৬.৫ অতিশয়োক্তি
  - ২৮.৬.৬ ব্যতিরেক
- ২৮.৭ সারাংশ-১
- ২৮.৮ অনুশীলনী-২
- ২৮.৯ মূলপাঠ-৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি
  - ২৮.৯.১ বিরোধমূলক : বিরোধাভাস (বিরোধ)
  - ২৮.৯.২ শৃঙ্খলামূলক : একাবলি
  - ২৮.৯.৩ ন্যায়মূলক : অর্থান্তরন্যাস
  - ২৮.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক : ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি
- ২৮.১০ সারাংশ-৩
- ২৮.১১ অনুশীলনী-৩

---

### ২৮.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন, তাহলে—

- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকের অর্থে নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো বোধ ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠবে।
- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকে বা বাক্যে বা শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার দক্ষতা কবি কতটা দেখাতে পারলেন, তা বিচার করা সম্ভব হবে।
- বাংলা কবিতার স্তবকে বাক্যে শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার নানারকম কৌশল কবিরা কীভাবে প্রয়োগ করে থাকেন, তা অনুসরণ করা ক্রমশ সহজ হবে।

---

## ২৮.২ প্রস্তাবনা

---

একক ৫ থেকে অলংকারের যে দুটি মূলবিভাগের কথা জেনেছিলেন, তার প্রথমটির (শব্দালংকার) পরিচয় পেলেন একক ৬-এ। একক ৭-এ পাবেন দ্বিতীয় বিভাগটির পরিচয়। এ বিভাগটির নাম অর্থালংকার।

এসব অলংকার তৈরি হয় কবিতার মনস্ক পাঠকের বোধে—তাঁর মনে-মস্তিষ্কে। বিভাগটি আয়তনে শব্দালংকারের তুলনায় অকেনটাই বড়ো, অনেক তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা। সেই কারণে, মূলপাঠকে তিনটি অংশ ভাগ করে নেওয়া হল।

প্রথম অংশে অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার আর তার অন্তর্গত কয়েকটি শ্রেণির পরিচয়, তৃতীয় অংশে অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণির পরিচয় সংক্ষেপে সাজিয়ে দেওয়া হল। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যিকমতো দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাসঙ্গিক অলংকারের ব্যাখ্যা করা হল।

---

## ২৮.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়

---

স্ববক বা তার অন্তর্গত চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। ‘অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে’ বলতে এই বোঝাতে চাই, বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। একটি উদাহরণ থেকে অর্থালংকারের এই স্বভাবটা বুঝে নেওয়া যাক :

‘কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে

গগনের নীলগাঙে।’

‘মেঘের মউজ’-এর অর্থ ‘মেঘের ঢেউ’, ‘গগনের নীলগাঙ’-এর অর্থ ‘আকাশের নীলরঙা নদী।’ এই অর্থের ওপর নির্ভর করেই দুটি শব্দগুচ্ছ মিলেমিশে একটি দৃশ্য রচনা করেছে নীল আকাশের বুকে। সে-দৃশ্য মেঘের খেলার পাশাপাশি ঢেউ-তোলা নদীর। যে নদীর দৃশ্য মাটির ওপরে দেখতেই দ্রষ্টা অভ্যস্ত, কবি কল্পনার জোরে তাঁর মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন নীল আকাশের মেঘের খেলার দিকে, সেই আকাশের বুকে পাশাপাশি দেখিয়ে দিলেন ঢেউ-তোলা নদীর দৃশ্যটি। কল্পনার চোখে দেখা এই দৃশ্যের সৌন্দর্যই অলংকার, এ অলংকারটি তৈরি দল অর্থের ওপর নির্ভর করেই। অতএব, এটি অর্থালংকার। অলংকারটি যে কেবল অর্থের ওপরই নির্ভর করেছে, শব্দের ওপর নয়—তা বোঝা যাবে, যদি দেখি, বাক্যটির অর্থ ঠিকঠাক রেখে দুটো-একটা শব্দ বদলে দিলেও অলংকারটি বেঁচে গেল।

প্রথমে দেখা যাক ‘মউজ’ আর ‘গগন’ শব্দদুটির বদলে একই অর্থের ‘ঢেউ’ আর ‘আকাশ’ বসিয়ে। তাহলে কথাটি দাঁড়াবে এই :

‘কোদালে মেঘের ঢেউ উঠেছে  
আকাশের নীলগাঙে।’

দেখা যাচ্ছে, মেঘের খেলা থামে নি, ‘গগন’ ‘আকাশ’ হয়েও তার বৃকে নীলরঙা নদীটি বইয়ে দিয়েছে আগের মতোই, ‘মউজ’-এর সৌন্দর্য ‘ঢেউ’ উঠেছে বৃকে এতটুকু কমে নি। অর্থাৎ, ‘মউজ-গগন’ের তৈরি অর্থসৌন্দর্য ‘ঢেউ-আকাশে’ও অব্যাহত। এই অর্থসৌন্দর্যই তো অর্থালংকার। শব্দ বদলালেও অর্থ বদলায়নি, অলংকারও সেরে যায়নি।

একটু দেখে নিই শব্দবদলের অন্য পরিণাম। শব্দবদলের আগে ‘মেঘের মউজ’ আর ‘গগনের গাঙ’ শব্দগুচ্ছ-দুটির মধ্যে অর্থালংকারের একটুখানি আড়াল থেকে উঁকি মারছিল একটি শব্দালংকার। ‘মেঘের মউজ’-এ ম-ধ্বনির দুবার এবং ‘গগনের গাঙ’-এ গ-ধ্বনির তিনবার উচ্চারণে ধ্বনিমাধুর্যের আনন্দ পাওয়া যাচ্ছিল। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি শব্দালংকার। কিন্তু, শব্দবদলের পরে ‘মেঘের মউজ’ যখন ‘মেঘের ঢেউ’ হল, তখন ম-ধ্বনিটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। তেমনি, ‘গগনের গাঙ’-এর বদলে ‘আকাশের গাঙ’ আসার ফলে গ-ধ্বনির গাঙটিও শুকিয়ে গেল। অর্থাৎ, একই সঙ্গে ম-ধ্বনি আর গ-ধ্বনির শব্দালংকারটি হারিয়ে গেল। শব্দবদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দালংকারের এই অপমৃত্যু জানিয়ে দিল, শব্দবদল এ অলংকারের পক্ষে অসহ্য। অথচ, অর্থালংকার একটু আগেই তা সহ্য করেছে।

অর্থালংকার শব্দবদল সহ্য করে ততক্ষণ, যতক্ষণ বদলে-যাওয়া শব্দের অর্থটুকু অক্ষত থাকে। এটাই দেখা গেল ‘মউজ’ থেকে ‘ঢেউ’ আর ‘গগন’ থেকে ‘আকাশ’-এর বদলে। এবারে ‘মউজ উঠেছে’-র ‘টুকরো ছড়ানো’ আর ‘গাঙে’-র বদলে ‘রঙে’ বসিয়ে দেখা যাক, সঙ্গে সঙ্গে অর্থবদল ঘটলে তার পরিণাম কী ঘটে :

‘কোদালে মেঘের টুকরো ছড়ানো  
গগনের নীলরঙে।’

দেখতে পাচ্ছি, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়ানো থাকলেও তার খেলা নেই, অর্থবদলের আগে ঢেউ-তোলা নদীর যে দৃশ্য আকাশে রচনা করেছিল অর্থালংকার, ‘মউজ’ আর ‘গাঙ’ তাদের অর্থ নিয়ে সেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা অদৃশ্য। আকাশের গায়ে পড়ে রইল এদিক-ওদিকে ছড়ানো কয়েক টুকরো মেঘ—তার রং নেই, কোনো আকর্ষণ নেই, তার গায়ে কোনো অলংকারই নেই—না শব্দালংকার, না অর্থালংকার। শব্দবদলে শব্দালংকারের লোপ, অর্থবদলে অর্থালংকারের লোপ। অর্থাৎ, শব্দ না টিকলে শব্দালংকার বাঁচে না, অর্থালংকার বাঁচতে পারে। কিন্তু, শব্দের সঙ্গে অর্থও সেরে গেলে শব্দালংকারের সঙ্গে অর্থালংকারের সহমরণ ঘটে।

অতএব, শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য মূল তিনটি :

১. শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, অর্থালংকার অর্থের অলংকার—প্রথমটি ধ্বনির মাধুর্য, দ্বিতীয়টি অর্থের সৌন্দর্য।
২. শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।
৩. শব্দালংকার শব্দের বদল সহ্য করে না, শব্দবদলে এর অপমৃত্যু। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে ; শব্দ-অর্থ দুই-ই বদলে গেলে অর্থালংকারেরও অপমৃত্যু।

সংস্কৃত কাব্যে যেসব অর্থালংকারে সম্বন্ধ পাওয়া গেছে, তার সংখ্যা অনেক। বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ তুলনায় অনেকটা সীমিত। যে কটি লক্ষণ অলংকারগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করেছে, সেগুলি এইরকম—সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় আর গুঢ়ার্থপ্রতীতি। নামগুলি সংস্কৃত আলংকারিকদের দেওয়া।

## ২৮.৪ সারাংশ

কবিতার স্তবক বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তবে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। অর্থালংকার অর্থের অলংকার—অর্থের সৌন্দর্য। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে। অর্থ বদলে গেলে অর্থালংকার বাঁচে না। অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণি—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক, গুঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক।

## ২৮.৫ অনুশীলনী-১

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬১-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. অর্থালংকার বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লিখুন।
২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—অর্থালংকার অর্থেরই অলংকার, শব্দের (ধ্বনির) অলংকার নয়।
৩. শব্দালংকার আর অর্থালংকারের মূল পার্থক্য কী কী লিখুন।
৪. অর্থালংকারের শ্রেণিগুলির নাম লিখুন।

## ২৮.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা একটিকে আর একটির সঙ্গে তুলনা করে থাকি। বলি, সতীর চোখদুটি শীলার চোখের মতো ‘উজ্জ্বল’ অথবা দার্জিলিঙের পাহাড় সিমলার মতো ‘সুন্দর নয়’ ইত্যাদি। এসব কথায় কোনো সৌন্দর্য নেই, অলংকার নেই। কিন্তু যদি বলি, ‘ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়’, ‘বাচ্চাটি ফুলের চেয়েও সুন্দর’, তা হলে মনে মনে লাফিয়ে চলা ছেলেটার পাশে একটা ব্যাঙ-কেও লাফাতে দেখব, বাচ্চাটির মুখ তখন ফুল হয়ে ফুটে উঠবে। অর্থাৎ ছেলেটার চলন আর বাচ্চাটির চেহারা এক-একটা ছবি হয়ে উঠবে আমাদের মনের চোখে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার। সাদৃশ্য এর লক্ষণ। সতীর চোখ, দার্জিলিঙের পাহাড় ছবি হয়ে ওঠেনি, তার কারণ, একজনের চোখের তুলনা হল আর-একজনের চোখেরক সঙ্গে, ঐ পাহাড়টাকে তুলনা করা হল আর একটা পাহাড়ের সঙ্গে—অর্থাৎ, সদৃশ দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা। এমন তুলনায় সৌন্দর্য নেই, অলংকারও নেই। অন্যদিকে, ছেলেটা ব্যাঙ বাচ্চাটি ফুল—এরা বিসদৃশ বলেই এদের তুলনায় সৌন্দর্য বা অলংকার হয়। এমনটা কেন হয়? দার্জিলিং-সিমলা সুন্দর হয়েও অলংকার পেল না, ছেলেটা ব্যাঙের মতো কুৎসিত লাফিয়েও অলংকার পেল কোন জাদুতে? এর কারণ, দার্জিলিং-সিমলার মতো সদৃশ বস্তুর তুলনায় কল্পনার প্রয়োজন নেই, যে দেখেছে সেই তুলনা করতে পারে তার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। কিন্তু ছেলেটা-



ব্যাংটার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা একটা আবিষ্কারের মতো দুরূহ কাজ। এ কাজে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সেই কল্পনায় জোরেই কেউ আকাশের চাঁদে ধান-কাটা কাশ্মির সাদৃশ্য খুঁজে পান, কেউ পূর্ণিমার চাঁদে বলসানো বুটি দেখতে পান। এঁরা নিতান্ত বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্য থেকে এমন-এমন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বের করে আনেন, সেই সাদৃশ্য দিয়ে এমন-এমন কথার ছবি নির্মাণ করেন, যা পাঠকের মনকে সৌন্দর্যে বিস্ময়ে ভরে দেয়। তখনই গড়ে উঠে সাদৃশ্যমূলক অলংকার। কালিদাসের, রবীন্দ্রনাথের, মধুসূদনের কাব্য-কবিতা এই গুণেই এতো মহৎ—এক-একটি কাব্য যেন এক-একটি চিত্রশালা।

অতএব, অলংকার-নির্মাণের জন্য যে-সাদৃশ্য কবির খোঁজেন, তার মূল শর্তই হল দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান। বস্তুদুটি বাইরে থেকে যত বেশি বিসদৃশ বা বিজাতীয় হবে, সাদৃশ্য তত বেশি সূক্ষ্ম হবে, অলংকার তত আকর্ষণীয় হবে। এই সাদৃশ্য কবির প্রধানত তিনটি উপায়ে দেখিয়ে থাকেন :

১. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের জন্য সমান মূল্য বরাদ্দ।
২. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা।
৩. বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া।

তিনটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক :

১. ননীর মত শয্যা কোমল পাতা।
২. আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই, কাব্যের জাল বুনি।
৩. এলো ওরা / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ে'র চেয়ে।

প্রথম উদাহরণে ‘ননী’ আর ‘শয্যা’ এই দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য। ‘মত’ শব্দটির প্রয়োগ বুঝিয়ে দিচ্ছে, ‘ননী’ আর ‘শয্যা’ পৃথক দুটি বস্তু, এদের পার্থক্য আকারে আয়তনে জাতিতে। একই বস্তু হলে ‘মত’ শব্দ দিয়ে ব্যবধান তৈরি করতে হত না। অতএব, পার্থক্য পুরোপুরি মানা হল। এই ‘মত’ শব্দটিই আবার জানিয়ে দিচ্ছে—ননী কোমল, শয্যা ও কোমল। ‘কোমলতা’ গুণটি দুটি বস্তুতেই সমান, তাই বস্তুদুটির মূল্যও গুণের দিক থেকে সমান। অতএব, সমান মূল্যও বরাদ্দ হল ‘ননী’ আর ‘শয্যা’র জন্য।

দ্বিতীয় উদাহরণে ‘কাব্য’ আর ‘জাল’-এর মধ্যে সাদৃশ্য। বস্তুদুটি অবশ্যই বিসদৃশ, পুরোপুরি পৃথক। ‘কাব্য’ কবির লেখা, হয়তো মুদ্রিত একখানি বই—পড়ে আছে পড়ার টেবিলে। ‘জাল’ সুতো দিয়ে বোনা, হয়তো ছড়ানো আছে নদী-পুকুরের বুকে, মাছের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এই পার্থক্যটা পুরোপুরি আড়ালে রেখে কবি ‘কাব্য’ আর ‘জাল’-কে এক করে দিলেন। কাব্য আর কাব্য রইল না, জাল হয়ে গেল। কলম ছেড়ে দিয়ে কবি সুতো তুলে নিলেন হাতে, বুনতে থাকলেন, জাল-কাব্যের জাল। এইভাবে তৈরি হল ‘কাব্য’ আর ‘জাল’-এর অভেদ—কল্পনা।

তৃতীয় উদাহরণে ‘ওরা’ মানে ইংরেজ, ‘তোমার নেকড়ে’ মানে আফ্রিকার নেকড়ে। ইংরেজদের নখ তীক্ষ্ণ, নেকড়ে'র নখও তীক্ষ্ণ। কিন্তু তীক্ষ্ণতা দুদিকে সমান নয়। ইংরেজের নখ বেশি তীক্ষ্ণ—এই কথাটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে নেকড়ে'র পার্থক্য বা ভেদ। এই ভেদের ওপরই জোর দেওয়া হল ‘চেয়ে’ শব্দটি প্রয়োগ করে।

সাদৃশ্যমূলক অর্থাৎকারের চারটি অঙ্গ বা অবয়ব :

১. যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু।

২. যার সঙ্গে তুলনা।

৩. যে-ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে এবং বস্তুদুটিকে তুলনীয় করে।

৪. যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়।

প্রথমটি উপমেয়, দ্বিতীয়টি উপমান, তৃতীয়টি সাধারণ ধর্ম, চতুর্থটি ভঙ্গি।

উদাহরণ ব্যাখ্যা করে অঙ্গ-চারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক :

‘এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !’ —রবীন্দ্রনাথ

‘রক্ত’ আর ‘জবাফুল’—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য স্থান করে অলংকার তৈরি হয়েছে উদ্ভূত উদাহরণে। অতএব, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থাৎকার। বাক্যটিতে তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু ‘জবাফুল’। ‘এও’ নির্দেশক সর্বনাম নির্দেশ করছে দুটি জবাফুল-কেই। কবির বস্তুব্য জবাফুল নিয়েই, জবাফুল দুটি যে টুকটুকে লাল, এটাই কবি বলতে চান। অতএব, ‘জবাফুল’ প্রথম অঙ্গ—উপমেয়। জবাফুলের তুলনা হয়েছে রক্তের সঙ্গে। রক্ত যে কত লাল, তা সবার জানা আছে। সেই কারণেই রক্তের সঙ্গে তুলনা। অতএব, ‘রক্ত’ দ্বিতীয় অঙ্গ—উপমান।

রক্ত রাঙা, জবাফুলও রাঙা। রাঙা হওয়ার ধর্ম রক্তেও আছে জবাফুলেও আছে এবং এই ধর্মই জবাফুলকে তুলনীয় করেছে রক্তের সঙ্গে। অতএব, ‘রাঙা’ বিশেষণটিতে আছে এ শ্রেণির অলংকারের তৃতীয় অঙ্গ—সাধারণ ধর্ম।

‘মতো’ অব্যয়টি উপমান ‘রক্ত’-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে উপমেয় ‘জবাফুল’ আর উপমান ‘রক্ত’কে বেঁধে রেখেছে একটি বাক্যে। এই বাঁধন-প্রক্রিয়াতেই ভিন্ন গোত্রের দুটি শব্দ জবাফুল-রক্ত একই বাক্যের মধ্যে ধরা দিল, ‘মতো’-র ইঙ্গিতে বিসদৃশ বস্তুদুটি সদৃশ হিসেবে চিহ্নিত হল। অতএব, সাদৃশ্যবাচক ‘মতো’ অব্যয়ের সংযোজন ক্রিয়াটিই এ শ্রেণির অলংকারের চতুর্থ অঙ্গ-ভঙ্গি, সাদৃশ্য-প্রকাশের বিশেষ পদ্ধতি।

অর্থাৎকারের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যমূলকে। ওই বৈচিত্র্য নির্ভর করে মূলত ভঙ্গির ওপর। কীভাবে ভঙ্গির ওপর অলংকারটি টিকে থাকছে, দেখা যাক। আগের পাতায় উদ্ভূত উদাহরণটিতে যে অলংকার হয়েছে, তার নাম ‘উপমা’ (একে একে অলংকারগুলির আলোচনা এর পরেই হবে)। এর অন্তর্গত উপমেয়-উপমান-সাধারণ ধর্ম—এই তিনটি অঙ্গের পরিবর্তনেও ‘উপমা’ উপমাই থাকবে :

মূল উদাহরণ—‘এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !’

পরিবর্তিত উদাহরণ—‘এও যে দুধের তো সাদা, দুটি কাশফুল !’

এ দুটি উদাহরণের অলংকার যে একই, তা আন্দাজ করা যায়। এবারে ভঙ্গির পরিবর্তন করে দেখা যাক কী ঘটে :

ভঙ্গি	ভঙ্গির চিহ্ন	উদাহরণ	অলংকার
১. উপমানের সঙ্গে সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ।	‘মতো’	‘এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !’	উপমা
২. অভেদ-আরোপে উপমেয়-উপমান পাশাপাশি	‘জবাফুলের রক্তলেখা’	‘জবাফুলের রক্তলেখায় রাঙা চরণদুটি !’	রূপক
৩. উপমানের সঙ্গে সংশয়বাচক শব্দের প্রয়োগ	‘যেন’	‘এও দুটি জবাফুল, যেন দুটি রাঙা রক্তাধার !’	উৎপ্রেক্ষা
৪. উপমানের অনুল্লেখে একমাত্র উপমেয়	‘জবা বরছে ফোঁটা ফোঁটা,	‘জবা বরছে ফোঁটা ফোঁটা দেবীর চরণতলে !’	সমাসোক্তি
৫. উপমেয়ের অনুল্লেখে একমাত্র উপমান	—‘রক্ত’	‘রাঙা রক্তের অঞ্জলিতে মায়ের পূজা হবে !’	অতিশয়োক্তি
৬. সাদৃশ্যবাচক শব্দ + না-বোধক শব্দ = ভেদের প্রয়োগ	‘মতো নয়’	‘রক্ত এত রাঙা নয়, জবাফুলের মতো’	ব্যতিরেক

ওপরের আটটি উদাহরণ মূলত একই বাক্যের আটটি পরিবর্তিত রূপ। এ পরিবর্তন কেবল ভঙ্গির। উপমেয় (জবাফুল), উপমান (রক্ত), সাধারণ ধর্মের (রাঙা) কোনো পরিবর্তন নেই। আটটি ভঙ্গি থেকে পৃথক আটটি অলংকারের জন্ম, প্রতিটি অলংকারই সাদৃশ্যমূলক অর্থাৎ অলংকারের এক-একটি রূপ।

### ২৮.৬.১ উপমা

সংজ্ঞা : একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি বস্তু মध्ये কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উপমা অলংকার।

(বিজাতীয় দুটি বস্তু মध्ये সাদৃশ্য দেখালেই উপমা)

বৈশিষ্ট্য :

- ১। একটিমাত্র বাক্য থাকবে।
- ২। দুটি বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তু মध्ये তুলনা হবে (উপমেয়-উপমান)।
- ৩। বস্তুদুটির বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের উল্লেখ থাকবে না।
- ৪। বস্তুদুটির মध्ये সাদৃশ্য বা মিলটুকু দেখানো হবে (সাধারণ ধর্ম)।
- ৫। সাদৃশ্য দেখানো হবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে (সাদৃশ্যবাচক শব্দ)। উপমা অলংকারে ব্যবহার্য সাদৃশ্যবাচক শব্দের তালিকাটি এইরকম : মত, মতন, ন্যায়, রূপে, নিভ, পারা, প্রায়, তুলা, সম, তুল্য, হেন যেমতি, কল্প, সদৃশ, বৎ, যথা, যেন, রীতি ইত্যাদি।

অতএব, উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

৬। উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো—বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার এটি প্রথম স্তর।

### বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

● বাংলায় উপমার উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছ-টি—

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (ক) পূর্ণোপমা ;                  | (খ) লুপ্তোপমা ;             |
| (গ) মালোপমা ;                    | (ঘ) স্মরণোপমা ;             |
| (ঙ) বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা ; | (চ) বিষ-প্রতিবিষভাবের উপমা। |

### সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ (ক) পূর্ণোপমা :

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা (পূর্ণা + উপমা)।

উদাহরণ :

- (i) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় ‘ছুরি’, উপমান ‘প্রভাতরশ্মি’, সাধারণ ধর্ম ‘তীক্ষ্ণদীপ্ত’, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ‘সম’।

- (ii) সিন্দূরবিন্দু শোভিল ললাটে

গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা ! —মধুসূদন

সংকেত : উপমেয় ‘সিন্দূরবিন্দু’, উপমান ‘তারারত্ন’, সাধারণ ধর্ম ‘শোভাসৃষ্টি’, (‘শোভিল’—ক্রিয়াগত), সাদৃশ্যবাচক শব্দ ‘যথা’।

■ (খ) লুপ্তোপমা :

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের (উপমান-সাধারণ ধর্ম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ) যেকোনো একটি দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে (অর্থাৎ, এদের উল্লেখ থাকে না), তার নাম লুপ্তোপমা (লুপ্তা + উপমা)।

উদাহরণ :

১. সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে —সঞ্জীবচন্দ্র

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত বাক্যে ‘বন্যেরা’ উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), ‘শিশুরা’ উপমান (অন্য বস্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), সাধারণ ধর্ম ‘সৌন্দর্য’ (সুন্দর) হওয়ার গুণটি উপমেয়-উপমান দু-পক্ষেই আছে, কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। উদ্ভূত পঙক্তিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে ‘বন্যেরা’ এবং ‘শিশুরা’ এই দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে, কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে।

অতএব, এটি উপমা অলংকার। অলংকারটিতে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্মেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নেই বলে এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

২. সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে

নাটোরের বনলতা সেন।

—জীবনানন্দ

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত চরণে ‘চোখ’ উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), ‘পাখির নীড়’ উপমান (অন্য বস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), ‘মতো’ সাদৃশ্যবাচক শব্দ, কিন্তু সাধারণ ধর্ম (প্রশাস্তি) লুপ্ত। উদ্ভূত চরণটিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে ‘চোখ’ আর ‘পাখির নীড়’ এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, অলংকার এখানে উপমা। অলংকারটিতে উপমেয় আছে, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের অন্যতম সাধারণ ধর্ম লুপ্ত বলে এটি ‘লুপ্তোপমা’।

৩. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

চকি কলাপাতা সন্ধ্যা।

—জগন্নাথ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : তিন শব্দের এই বাক্যে ‘সন্ধ্যা’ উপমেয়, ‘কচি কলাপাতা’ উপমান, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত। বাক্যটিতে ‘সন্ধ্যা’ আর ‘কচি কলাপাতা’ এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ থাকলেও অন্য তিনটি অঙ্গের একমাত্র উপমান ছাড়া আর দুটি অঙ্গই (সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম) লুপ্ত। সুতরাং, এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

৪. উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে

কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত বাক্যের শেষ শব্দ ‘হরিণ-চোখ’-এ সাদৃশ্যের সঞ্চার হয়েছে। ‘হরিণ-চোখ’ আসলে হরিণের চোখ নয়, ওটা কালো মেয়েরই চোখ। সাদৃশ্যের টানেও হরিণ আসেনি, এসেছে হরিণের চোখ-ই। কেননা, কবির দৃষ্টিপাত কালো মেয়ের চোখের প্রতি নিবন্ধ। অর্থাৎ, এখানে বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় কালো মেয়ের ‘চোখ’ যা কবি দেখেছিলেন, আর উপমান হরিণের ‘চোখ’ যা কবি কল্পনা করেছিলেন। ‘হরিণ-চোখ’-এর অর্থ যদি ‘হরিণের চোখ’ হত, তাহলে ওই ‘হরিণ-চোখ’-ই হত উপমান। কিন্তু, প্রয়োগ-কৌশলে ‘হরিণ-চোখ’-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে ‘হরিণের চোখের মত চোখ’। ‘হরিণ-চোখ’-এ সমাসবন্ধ হয়ে তা উপমান ‘চোখ’ আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ ‘মত’ দুটিকেই হারিয়েছে, রক্ষা করেছে কেবল কালোমেয়ের ‘চোখ’, যা হরিণের চোখের মতোই কালো, অতএব উপমেয়। সুতরাং, বাক্যটিতে দুটি বিজাতীয় বস্তু ‘কালো মেয়ের চোখ’ ও ‘হরিণের চোখ’-এর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, তৈরি হয়েছে উপমা অলংকার। আর, উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রয়েছে বলে এটি নিঃসন্দেহে লুপ্তোপমা।

মন্তব্য : ‘মেয়ে’ আর ‘হরিণ’ বিজাতীয়, অতএব তাদের চোখও বিজাতীয়।

৫. উপমান সাধারণ ধর্মও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

নীরবিলা বীণাবাণী

—মধুসূদন

ব্যাখ্যা : ‘মেঘনাদবধকাব্য’ থেকে উদ্ভূত উদাহরণটিতে উপমেয় প্রমীলা—‘বীণাবাণী’-বিশেষণের রূপে। কিন্তু, উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দে এখানে লুপ্ত। বীণার বাণীর মতো বাণী যার, সেই প্রমীলা উপমেয় হলেও ‘বীণা’ তার উপমান নয়, ‘বাণী’র সঙ্গে সমাসবন্ধ হয়ে তা প্রমীলার বিশেষণ হয়ে আছে। তবে ‘বাণী’র ধারক হিসেবে ‘বীণা’র সঙ্গে প্রমীলা সাদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো ফলে এখানে উপমা অলংকার হয়েছে এবং উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকার কারণে এটি লুপ্তোপমা।

■ (গ) মালোপমা :

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা (মালা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) তোমার সে-চুল

জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন। —বুদ্ধদেব বসু

সংকেত : উপমেয় ‘চুল’, উপমান ‘সূতা’ আর ‘মেঘ’।

(ii) উড়ে হোক ক্ষয়

ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত

নিষ্ফল সঞ্জয়।

—রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় ‘সঞ্জয়’, উপমান ‘ধূলি’ আর ‘তৃণ’।

২৮.৬.২ রূপক

সংজ্ঞা : বিষয়ের অপহুব না ঘটিয়ে (উপমেয়কে লুপ্ত না করে) তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। বাক্যে উপমেয় এবং উপমানের উল্লেখ থাকবে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে না।

২। উপমেয় এক হয়ে যাবে উপমানের সঙ্গে। এরই নাম অভেদ। সাদৃশ্যের প্রথম স্তর উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো (উপমা), দ্বিতীয় স্তরভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো (ব্যতিরেকে), তৃতীয় স্তর অভেদ (রূপক)।

৩। বাক্যে উপমানই প্রধান, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বাক্যাংশ উপমানকেই অনুসরণ করবে। উপমেয় লুপ্ত নয়, তবে গৌণ।

৪। জীবন অঞ্জী, শৈশব-যৌবন বার্ধক্য তার অঞ্জা ; আকাশ অঞ্জী, মেঘ-তারা-নীলরং তার অঞ্জা ; নদী অঞ্জী—ধারা-ঢেউ-ফেনা-তীর তার অঞ্জা। অঞ্জী উপমেয়ের অঞ্জের সঙ্গে অঞ্জী উপমানের অঞ্জের অভেদ হতে পারে।

### বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—  
(ক) নিরঞ্জারূপক ; (খ) সাজারূপক ; (গ) পরস্পরিত রূপক ।
- নিরঞ্জারূপক দু-রকমের—  
(ক) কেবল নিরঞ্জারূপক ; (খ) মালা নিরঞ্জারূপক ।

### সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

#### ■ (ক) নিরঞ্জারূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে কোনো অঞ্জোর অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঞ্জারূপক । একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঞ্জারূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঞ্জারূপক (মালারূপক) ।

#### উদাহরণ :

১. কেবল নিরঞ্জারূপক (একটি উপমেয়, একটি উপমান)—

(i) শিশুফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : উপমেয় ‘শিশু’, উপমান ‘ফুলগুলি’ । ক্রিয়াপদ ‘ফুটে’ ফুলগুলি’র অনুসারী । ‘শিশু’র ওপর কেবল ‘ফুলগুলি’র অভেদ আরোপ ।

(ii) যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি। —মোহিতলাল

সংকেত : উপমেয় ‘যৌবন’, উপমান কেবল ‘মৌবন’ । ‘মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি’—এই বাক্যাংশ উপমান ‘মৌবন’-এর অনুসারী ।

মন্তব্য : এখানে ‘যৌবনেরি মৌবনে’ অংশে ‘বনে’ ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ (মৌ-‘বনে’) এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ (যৌ-‘বনে’-রি) হচ্ছে বলে নিরর্থক যমক অলংকারও হয়েছে। লক্ষণীয়, ‘মৌবনে’ শব্দটি ‘মৌ’ এবং ‘বনে’—এ দুটি স্বতন্ত্র শব্দের সমাসে তৈরি বলে ‘বনে’ শব্দের মর্যাদা পাবে ।

২. মালা নিরঞ্জারূপক (মালারূপক একটি উপমেয়, একের বেশি উপমান)—

(i) অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী

তুমি অন্তরব্যাপিনী

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,

একটি পদ্ব হৃদয়বৃত্তশয়নে,

একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—

চারিদিকে চিরযামিনী ।

—রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় ‘তুমি একা’, উপমান ‘একটি স্বপ্ন’, ‘একটি পদ’, ‘একটি চন্দ্র’। একটি উপমেয়ের ওপর তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ।

(ii) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,  
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা ? —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় ‘আমি’, উপমান ‘উপদ্রব’, ‘অভিশাপ’, ‘দুরদৃষ্ট’, ‘দুঃস্বপ্ন’, ‘কাঁটা’। একটি উপমেয়ের ওপর পাঁচটি উপমানের অভেদ আরোপ।

■ (খ) সাঙ্গরূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গরূপক।

(অর্থাৎ, উপমেয়-উপমান অঙ্গসমেত এক হয়ে গেলে সাঙ্গরূপক।)

উদাহরণ :

(i) শঙ্খধবল আকাশগাঙে  
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে  
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি  
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?

—যতীন্দ্রমোহন

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে একদিকে উপমেয় ‘আকাশ’ অঙ্গী, অন্যদিকে উপমান ‘গাঙ’ অঙ্গী। অঙ্গী ‘আকাশ’-এর অঙ্গ ‘মেঘ’, ‘জ্যোৎস্না’, ‘ধরা’—কেননা, মেঘ-জ্যোৎস্নার আধার আকাশ, আকাশ থেকে যাত্রা শুরু, ধরায় যাত্রাসমাপন। অন্যদিকে অঙ্গী ‘গাঙ’-এর অঙ্গ ‘পাল’, ‘তরী’, ‘ঘাট’—পালসহ তরী গাঙেই ভাসে, ঘাট গাঙেরই সংলগ্ন হয়ে থাকে। উদ্ধৃত বাক্যে ‘পালটি মেলে’ বাক্যাংশ উপমান ‘গাঙ’-এর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ ‘আকাশ’-এর ওপর ‘গাঙ’-এর অভেদ আরোপে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। সেইসঙ্গে উপমেয় ‘আকাশ’-এর অঙ্গ ‘মেঘ’, ‘জ্যোৎস্না’ আর ‘ধরা’-এর ওপর উপমান ‘গাঙ’-এর অঙ্গ যথাক্রমে ‘পাল’, ‘তরী’ আর ‘ঘাট’-এর অভেদ-ও আরোপ করা হয়েছে (অর্থাৎ মেঘ-পাল, জ্যোৎস্না-তরী আর ধরা-ঘাট এক হয়ে গেছে।) অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে বলে।

(ii) সৌন্দর্য-পাথারে  
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী  
সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,  
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ; —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : অঙ্গী উপমেয় ‘সৌন্দর্য’, তার অঙ্গ ‘বেদনা’, ‘মন’, ‘হৃদয়’। অঙ্গী উপমান ‘পাথার’ তার অঙ্গ ‘বায়ু’, ‘তরী’, ‘পাল’।



■ (খ) পরম্পরিত রূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর ওকটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক।

(একটি নিরঞ্জরূপক থেকে আর একটি নিরঞ্জরূপকের জন্ম—এইভাবে রূপকের পরম্পরা বা ধারা তৈরি হতে থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত রূপক।)

উদাহরণ :

- (i) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে  
রেখেছে সখ্যা আঁধারপর্ণপুটে। —রবীন্দ্রনাথ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় ‘আলো’র ওপর প্রথম উপমান ‘কমলকলিকা’-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় ‘আঁধারে’র ওপর দ্বিতীয় উপমান ‘পর্ণপুট’-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। সেইকারণে এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে।

মন্তব্য : ‘আলো-আঁধার’ আর ‘কমলকলিকা-পর্ণপুট’-এ অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও কার্যকারণ-পরম্পরার ভাব প্রবল হওয়ায় এখানে সাঙ্গরূপক না হয়ে পরম্পরিত রূপকই হয়েছে।

- (i) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর  
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা। —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় ‘দীর্ঘশ্বাস’র ওপর প্রথম উপমান ‘ধোঁয়ার’-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় ‘অনুশোচনা’র ওপর দ্বিতীয় উপমান ‘আগুন’-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। আবার দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ থেকে তৃতীয় উপমেয় ‘উৎসাহ’-এর ওপর তৃতীয় ‘কয়লা’র অভেদ-আরোপের জন্ম—এইভাবে রূপকের কার্যকারণ-পরম্পরা তৈরি হচ্ছে বলে এটি পরম্পরিত রূপক।

## ২৮.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা

সংজ্ঞা : গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাঙ্গা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার।

(উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়-উপমানের সাধারণ সাদৃশ্য থেকে উপমা, অভেদ থেকে রূপক, আর প্রবল সংশয় থেকে উৎপ্রেক্ষা। গভীর সাদৃশ্য এ সংশয়ের কারণ।

২। সংশয় একদিকে—উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়।

৩। এ সংশয় কবিত্বময়, সাধারণ সংশয় থেকে অলংকার হয় না।

৪। কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয়েরে তুলনায় কাল্পনিক উপমানকেই বেশি সত্য বলে মনে হয়।

#### প্রকারভেদ

##### ● উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—

(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা  
(বাচ্যা + উৎপ্রেক্ষা)

(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা  
(প্রতীয়মানা + উৎপ্রেক্ষা)

#### সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

##### ■ (ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা :

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে ‘যেন’, ‘বুঝি’, ‘জনু’, ‘মনে হয়’, ‘মনে গণি’ জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) বসিলা যুবতী  
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি  
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।

—মধুসূদন  
(মেঘনাদবধকাব্য/৪র্থ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত উদাহরণে উপমেয় ‘পদতলে বসা যুবতী’ (অশোকবনে সীতার পদতলে বসা সরমা), উপমান ‘তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি’ (প্রদীপ)। সীতার পদতলে বসা যুবতী সরমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুলসীতলায় জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপটি। দুটি দৃশ্যই আছে একটি পবিত্র সৌন্দর্য। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় ‘পদতলে বসা যুবতী’কে উপমান ‘তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি’ বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। অতএব, এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার। সংশয়বাচক ‘যেন’ শব্দের সংযোগে, সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(i) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময় :  
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কলঙ্কিত গোলাকৃতির সাদৃশ্যে উপমেয় ‘পূর্ণিমা-চাঁদ’-কে ক্ষুধাতুর মানুষের পক্ষে অত্যাৱশ্যক উপমান ‘ঝলসানো রুটি’ বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়সূচক শব্দ ‘যেন’-র উল্লেখ সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

##### ■ (খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ।

তার পাছে ব্যাধ যেন উড়িছে পতঙ্গ।

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত উদাহরণে প্রথম চরণে উপমেয় ‘ভগবতী’তে উপমান ‘দীঘল তরঙ্গ’ বলে কবির মনে প্রবল সংশয় জেগেছে। ভগবতীর চলনভঙ্গিতে ‘তরঙ্গে’র নাচন কবি লক্ষ করেছেন। এই গভীর সাদৃশ্য থেকেই কবির মনে সংশয়, এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে তা কবিত্বময়। অতএব, অলংকার এখানে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়সূচক শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অর্থ থেকে সংশয়ের ভাব অনুমিত হওয়ায় এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

দ্বিতীয় চরণেও উপমেয় ‘ব্যাধ’-কে উপমান ‘পতঙ্গ’ বলে কবির মনে প্রবল সংশয়। এর মূলেও রয়েছে ‘ব্যাধ’ আর ‘পতঙ্গে’র চলনভঙ্গির সাদৃশ্য। অতএব, এখানেও উৎপ্রেক্ষা, তবে সংশয়সূচক শব্দ ‘যেন’-র উল্লেখ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(ii) এ ব্রহ্মাণ্ড বুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল। —যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উদ্ভূত চরণে উপমেয় ‘ব্রহ্মাণ্ড’, উপমান ‘মাকাল ফল’। বাইরের রূপে লোভনীয় অথচ ভেতরের সারশূন্য ‘ব্রহ্মাণ্ড’ এবং ‘মাকাল ফল’ দুই-ই। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে ‘ব্রহ্মাণ্ড’-কে একটি বুলন্ত প্রকাণ্ড ‘মাকাল ফল’ বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশে এখানে অলংকার হয়েছে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়মূলক শব্দের কোনো উল্লেখ নেই বলে উদাহরণটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

## ২৮.৬.৪ সমাসোক্তি

সংজ্ঞা : বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হলে সমাসোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

- ১। উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, তবে তার ব্যবহার বা আচরণের উল্লেখ থাকে।
- ২। উপমেয় একা এবং তার ব্যবহার বা আচরণ পুরোপুরি উপমানের।
- ৩। উপমেয়ের ওপর আরোপিত ব্যবহার থেকেই উপমানকে চেনা যায়।
- ৪। ব্যবহার বা আচরণ সাধারণভাবে গুণগত বা ক্রিয়াগত।
- ৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপমেয় অচেতন বস্তু, তার ব্যবহার চেতনের।

উদাহরণ :

(i) শুনিতেছি আজো আইম প্রাতে উঠিয়াই,

‘আয়’ ‘আয়’ কাঁদিতেছি তেমনি সানাই। —নজরুল ইসলাম

সংকেত : যে কাল্পনিক মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অচেতন ‘সানাই-এর ওপর তা আরোপিত। চেতন মানুষই এখানে উপমেয়, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, আছে তার ব্যবহারের (কাল্পনিক) উল্লেখ। এই ব্যবহারের আরোপ হল ‘সানাই’-এর ওপর। অতএব, ‘সানাই’ এখানে অনুক্ত ‘মানুষ’-এর উপমান। অলংকার সমাসোক্তি।

(ii) শূনিয়া উদাসী

বসুন্ধরা বসিয়া আছে এলোচুলে

দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে

একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্জল

বক্ষে টানি দিয়া ;

—রবীন্দ্রনাথ

(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

ব্যাখ্যা : ‘বসুন্ধরা’ উদ্ভূত স্তবকের উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয়, উপমানের উল্লেখ নেই। আমাদের পরিচিত ‘বসুন্ধরা’ (মাটির পৃথিবী) অচেতন। কিন্তু এখানকার বর্ণিত ‘বসুন্ধরা’ মেঠোসুরে বাঁশির কাল্পনিক শূনে ‘উদাসী’, ‘হিরণ্য-অঞ্জল বক্ষে’ টেনে এলোচুলে বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এ স্বভাব ‘বসুন্ধরা’র নয়, আঁচল বুক-টানা এলোচুলে বসে-থাকা উদাসিনী নারীর ব্যবহার বা আচরণ কবি আরোপ করেছেন, ‘বসুন্ধরা’র ওপর। ওই ‘নারী’ই ‘বসুন্ধরা’-র উপমান। উপমান ‘নারী’কে চেনা যায় উপমেয় ‘বসুন্ধরা’র ওপর আরোপিত আচরণের বর্ণনা থেকেই। অতএব, উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপের সৌন্দর্যই উদ্ভূত স্তবকের অলংকার, সে অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

### ২৮.৬.৫ অতিশয়োক্তি

সংজ্ঞা : বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি।

(উপমেয় লুপ্ত এবং উপমান প্রবল হলে অতিশয়োক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয় লুপ্ত।

২। বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে উপমেয়কে চেনা যায়।

৩। উপমান একা, সর্বাঙ্গিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৪। উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্য এখানে চূড়ান্ত, অভেদ সম্পূর্ণ।

৫। ‘উপমা’য় উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো, ‘ব্যতিরেকে’ ওই ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো, ‘রূপকে’ অসম্পূর্ণ অভেদ, ‘অপহুতি’-তে অভেদ মেনে নিয়ে উপমেয়ের অস্বীকৃতি, ‘অতিশয়োক্তি’তে সাদৃশ্যের চূড়ান্ত পরিণাম—অভেদ সম্পূর্ণ।

উদাহরণ :

(i) মুকুতামণ্ডিত বুকো নয়ন বর্ষিল

উজ্জ্বলতর মুকুতা !

—মধুসূদন

(মেঘনাদবধকাব্য/৬ষ্ঠ সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিকুঞ্জিলা যজ্ঞস্থলের দিকে পা-বাড়ানো মেঘনাদের বিদায়-মুহূর্তের একটি করুণ দৃশ্য উদ্ভূত উদাহরণটি। বেদনার্ত প্রমীলার ক্রন্দন-দৃশ্য। নয়ন থেকে অশ্রুধারাই তো বর্ষিত হল। কিন্তু অশ্রু এখানে অনুস্ত। প্রমীলার নয়ন বা বর্ষণ করল, কবের চোখে তা ‘মুকুতা’। তারই উল্লেখ এখানে আছে। অর্থাৎ, প্রকৃত বা উপমেয় ‘অশ্রু’-র উল্লেখ নেই, আছে কেবল অপ্রকৃত বা উপমান ‘মুকুতা’র (মুক্তা) উল্লেখ। অতএব, অলংকার এখানে অতিশয়োক্তি (বিশেষ নাম ‘রূপকতিশয়োক্তি’)।

(ii) হায় সূর্ণগা,

কি কুম্ফণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,

কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা

এ ভুজগে ?

—মধুসূদন

(মেঘনাদবধকাব্য/১ম সর্গ)

ব্যাখ্যা : বিধ্বংসী লঙ্কায়ুদ্ধের জন্য রাবণ দায়ী করলেন সূর্ণগাকে। পঞ্চবটীবনে ‘কালকূটে ভরা ভুজগ’টিকে দেখারই পরিণাম এ যুদ্ধ। কিন্তু, বিধ্বস্ত রাবণের দৃষ্টিতে যা ‘ভুজগ’ (সাপ), প্রকৃত অর্থে তিনি এখানে রামচন্দ্র। সূর্ণগা রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখেই কামাসক্ত হয়ে রক্তারক্তি-কাণ্ডের সূচনা করেছিল, কোনো সাপ দেখে নয়। অতএব, ‘ভুজগ’ এখানে উপমান-মাত্র, তার উপমেয় ‘রামচন্দ্র’।

বস্তুর (রাবণের) মূল্যায়নে এবং কবির প্রকাশভঙ্গিতে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তাদের অভেদ এখানে পরিপূর্ণ। ফলে, বাক্যে উপমেয় ‘রামচন্দ্র’ পুরোপুরি লুপ্ত, উপমান ‘ভুজগ’ সর্বাঙ্গিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, উপমান সম্পূর্ণভাবে উপমেয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং, এখানকার অলংকার অতিশয়োক্তি।

### ২৮.৬.৬ ব্যতিরেক

সংজ্ঞা : উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার।

(উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

২। উপমান অপেক্ষা উপমেয় নিকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৩। অধিক-চেয়ে-অপেক্ষা, নিন্দা-নিন্দিত-নিন্দু, জিনি-জিতল, গঞ্জি-গঞ্জন, লাজ-লজ্জা, ছার ইত্যাদি তারতম্যবোধক শব্দের প্রয়োগে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়।

৪। সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে থাকে।

৫। কখনো কখনো বর্ণনায় অন্তর্নিহিত থাকে উৎকর্ষ-অপকর্ষ, ভাব বা অর্থ থেকে বুঝে নিতে হয়।

৬। ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো হয়। এটি সাদৃশ্যের দ্বিতীয় স্তর। (প্রথম স্তর উপমায়, যেখানে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়।)

উদাহরণ :

(i) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ

নারীকণ্ঠের কাকলি।

—রবীন্দ্রনাথ

(কথা/ সামান্য ক্ষতি)

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত চরণে উপমেয় ‘নারীকণ্ঠের কাকলি’, উপমান ‘কলকল্লোল’। এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ নেই, আছে তারতম্য-বোধক ‘লাজ দিল’ কথাটি—এর সাহায্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝা যাচ্ছে। উপমেয় ‘নারীকণ্ঠের কাকলি’ লজ্জা দিল উপমান ‘কলকল্লোল’কে। লজ্জা যে দেয়, সে তার শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষের কারণেই দেয়। এখানে ‘নারীকণ্ঠের কাকলি’রই উৎকর্ষ। কিন্তু, কোন্ গুণে এই উৎকর্ষ, সে কারণটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করা যায়। কলধ্বনি নারীর কণ্ঠেও আছে, কল্লোলের (ঢেউ) মৃদু আঘাতেও আছে। এই ধ্বনির উচ্চতায় ‘কলকল্লোল’ অপেক্ষা নারীকণ্ঠের কাকলি’রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এ উদাহরণে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে।

(i) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি

ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা

স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে।

—মধুসূদন

(মেঘনাদবধকাব্য /১ম সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উপমেয় ‘রাবণের রাজসভা’ (ইহা), উপমান ‘ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব-সভা’। দুটি সভাই ঐশ্বর্যময়। তবে, তারতম্য-বোধক ‘ছার’ শব্দের প্রয়োগে ঐশ্বর্যের পরিমাণের দিক থেকে দুটি রাজ্যসভার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ‘রাবণের রাজসভা’রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এখানকার অলংকার উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

## ২৮.৭ সারাংশ-২

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

‘ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়’—কথাটি বললে ছেলেটার চলন একটা ছবি হয়ে ওঠে আমাদের মনে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার—অর্থালংকার। ‘ছেলেটা’ আর ‘ব্যাং’—এই দুটি বিসদৃশ বস্তু মধ্য কল্পনার

জোরে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা হল। সাদৃশ্যই এখানকার অলংকারের লক্ষণ। তাই, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থাৎ অলংকার। প্রধানত তিনটি উপায়ে এ সাদৃশ্য দেখানো হয়—বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়ে (‘নীর মতো শয্যা’), পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে (‘কাব্যের জাল’), পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে (‘নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে’)। সাদৃশ্যমূলক অর্থাৎ অলংকারের চারটি অঙ্গ—উপমেয় (বর্ণনীয় বিষয়), উপমান (যার সঙ্গে তুলনা), সাধারণ ধর্ম (যা দুটি বস্তুতেই থাকে), ভঙ্গি (তুলনার)। কেবল ভঙ্গির পরিবর্তনে সাদৃশ্যমূলকে নানারকম অলংকার তৈরি হয়ে যায়—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ইত্যাদি।

**উপমা :** বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা। উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমার প্রধান বিভাগ তিনটি—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা। উপমার চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকলে পূর্ণোপমা, উপমেয় থাকলেও আর কোনো অঙ্গের লোপ হলে লুপ্তোপমা, একটি উপমেয়ের একের বেশি উপমান থাকলে মালোপমা।

**রূপক :** উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক। রূপক প্রধানত তিন রকমের—নিরঞ্জারূপক, সাজারূপক, পরম্পরিত রূপক। কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একের বেশি উপমানের অভেদ আরোপ করলে নিরঞ্জারূপক (উপমেয়-উপমানের কোনো অঙ্গের অভেদ থাকবে না)। উপমেয়-উপমানের অঙ্গসমেত অভেদ হলে সাজারূপক। একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ থেকে আর একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ তৈরি হলে পরম্পরিত রূপক।

**উৎপ্রেক্ষা :** উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা। উৎপ্রেক্ষা দু-রকমের—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (পূর্ণিমা-চাঁদ যেন বলসানো রুটি), সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ ছাড়াই সংশয় অনুমান করা গেলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা)।

**অতিশয়োক্তি :** উপমেয় লুপ্ত আর উপমান প্রবল হলে অতিশয়োক্তি। ‘নয়ন বর্ষিল .... মুকুতা’—এখানে উপমেয় ‘অশ্রু’ লুপ্ত, উপমান ‘মুকুতা’ প্রবল।

**সমাসোক্তি :** উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হল সমাসোক্তি। ‘বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে’—উপমেয় ‘বসুন্ধরা’র ওপর উপমান ‘নারী’-র ব্যবহার।

**ব্যতিরেক :** উপমেয়-উপমানের মধ্যে সাধারণ ধর্মের কমবেশি দেখানো হলে ব্যতিরেক। ‘কলকল্লোর লাজ দিল আজ / নারীকণ্ঠের কাকলি’—সাধারণ ধর্ম ‘কলধ্বনি’ উপমান ‘কল্লোল’-এর চেয়ে উপমেয় ‘নারীকণ্ঠে-ই বেশি।

## ২৮.৮ অনুশীলনী-২

১. সাদৃশ্যমূলক অর্থাৎ অলংকার কীভাবে গড়ে ওঠে, লিখুন।
২. কী কী উপায়ে কবির দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে থাকেন, উদাহরণসহ লিখুন।

৩. সাদৃশ্যমূলক অলংকারের কী কী অঙ্গ, একটি উদাহরণে সেসব দেখিয়ে দিন। কোন অঙ্গ বদলালে অলংকার বদলে যায়, লিখুন।
৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন :  
পূর্ণোপমা, সাজা রূপক, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক।
৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—
- (ক) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।
- (খ) নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা।
- (গ) তটিনী চলেছে অভিসারে।
- (ঘ) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ।
- (ঙ) অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।
- (চ) কচি কলাপাত সন্ধ্যা।

## ২৮.৯ মূলপাঠ -৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি

পাঁচটি লক্ষণ থেকে যে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ হয়েছে, এ কথা মূলপাঠ-১ থেকে আপনারা জেনেছেন। প্রথম লক্ষণ সাদৃশ্য, তা থেকে তৈরি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের পরিচয় পেলেন মূলপাঠ-২-এ। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও চারটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক আর গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা।

### ২৮.৯.১ বিরোধমূলক অর্থালংকার

কোনো কবির লেখায় যদি দেখি, কার্য-কারণ-ঘটনাক্রম তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অন্যপথ বা উল্টোপথে চলছে, তখনই বুঝব সেখানে ‘বিরোধ’ আছে। যেহেতু তা কবির লেখা, সেই কারণে ধরে নিতে হবে—সেখানে যা-কিছু বিরোধ সবই বাইরে থেকে বিরোধ বলে মনে হয়, একটু তলিয়ে ভাবলেই তার মীমাংসা খুঁজে পাব, বিরোধ মিলিয়ে যাবে। কাব্য-কবিতার বিরোধের ব্যাপারটি কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝে নেওয়া যাক :

১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
২. মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল।
৩. আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
৪. তাদের বনে ঝরে শাবণ-ধারা আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।
৫. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
৬. এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে বাঁধিতে গলায় ?



প্রথম উদাহরণে আছে একটি শিশু আর শিশুর পিতা। শিশুটি তার পিতার কোলে ঘুমিয়ে আছে, এই তথ্য অভিজ্ঞ মানুষের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু, শিশুর পিতাটি ঘুমিয়ে আছে শিশুর মধ্যে—এ ধরনের কথায় মনে খটকা লাগে, অভিজ্ঞতা ধাক্কা খায় একটা বিপরীত ছবির কল্পনায়। পাঠককে ভাবায়, পাঠক কিছু সময়ের জন্য গভীর জলে পড়ে যায়, এর অর্থ খুঁজে বের করে অবশেষে কিনারা পায়। এটাই বিরোধ, এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার।

দ্বিতীয় উদাহরণে মেঘশূন্য নীল আকাশ থেকে অঝোরে বর্ষণ, তৃতীয় উদাহরণে চোখ থেকেও দৃষ্টি না-থাকা-কারণ-কার্যের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করছে বলে বিরোধ। চতুর্থ উদাহরণে শ্রাবণের ধারা বরল একটি বনে, কদম ফুটল অন্য একটি বনে। এমন ঘটনা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আইন অমান্য করছে। অতএব, খবর হিসেবে এটি মিথ্যা, অন্ততপক্ষে অবিশ্বাস্য। বনে বনে সন্ধান করেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই বিরোধের খোলসটা ছাড়িয়ে পাঠকের মনে যে কদম ফুটে উঠল ক্রমশ, তার সৌন্দর্য পাঠকই উপভোগ করবেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী তার আশ্বাস পাবেন না। পঞ্চম উদাহরণে সুখের আশায় বাঁধা ঘর আগুনে পুড়ে দুঃখ এনে দিল, বস্তুজীবনেও এমনটি ঘটে। এই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেও তো বিরোধ আছেই। এই বিরোধটাই কবি কাজে লাগাচ্ছেন তাঁর কবিতায়, যেখানে সত্যি সত্যি ঘর-বাঁধা বা ঘর-পোড়ার ঘটনা ঘটছে না, ঘটছে কারো মনে সুখের বদলে দুঃখের আনাগোনা। শেষ উদাহরণের দৃশ্যটা অদ্ভুত এবং কিষ্কিৎ ভয়ংকর। এমন সাপের কথা কবি বলছেন, যাকে দেখলে ভয়ে শিউরে ওঠার বদলে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে। খবর হিসেবে এটাও অবিশ্বাস্য। এখানেই এর বিরোধ। কেন সাপটাকে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে বুঝতে পারলেই চমক, চমৎকারিত্ব। গলায় বাঁধা ওই সাপটা তখন সত্যি সত্যি হয়ে উঠবে অলংকার—গলারও, মনেরও।

### বিরোধভাস (বিরোধ)

সংজ্ঞা : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে সে বিরোধির অবসান ঘটে, তাহলে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধভাস বা বিরোধ অলংকার।

(দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখানো হলে বিরোধভাস।)

#### উদাহরণ :

(i) বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,

ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে

বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে।

—রবীন্দ্রনাথ

(কথা/পরিশোধ)

ব্যাখ্যা : ‘মুক্তি’র বিপরীত ‘বন্ধন’। ‘শৃঙ্খলমুক্ত করা’ আর ‘শৃঙ্খলে বাঁধা’ বিরুদ্ধ দুটি কাজ। অতএব, শ্যামা বজ্রসেনকে শৃঙ্খলমুক্ত করে শৃঙ্খলেই বেঁধেছে—এ কথা শুনে মনে হয়, শ্যামার এ দুটি কাজের মধ্যে বিরোধ আছে। কিন্তু এ শৃঙ্খলমুক্তি ‘ক্ষণিকের’ আর এ শৃঙ্খলে বাঁধা ‘অনন্তের’। এর অর্থ, কারাগারের লোহার শৃঙ্খল থেকে

মুক্তি (যা মুহূর্তেই ঘটে গেছে) আর প্রেমের শৃঙ্খলে বন্ধন (যা চিরকালের)। এই অর্থবোধ থেকে শ্যামার দুটি কাজের আপাত বিরোধের অবসান ঘটল। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার হয়েছে।

(ii) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়

লভিবে মুক্তির স্বাদ।

—রবীন্দ্রনাথ

(নৈবেদ্য)

ব্যাখ্যা : ‘বন্ধন’ আর ‘মুক্তি’ বিপরীত দুটি শব্দ। অতএব, ‘বন্ধনমাঝে’ ‘মুক্তির স্বাদ’ পাবার কল্পনায় বিরোধ আছে। কিন্তু ‘বন্ধন’ যদি হয় ‘অসংখ্য’ আর ‘মুক্তির স্বাদ’ যদি হয় ‘মহানন্দময়’, তাহলে সে ‘বন্ধন’ আর ‘মুক্তি’র অন্য অর্থ অবশ্যই আছে। আমাদের চারপাশের সীমানার যে বন্ধন, তা বাইরের। সেই বাইরের বন্ধনে বাঁধা থেকেই কবি চেয়েছেন মনের মুক্তি। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভবে যে আনন্দের স্থান কবি পেতে চান, কবির পক্ষে সেইটাই হবে সীমার বাহ্য বন্ধনের মধ্যে থেকেও অসীম আনন্দলোকে সত্যকার মুক্তি। এই অর্থবোধ থেকেই ‘বন্ধন’-‘মুক্তি’র আপাত বিরোধের অবসান ঘটে বলে এখানে বিরোধাভাস অলংকার আছে।

(iii) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,

মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

—রবীন্দ্রনাথ

(দেশবন্ধুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য)

ব্যাখ্যা : ‘মৃত্যুহীন’ যে প্রাণ, ‘মরণে’ তাকেই দান করা হল। ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’-এর সঙ্গে ‘মরণ’-এর সংযোগ—এতে বিরোধ আছে। এ বিরোধ শব্দের সঙ্গে শব্দের, অতএব ভাষাগত বাহ্য বিরোধ। কিন্তু, কথাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো মহান পুরুষ সম্পর্কে উচ্চারিত। এখানে ‘প্রাণ’-এর অর্থ আত্মার বাণী, তার মৃত্যু বা বিনাশ নেই বলে সে-‘প্রাণ’ ‘মৃত্যুহীন’। আর, ‘মরণ’ কেবল শরীরের, ‘প্রাণে’র নয়। দেশবন্ধু তাঁর শরীরী মৃত্যুতে আত্মার অমর বাণী দেশবাসীর জন্য রেখে গেলেন—এই অর্থবোধ থেকে উদ্ভূত স্তবকটির ভাষাগত আপাত বিরোধের অবসান ঘটে। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার আছে।

### ২৮.৯.২ শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার

শৃঙ্খলা মনকে প্রসন্ন করে, বিশৃঙ্খলা মনকে বিরক্ত করে—এটাই সুস্থ মানুষের মনস্তত্ত্ব। সৈন্যদলের কুচকাওয়াজকে মনে হয় সুন্দর, কাউন্টারের পাশে এমনকী সুশৃঙ্খল ক্রেতার পঙক্তিও সুন্দর, কিন্তু ভিড়-ঠাসা বাস বা ট্রেনের দরজায় ওঠা-নামার ছুড়োছুড়ি বিরক্তিকর, অসুন্দর। আলমারির তাকগুলিতে থাকে থাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর, পড়া হোক বা না হোক। কারণ শৃঙ্খলা। টেবিলের এলোমেলো ছড়ানো বই গভীর পাঠের সহায়ক হলেও অসুন্দর। কারণ শৃঙ্খলার অভাব। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসের শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্য থাকলে সেটাই হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। এ শৃঙ্খলা আসতে পারে কারকের বিন্যাস থেকে, পদের বিন্যাস থেকে, কারণ-কার্যের বিন্যাস থেকে, অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রমশ নির্দিষ্ট হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে।

দুটো-একটা উদাহরণ দিই :

‘ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত ।’

দুটি বাক্য বা বাক্যাংশেই ‘ছাড়ে’ ক্রিয়াটি আছে। ক্রিয়ার সঙ্গে প্রথমে যুক্ত নারদ-বীণা, পরে যুক্ত বীণা-গীত। প্রথমে ‘নারদ কর্তা, ‘বীণা’ কর্ম, পরে ‘বীণাই কর্তা হয়ে ওঠে ‘গীত’কে কর্ম বানিয়ে। এই শৃঙ্খলা থেকেই অলংকারের জন্ম।

‘ফুল চাই সখা, সাদা ফুল, মধুগন্ধিত সাদা ফুল ।’

তিনটি বাক্যাংশ বাক্যটিতে। প্রথম অংশের সঙ্গে যে কোনো ‘ফুল’ থেকে দ্বিতীয় বাক্যাংশে বেছে নেওয়া হল ‘সাদা ফুল’, সেই ‘সাদা ফুল’ থেকেও তৃতীয় বাক্যাংশের বাছাই হল একমাত্র সেই ফুল যেখানে মধুর গন্ধ আছে। এটাই শৃঙ্খলা, এখানেই অলংকার।

‘পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন,

আর চুম্বনে মরণ ।’

বাক্যাংশ এখানেও তিনটি। প্রথম অংশে ‘পরশ’ বা স্পর্শ থেকে ‘চাহনি’ বা দৃষ্টি, দ্বিতীয় অংশে ‘দৃষ্টি’ থেকে ‘চুম্বন’, তৃতীয় বাক্যে ‘চুম্বন’ থেকে ‘মরণ’—স্পর্শ থেকে যার শুরু, দৃষ্টি আর চুম্বন পেরিয়ে মরণে তার চূড়ান্ত পরিণাম। বিন্যাসের একটা শৃঙ্খলা বাক্যটিতেও আছে। এই শৃঙ্খলার সৌন্দর্যই এখানকার অলংকার।

**একাবলি**

সংজ্ঞা : পূর্ব-পূর্ব বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণ বা বিশেষ্যপদ উত্তরোত্তর বাক্য বা বাক্যাংশের যথাক্রমে বিশেষ্য বা বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হতে থাকলে যে শৃঙ্খলাজনিত অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম একাবলি।

(পূর্ব-পূর্ব বিশেষণ বা বিশেষ্যের উত্তরোত্তর বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি।)

**উদাহরণ :**

(i) তাঁহার কাব্য বর্ণনাবহুল, ....বর্ণনা চিত্রবহুল.... চিত্র বর্ণবহুল।

—বুদ্ধদেব বসু

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত বাক্যের প্রথম বাক্যাংশের বিশেষণ ‘বর্ণনাবহুল’ দ্বিতীয় বাক্যাংশে বিশেষ্য ‘বর্ণনা’য় পরিণত, দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষণ ‘চিত্রবহুল’ তৃতীয় বাক্যাংশ বিশেষ্য ‘চিত্র’তে পরিণত। এইভাবে পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশের বিশেষণপদ উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হতে হতে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

অতএব, এখানে ‘একাবলি’ অলংকার হয়েছে।

(ii) বাপী নিরমল, বাপীতে কমল ফুটে।

কমলে ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গে গীতিকা উঠে।।

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত স্তবকের দুটি বাক্যে চারটি বাক্যাংশ। প্রথম বাক্যাংশের বিশেষ্য ‘বাপী’ (দিঘি) দ্বিতীয় বাক্যাংশে ‘কমল’-এর বিশেষণ পদে (‘বাপীতে’) পরিণত। দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য ‘কমল’ তৃতীয় বাক্যাংশে ‘ভৃঙ্গ’-এর বিশেষণপদে (‘কমলে’) পরিণত। তৃতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য ‘ভৃঙ্গ’ (ভ্রমর) চতুর্থ বাক্যাংশে ‘গীতিকা’র (সংগীত) বিশেষণপদে (‘ভৃঙ্গে’) পরিণত। ‘বাপীতে’, ‘কমলে’, ‘ভৃঙ্গে’ পদগুলি বিশেষণ—কারণ,

এদের সংযোগে ‘কমল’, ‘ভৃঙ্গ’ আর ‘গীতিকা’ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশে বিশেষ্য উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হল বলে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, এখানকার অলংকার ‘একাবলি’।

### ২৮.৯.৩ ন্যায়মূলক অর্থালংকার

‘ন্যায়’-এর অর্থ যুক্তি তর্কবিচার। ‘ন্যায়দর্শন’ দর্শনই, কবিতা নয়। ‘ন্যায়’ বা যুক্তি-তর্ক-বিচার দর্শনের বিশ্লেষণের বিষয়, আলোচনার বিষয়, কিন্তু কবিতার বিষয় নয়। ওটা হতে পারে কবিতার একটা পদ্ধতি। এইরকম একটা পদ্ধতি হচ্ছে ‘সমর্থন’-এর প্রয়োগ। একটি কথা বলতে গিয়ে বা সেই কথার সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর একটি কথার সমর্থন আসতেই পারে। এলে সেইটিই হবে যুক্তি বা ‘ন্যায়’। সেই কথাটি ‘ন্যায়’-এর সহযোগে কবিতা হয়ে উঠলে অর্থাৎ সেই কথাটির সৌন্দর্য উপভোগ্য হলে তা হবে ন্যায়মূলক অর্থালংকার।

‘ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।

ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি

মধ্যে রাখে ব্যবধান।’

‘ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম’—এই কথাটি যে সত্য, তা প্রমাণ করার জন্য সমর্থনে এগিয়ে এল পরের কথাটি—বড় দুটি গাছেরই মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকে, ‘সমর্থন’ই এখানে যুক্তি বা ন্যায়। অলংকারও তাই ন্যায়মূলক।

‘যত বড় হোক, ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা।

আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।’

ইন্দ্রধনু বা রামধনু আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে বর্ণের সমারোহ নিয়ে ছড়ানো থাকে। দেখতেও ভালোই লাগে। কিন্তু তাতে লাভ কী? সে তো থাকে বহুদূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাছে থাকলে তবেই তো ভালোবেসে তৃপ্তি। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটাই সমর্থিত হচ্ছে দূরের ইন্দ্রধনুকে সরিয়ে রেখে কাছের প্রজাপতি-পাখাকেই ভালোবাসার অভ্যাসে। কবিরা এই পথেই কবিতায় ‘সমর্থন’ তৈরি করেন, এইভাবেই তৈরি হয় ন্যায়মূলক অলংকার।

### অর্থান্তরন্যাস

সংজ্ঞা : সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

বৈশিষ্ট্য :

১। এ অলংকারের বিশেষ লক্ষণ সমর্থন।

২। সাধারণত দুটি বাক্য থাকে, দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যকে সমর্থন করে।

৩। একটি বাক্যে সামান্য (বা সাধারণ বিবৃতি) থাকলে অন্য বাক্যে বিশেষ, একটি বাক্যে কারণ থাকলে অন্য বাক্যে কার্য।

৪। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের বিশেষের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের বিশেষ দ্বারা প্রথম বাক্যের সামান্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কারণের দ্বারা প্রথম বাক্যের কার্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কার্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের কারণের সমর্থন—সমর্থন এই চার রকমে হতে পারে।

উদাহরণ :

১। সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন—

হেন সহবাসে,

হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?

গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুস্মৃতি। —মধুসূদন

(মেঘনাদবধকাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত স্তবকে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্যে আছে একটি বিশেষ বিবৃতি—মেঘনাদের কাকা (‘পিতৃব্য’) বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে (‘হেন সহবাসে’) বর্বরতা শিখেছে। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যে ব্যক্তি নিম্নবুচির মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে (‘গতি যার নীচ সহ’) তার নিজের বুচিও নীচেই নেমে যায় (‘নীচ সে দুস্মৃতি’)। দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত মানব-স্বভাবের এই সামান্য বা সাধারণ নিয়মটি সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত বিভীষণের বর্বর হয়ে যাওয়ার পরিণামকে। সমর্থনসূচক বাক্যাংশ ‘বর্বরতা কেন না শিখিবে?’ সমর্থনকে আরও জোরদার করে তুলছে। অতএব, সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন থাকায় স্তবকটিতে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

২. বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন—

এ জগতে, হয়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—

রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। —রবীন্দ্রনাথ

(কাহিনী/দুই বিঘা জমি)

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত বাক্যদুটির প্রথম বাক্যে আছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যার বেশি বেশি আছে, সে আরও বেশি চায়। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি বিশেষ উদাহরণ—বাবুর মতো রাজারাই উপেনের মতো গরিবের ধন চুরি করে নেয়। স্পষ্টত, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ সত্যটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত সাধারণ সত্যকেই সমর্থন করছে। বিশেষের দ্বারা সামান্যের এই সমর্থন উদ্ভূত স্তবকে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

৩. কারণ দ্বারা কার্যের সমর্থন—

হায়, তাত, উচিত কি তব

এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশভুনিভ

কুস্তকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?

—মধুসূদন

(মেঘনাদবধ কাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : শত্রুপক্ষের লক্ষণকে নিকুন্তিলায় এনে নিজের বংশকে বিনাশ করে দেবার যে আয়োজন বিভীষণ ('তাত') করল, সে কাজের অনৌচিত্য-ঘোষণা (উচিত কি তব একাজ') উদ্ভূত স্তবকের প্রথম অংশে রয়েছে। স্তবকের পরবর্তী অংশে আছে বিভীষণের বংশকৌলিন্যের ব্যাখ্যা। এই বংশকৌলিন্যই পূর্ববর্তী অনৌচিত্যের কারণ। স্তবকের পরবর্তী অংশের অন্তর্গত এই কারণটি সমর্থন করছে পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্গত কার্যকে (অনৌচিত্যকে)। এই সমর্থন থেকেই স্তবকটিতে একটি অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

মন্তব্য : লক্ষ করার বিষয়, প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'এ কাজ' অর্থাৎ বিভীষণের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তার বংশগৌরবের অনুরূপ কার্য নয়, অভিজাত বংশের সন্তান বিভীষণের পক্ষে 'এ কাজ'-টি করার মধ্যে যে 'অনৌচিত্য' রয়েছে, সেইটিই এখানকার কার্য। এই কার্য সমর্থিত হচ্ছে বংশগৌরবের বর্ণনা দ্বারা।

৪. কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন—

দীন্ দুনিয়ার মালিক যেজন তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার।

মমতাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার! —মোহিতলাল

ব্যাখ্যা : উদ্ভূত স্তবকের প্রথম বাক্যের 'তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার!' বাক্যাংশে সংশয়াত্মক 'নাকি' শব্দ 'ন্যায়বিচার' কথাটির অর্থ উল্টে দিয়েছে। তার ফলে প্রথম বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় : দীন্ দুনিয়ার মালিকের ন্যায়বিচারের অভাব। এই অভাবের কারণেই দ্বিতীয় বাক্যের দুটি বাক্যাংশের অন্তর্গত কার্যে বৈষম্য—মৃত্যুর পর মমতাজেরই প্রতি সম্মান ('তাজের শিরোপা') আর নূরজাহানের প্রতি অবজ্ঞা ('কাফন সার') বরাদ্দ করে মালিক এই বৈষম্যই তাঁর বিচারে দেখালেন। অতএব, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত কার্য (মমতাজ-নূরজাহানে বিষম বিচার) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'ন্যায়বিচার'-এর প্রতি সংশয়কে অর্থাৎ ন্যায়বিচারের অভাবরূপ কারণকে। কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে উদ্ভূত উদাহরণে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে।

### ২৮.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রীতিমূলক অর্থালংকার

গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে শব্দ-বাক্যের আড়ালে। শব্দ-বাক্যের এক-একটা অর্থ থাকে, যা বোঝা যায় শব্দগুলি চেনা শব্দ হলেই। এই অর্থটা কথার বাইরের অর্থ। কিন্তু এই বাইরের অর্থে অনেক সময়ই কবির বক্তব্য ধরা পড়ে না, তখন কথাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ :

'কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে

ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'

এই বাক্যের প্রতিটি শব্দ চেনা শব্দ, বাক্যের অর্থও অতি সহজ। কিন্তু সমস্যাটা তখনই তৈরি হয়, যখন লক্ষ করি, 'কেরোসিন-শিখা' আর 'মাটির প্রদীপ'—বিদ্যুৎহীন গ্রাম-বাংলার এতদিনের অতি প্রয়োজনীয় এই দুটি বস্তুর গলা টিপে ধরলে তাদের মৃত্যু ঘটবে, তারা নিবেই যাবে, কিন্তু একটি কথাও বলবে না। জাদুর কৌশলে

পাথরের গণেশ দুধ খায়, প্লাস্টিকের পুতুল কথা বলে, কিন্তু মাটির প্রদীপ ভাই ভলে ডাকে অথবা কেরোসিন-শিখা গলা টেপার হুমকি দেয়, এমন দুঃসংবাদ কখনো শোনা যায়নি। কবির কথাটাই তখন প্রলাপের মতো শোনায়। অতএব বাইরের অর্থ এখানে মূল্যহীন। এখানেই জরুরি হয়ে ওঠে চেনা শব্দ-বাক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আর একটি অর্থ খুঁজে বার করা, যা কবির আসল বক্তব্য। ওই ভেতরের অর্থটাই গূঢ়ার্থ। সেই গূঢ়ার্থ যখন পাঠকেরক বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তার নাম গূঢ়ার্থপ্রতীতি। ‘গূঢ়ার্থের এই ‘প্রতীতি’ যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে অর্থের গুণে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। কৃঢ় অর্থের উজ্জ্বল আলোতে এসে ‘কেরোসিন-শিখা’ আর ‘মাটির প্রদীপ’ তখন গৃহকোণটিকে আলোকিত করার তুচ্ছ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, এসে দাঁড়ায় সমাজের বৃহত্তর অজ্ঞানে, নির্দেশ করে সমাজের দুটি স্তরকে। তখন তারা শুধু কথাই বলে না, কঠিন সত্যের উচ্চারণ হয়ে ওঠে।

### ব্যাজস্তুতি

সংজ্ঞা : ভাষায় বা বাইরের অর্থে (বাচ্যার্থে) যাকে নিন্দা বা স্তুতি বলে মনে হয়, গভীর অর্থে (গূঢ়ার্থে) যদি তা যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা বলে বোঝা যায়, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যাজস্তুতি অলংকার।

(নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।)

উদাহরণ :

১. নিন্দার ছলে স্তুতি—

(i) ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

ব্যাখ্যা : শিবকে নেশাখোর (ভাঙ্ খান) মাতাল (মত্ত) বলা হল। দুটি বিশেষণই নিন্দাসূচক। এ কথাও বলা হল, প্রতিটি বিষয়েই তাঁর অসন্তোষ, অতৃপ্তি। কেবলমাত্র বেলপাতা (বিল্বদল) পেলেই তিনি খুশি। সুতরাং, সব মিলিয়ে যে চরিত্রটি প্রকাশ পেল, তা সাধারণভাবে অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু ‘কেবল তুষ্ট বিল্বদলে’ কথাটির গভীরতর তাৎপর্য এই, অস্তরের ভক্তিত্বকু মিশিয়ে তাঁকে একটুখানি স্মরণ করলেই তিনি তুষ্ট। এ কারণে শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। তুষ্ট হলে যেকোনো কাম্যবস্তু অতি সহজেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। এইখানেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পরিচয়। বাক্যের নিন্দাসূচক ইজিত বাইরে থেকে পাওয়া গেলেও শিব প্রশংসিতই হলেন। নিন্দার ছলে স্তুতি প্রকাশ পেল বলে এখানকার অলংকার ব্যাজস্তুতি।

(ii) ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।

না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে।।

সংকেত : আমার স্বামী ভূত নাচিয়ে বেড়ান, এমন বিয়ে যিনি দিলেন, সেই নিষ্ঠুর বাপের মৃত্যু হলেই ভালো। এ অর্থ নিন্দাসূচক। কিন্তু, আমার স্বামী ভূতনাথ—দেবাদিদেব মহাদেব, এমন স্বামীর সঙ্গে যিনি আমাকে ধন্য করেছেন, তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি হিমালয় পর্বত। এ অর্থ স্তুতিবাচক। নিন্দার ছলে স্তুতি।

## ২. স্তুতির ছলে নিন্দা—

- (i) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,  
প্রচেতঃ !

—মধুসূদন

(মেঘনাদবধকাব্য/প্রথম সর্গ)

ব্যাখ্যা : ‘সুন্দর মালা’ যার গলায়, তিনিও সুন্দর, শ্রদ্ধেয়। অতএ, উদ্ভূত বাক্যের অন্তর্গত সম্বোধনে সমুদ্রের (প্রচেতঃ) প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করা হল, বাহ্যত তা স্তুতি বা প্রশংসার ভাষা। কিন্তু, বাইরের অর্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে (গূঢ়ার্থ) পৌঁছলেই বোঝায় যায়, এ ‘মালা’ আসলে বানরসৈন্যের তৈরি সেতু, যার বন্ধনে বাঁধা পড়ে অলঙ্ঘ্য অজেয় সমুদ্র আজ রামচন্দ্রের কাছে বন্দি। এ ‘সুন্দর মালা’র গূঢ়ার্থ পরাক্রান্ত সমুদ্রের পায়ে বাঁধা শিকল’। সমুদ্রের পক্ষে এ লজ্জার, নিন্দার বিষয়। ভাষায় যাকে স্তুতি বলে মনে হয়, অর্থে তা নিন্দা বলে বোঝা গেল। সুতরাং উদ্ভূত বাক্যে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়েছে।

- (ii) বন্ধু ! তোমার দিলে নাক দান  
রাজ সরকার রেখেছেন মান !

যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব’লে অ-মূল্যে নেন। —নজরুল ইসলাম

(সর্বহারা/আমার কৈফিয়ৎ)

ব্যাখ্যা : ‘রাজ সরকার’ (ইংরেজ সরকার) সত্যি যদি কবির লেখাকে অমূল্য সম্পদ (যার অসীম মূল্য) গণ্য করে থাকেন, তবে কবির পক্ষে অবশ্যই তা সম্মানের, শ্লাঘার বিষয় এবং এ আচরণ ইংরেজ সরকারের পক্ষে প্রশংসার বিষয়। তবে, এই অর্থটি উদ্ভূত স্তবকের বাইরের অর্থ (বাচ্যার্থ)। এই বাইরের অর্থে অবশ্যই রয়েছে ইংরেজ সরকারের প্রতি কবির স্তুতি। কিন্তু এই বাচ্যার্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে পৌঁছলেই বোঝা যাবে কবি প্রতি ইংরেজ সরকারের প্রকৃত আচরণটি। ‘অ-মূল্য’ শব্দটি প্রয়োগ করে (মূল্যহীন অর্থে) কবি ইঞ্জিত করলেন একটি তথ্যের দিকে—সরকার বিনামূল্যেই কবির লেখা সংগ্রহ করে নিয়েছিল ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের এই আচরণটি অবশ্যই নিন্দনীয়। গূঢ়ার্থে সেই নিন্দাই উচ্চারিত। অতএব, স্তবকটিতে রয়েছে ব্যাজস্তুতি।

### স্বভাবোক্তি

সংজ্ঞা : বস্তুর আচরণ এবং স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনা যখন ওই বস্তুটিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, তখন সেই বর্ণনা থেকে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার।

(বস্তুর স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনাই স্বভাবোক্তি।)

### উদাহরণ :

- (i) কী জানি দৈবাৎ  
এটা ওটা আবশ্যিক যদি হয় শেষে  
তখন কোথায় পাবে বিড়ুই বিদেশে ?  
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান ;



ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান  
 গুড়ের পাটালি ; কিছু বুনা নারিকেল ;  
 দুই ভাঙ ভালো রাই-সরিষার তেল ;  
 আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ—  
 এই-সব শিশিকোটা ওয়ুধবিষুধ ।  
 মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,  
 মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে। —রবীন্দ্রনাথ  
 (সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

(ii) মাল চেনাচেনি দল জানাজানি,  
 কানাকড়ি নিয়ে যত টানাটানি ; —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ব্যখ্যা : তিনটি বাক্যাংশে সম্পূর্ণ উদ্ভূত বাক্যাটিতে তিনটি ক্রিয়ার উল্লেখ আছে—‘মাল চেনাচেনি’, ‘দর জানাজানি’ আর ‘কানাকড়ি নিয়ে .....টানাটানি’। তিনটি ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়েছে কোনো বস্তু স্বভাবের তিনটি বিশেষ লক্ষণ। বস্তুস্বভাবের বর্ণনাটি ওই তিনটি লক্ষণের দ্বারা এতই সূক্ষ্ম সুন্দর এবং যথাযথ হয়ে উঠছে যে, বস্তুটি যে হাট, এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাট-ই বিশেষভাবে চিহ্নিত হচ্ছে। অতএব, এখানকার অলংকার স্বভাবোক্তি।

## ২৮.১০ সারাংশ-৩

### বিরোধমূলক :

কার্য-কারণ সম্পর্ক ঠিক রেখে কোনো ঘটনা যেমন ঘটবার কথা, তার উল্টোটা কোনো কবিতায় ঘটলেই বুঝব সেখানে ‘বিরোধ’ আছে। কিন্তু, এ বিরোধ বাইরের, ভেতরের অর্থে বিরোধ নেই। ‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে’—‘শিশুর পিতা’-র ঘুমিয়ে থাকার উল্টো ছবিতে ‘বিরোধ’। এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার—বিরোধমূলক অর্থালংকার।

বিরোধভাস : দুটি বস্তুর মধ্যে বাইরে থেকে বিরোধ দেখানো হলে বিরোধভাস। ‘গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়’—গ্রহীতা গ্রহণ করছে, দাতার ঋণ বাড়ছে, বাইরে থেকে এ কথায় রয়েছে বিরোধ। গ্রহীতা প্রেম যত গ্রহণ করছে, দাতা তত ধন্য হচ্ছে, ভেতরের এ অর্থ বুঝলেই বিরোধ মিলিয়ে যায়।

### শৃঙ্খলামূলক :

সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ, কাউন্টারের পাশে সারিবন্ধ ক্রেতা, আলমারির তাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর। কারণ শৃঙ্খলা। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসে শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্যই শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। ‘পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন, আর চুম্বনে মরণ’ ‘পরশ’ থেকে ‘চাহনি’-‘চুম্বন’ হয়ে ‘মরণ’-এ উত্তরণ—তিনটি বাক্যাংশের এই বিন্যাসে রয়েছে শৃঙ্খলা।

**একাবলি :** আগের বাক্য-বাক্যাংশের থাকা বিশেষ্য-বিশেষণের পরের বাক্য-বাক্যাংশে বিশেষণ-বিশেষ্য হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি। ‘.....কব্য বর্ণনাবহুল, .....বর্ণনা চিত্রবহুল, .....চিত্র বর্ণবহুল’—বিশেষণ ‘বর্ণনাবহুল’ থেকে বিশেষ্য ‘বর্ণনা’, বিশেষণ ‘চিত্রবহুল’ থেকে বিশেষ্য ‘চিত্র’।

**ন্যায়মূলক :**

‘ন্যায়’-এর একটি অর্থ যুক্তি। এই ‘ন্যায়’ বা যুক্তির সহযোগে কোনো কথা কবিতা হয়ে উঠলে সেই কথার সৌন্দর্য হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। ‘ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি / মধ্যে রাখে ব্যবধান’—ঈর্ষা যে বড়োর ধর্ম, এটা বোঝাতে দুটি বড়ো গাছের মাঝখানে-থাকা ফাঁকা জায়গার যুক্তি বা ‘ন্যায়ের’ সাহায্য নেওয়া হল।

**অর্থান্তরন্যাস :** একটি বাক্যের কথা (সামান্য বিশেষ কারণ বা কার্য) আর-একটি বাক্যের কথাকে (বিশেষ সামান্য কার্য বা কারণ) সমর্থন করলে অর্থান্তরন্যাস।

‘হেন সহবাসে .... বর্বরতা কেন না শিখিবে ? / গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি’—দ্বিতীয় বাক্যের কথা (নীচের সঙ্গে মিশলে নীচ হতেই হয়) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের কথাকে (রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে বিভীষণ তো বর্বরতা শিখবেই)।

**গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক :**

শব্দ-বাক্যের বাইরের তুচ্ছ অর্থ পেরিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল অর্থ (গূঢ়ার্থ) যখন পাঠকের বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতি অর্থের গুণে যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। ‘মাটির প্রদীপের পক্ষে ‘ভাই’ বলে ডাকা আর ‘কেরোসিন শিখার পক্ষে গলা টিপে দেওয়া—এই বাইরের অর্থটা তুচ্ছ, অর্থহীন। কিন্তু ভেতরের অর্থে সমাজের দুটি স্তরের প্রতীক হিসেবে এদের সম্পর্কটা বাস্তব, অর্থপূর্ণ। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতিতেই রয়েছে কথার সৌন্দর্য, অলংকার।

**ব্যাজস্তুতি :** বাইরের অর্থে নিন্দা বা স্তুতি থেকে ভেতরের অর্থে স্তুতি বা নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি। ‘ভাঙ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিশ্বদলে’—নেশাখোর মাতাল অসন্তুষ্ট শিবের প্রতি নিন্দা বাইরের অর্থে, ভক্তজনের কাছে আশুতোষ শিবের প্রতি স্তুতি ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে। ‘কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ’—সুন্দর মালা-পরা সমুদ্রের প্রতি স্তুতি বাইরের অর্থে, সেতুর বন্ধনে বন্দি সমুদ্রের প্রতি নিন্দা ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে।

**স্বভাবোক্তি :** বস্তুর স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা থেকে বস্তুটি বোঝা গেলেই স্বভাবোক্তি। ‘মাল চেনাচেনি’, ‘দর জানাজানি’, ‘কানাকড়ি নিয়ে ..... টানাটানি’—এ সব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বস্তুটি হাট। বাইরের বর্ণনা থেকে ভেতরের বস্তুটির বোধ জেগে-ওঠা, এটা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। এখানেই অলংকার।

---

## ২৮.১১ অনুশীলনী-৩

---

১. বিরোধ শৃঙ্খলা ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি—অর্থালংকারের এই চারটি লক্ষণ থেকে কীভাবে চারটি শ্রেণির অলংকার গড়ে ওঠে, একটি করে উদাহরণের সাহায্য নিয়ে সংক্ষেপে দেখিয়ে দিন।
২. কাকে বলে লিখন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—বিরোধাভাস, একাবলি, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি।
৩. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—
  - (ক) না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে।
  - (খ) পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি।  
আস্বে একটু চলনা ঠাকুর-ঝি।  
\*\* \*\* \* \* \*
  - জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরি ভাই—  
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?
  - (গ) গাছে গাছে ফল, ফুলে ফুলে অলি....
  - (ঘ) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।

## ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৮টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-১ পর্যায়ে। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাংলা কবিতার ছন্দ। আলোচনা মূলত ২টি ভাগ—ছন্দতত্ত্ব আর ছন্দ-বিশ্লেষণ। ছন্দতত্ত্বকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হল, চতুর্থ ভাগে রইল ছন্দ-বিশ্লেষণ। গোটা পর্যায়টিও ৪টি এককে বিভক্ত। প্রথম ৩টি এককে ছন্দতত্ত্ব, চতুর্থ এককে ছন্দ-বিশ্লেষণ। প্রতিটি এককের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এই রকম :

**একক ৩৩ :** বাংলা ছন্দের পরিভাষা এই এককের আলোচনার বিষয়। বাংলার দুই প্রথম সারির ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালীন ছন্দচর্চার ফসল থেকে তুলে আনা হয়েছে ৩৬টি পরিভাষা এর মধ্য থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষা বেছে নিয়ে দৃষ্টান্তসহ এদের ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল এই এককে। বাকি ১৩টি পরিভাষা ব্যবহারিক পর্যায়ের—প্রয়োগসূত্রে তাদের ব্যাখ্যা রয়েছে পরের এককগুলিতে।

**একক ৩৪ :** বাংলা ছন্দের ৩টি রীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল এই এককে। সবরকমের বাংলা কবিতার ছন্দ যে শেষপর্যন্ত ৩টি রীতির মধ্যে আবদ্ধ, এ বিষয়ে বিতর্ক না থাকলেও এদের নাম নিয়ে বিতর্ক এখনো টিকে আছে। সেই কারণে প্রবোধচন্দ্রের আর অমূল্যধনের দেওয়া চূড়ান্ত নামকরণ-দুটিই প্রতিটি রীতির ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হল, এই এককে দৃষ্টান্তসহ সেসব ব্যাখ্যাও করা হল সেইমতো।

**একক ৩৫ :** বাংলা কবিতার ছন্দবন্ধ এই এককে আলোচিত। ছন্দের রীতি কবিতার ছন্দের ভেতরকার পরিচয়, তার আলোচনা থাকবে একক-২এ। ছন্দবন্ধ ছন্দের বাইরের পরিচয়। বাংলা কবিতায় ছন্দের এই বাইরের রূপটি কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে একঘেয়ে প্রথার শাসন থেকে মুক্তি পেল, ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠল, তার দুটি-একটি দিক তুলে ধরা হল এই এককে। আলোচনা অবশ্য সীমিত রাখতে হল পয়ার, অমিত্রাক্ষর, আর চতুর্দশপদীর গণ্ডির মধ্যে।

**একক ৩৬ :** বাংলা কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ এই এককের বিষয়। আগের ৩টি একক থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলা কবিতার ছন্দ বিষয়ে যে-তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করলেন, তার সঠিক প্রয়োগ কী করে করতে হয়, কবিতার স্তবকে স্তবকে, প্রথমে তা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তারপর একে একে ৩২টি স্তবক নানা মেজাজের নানারকম কবিতা থেকে আহরণ করে তাদের ছন্দ-বিশ্লেষণ করে দেখানো হল এই এককে। অবশেষে, প্রতিটি এককের সংলগ্ন অনুশীলনীর উত্তর-সংকেত জুড়ে দেওয়া হল এই এককের সঙ্গে।

একক চারটি মনোযোগ আর সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে বাংলা কবিতার ছন্দতত্ত্ব আর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হতে পারবে, ছন্দবোধ আরো সমৃদ্ধ হতে পারবে, ছন্দ জিজ্ঞাসা বাড়বে এবং বাংলা ছন্দের খুঁটিনাটি নিয়ে জমে-ওঠা বিতর্ক-বিভ্রান্তি থেকে শিক্ষার্থীরা দূরে সরে থাকতে পারবেন।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে বিস্তর সাহায্য করছে এই ৩টি বই :

১. প্রবোধচন্দ্র সেন : নূতন ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৮৬)।
২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৮৩)।
৩. পবিত্র সরকার : ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ (১৯৯৯)।

---

## একক ৩৩ □ বাংলা ছন্দের পরিভাষা (প্রাথমিক পর্যায়)

---

গঠন

- ৩৩.১ উদ্দেশ্য
- ৩৩.২ প্রস্তাবনা
- ৩৩.৩ মূলপাঠ-১ : ছন্দ, তার উপাদান
  - ৩৩.৩.১ ছন্দ
  - ৩৩.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি
  - ৩৩.৩.৩ অক্ষর, দল
  - ৩৩.৩.৪ মাত্রা, কলা
  - ৩৩.৩.৫ ছেদ, যতি
- ৩৩.৪ সারাংশ-১
- ৩৩.৬ মূলপাঠ-২ : ছন্দের নানাবিভাগ
  - ৩৩.৬.১ পর্ব, পদ
  - ৩৩.৬.২ পর্বাজা, উপপর্ব
  - ৩৩.৬.৩ চরণ, পঙ্ক্তি
  - ৩৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক
- ৩৩.৭ সারাংশ-২
- ৩৩.৮ অনুশীলনী-২
- ৩৩.৯ মূলপাঠ-৩ : উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব
  - ৩৩.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ
  - ৩৩.৯.২ শ্বাসঘাত, প্রস্বর
  - ৩৩.৯.৩ তান, মিল
- ৩৩.১০ সারাংশ-৩
- ৩৩.১১ অনুশীলনী-৩
- ৩৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি-৩

---

### ৩৩.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন তাহলে—

- বাংলা কবিতার আশ্রয়ে গড়ে-ওঠা বাংলা ছন্দের তত্ত্ব যে আধুনিক বিজ্ঞানেরই আর-একটি শাখা হয়ে উঠতে পারে এ-রকম বিশ্বাস আপনার মনে তৈরি হবে।

- বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পথে বাংলা ছন্দতত্ত্বের সামনে যেসব তর্কের বাধা আছে, তা কমিয়ে আনার জন্য যুক্তি তথ্য খুঁজে নিতে পারবেন।
- বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরিভাষা প্রয়োগ করতে পারবেন।

## ৩৩.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ নিয়ে আলোচনার অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় ছন্দ নিয়ে বিতর্ক বাড়ানো, বিভ্রান্তি ছড়ানো। এর কারণ, বাংলা ছন্দতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি। সেই ফাঁকে ছন্দ-ভাবকেরা নতুন নতুন কথা বলেন, নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করে এর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেন। এতে করে ছন্দ-ভাবনার আয়তন ক্রমশ বাড়ে এ কথা ঠিক, কিন্তু সেই বাড়তে থাকা আয়তনে নতুন শিক্ষার্থীরা দিশাহার হয়ে পড়েন, পথ হারিয়ে ফেলেন। এ সমস্যার সমাধান—ছন্দকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করানো। এটা করতে গেলে আবশ্যিক এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা, যা সবার কাছে মান্য হতে পারে, যার প্রয়োগে বাংলা ছন্দের সূত্র এবং তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে একটিমাত্র রূপ নিয়ে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, অন্তর্বর্তী কালের ব্যবস্থা হিসেবে ততক্ষণ শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হতে পারেন বাংলা ছন্দচর্চায় অগ্রণী ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এঁদের তৈরি এবং বাবহার করা অনেকগুলি পরিভাষা বাঙালি ছন্দ-জিজ্ঞাসুর কাছে এখনো শ্রদ্ধেয়। এঁদের ছন্দ-ভাবনা দুটি পৃথক স্রোতে প্রবাহিত হলেও কিছু কিছু পরিভাষা দুজনের কাছেই গ্রাহ্য, অবশ্য অনেকগুলিই রূপে বা অর্থে পৃথক। এর মধ্যে যেসব পরিভাষা তর্ক এড়িয়ে এঁদের শেখানো পদ্ধতিকেই বুঝতে সাহায্য করে, তেমন কয়েকটি নেওয়া হল।

অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগে রয়েছে প্রায় ৫০টি প্রধান পরিভাষা (শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে)। দুজনের ভাগ প্রায় সমান সমান। এ থেকে বেছে নেওয়া হল ৩৬টি—কেবল অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ১০টি, কেবল প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ১৪টি, আর দুজনের মিলিত প্রয়োগ থেকে ১২টি। পরিভাষাগুলির মধ্যে আবার ২টি ভাগ—২৩টি প্রাথমিক পর্যায়ের, বাকি ১৩টি ব্যবহারিক পর্যায়ের। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রথম এককের বিষয়। ব্যবহারিক পর্যায়ের ১৩টি পরিভাষা ব্যাখ্যাসহ সরাসরি ব্যবহার করা হবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় এককে। প্রথম এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করা হল ৩টি পৃথক নামে। প্রথম অংশের নাম ‘ছন্দ, তার উপাদান’—এতে আছে ৯টি পরিভাষা, দ্বিতীয় অংশ ‘ছন্দের নানাবিভাগ’—এতে রয়েছে ৮টি, তৃতীয় অংশ ‘উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব’—এ আছে বাকি ৬টি পরিভাষার পরিচয়।

নির্বাচিত পরিভাষার তালিকাটি এইরকম (মোট ৩৬টি)—

১। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি :

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৯টি—দল, কলা, উপপর্ব, পদ, পঙ্ক্তি, শ্লোক, প্রস্বর, সংশ্লেষ, বিশ্লেষ।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৬টি—অক্ষর, ছেদ, পর্বাঙ্গ, চরণ, স্বাসাঘাত, তান।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৮টি—ছন্দ, বর্ণ, ধ্বনি, মাত্রা, যতি, পর্ব, স্তবক, মিল।

২। ব্যাবহারিক পর্যায়ে ১৩টি :

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৫টি—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, প্রবহমানতা, মুক্তক।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৪টি—স্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, চতুর্দশপদী।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৪টি—ছন্দরীতি, ছন্দবন্ধ, পয়ার, অমিত্রাক্ষর।

### ৩৩.৩ মূলপাঠ-১ : ছন্দ, তার উপাদান

ধরুন, আপনি একটি পাকা বাড়ি তৈরির কথা ভাবেননি। এর জন্য আবশ্যিক চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, লোহা—এ সব মাল-মশলা বা উপাদান। সঠিক অনুপাতে আর সঠিক পরিমাণে এদের মিশ্রণ আর সঠিক কৌশলে এদের প্রয়োগ ঘটলেই ক্রমশ গড়ে উঠবে একটি মজবুত বাড়ি। তেমনি, কবিতা লেখার উপাদান বর্ণ, কবিতা উচ্চারণের উপাদান ধ্বনি, অক্ষর বা দল। কবিতার ছন্দ নিয়ে যখন ভাবব, তখন কবিতার উপাদান হয়ে ওঠে ছন্দেরও উপাদান। কবিতার উপাদান ছাড়াও ছন্দ-গঠনের জন্য আবশ্যিক হয় ছন্দের নিজস্ব আরো কয়েকটি উপাদান—মাত্রা বা কলা আর যতি, প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ছন্দ-এর ভূমিকা। সেই কারণে, ছন্দ আর তার উপাদানগুলির পরিভাষা হবে প্রথম এককের মূলপাঠের প্রথম অংশের বিষয়। মূলত একই উপাদানকে নির্দেশ করে—এ রকম ১টি করে পরিভাষা বেছে নেওয়া হবে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে। প্রয়োগের দিক থেকে প্রতি জোড়া পরিভাষার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় পার্থক্য, তা আপনাদের দেখানো হবে দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে। ছন্দ-ই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়, অতএব শুরুতেই একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পরিভাষাটি বুঝে নিন। তারপর ক্রমশ জেনে নিন ছন্দের ৮টি উপাদানের পরিভাষা আর তাদের পরিচয়।

#### ৩৩.৩.১ ছন্দ

‘ছন্দ’ কাকে বলব, এই নিয়ে দুজন ছন্দসিকের দু-রকমের কথা শোনা যাক।

১। ‘যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়’ তাকে ‘ছন্দ’ বলতে চান অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২। ‘উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল ও আবর্তনময় বিন্যাসকে ‘ছন্দ’ বলতে চান পবিত্র সরকার।

প্রথম কথাটির অর্থ—যেভাবে কথার পর কথা সাজালে শুনতে ভালো লাগে, তারই নাম ছন্দ। অর্থাৎ, কথা নয়, কথা সাজানোও নয়, ছন্দ আসলে কথা সাজানোর এমন একটি কৌশল বা শৃঙ্খলা যার গুণে কথা মধুর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ—কথার উচ্চারণ, একটু থামা, আবার উচ্চারণ, আবার থামা—কথাগুলি আলাদা হলেও কথার উচ্চারণ আর বিরাম যদি পরপর একইভাবে বিশেষ একটি নিয়মে বা শৃঙ্খলায় ঘুরে ঘুরে আসে, তাহলে কথার এই বিশেষ নিয়মে ঘুরে-ঘুরে-আসা-টাই হবে ছন্দ।

তাহলে দেখছি, কেউ বলেন—কথা সাজানোর শৃঙ্খলাটাই ছন্দ, আবার কেউ বলতে চান—শৃঙ্খলার সঙ্গে কথা সাজানোটাই (বিন্যাসটাই) ছন্দ। মুখের ছন্দ বললে বুঝি কেবল মুখের গড়নটুকু, চলার ছন্দ বললে বোঝায় চলার ভঙ্গিটাই। কিন্তু, কবিতার ছন্দ বলতে বুঝব কথা সাজানো আর সাজানোর শৃঙ্খলা একই সঙ্গে।

কথার এই ছন্দ বক্তৃতায় থাকতে পারে, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের গদ্যে থাকতে পারে, কবিতায় তো থাকেই। আমরা যে ছন্দ নিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা করব, তা কেবল কবিতারই ছন্দ—আরো নির্দিষ্ট করে বলতে তা হবে কেবল বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

এবারে বাংলা কবিতার একটি অংশ পড়ে পড়ে বুঝে নিই, কথার উচ্চারণ আর বিরামের এই খেলাটি কী রকম—

নৌকা ফি সন		ডুবিছে ভীষণ		রেলো কলিশন		হয়	
হাঁটিতে সর্প		কুকুর আর		গাড়ি-চাপা-পড়া		ভয়	

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা ‘হাসির গান’ কাব্যের ‘নন্দলাল’ কবিতা থেকে নেওয়া এই দুটি ছত্রের প্রথম ছত্রটি পড়তে পড়তে ৪-বার থামলেন। ‘নৌকা ফি সন’ কথাটুকু উচ্চারণ করে একটু থামা, তারপর ‘ডুবিছে ভীষণ’ উচ্চারণ করে আর একটু থামা, এরপর ‘রেলো কলিশন’ উচ্চারণ ও আবার থামা, এবং সবশেষে ছোট্ট কথা ‘হয়’ উচ্চারণের পর একটু বেহাশি থামা (|- চিহ্নের জায়গায় কম থামা আর ||-চিহ্নের জায়গায় বেশি থামা)। এবারে দ্বিতীয় ছত্রটি পড়ুন। লক্ষ করুন, একইভাবে ‘হাঁটিতে সর্প’ ‘কুকুর আর’ ‘গাড়ি-চাপা-পড়া’—এই ৩টি কথার উচ্চারণের পর ৩ বার একটুখানি করে থামা, শেষ কথা ছোট্ট ‘ভয়’-এর উচ্চারণ করেই পুরোপুরি থামা।

এখন আন্দাজ করুন এক-একটি কথার উচ্চারণের মাপ। উচ্চারণ শুনতে শুনতে কানে খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে—প্রথম ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (নৌকা ফি সন, ডুবিছে ভীষণ, রেলো কলিশন) সমান মাপের, শেষ কথাটি (হয়) মাপে বেশ ছোটো। একইভাবে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর, গাড়ি-চাপা-পড়া) পাশাপাশি সমান মাপের, শেষ কথাটি (‘ভয়’) ছোটো। এবারে ওপরে-নীচে মিলিয়ে দেখুন, প্রথম ছত্রের কথাগুলি পরপর নীচের ছত্রের কথাগুলির সঙ্গে সমান মাপের (‘নৌকা ফি সন’ আর ‘হাঁটিতে সর্প’, ‘ডুবিছে ভীষণ’ আর ‘কুকুর আর’, ‘রেলো কলিশন’ আর ‘গাড়ি-চাপা-পড়া’, ‘হয়’ আর ‘ভয়’)। মাপগুলি অবশ্যই ইঞ্চি-সেন্টিমিটার বা মিনিট-সেকেন্ড ধরে নয়, কবিতার উচ্চারণ শুনে শুনে কান অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সহজেই আমাদের বোধে তখন তৈরি হয়ে যায় কথার মাপের আন্দাজ।

বাংলা কবিতার উদ্ভূত ছত্র দুটিতে আমরা এতক্ষণ কী দেখলাম? দেখা গেল, এখানে ৮টি কথা এমনভাবে সমাজানো যে প্রতিটি ছত্রেই সমান মাপের এক-একটি কথার উচ্চারণের পর একটি করে ছোটো মাপের বিরাম পর পর ৩-বার একইভাবে (উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম) ঘুরে ঘুরে আসে, শেষে ছোটো মাপের একটি কথার উচ্চারণের পর একটি বড়ো মাপের বিরাম। উচ্চারণ আর বিরামের এই ঘুরে ঘুরে আসা দুটি ছত্রে একইভাবে ঘটছে। কবি এমনি করে সাজিয়েছেন কথার উচ্চারণ আর বিরাম—একইভাবে পরপর ঘুরে ঘুরে আসার শৃঙ্খলায়। এই বিন্যাস আর শৃঙ্খলার গুণেই ছত্র দুটির অন্তর্গত কথাগুলি মধুর হয়ে শ্রোতার কানে বাজতে থাকে। তখনই তৈরি হয়ে যায় ছন্দ—কবিতার কথা শুনতে ভালোলাগার জাদু।



### ৩৩.৩.২. বর্ণ, ধ্বনি

আমরা যা উচ্চারণ করি, তা লিখতে গেলেই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। এই চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। কবিকেও কবিতা লিখতে হয় চিহ্নের পর চিহ্ন—বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়ে। অতএব, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস। যিনি কবিতা পড়েন, তিনি সাজানো বর্ণগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেই সেগুলি একটার পর একটা উচ্চারণ করতে থাকেন, ক্রমে ক্রমে গোটা কবিতাই পড়া হয়ে যায়।

তাহলে দেখা গেল, কবি তাঁর কবিতা লেখেন বর্ণ বিন্যাস করে, পাঠক সেই কবিতা পড়েন বর্ণের পর বর্ণ উচ্চারণ করে। বর্ণের এই উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। অতএব, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। পাঠক বর্ণ চোখে দেখে উচ্চারণ করেন, শ্রোতা সেই উচ্চারণ থেকে ধ্বনি শুনতে থাকেন।

অর্থাৎ, কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, ছাপাও হয় বর্ণ দিয়ে। কিন্তু, যখন তা পড়া হয়, তখন সেই কবিতা ধ্বনির সমষ্টি হয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছয়। সেই ধ্বনির বিন্যাস থেকেই তৈরি হয়ে যায় কবিতার ছন্দ, এবং তা ধরা পড়ে শ্রোতার কানে।

‘ধ্বনিবিজ্ঞান’-এর পাঠ থেকে ইতোমধ্যেই আপনারা জেনে নিয়েছেন বাংলা বর্ণ আর ধ্বনির কথা, ব্যবহারের দিক থেকে তাদের পার্থক্যের কথা (FBG 2 : একক ৭ : পৃ. ৬-৯)। বাংলায় আমরা ব্যবহার করি ১১টি স্বরবর্ণ (‘ঈ’ ব্যবহার করি না), কিন্তু উচ্চারণ করি ৭টি স্বরধ্বনি (অ আ ই উ অ্যা এ ও) ; ব্যবহার করি ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণ করি মাত্র ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি। তার অর্থ, আমাদের কবিরাজ বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করে থাকেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে. ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ (মোট ৫১টি)। কিন্তু, পাঠকের উচ্চারণে আর শ্রোতার কানে ধরা পড়ে ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি (মোট ৩৬টি)। বাংলা কবিতার ছন্দ তৈরি হয় এই ৩৬টি ধ্বনির নানারকম বিন্যাস থেকে। অতএব, ছন্দের হিসেব করতে গিয়ে আমরা কানের সাক্ষ্যই মানব, চোখের সাক্ষ্য (অর্থাৎ বর্ণ, বানান এসব) যেন বিভ্রান্ত না করে—সেদিকে সতর্ক থাকব।

এবারে শুনি বর্ণ আর ধ্বনি নিয়ে ছন্দসিকেরা কী কী বলেন। বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, আর ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ—এ কথা প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানেন। কিন্তু, ‘ধ্বনি’ বোঝাতে দুজনেই অনেক সময় ‘বর্ণ’ কথাটি প্রয়োগ করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র বর্ণকে বা ধ্বনিকে সরাসরি স্বর-ব্যঞ্জে ভাগ করেননি। তাঁর বর্ণ-বিভাগ এই রকম : বাংলা বর্ণের সব মিলিটে ৪টি শ্রেণি—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুধস্বর, আর ব্যঞ্জন। এটি আসলে তাঁর ধ্বনি বিভাগও, ‘বর্ণ’ কথাটির বদলে ‘ধ্বনি’ বসালেই হল। মুক্তস্বর ছ-টি—অ আ ই উ এ ও। যে কোনো মুক্তস্বর বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অন্য স্বরের সহায়তা ছাড়াই এদের উচ্চারণ সম্ভব। ই উ এ ও—এই চারটি স্বর কখনও কখনও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। তখনই তারা খণ্ডস্বর। তখন তাদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়। মুক্ত ‘আ’-এর পাশে খণ্ড ‘ই’ আশ্রয় নিলেই তৈরি হয় ‘আ-ই’ (খাই, নাই)। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তস্বরের দরজাটি রুদ্ধ হয়ে যায়, তৈরি হয় রুধস্বর ‘আই’। রুধস্বর হচ্ছে একটি মুক্তস্বর আর একটি খণ্ডস্বরের যৌথ উচ্চারণ। এমনি করে ৬টি মুক্তস্বর আর ৪টি খণ্ডস্বরের নানারকম মিলনে তৈরি হয় অন্ততপক্ষে ১৬টি রুধস্বর—অই (কই, সই), অউ (বউ) আও (যাও, খাও), ইউ (মিউ), উই (দুই), এই (সেই), ওএ (শোয়) ইত্যাদি। এই ১৬টি রুধস্বরধ্বনির মধ্যে কেবলমাত্র ‘অই’ আর ‘অউ’ ধ্বনির জন্য

বরাদ্দ আছে ‘ঐ’ আর ‘ঔ’ বর্ণ। রইল বাকি ব্যঞ্জন। এদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়—হয় আগে মুক্তস্বর পরে ব্যঞ্জন (অপ্, আখ্, ইট্, উট্), না হয় আগে ব্যঞ্জন পরে মুক্তস্বর (প, খা, টি, টু), অথবা আগে-পরে দুদিকেই মুক্তস্বর মাঝখানে ব্যঞ্জন (আদা = আ-দ্-আ, ইনি = ই-ন্-ই)। ব্যঞ্জন যখন উচ্চারণ করব, তখন তা হবে ব্যঞ্জনধ্বনি, আর যখন লিখবে, তখন তার নাম ব্যঞ্জনবর্ণ।

অমূল্যধনের বিচারে ‘বর্ণ’ হচ্ছে ‘লিখিত হরফ’। বর্ণকে বা ধ্বনিক তিনি অবশ্য পরোক্ষে স্বর আর ব্যঞ্জনেই ভাগ করেছেন। স্বরধ্বনি তাঁর কাছে দুটি জাতিতে বিভক্ত—মৌলিক আর যৌগিক। অ আ ই উ এ ও—এই ৭টি মৌলিক স্বর, ওই আই আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর। দেখা গেল, প্রবোধচন্দ্রের ৬টি মুক্তস্বরই অমূল্যধনের কাছে মৌলিক স্বরধ্বনি, অমূল্যধনের ‘অ্যা’-স্বরধ্বনিটি কেবল প্রবোধচন্দ্রের তালিকার বাইরে। আর, প্রবোধচন্দ্রের বৃদ্ধস্বরের সঙ্গেও অমূল্যধনের যৌগিক স্বরের পার্থক্য খুব বেশি নেই।

### ৩৩.৩.৩ অক্ষর, দল

‘ধ্বনিবিজ্ঞান’-এর পাঠ থেকে আপনারা বাগ্যন্ত্র আর ধ্বনির কথা আগেই জেনেছিলেন (FBG : একক ৭ পৃ. ৪-৫), ধ্বনির কথা একটু আগে আরো বিশদভাবে জানলেন। আমাদের এক একটা ধ্বনির উচ্চারণ আসলে বাগ্যন্ত্রের নানা অংশের মিলিত চেষ্টির ফল। তবে ধ্বনির উচ্চারণ সাধারণত একটা একটা করে হয় না। একটানা কথা বলতে গেলে ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে আমাদের কানে ধরা পড়ে না। বাগ্যন্ত্রের অংশগুলির একেবারের মিলিত চেষ্টির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২-টি-৩টি ধ্বনির একসঙ্গে উচ্চারণ হয়ে যায়, কখনো-সখনো একটি ধ্বনিরই উচ্চারণ হয়। একেবারের চেষ্টির যে-কটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, ইংরেজিতে তার নাম Syllable (beau-ti-ful), বাংলায় একে কেউ বলেন অক্ষর, কেউ বলেন দল।

একে অক্ষর বলেন অমূল্যধন। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি এই রকম : ‘বাগ্যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।’ ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে অক্ষর হচ্ছে বাক্যের অণু। একটি শব্দ ভাঙলে তা থেকে পাওয়া যাবে কয়েকটি অক্ষর। ‘জননী’ শব্দে অক্ষর আছে ৩টি—জ-ন-নী, ‘শরৎ’ শব্দে আছে ২টি অক্ষর—শ-রৎ। ‘গুঞ্জন’ শব্দেও ২টি অক্ষর—গুন্-জন্। এই ৩টি শব্দ ভেঙে যেসব টুকরো পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটিতেই আছে দুটি বা তিনটি করে ধ্বনি এবং তার উচ্চারণ হচ্ছে এককোঁকে (জ = জ-অ, ন = ন্-অ, নী = ন্-ই, শ = শ্-অ, রৎ = র্-অ-ৎ, গুন্ = গ্-উ-ন্, জন্ = জ্-অ-ন্)। এই ৭টি অক্ষরের মধ্যে ২টি শ্রেণি লক্ষ্য করুন। জ-ন-নী-শ—এদের শেষ ধ্বনিটি স্বরধ্বনি (অ-অ-ই-অ), রৎ-গুন্-জন্—এদের শেষে আছে ব্যঞ্জনধ্বনি (ৎ-ন্-ন্)। অমূল্যধন শ্রেণিদুটির নাম দিলেন ‘স্বরান্ত’ (শেষে স্বরধ্বনি আছে বলে) আর ‘হলন্ত’ (শেষে যার ব্যঞ্জনধ্বনি)। তবে অক্ষরের শেষধ্বনি যৌগিক স্বর হলেও তাকে হলন্ত-ই বলা হবে। যেমন ‘ভাসাই’ = ভাসাই—এখানে ‘ভা’-র শেষধ্বনি মৌলিক স্বর (আ) বলে এটি স্বরান্ত, আর ‘সাই’-এর শেষধ্বনি যৌগিক স্বর (আই) বলে এটি হলন্ত। অতএব, স্বরান্ত অক্ষরের শেষধ্বনি কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যৌগিক স্বর।

প্রবোধচন্দ্র Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘অক্ষর’ কথাটির বদলে ‘দল’ কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে ‘বাক্যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড’। ‘দল’ ‘ছন্দ’ আর ‘ছান্দসিক’

শব্দতিনটি ভেঙে তিনি দেখালেন ১টি (দল), ২টি (ছন্দ-দ) আর ৩টি (ছান্দ-দ-সিক) দল। প্রতিটি দলে থাকবে একটিমাত্র স্বরধ্বনি (মুক্ত বা বৃন্দ যা-ই হোক), ব্যঞ্জন থাক বা না-থাক। ‘অসি’, ‘আতা’, ‘ইতি’—এই ৩টি শব্দের প্রথমেই আছে একটিমাত্র মুক্তস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (অ-আ-ই), ‘ঐকান্তিক’ ‘ঔদরিক’ ‘আইবুড়ো’—এই ৩টি শব্দের প্রথমে রয়েছে একটিমাত্র বৃন্দস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (ঐ-ঔ-আই) ‘অগ্নি’, ‘আল্-তা’, ‘ইন্দু’ শব্দের প্রথম দলে (অগ্ন-আল্-ইন্দু) রয়েছে ১টি মুক্ত স্বরধ্বনি (অ-আ-ই) আর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (গ্ন-ল্-ন্)। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম মুক্তদল ; আর, যে দলের শেষে বৃন্দস্বর (বে = ব্-ঐ, গৌ = গ্-ঔ, সাই = স্-আই) বা ব্যঞ্জনধ্বনি (অ-গ্ন, আ-ল্, ই-ন্), তার নাম বৃন্দদল।

লক্ষ্য করুন, অমূল্যধনের ‘অক্ষর’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘দল’ একই। অমূল্যধনের ‘স্বরাস্ত অক্ষর’-ই প্রবোধচন্দ্রের ‘মুক্তদল’, আর অমূল্যধনের ‘হলস্ত অক্ষর’ প্রবোধচন্দ্রের কাছে ‘বৃন্দদল’। কাজের সুবিধার জন্য আমরা ‘দল’ কথাটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, এবং সাধ্যমতো সব বৃন্দদলই মোটা হরফে দেখানো হবে।

### ৩৩.৩.৪. মাত্রা, কলা

১. দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে
২. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসী ঘুম দিয়ে যাও
৩. বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
৪. ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
৫. জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা

৫টি কবিতা থেকে ৫টি ছত্র নেওয়া হল। প্রথম ছত্রটি উচ্চারণ করতে থাকুন। উচ্চারণ হবে এইরকম—‘দু-নু-দু-ভি বেজে ওঠে ডি-ম্ ডি-ম্ রবে’। অর্থাৎ, ‘দুন্’ ‘ডিম্’ ‘ডিম্’—এই ৩টি হলস্ত অক্ষর বা বৃন্দদলের উচ্চারণ হবে টেনে টেনে, আর দু ভি বে জে ও ঠে র বে — এই ৮টি স্বরাস্ত অক্ষর বা মুক্তদলের উচ্চারণ হবে কেটে কেটে। এবার দ্বিতীয় ছত্রটি উচ্চারণ করুন। একই বৃন্দদল ‘ঘুম্’-এর দুবার উচ্চারণ হচ্ছে দুভাবে—প্রথম ‘ঘুম্’-এর উচ্চারণ পা ডা নি মুক্তদল তিনটির মতোই কেটে কেটে—ঘুম্-পা-ডা-নি, দ্বিতীয় ‘ঘুম্’-এর উচ্চারণ ‘ঘু-ম্’ বা ‘ঘুউম্’—অর্থাৎ খানিকটা টেনে। তৃতীয় ছত্রে দলগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করুন বিষ-টি প-ড়ে টা-পুর টু-পুর ন-দেয় এ-ল বান্—১৩টি দলই উচ্চারিত হল একইভাবে কেটে কেটে, এর মধ্যে বিষ্ পূর্ পূর্ দেয় বান্—এই ৫টি বৃন্দদল, বাকি ৮টি মুক্তদল। চতুর্থ ছত্রে দেখুন : নে-র্ মে-ঘ্ দলদুটি বৃন্দদল, উচ্চারণ টেনে টেনে ; পুন্ অন্ দলদুটিও বৃন্দদল, কিন্তু উচ্চারণ কেটে কেটে (পুন্-জ, অন্-খ) ; প্রতিটি মুক্তদলেরই কাটা-কাটা উচ্চারণ। পঞ্চম ছত্রে একমাত্র বৃন্দদল ‘ভাগ্’ বাদে আর প্রতিটি দলই মুক্তদল (বা স্বরাস্ত অক্ষর)। কিন্তু, ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে দেখুন—না হে ভা ধা তা মুক্তদল হলেও তাদের উচ্চারণ টেনে টেনে, বাকি মুক্তদলগুলির উচ্চারণ কেটে কেটে। ‘ভাগ্’ অবশ্য বৃন্দদল (ভা-গ্ গ) এবং তার উচ্চারণ টেনে।

দেখা গেল, উদ্ভূত ৫টি ছত্রে সব শুম্ব ১৬টি বুম্বদল (বা হলন্ত অক্ষর), এর মধ্যে ৯টির উচ্চারণ কেটে কেটে, ৭টির উচ্চারণ টেনে টেনে ; অন্যদিকে সর্বমোট ৫৮টি মুক্তদলের (বা স্বরান্ত অক্ষরের) মধ্যে ৫৩টির উচ্চারণ কেটে কেটে, মাত্র ৫টির উচ্চারণ একটুখানি টেনে। এই হিসেব থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, মুক্তদলের সাধারণ কাটা-কাটা উচ্চারণ, কিন্তু বুম্বদলের উচ্চারণ দুভাবেই হতে পারে। কোন্ দলের উচ্চারণ কীরকম হবে, সে কথায় আমরা পরে আসব। তার আগে বুঝে নিই, এই দু-রকমের উচ্চারণে আসল তফাত-টা কী।

প্রথম ছত্রের ‘দুনুভি’ কথাটি আর একবার উচ্চারণ করে দেখুন। এর ৩টি দলের উচ্চারণ দু-ন্ দু ভি—‘দু-ন্’ এর এই টানা উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগে, ‘দু’ বা ‘ভি’-র উচ্চারণে সময় লাগে তার চেয়ে কম। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ‘ঘুম’-এর কাটা-কাটা উচ্চারণ যেন একটু আচমকা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তুলনায় দ্বিতীয় ‘ঘু-ম্’-এর উচ্চারণ হয় একটু টেনে, খানিকটা বাড়তি সময় নিয়ে। দল মুক্ত হোক বা বুম্ব হোক, কেটে কেটে উচ্চারণ সব ক্ষেত্রেই সব কম সময় নিয়ে, আর টেনে টেনে উচ্চারণ হলেই সময়ের ব্যয় হবে একটু বেশি। দলের উচ্চারণ-কালের এই কম-বেশিকে একটা হিসেবের মধ্যে ধরার জন্য এক ধরনের একক (Unit) তো চাই অনেকটা সেকেন্ড মিনিটের মতো। ছন্দ-বিজ্ঞানে এই এককই হল মাত্রা। এর অর্থ পরিমাণ বা মাপ, ছন্দের আলোচনায় এর অর্থ দল-উচ্চারণের মাপ। দলের উচ্চারণ যেখানে কাটা-কাটা, সময়ের ব্যয় সেখানে তুলনায় কম—দল সেখানে ১-মাত্রার। আর দলের উচ্চারণ সেখানে টেনে টেনে, তুলনায় একটু বেশি সময় নিয়ে,—সেখানে দল ২-মাত্রার।

এবারে চলুন ছান্দসিকদের দরবারে। অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধনিপরিমাণ। ‘মাত্রা’ নিয়ে দুই শীর্ষ ছান্দসিকের বিতর্ক যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন বিতর্ক এড়িয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার ‘মাত্রা’-কে দলের ‘ওজন’ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। আমরা অবশ্য খানিকটা অমূল্যধন-ঘেঁষা সময়ের মাপের দিকেই ঝুঁকছি, তবে সেই সঙ্গে দলের উচ্চারণের চরিত্রটিও মাথায় রাখছি (কেটে-কেটে উচ্চারণ আর টেনে-টেনে উচ্চারণ)। কেটে-কেটে উচ্চারণে সময় কম লাগে, টেনে-টেনে উচ্চারণে সময় লাগে বেশি।

একটু আগে বলেছিলাম, মুক্তদলের উচ্চারণ সাধারণত কাটা-কাটা, আর বুম্বদলের উচ্চারণ কেটে কেটেও হয়, টেনে টেনেও হয়। এ কথার অর্থ—মুক্তদল সাধারণ ১-মাত্রার, আর বুম্বদল ১-মাত্রার বা ২-মাত্রার। ঠিক কোন্ বুম্বদলে ১-মাত্রা বা ২-মাত্রা, অথবা কোন্ অবস্থায় মুক্তদলে ২-মাত্রা, এসব নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। তবে, কোন্ অক্ষরে বা দলে কত মাত্রা, এ নিয়ে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্র কার্যত কোনও বিরোধ নেই।

‘মাত্রা’র কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই যে ৫টি ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তর্গত দলগুলি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি এবং প্রতিটি দলের মাথায় মাত্রা-চিহ্ন বসিয়ে দিচ্ছি (যে-দলের উচ্চারণ ১-মাত্রায় তার মাথায় ১, যে-দলের উচ্চারণ ২-মাত্রায় তার মাথায় ২)। দলের ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে (হয় কেটে কেটে না-হয় টেনে টেনে) তার মাথায় বসানো মাত্রা সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে ছত্রগুলি একটা-একটা করে পড়তে চেষ্টা করুন।

১.	২	১	১	১	১	১	১	২	২	১	১			
	দু-ন্	দু	ভি	বে	জে	ও	ঠে	ডি-ন্	ডি-ন্	র	বে			
২.	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১			
	ঘুম্	পা	ড়া	নি	মা	সী	পি	সী	ঘু-ন্	দি	য়ে	যাও		
৩.	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১	১		
	বিষ্	টি	প	ড়ে	টা	পূর্	টু	পূর্	ন	দেয়	এ	ল	বান্	
৪.	১	১	২	১	১	২	১	১	১	১	১			
	ঈ	শা	নে-র্	পুন্	জ	মে-ঘ	অন্	ধ	বে	গে				
				১	১	১	১	১	১	১				
				ধে	য়ে	চ	লে	আ	সে					
৫.	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	২			
	জ	ন	গ	ণ	ম	ন	অ	ধি	না	য়	ক	জ	য়	হে
				২	১	১	২	১				১	২	২
				ভা	র	ত	ভা-গ্	গ				বি	ধা	তা

চেনার সুবিধার জন্য বুদ্ধদলগুলি মোটা হরফে ছেপে দেওয়া হল।

এবারে লক্ষ্য করুন—

প্রথম ছত্রে প্রতিটি মুক্ত দলে ১-মাত্রা, প্রতিটি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

দ্বিতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ১টি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

তৃতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, প্রতিটি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

চতুর্থ ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

পঞ্চম ছত্রে প্রতিটি হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

‘মাত্রা’র আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, মুক্তদল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১-মাত্রার, কম ক্ষেত্রেই ২-মাত্রার। বুদ্ধদল ১-মাত্রার হতে পারে, ২-মাত্রারও হতে পারে। ১-মাত্রার দলে হ্রস্ব উচ্চারণ, ২-মাত্রার দলে দীর্ঘ উচ্চারণ—সে দল মুক্ত হোক বা বুদ্ধ রোগ। অর্থাৎ, মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, দুটি-একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ হতে পারে, বুদ্ধদল হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিই, উচ্চারণ করে বুঝে নিন—

	১ ১	১ ১	২	২	১ ১	১ ১	২
১.	চলি	চলি	পা	পা	টলি	টলি	যায়
	১ ১ ১ ১	১ ১ ২	১ ১ ২		১ ১		
২.	ভালোমন্দ	দুখসুখ	অন্ধকার		আলো		

প্রথম দৃষ্টান্তে চ লি চ লি ট লি ট লি—প্রতিটি মুক্তদল হ্রস্ব, কিন্তু পা পা—দুটি মুক্তদল দীর্ঘ। আবার, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মন্ দুক্ অন্—তিনটি বৃন্দদল হ্রস্ব, কিন্তু সুখ কার—দুটি বৃন্দদলই দীর্ঘ।

দল হ্রস্ব হয় তখনই, যখন তার ভেতরকার ধ্বনি একটুখানি কুঁচকে যায়। আর, দলের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ ধ্বনিগুলির আয়তনে বেড়ে যাওয়া। এইরকম একটি কোঁচকানো বা হ্রস্ব দলের সমপরিমাণ ধ্বনির নাম প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন কলা। অর্থাৎ একটি হ্রস্বদলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, একটি দীর্ঘদলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। ওপরের দৃষ্টান্ত-দুটিতে ১-মাত্রার প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, মাত্রা আর কলার সম্পর্কটা দাঁড়াল এই রকম—প্রতিটি হ্রস্ব দলে থাকে প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ১-কলা, অমূল্যধনের হিসেবে ১-মাত্রা ; প্রতি দীর্ঘ দলে এঁদের হিসেবে ২-কলা বা ২-মাত্রা। অর্থাৎ, মাত্রা আর কলা কার্যত একই।

### ৩৩.৩.৫ ছেদ, যতি

গোড়ার দিকে ছন্দের সংজ্ঞা নিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের কথাটি আর একবার শুনো নিন। তাতে আছে ‘উচ্চারণ’ আর ‘বিরাম’-এর উল্লেখ। এই ‘বিরাম’ বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে থামাটাই কখনো ছেদ, কখনো যতি। গদ্য-পদ্য যা-ই হোক, পড়তে পড়তে বা উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে কম বা বেশি থামতে হয় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণ—না থামলে কথার অর্থ শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, দ্বিতীয় কারণ—না থামলে দমে কুলোয় না, তৃতীয় কারণ—থামলে কথা শুনতে ভালো লাগে। প্রথম আর দ্বিতীয় কারণ মূলত গদ্য পড়ার ক্ষেত্রে, কখনো কখনো পদ্যের ক্ষেত্রে খাটে, তৃতীয় কারণটি খাটে মূলত পদ্য পড়ার ক্ষেত্রে। প্রথম দুটি কারণে যে-থামা, তার নাম ছেদ, তৃতীয় কারণে থামার নাম যতি। তার মানে, গদ্য পড়তে পড়তে অর্থ-বুঝে-নেওয়া আর দম-ঠিক-রাখার দায়িত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে অনিয়মিত থামা—এর নাম ছেদ, আর কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম যতি।

নীচের গদ্যটুকু পড়ুন—

‘এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চারমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অনলংকৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বানপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকতে,

সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ থেকে নেওয়া এই গদ্য অংশ এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কতটা কষ্টসাধ্য, তা একটিবার পরীক্ষা করে দেখুন। আর, তেমন পড়ায় এ অংশে প্রসবণগিরির যে বর্ণনা রয়েছে, তাও স্পষ্ট হবে না। সেই কারণে লেখক নিজেই দাঁড়ি-সেমিকোলন-কমা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কোথায় কতটুকু থামতে হবে। কমা কম থামার চিহ্ন আর দাঁড়ি সেমিকোলন পুরো থামার চিহ্ন। এই থামাটাই ছেদ। ছেদচিহ্নগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় ছেদগুলি কতটা অনিয়মিত। ছেদের দ্বারা বিভক্ত ৭টি অংশ মাপে অনেকখানি ছোটো-বড়ো।

এবারে নীচের পদ্যটুকু পড়ুন—

দিনের আলো | নিবে এল | সূর্যি ডোবে | ডোবে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | চাঁদের লোভে | লোভে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

প্রথম ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম-থামা, শেষে পুরো থামা।

দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম থামা, শেষে পুরো থামা।

প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ৩-বার করে থামার ফলে ৪টি করে টুকরো হল। প্রথম ৩টি টুকরো সমান মাপের (প্রতিটি ৪-মাত্রার), শেষেরটি ছোট (২-মাত্রার)। অর্থাৎ, এক-একটি ছত্র উচ্চারণ করার ফাঁকে ফাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে (এখানে ৪-মাত্রার পরে) নিয়মিত থামছি, শেষে আরো ২-মাত্রার উচ্চারণের পর পুরোপুরি থামছি। এই থামাটাই যতি। যতির পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন, শুনতে ভালোলাগার আকাঙ্ক্ষা। অতএব, ছন্দ বুঝতে গেলে ‘যতি’-কেই নিখুঁতভাবে চিনতে হবে, ‘ছেদ’-কে তোয়াক্কা না করলেও চলবে।

অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। এক-একটি ছত্রের মাঝখানে একদাঁড়ি (।)-চিহ্ন দিয়ে দেখানো কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি, জোড়াদাঁড়ি (।।)-চিহ্নে দেখানো পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি। প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির ১০টি নাম—অনুযতি বা দলযতি, উপযতি বা উপপর্বযতি, লঘুযতি বা পর্বযতি, অর্ধযতি বা পদযতি, পূর্ণযতি বা পঙ্ক্তিযতি। এর মধ্যে ৩টি নাম আমাদের কাজে ব্যবহার করা হবে—পর্বযতি (অমূল্যধনের অর্ধযতি), পদযতি আর পঙ্ক্তিযতি (পূর্ণযতি)। এদের পরিচয় ক্রমশ জানবেন।

### ৩৩.১.৪. সারাংশ-১

**ছন্দ :** বাংলা কবিতার পদ্যে কথার পর কথা এমনভাবে সাজানো থাকে যে, কথার উচ্চারণ আর বিরাম পর পর একইভাবে ঘুরে ঘুরে আসে। এই কথা-সাজানো আর সাজানোর কৌশল বা শৃঙ্খলা—এই নিয়েই তৈরি হয় বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

**বর্ণ, ধ্বনি :** লিখতে গিয়ে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়, তার নাম হরফ বা বর্ণ। আর, বর্ণের উচ্চারিত রূপের নাম ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। অর্থাৎ, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, পড়া হয় ধ্বনি দিয়ে।

বাংলা কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, পাঠক উচ্চারণ করেন ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রবোধচন্দ্র বাংলা বর্ণ আর ধ্বনিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, বৃন্দস্বর আর ব্যঞ্জন। অমূল্যধন ভাগ করেছেন ২টি শ্রেণিতে—স্বর আর ব্যঞ্জন, স্বরের ২টি ভাগ—মৌলিক আর যৌগিক। প্রবোধচন্দ্রের মুক্তস্বর আর অমূল্যধনের মৌলিক স্বর প্রায় এক, বৃন্দস্বর আর যৌগিক স্বরেও তেমন পার্থক্য নেই।

**অক্ষর, দল :** বাগ্যন্ত্রের একেবারের চেষ্টায় যে একটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, অমূল্যধন তাকে বলেন ‘অক্ষর’, প্রবোধচন্দ্র বলেন ‘দল’। যেসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তার নাম অমূল্যধনের ভাষায় ‘স্বরান্ত অক্ষর’। অক্ষরের শেষধ্বনি ব্যঞ্জন বা যৌগিক স্বর হলে তিনি তাকে বলেন ‘হলন্ত অক্ষর’। অন্যদিকে, প্রবোধচন্দ্রের ভাষায়—দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর হলে তা ‘মুক্তদল’, আর বৃন্দস্বর বা ব্যঞ্জন বলে তার নাম ‘বৃন্দদল’। অতএব, যা ‘অক্ষর’ তা-ই ‘দল’, যা ‘স্বরান্ত অক্ষর’ তা-ই ‘মুক্তদল’, যা ‘হলন্ত অক্ষর’ তাই ‘বৃন্দদল’।

**মাত্রা, কলা :** ‘মাত্রা’ কথাটির সাধারণ অর্থ পরিমাণ বা মাপ। ছন্দের আলোচনায় এর অর্থ দল বা অক্ষর উচ্চারণের মাপ, অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভাষায় ‘দলের ওজন’। যে দলের উচ্চারণ কেটে কেটে, তার মাপ বা ওজন কম—দল সেখানে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার। যে দলের উচ্চারণ টেনে টেনে, তার মাপ বা ওজন তুলনায় বেশি—দল সেখানে দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর সাধারণত ১-মাত্রার, বৃন্দদল বা হলন্ত অক্ষর কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার।

অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কাল পরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনি-পরিমাণ। দলের ভেতরকার ধ্বনি কুঁচকে গেলে দল হয় হ্রস্ব। এই রকম হ্রস্ব দলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা। দলের ধ্বনি আয়তনে বাড়লে দল হয় দীর্ঘ, এ রকম দলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, অমূল্যধনের ‘মাত্রা’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘কলা’-র মধ্যে কার্যত কোনও পার্থক্য নেই।

**ছেদ, যতি :** কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝে নেওয়া আর দাম ঠিক রাখা—এই ২টি প্রয়োজনে গদ্য বা পদ্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে অনিয়মিত যে থামা, তার নাম ‘ছেদ’। আর, কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নিয়মিত যে থামা, তরা নাম ‘যতি’। ছেদের জায়গা বোঝানোর জন্য



২-রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়—কম থামার চিহ্ন কমা (,) আর পুরো থামার চিহ্ন দাঁড়ি ;  
সেমিকোলন (।;) ইত্যাদি। অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—কম থামার নাম  
অর্ধযতি, পুরো থামার নাম পূর্ণযতি। অর্ধযতির চিহ্ন (।), পূর্ণযতির চিহ্ন (।।)।

### ১.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ১০৪ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন :

ছন্দ, দল, মাত্রা।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন :

বর্ণ আর ধ্বনি, মাত্রা আর কলা, ছন্দ আর যতি।

২. (ক) ছন্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(খ) ছন্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(গ) প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কীভাবে দল বা অক্ষরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা লিখুন :

স্বরান্ত অক্ষর, হলন্ত অক্ষর, মৌলিক স্বর, যৌগিক স্বর।

(খ) নীচের ৪টি ছত্রে প্রতিটি দল পৃথক করে দেখান এবং জলের মাথায় মাত্রা-সংখ্যা বসিয়ে দিন :

i) বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান

ii) সান্দ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়

iii) ঝর্ণা, ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা

iv) বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়

(গ) অর্ধযতি আর পূর্ণযতির চিহ্ন বসিয়ে দিন :

i) কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল

মঞ্জুরী চীরহি ঝাঁপি

ii) আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে

মুঞ্চললিত অশ্রুগলিত গীতে

- iii) হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
- iv) যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
- (ঘ) শূন্যস্থান পূরণ করুন :
- i) \_\_\_\_\_ চোখে দেখার জিনিস, \_\_\_\_\_ কানে শোনার জিনিস।
- ii) মাত্রাকে অমূল্যধন বলেন \_\_\_\_\_, প্রবোধচন্দ্র বলেন \_\_\_\_\_।
- iii) \_\_\_\_\_ র সমপরিমাণ ধ্বনির নাম কলা।
- iv) \_\_\_\_\_ র পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন।
- v) কথার অর্থ শ্রোতার কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য যে থামা, তার নাম \_\_\_\_\_।

## ৩৩.৬ মূলপাঠ : ছন্দের নানা বিভাগ

এত সমুদ্র জল টুকরো করতে করতে শেষপর্যন্ত এক ফোঁটা জল হাতে তুলে নেওয়া হয়। নোনা জলের নুনটুকু সরিয়ে বিশুদ্ধ জলের ফোঁটাকেও ভাঙতে ভাঙতে জলের অণু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেনা। এমন কী, ঐ অণুটিকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণুও পেয়ে যেতে পারেন। একইভাবে একটি কবিতাকে যদি টুকরো করতে থাকেন, তাহলে পৌঁছে যাবেন একটি অক্ষর বা দলের (Syllable) উচ্চারণে, আর, দলটিকেও ভাঙলে পাওয়া যাবে কয়েকটি ধ্বনি। দল যেন কবিতার অণু, ধ্বনি তাহলে পরমাণু। উল্টোদিক থেকে ভাষা যায় কয়েকটি পরমাণু মিলেমিশে যেমন অণুর গঠন, অসংখ্য অণুর জোড় লেগে যেমন এক-একটি পদার্থ তৈরি হতে পারে, তেমনি করে কয়েকটি ধ্বনির এক ঝাঁকে উচ্চারণে দল, আর দলের পর দলের উচ্চারণ হতে হতেই অবশেষে একটি গোটা কবিতার উচ্চারণ কানে বেজে ওঠে। এই ধ্বনির উচ্চারণ থেকে কবিতার উচ্চারণ হয়ে ওঠার পথে নানারকম ছন্দ-বিভাগ পেরোনোর ঘটনা ঘটে যায়। এই বিভাগগুলি চিনে নেওয়াই আমাদের এখনকার কাজ। উচ্চারণে প্রথম ধাপে ‘ধ্বনি’ আর ‘দল’ (বা ‘অক্ষর’)-কে ছন্দের মূল উপাদান হিসেবে আপনারা জেনেছেন। এবারে ক্রমে ক্রমে জেনে নিন পরের বিভাগগুলির কথা—ছন্দসিকেরা যাদের নাম দিয়েছেন, পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব, পর্ব বা পদ, চরণ বা পঙ্ক্তি, শ্লোক বা স্তবক। সেইসঙ্গে ক্রমশ বুঝে নিন—যাতে কীভাবে উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দ-বিভাগ বলে চিনিয়ে নেয়।

### ৩৩.৬.১ পর্ব, পদ

রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্য থেকে ‘বিস্তি পড়ে টাপুর টুপুর’ কবিতার প্রথম ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

দিনের আলো । নিবে এল । সূর্য ডোবে । ডোবে ॥ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

পর পর ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে কম-থামার জায়গাগুলি আর শেষে একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) দিয়ে পুরো-থামার জায়গাটি চিহ্নিত করা হল। এর ফলে কবিতার ছত্রটি ৪টি টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল—৩টি সমান, শেষেরটি ছোটো। এই এক-একটি টুকরোই এক-একটি পর্ব। ‘পর্ব’ নিয়ে আরো বিশদ আলোচনায় একটু পরে আসছি। যে ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে ছত্রটিকে ৪টি পর্বে ভাগ করা হল তাকে অমূল্যধন বলেন ‘অর্ধযতি’-র চিহ্ন, প্রবোধচন্দ্র বলেন ‘পর্বযতি’-র চিহ্ন। ছত্রশেষের একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) অমূল্যধনের দেওয়া নাম ‘পূর্ণযতি’-র চিহ্ন। পরপর ২টি যতির মাঝখানে রয়েছে এক-একটি পর্ব।

প্রথম ৩টি পর্ব যে সমান তার কারণ, প্রতিটি পর্বেই আছে ৪টি করে মাত্রা। প্রতিটি দলের মাথায় ১ বসিয়ে মাত্রা নির্দেশ করছি, উচ্চারণ করে করে প্রতিটি দলের ১-মাত্রা বুঝে নিতে চেষ্টা করুন—

$$\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 1 & & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & & \\ \hline \end{array} \parallel = 8+8+8+2$$

আগেই জেনেছেন মুক্তদল (বা স্বরাস্ত্র অক্ষর) সাধারণত ১-মাত্রার, বৃন্দদল (বা হলস্ত্র অক্ষর) কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার। এখানে লক্ষ করুন—প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রার বটেই, এমনকী প্রতিটি বৃন্দদলও (নের, সুজ্) ১-মাত্রারই হয়েছে।

লক্ষ্য করছেন, ছত্রটির পর্ব বিভাগ করে ২-রকম মাপের পর্ব পাওয়া গেল—৪-মাত্রার ৩টি আর ২-মাত্রার ১টি পর্ব। ৪টি পর্বের মধ্যে ৪-মাত্রার পর্ব ৩-বার ঘুরে ঘুরে এল পর পর। অতএব, ৪-মাত্রার পর্বই ছত্রটির মূলপর্ব, মাপের দিক থেকে এটি পূর্ণ। এর নাম পূর্ণপর্ব। ছত্রের শেষ পর্বটি ‘পূর্ণপর্বের চেয়ে ছোট মাপের—২-মাত্রার। অতএব, পর্বটির নাম অপূর্ণপর্ব এবার নীচের ছত্রদুটি পড়ুন—

$$\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 1 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & & \\ \hline \end{array} \parallel = 8+8+10$$

এতে আছে ৩টি পর্ব—প্রথম ২টি পর্ব পরপর ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ১০-মাত্রার। ৮-মাত্রার পর্ব ঘুরে ঘুরে এল ২-বার পরপর। অতএব, ৮-মাত্রাই এখানে মূল পর্বের পুরো মাপ, ৮-মাত্রার পর্বই ‘পূর্ণপর্ব’। অথচ, শেষ পর্বটির ১০-মাত্রা পূর্ণপর্বের মাপ ছাড়িয়ে গেছে। অমূল্যধনের পথ ধরে এ-পর্বকে বলা হবে ‘অতিপূর্ণ পর্ব’।

$$\begin{array}{c|c|c|c} 2 & 1 & 1 & \\ \hline 2 & 1 & 1 & \\ \hline 2 & 1 & 1 & \\ \hline 2 & 1 & 1 & \\ \hline \end{array} \parallel = 6+2$$

প্রথম ছত্রটিতে প্রথম পর্ব ৬-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব ২-মাত্রার। কোনও পর্বই ঘুরে ঘুরে আসে নি। তবু প্রথম পর্বকেই গণ্য করা হবে পূর্ণপর্ব বলে। দ্বিতীয় পর্ব পূর্ণপর্বের চেয়ে মাপে ছোটো বলে অপূর্ণপর্ব হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় ছত্রে অবশ্য ৬-মাত্রার পর্ব পর পর ৩-বার ঘুরে ঘুরে এসে পূর্ণপর্ব হবার দাবি কায়ম করেছে। শেষপর্ব তার চেয়ে ছোটো বলে অবশ্যই অপূর্ণপর্ব। কিন্তু, লক্ষ করুন, ২টি ছত্রেরই শুরুতে বৃন্দদল (নের) মধ্যে ১টি করে ২-মাত্রা মাপের ছোটো পর্ব রয়েছে। পর্বদুটি ছন্দের হিসেবের বাইরে, ছন্দের পক্ষে যেন খানিকটা বাড়তি বোঝা, না থাকলেও ছন্দের ক্ষতি হত না। এ ধরনের পর্বকে ছান্দসিকেরা বলে অতিপর্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছত্রের শুরুতেই এসব পর্ব কবির বাসন, কখনও কখনও ছত্রের মাঝখানে—

ভবের গাছে । বেঁধে দিয়ে (মা) । পাক দিতেছ । অবিরত ।।  
‘মা’ এখানে ছত্রটির মাঝখানে-থাকা ‘অতিপর্ব’।

কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি আর পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি—অমূল্যধনের হিসেবমতো এই ২-রকম থামা বা যতির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ্য করলেন আর এক রকমের থামা বা যতি, যা কম-থামার চেয়ে একটু বেশি, অথচ পুরো-থামার চেয়ে একটু কম। এর নাম ‘পদযতি’। অমূল্যধনের অর্ধযতিকে প্রবোধচন্দ্র বলেন পর্বযতি। অর্ধযতি বা পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখায়। তেমনি পদযতির কাজ পদ-বিভাগ করে দেখানো। পদযতি পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামায়। একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে অমূল্যধন দেখান পূর্ণযতি, প্রবোধচন্দ্র দেখান পদযতি। ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’-এর ছত্রটিতে (।) চিহ্ন দিয়ে দেখানো পদযতিটি চিনে নিন। ক্রমশ বুঝে নিন পদ-বিভাগের তত্ত্ব, পর্ব আর পদের পার্থক্য—

$$\begin{array}{cccc|cccc||cc|cc|cc} ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ \\ \text{দিনের} & \text{অলো} & & & \text{নিবে} & \text{এল} & & & \text{সুজ্} & \text{জি} & \text{ডোবে} & & & \text{ডোবে} & & \\ & & & & & & & & & & & & & & & & \end{array} = (8 + 8) + (8 + 2)$$

পদযতি (||) এখানে ছত্রটিকে ২ টি খণ্ডে ভাগ করেছে, এক-একটি খণ্ড এক-একটি ‘পদ’। প্রথম পদ তৈরি হয়েছে ২ টি সমান মাপের পর্ব নিয়ে (৪+৪), দ্বিতীয় পদ তৈরি হয়েছে ২ টি ছোটো-বড়ো পর্ব নিয়ে (৪+২)। অতএব, পর্বের চেয়ে ‘পদ’ বড়ো মাপের খণ্ড। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয়ে এক একটি ‘পদ’। ছত্রটিতে আছে ৪ টি পর্ব, কিন্তু ২ টি পদ।

লক্ষ্য করুন, ওপরের ছত্রটিতে পর্বের মাপ অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবমতো একই (প্রথম ৩ টি ৪-মাত্রার, শেষেরটি ২-মাত্রার)। অতএব, অমূল্যধনের ২ টি করে ‘পর্ব’ নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রবোধচন্দ্রের এক-একটি ‘পদ’।

এবারে পড়ুন ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যেরই আর-একটি কবিতা ‘প্রাণ’-এর দ্বিতীয় ছত্রটি—

‘মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’।

ছত্রটির পর্ব-বিভাগ আর পদ-বিভাগ প্রবোধচন্দ্র করবেন এইভাবে—

$$\begin{array}{ccc|cc||cccc|c} ১ & ১ & ২ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ১ & ২ \\ \text{মানবের} & & & \text{মাঝে} & \text{আমি} & & & \text{বাঁচিবারে} & & \text{চাই} & \\ & & & & & & & & & & \end{array} = (8+8) + (8+2)$$

প্রথম ৩ টি পর্বের মাপ ৪-মাত্রা করে, শেষপর্ব ২-মাত্রার। আর প্রথম পদটির মাপ ৮-মাত্রা (৪+ ৪), দ্বিতীয় পদের মাপ ৬-মাত্রা (৪+২)।

অন্যদিকে, অমূল্যধনের পর্ব-বিভাগ হবে এইরকম—

$$\text{মানবের} \quad \text{মাঝে} \quad \text{আমি} \quad | \quad \text{বাঁচিবারে} \quad \text{চাই} \quad || = ৮+৬$$

প্রথম পর্ব ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ৬-মাত্রার।

ওপরের ছত্রটির ছন্দ-বিভাগ থেকে প্রবোধচন্দ্রের ‘পর্ব’ আর ‘পদ’-এর সঙ্গে অমূল্যধনের পর্বের সম্পর্ক বিষয়ে ২ টি কথা লক্ষ্য করুন :

- (১) পূর্ণপর্ব প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে এখানে ৪-মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ৮-মাত্রার। অর্থাৎ, দুই ছন্দসিকের পর্বের মাপ দু-রকম।
- (২) প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২টি পদ ৮ আর ৬ মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ২টি পর্ব ৮ আর ৬ মাত্রার। অর্থাৎ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে যা ‘পদ’, অমূল্যধনের কাছে তা ‘পর্ব’।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই : ‘পর্ব’ আর ‘পদ’ নিয়ে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের হিসেবে আছে কিছু মিল, কিছু গরমিল। দুজনের ‘পর্ব’ কখনও সমান, কখনো ছোটো-বড়ো। সেই কারণে, প্রবোধচন্দ্রের ‘পদ’ কখনো অমূল্যধনের ‘পর্বের’ সমান, কখনো বড়ো। ‘পদ’-এর কথা অমূল্যধন ভাবেননি।

### ৩৩.৬.২ পর্বাঙ্গা, উপপর্ব

‘পর্ব’, সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে গেল। বোঝা গেল, কবিতার একটি ছত্র উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে যে যতি পড়ে (অর্থাৎ থামতে হয়), সেই যতির জায়গাটিতে এক-একটি পর্ব তৈরি হতে থাকে। পর্বগুলি পাশাপাশি সমান হবার কথা, তবে শেষপর্ব ছোটো (বা বড়ো) হতে পারে।

এই ‘পর্ব’-কে মাঝখানে রেখে ছন্দসিকেরা একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে ছোটো, আর একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে বড়ো ছন্দ-বিভাগের কথাও ভেবেছেন। ছোটো মাপের বিভাগচাই আগে দেখুন। ‘দিনের আলো’ দিয়ে শুরু-করা ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

১	১	১	১		১	১	১	১		১	১	১	১		১	১	
দিনের		আলো			নিবে		এল			সুজ্জি		ডোবে			ডোবে		

‘দিনের আলো’ পর্বটির ‘দিনের’ ‘আলো’—এই দুটি অংশে ভাগ হয়ে উচ্চারণ হচ্ছে। ফলে ৪-মাত্রার পর্বটি ২ + ২ মাত্রায় আবার ২টি টুকরো হচ্ছে। একইভাবে ‘নিবে এল’ আর ‘সুজ্জি ডোবে’ পর্বদুটিও ২ + ২ মাত্রায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শেষের ‘ডোবে’ পর্বটি অবশ্য ২-মাত্রাতেই থেকে গেল, ভাগ হল না। পর্বের এই ভাগগুলিকে অমূল্যধন বলেন ‘পর্বাঙ্গা’ (=পর্বের অঙ্গ), প্রবোধচন্দ্র বলেন উপপর্ব (=পর্বের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বিভাগ)। ‘পর্বাঙ্গা’র চিহ্ন (:), ‘উপপর্বের চিহ্ন (::)। এই চিহ্ন দিয়ে ছত্রটি সাজিয়ে দেখুন—

পর্বাঙ্গা : দিনের : আলো | নিবে : এল | সুজ্জি : ডোবে | ডোবে

উপপর্ব : দিনের : আলো | নিবে : এল | সুজ্জি : ডোবে | ডোবে

অমূল্যধনের ‘পর্বাঙ্গা’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘উপপর্ব’ পর্বেরই এক-একটি ভাগ। কিন্তু, পর্বাঙ্গা আর উপপর্ব সবসময় হুবহু এক নয়। এর কারণ, অমূল্যধনের ‘পর্ব’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘পর্ব’ সবসময় মাপে এক হয় না। কেন হয় না তা আমরা পরে দেখব। ‘দিনের আলো’-র ছত্রটিতে অবশ্য প্রথম ৩টি পর্ব দুজনের হিসেবেই সমান

মাপের (৪-মাত্রার), সে-কারণে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও সমান হতে পেরেছে (২-মাত্রার)। কিন্তু নীচের ছত্রটিতে দেখুন—

পর্বাঙ্গ : একা দেখি : কুল বধু | কে বট : আপনি || = (৪+৪) + (৩ + ৩)

উপপর্ব : একা : দেখি | কুল : বধু || কে বট : আপনি = (২+ ২) + (২+ ২) + (৩+ ৩)

অমূল্যধনের হিসেবে ছত্রটিতে ২ টি পর্ব, প্রথমটি ৮-মাত্রার। ৮-মাত্রার প্রথম পর্বে পাওয়া গেল ৪-মাত্রার ২ টি পর্বাঙ্গ। অথচ, ৮-মাত্রার এই পর্বটিই প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২ টি ৪-মাত্রার পর্বে ভাগ হল, ৪-মাত্রার এক-একটি পর্বে পাওয়া গেল ২-মাত্রার ২ টি করে উপপর্ব। ‘কে বট আপনি’-অংশটি অমূল্যধনের কাছে ৬-মাত্রার পর্ব, ভাগ হল ৩-মাত্রার ২ টি পর্বাঙ্গে। আর, এ অংশটি প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৬-মাত্রার একটি পদ, কিন্তু, সরাসরি এর ভাগ হল ৩-মাত্রার ২-টি উপপর্বে (পদটিকে পর্বে পর্বে ভাগ করা সম্ভব নয় বলে)। পর্বাঙ্গ-উপপর্বের মাপটাও সেই কারণেই সমান (৩-মাত্রার)। অতএব দেখলেন, একই কবিতার একই ছত্রে সব পর্বে মাপ ছান্দসিকদের কাছে সমান হয় না, তার ফলে পর্ব কেটে-কেটে-পাওয়া পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও অসমান হয়ে পড়ে।

এক-একটা পর্ব যে ২ টি-৩ টি টুকরোয় ভাগ হতে পারে, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে, পর্বের মাঝখানে সত্যিই থামতে হয় কিনা—অর্থাৎ যতি পড়ে কিনা এ বিষয়ে ছান্দসিকেরা একমত নন। অমূল্যধনের মতে পর্বের মাঝখানে যতি নেই, (:) চিহ্নটিও যতিচিহ্ন নয়)। প্রবোধচন্দ্রের মতে যতি অবশ্যই আছে, যতিই পর্বকে উপপর্বে ভাগ করে এবং সে-যতির নাম উপযতি।

### ৩৩.৬.৩. চরণ, পঙ্ক্তি

পর্বের চেয়ে ছোটো ছন্দ-বিভাগের কথা হল। এবারে বড়ো বিভাগের কথা। একটু আগেই আমরা দেখলাম খতির আঘাতে ‘দিনের আলো’-র ছত্রটির ৪ টি পর্বে ভাগ হওয়ার এবং ছত্রটির শেষে পুরো থেমে যাওয়ার ঘটনা। এই পুরো থামার যতিকে বলা হয় ‘পূর্ণযতি’, আর শুরু থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম অমূল্যধনের কাছে চরণ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে পঙ্ক্তি। অর্থাৎ, পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকেই অমূল্যধন বলছেন ‘চরণ’, প্রবোধচন্দ্র বলেছেন ‘পঙ্ক্তি’। প্রবোধচন্দ্র এই কারণে ‘পূর্ণযতি’-কে আরো নির্দিষ্ট করে বললেন ‘পঙ্ক্তিযতি’। সেদিক থেকে ‘চরণ’ আর ‘পঙ্ক্তি’-র মধ্যে তফাত থাকার কথা ছিল না। কিন্নু, ‘চরণ’ বা ‘পঙ্ক্তি’র মাপ যে নির্দিষ্ট করে দেয়, সেই পূর্ণযতিই ঠিক কোথায় পড়বে (অর্থাৎ, পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে কোন্ পর্বের শেষে পুরোপুরি থামতে হবে)—এই নিয়ে ছান্দসিক দুজন সব সময় একমত নন। তার ফলেই ‘চরণ’ আর ‘পঙ্ক্তি’ কখনো কখনো পৃথক হয়ে যায়।

‘দিনের আলো’র ছত্রটি চরণ বটে, পঙ্ক্তিও বটে—এটা আমরা দেখলাম। সমান মাপের চরণ-পঙ্ক্তি আরো দুটি-একটি দেখা যাক।

১ম চরণ	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১		১ ২	১ ১ ১		= ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার
	মরিতে	চাহিনা	আমি		সুন্দর	ভূবনে		
২য় চরণ	১ ১ ২	১ ১	১ ১		১ ১ ১ ১	২		= ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার
	মানবের	মাঝে	আমি		বাঁচিবারে	চাই		
১ম পঙ্ক্তি	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১		১ ২	১ ১ ১		= ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার
	মরিতে	চাহিনা	আমি		সুন্দর	ভূবনে		
২য় পঙ্ক্তি	১ ১ ২		১ ১	১ ১		১ ১ ১ ১	২	= ৮ + ৮ + ৮ + ২ = ১৪ মাত্রার
	মানবের		মাঝে	আমি		বাঁচিবারে	চাই	

এখানে মাত্রা বসেছে এই নিয়মে—প্রতি মুক্তদলে (বা স্বরাস্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের-প্রথমে-থাকা ‘সুন্’ বৃন্দদলেও (বা হ্রস্ব অক্ষরে) ১-মাত্রা, শব্দের-শেষে-থাকা প্রতি বৃন্দদলে ২-মাত্রা। লক্ষ করুন, ২টি ক্ষেত্রেই পূর্ণযতি (পুরো থেমে-যাওয়া) পড়ছে ছত্রের শেষে ১৪-মাত্রার পরে। অতএব, চরণ আর পঙ্ক্তির মাপে কোনো পার্থক্য রইল না। পার্থক্য কেবল এদের ছন্দ-বিভাগে। প্রথম চরণ ৮ + ৬ মাত্রার ২টি পর্বে ভাগ হয়ে গেছে, আর প্রথম পঙ্ক্তির ভাগ হয়েছে ৮ + ৬ মাত্রায় ২টি পর্বে। দ্বিতীয় চরণে ২টি পর্ব (৮ + ৬), কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ৪টি পর্ব (৪+৪+ ৪+২)।

এবারে দেখুন একটি পৃথক্ মাপের চরণ পঙ্ক্তির দৃষ্টান্ত—

১	১ ১	১ ২		১ ১ ২ ২		২ ১ ১	
এ	নহে	মুখর্		বনমর্মর্		গুন্জিত	
১	১	১ ১ ২		১ ১ ১	১ ২		১ ১ ১
এ	যে	অজাগর্		গরজে	সাগর্		ফুলিছে

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ২-বার পূর্ণযতি, তাই ২-টি চরণ। কিন্তু, প্রবোধচন্দ্র প্রথম ছত্রের শেষে পূর্ণযতি মানেন না, মানেন পদযতি। ২টি ছত্র পুরোপুরি উচ্চারণ করার পরে তিনি পুরো থামতে চান (কেবল ‘ফুলিছে’-র পর), তার আগে নয়। অতএব তাঁর হিসেবে ২টি ছত্র মিলে এখানে ২টি পঙ্ক্তি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য চরণ-পঙ্ক্তি সমান। যেখানে সমান নয়, সেখানে দেখা যাবে পঙ্ক্তির মাপ চরণের চেয়ে বড়ো। এর কারণ, পর্ব আর পঙ্ক্তির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র যে অতিরিক্ত ছন্দ-বিভাগ ‘পদ’ কল্পনা করে নিয়েছে, তা কখনো কখনো ‘চরণ’-এর সমান হয়ে যায়। আপনারা জানেন, কয়েকটি পর্ব মিলে তৈরি হয় ‘পদ’। তেমনি, কয়েকটি ‘পদ’ জুড়ে তৈরি হয় পঙ্ক্তি। একটু আগে ‘এ নহে মুখর্’-এর ২টি ছত্র মিলে যে একটি মাত্র পঙ্ক্তি তৈরি হল, তার কারণ এক-একটি ছত্র প্রবোধচন্দ্রের কাছে এক-একটি ‘পদ’ বলেই মনে হয়েছে, তার বেশি নয়। অর্থাৎ, প্রথম ছত্রের শেষে অমূল্যধন পুরোপুরি থামলেও (পূর্ণযতি) প্রবোধচন্দ্র পুরো



থামছেন না, পর্বের শেষে যতটুকু থামতে হয় (পর্বযতি) তার চেয়ে একটু বেশি থামছেন (পদযতি)।

ফলে এখানে অমূল্যধনের 'চরণ' হয়ে যাচ্ছে প্রবোধচন্দ্রের 'পদ'-এর সমান। অতএব, ২টি 'পদ' নিয়ে তৈরি 'পঙ্ক্তি'

এখানে ২টি 'চরণে'রই যোগ ফল। নীচে লক্ষ করুন—

২	১ ১	২	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১		= ৬ + ৬ + ৩ = ১৫
ঐ	আসে	ঐ	অতি	ভৈরব	হরষে		
১ ১	২ ১ ১	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১			
জলসিন্চিত	ক্ষিতি	সৌরভ	রভসে				= ৬ + ৬ + ৩ = ১৫
১ ১	২ ১ ১	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১			
ঘনগৌরব	নবযৌবনা	বরষা					= ৬ + ৬ + ৩ = ১৫
	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১				
	শ্যামগম্ভীর	সরষা					= ৬ + ৩ = ৯

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ৪টি ছত্রই ৪টি চরণ। আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ৪টি ছত্রে আছে ৪টি পদ মিলে একটিমাত্র পঙ্ক্তি। প্রথম ৩টি চরণের মাপ ১৫-মাত্রা করে, চতুর্থটি ৯-মাত্রার। পঙ্ক্তিটির মাপ ১৫ + ১৫ + ১৫ = ৪৫ মাত্রা। চরণ আর পদ সমান হলে প্রবোধচন্দ্রের একপদী পঙ্ক্তি ছাড়া আর সব পঙ্ক্তিই মাপে চরণের চেয়ে বড়ো হবে গণিতের নিয়ম মেনে।

### ৩.৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক

ছন্দ-বিভাগ নিয়ে যেটুকু কথা হল, তা থেকে এটা বোঝা যাবে, পর্ব আর চরণ এই ২ রকম মাপের বিভাগ থেকেই উচ্চারণ আর বিরামের বিন্যাসের শৃঙ্খলাটা ধরা পড়ে যায়। কবিতার পদ্য পড়তে গেলেই চলতে থাকে পর্বের পর পর্ব উচ্চারণ, মাঝখানে অর্ধযতি। পরপর কয়েকটি পর্বের উচ্চারণ হলেই পড়ে পূর্ণযতি, শেষ হয় একটি চরণের উচ্চারণ। আবার চলতে থাকে একইভাবে পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে আর-একটি চরণের উচ্চারণ আর-একটি পূর্ণযতি পর্যন্ত। এর সঙ্গে বাড়তি যে ২টি বিভাগের কথা আপনারা জানলেন (পর্বের চেয়ে ছোটো মাপের 'পর্বাঙ্গ' বা 'উপপর্ব' আর পর্বের চেয়ে বড়ো মাপের 'পদ'), ছন্দের মূল চরিত্র এদের বাদ দিলেও বুঝে নেওয়া যাবে। আর, 'পদ' বাদ পড়লে 'পঙ্ক্তি'ও অবাস্তর হয়ে পড়ে। কেননা, 'পঙ্ক্তি'র ধারণা তৈরি হয় কয়েকটি 'পদে'র যোগফল হিসেবেই।

অতএব, কবিতা যখন পড়ি, তখন আমরা পর পর নির্দিষ্ট মাপের (মাত্রা সংখ্যার) চরণই একের পর এক উচ্চারণ করে যেতে থাকি। মনে রাখবেন, একটি কবিতার গোটা শরীরে যতগুলি চরণ ছড়ানো আছে, তাদের

ছন্দ-স্বভাব একটাই। সে-কারণে, কোনও কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য গোটা কবিতাই পড়ে পড়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কবিতার একটি অংশ এর জন্য বেছে নিলেই চলে। তবে, অংশটি এমন হওয়া চাই, যাতে থাকে মাপ বা মাত্রা সংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা পরপর কয়েকটি চরণ। এই রকম কয়েকটি চরণের গুচ্ছকে ছন্দসিকেরা বলেন স্তবক।

সাধারণভাবে 'স্তবক'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকী তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে, এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র একটু ভিন্ন কথা বলতে চান। তাঁর মতে 'স্তবক'র পঙ্ক্তি-সংখ্যা কমপক্ষে ৫ হওয়া চাই-ই। তার চেয়ে কম হলে তার নাম হবে শ্লোক, 'স্তবক' নয়। ৫ বা তার বেশি সংখ্যার পঙ্ক্তির গুচ্ছও তাঁর কাছে বড়ো মাপের শ্লোক-ই, কেবল তার বিকল্প নাম 'স্তবক'। আমরা অবশ্য চরণের যেকোনো গুচ্ছকেই বলব 'স্তবক'। নীচের 'স্তবক'গুলি উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন, পরপর সাজানো চরণগুলি মাত্রা সংখ্যায় শৃঙ্খলায় কিভাবে পরপর বাঁধা পড়ল এক-একটি 'স্তবক' তৈরি করেছে—

১. এ জগতে হয় | সেই বেশি চায় | আছে যার ভূরি | ভূরি || = ৬+৬+৬+২ = ২০  
রাজার হস্ত | করে সমস্ত | কাঙালের ধন | চুরি || = ৬+৬+৬+২ = ২০

২. নিত্ত তোমায় | চিত্ত ভরিয়া | স্মরণ করি || = ৬+৬+৬+২ = ২০  
অন্তবিহীন | বিজনে বসিয়া | বরণ করি || = ৬+৬+৫ = ১৭  
তুমি আছ মোর | জীবন-মরণ | হরণ করি || = ৬+৬+৫ = ১৭

৩. মরিতে চাহি না | আমি সুন্দর ভুবনে || ৮+৬ = ১৪  
মানবের মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই || ৮+৬ = ১৪  
এই সুরযকরে এই | পুষ্পিত কাননে || ৮+৬ = ১৪  
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে | যদি স্থান পাই || ৮+৬ = ১৪

৪. দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে || = ১০  
জাগিয়া উঠিল হাহারবে || = ১০

বুধ নিজ ভক্তগণে | শুধালেন জনে জনে।

ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা || = ৮+৮+১০ = ২৬

তোমরা লইবে বল কেবা || = ১০

১ম স্তবকে ২টি চরণ (৬+৬+৬+২ মাত্রার), ২য় স্তবকে ৩টি চরণ (৬+৬+৫ মাত্রার),

৩য় স্তবকে ৪টি চরণ (৮+ ৬ মাত্রার), ৪র্থ স্তবকে ৪টি চরণ (১০ মাত্রার ৩টি, ৮+৮+১০ মাত্রার ১টি)।

### ৩৩.৭ সারাংশ-২

**পর্ব, পদ :** কবিতার ছত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে একটুখানি থামতে থামতে পুরো ছত্র পড়ে ফেলি। ফলে পুরো ছত্রটি কয়েকটি টুকরোয় ভাগ হয়ে যায়। এক-একটি টুকরোর নাম 'পর্ব'। সমান সমান মাত্রার পর থামলে পর্বের মাপও পরপর সমান হবে। এ রকম একই মাপের পর্ব পরপর ঘুরে ঘুরে এলে তার নাম 'পূর্ণপর্ব'। 'পূর্ণপর্বে'-র চেয়ে ছোটো মাপের পর্বের নাম 'অপূর্ণপর্ব', আর বড়ো মাপের পর্বের নাম 'অতিপূর্ণপর্ব'। কবিতার ছত্রের শুরুতে, কখনো কখনো মাঝখানে ছোটো মাপের এমন পর্ব মাঝে মাঝে কবিরা ব্যবহার করেন, যা ছন্দের হিসেবের বাইরে। এ রকম অতিরিক্ত এবং প্রায় অনাবশ্যিক পর্বের নাম 'অতিপর্ব'।

অমূল্যধনের অর্ধযতি বা প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে। এই অর্ধযতি বা পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামা, অথচ পূর্ণযতির চেয়ে একটু কম থামা প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করে তার নাম দিলেন পদযতি। এই পদযতি ছত্রকে যেসব খণ্ডে ভাগ করে, তার নাম 'পদ'। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয় 'পদ'।

কবিতার একই ছত্রে অমূল্যধনের পর্বের মাপ কখনো প্রবোধচন্দ্রের পর্বের সমান, কখনো তার চেয়ে বড়ো। তাই, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের পর্বের সমান, কখনো বড়ো।

### পর্বাঙ্গ, উপপর্ব :

১টি পর্বকে ২টি-৩টি ভাগে উচ্চারণ করে এক-একটি ভাগকে অমূল্যধন বলেন 'পর্বাঙ্গ', আর প্রবোধচন্দ্র বলেন 'উপপর্ব'। দুজনের পর্বের মাপ যখন সমান থাকে, সেই পর্বের পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও তখন সমান। কিন্তু, দুজনের পর্ব ছোটো-বড়ো হলে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও হবে ছোটো-বড়ো। আবার, পর্বে পর্বে ভাগ না-হয়ে সরাসরি কয়েকটি উপপর্বে ভাগ হয়ে যায়, প্রবোধচন্দ্রের এ রকম ১টি পদ যদি অমূল্যধনের পর্বের সঙ্গে সমান মাপের হয়, তাহলেও পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সমান হবে।

### চরণ, পঙক্তি :

পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকে অমূল্যধন বলেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পঙক্তি'। কবিতার কোনো কোনো ছত্রের শুরু থেকে সেই ছত্রের বা পরের কোনো ছত্রের শেষে-থাকা পূর্ণযতি পর্যন্ত যে ছন্দ-বিভাগ, তার নাম 'চরণ' বা 'পঙক্তি'। অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের পূর্ণযতি একই ছত্রের শেষে পড়লে 'চরণ' আর 'পঙক্তি' একই হবে, ভিন্ন ভিন্ন ছত্রের শেষে পড়লে চরণ-পঙক্তি পৃথক হবে।

প্রবোধচন্দ্রের পর্ব আর পঙক্তির মাঝামাঝি মাপের ছন্দ-বিভাগ পদ। কয়েকটি পদ জুড়ে তৈরি

হয় 'পঙ্ক্তি'। কখনো কখনো কবিতার এক-একটি ছত্র অমূল্যধনের কাছে তরণ হলেও প্রবোধচন্দ্রের কাছে তা এক-একটি পদ বলে গণ্য হতে পারে। তখনই পঙ্ক্তি হয়ে পড়ে চরণের চেয়ে বড়ো মাপের পৃথক ছন্দ-বিভাগ।

স্ববক, শ্লোক :

কোনো কবিতার এমন একটি অংশ, যেখানে পরপর ২, ৩, ৪, ৫, ৬, বা ৮-টি চরণের গুচ্ছ মাত্রাসংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা, তার নাম 'স্ববক'। প্রবোধচন্দ্রের বিচারে কমপক্ষে ৫টি পঙ্ক্তির গুচ্ছ হবে 'স্ববক'।

২, ৩ বা ৪টি পঙ্ক্তির গুচ্ছকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'শ্লোক'।

---

### ৩৩.৮ অনুশীলনী—২

---

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ১০৪ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন :

পর্ব, চরণ, স্ববক।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন :

পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব, পর্ব আর পদ, চরণ আর পঙ্ক্তি।

(গ) অর্ধযতি পূর্ণযতি পর্ব স্ববক—এই ৪টি পরিভাষা অমূল্যধন প্রবোধচন্দ্র দুজনেই ব্যবহার করতেন। প্রতিটি পরিভাষার ব্যবহারে ছন্দসিক দুজনের কোথায় মিল, কোথায় গরমিল—দেখান।

২. (ক) 'আম্রের মঞ্জুরী গন্ধ বিলায়'—এই ছত্রটিতে দলগুলিকে পৃথক করে দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে নিন।

এরপর—

i) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে পর্বাঙ্গ পর্ব আর চরণের বিভাগগুলি দেখান।

ii) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে উপপর্ব আর পদের বিভাগগুলি দেখান।

iii) ওপরের দু রকমের ছন্দ-বিভাগ থেকে অমূল্যধনের পর্বাঙ্গে-পর্ব-চরণের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের উপপর্ব-পর্ব-পদ-পঙ্ক্তির মাপের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটাব তিমির রাত

বাধার বিন্দ্যাচল।'

প্রশ্ন-২(ক)-এর পশ্চতিতে i) ওপরের ৪টি ছত্রে পরপর দুইরকমের ছন্দ-বিভাগ করুন।

ii) তা থেকে ঐ দুই রকমের বিভাগের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) পর পর এমন ৩টি পদ্যছত্রের দৃষ্টান্ত লিখুন যার—

i) প্রথমটিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার।

ii) দ্বিতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৬-মাত্রার।

iii) তৃতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৮-মাত্রার।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপর্ব থাকবে।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপূর্ণ পর্ব থাকবে।

যেকোনো দুটিতে ১টি করে অপূর্ণপর্ব থাকবে।

(ছত্রের শেষে পর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন। কোনটি অতিপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অতিপূর্ণপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অপূর্ণপর্ব প্রতিটি দৃষ্টান্তের নীচে লিখুন।)

৩. (ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

- i) \_\_\_\_\_ উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দবিভাগ বলে চিনিয়ে দেয়।
  - ii) অমূল্যধন (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
  - iii) প্রবোধচন্দ্র (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
  - iv) অমূল্যধন (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
  - v) প্রবোধচন্দ্র (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান \_\_\_\_\_, চিহ্নটিকে বলেন \_\_\_\_\_।
  - vi) প্রবোধচন্দ্র চিহ্ন \_\_\_\_\_, উপপর্বের চিহ্ন \_\_\_\_\_।
  - vii) ৪-ছত্রের কবিতাগুচ্ছকে অমূল্যধন বলেন \_\_\_\_\_, প্রবোধচন্দ্র বলেন \_\_\_\_\_।
  - viii) অমূল্যধনের স্ববকের জন্য আবশ্যিক \_\_\_\_\_ টি চরণ, প্রবোধচন্দ্রের স্ববকের জন্য আবশ্যিক \_\_\_\_\_ টি পঙক্তি।
- (খ) পর্বের মাঝখানে যতি পড়ে কিনা, পড়লে সে-যতি দিয়ে তৈরি ছন্দ-বিভাগের নাম কী, লিখুন।

---

## একক ২৯ □ বৈষ্ণব পদাবলী—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

---

গঠন

- ২৯.১ উদ্দেশ্য
- ২৯.২ প্রস্তাবনা
- ২৯.৩ মূলপাঠ
- ২৯.৪ মূল পাঠের ভাববস্তু বিশ্লেষণ ও কাব্য মূল্যায়ন।
- ২৯.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ।
- ২৯.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও তাঁদের কবিকৃতি আলোচনা
- ২৯.৭ অনুশীলনী
- ২৯.৮ উত্তরমালা
- ২৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

---

### ২৯.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি পাঠ ক রলে আপনি—

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে রচি রন্তন রূপরেখাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ ক রতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কবিকৃতির নানা দিক জেনে এই চারজন কবির সৃষ্টি সম্পদের মূল্যায়ন ক রতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, যথা—গৌরাস্তব বিষয়ক, পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, প্রেম বৈচিত্র ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোচ্ছ্বাস ও মিলন প্রার্থনা ইত্যাদির মূল তথ্য ও রস ব্যঞ্জনা আস্থাদন করে প্রতিটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক রতে পারবেন।
- চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী—এই তিনটি স্তরের কবিদের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার আস্থাদন সম্পর্কে ধারণা ও তার রূপদানের ক্ষেত্রে যে তারতম্য আছে তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব কবিগণ—‘দেবতারে প্রিয় করি—প্রিয়রে দেবতা।’ কিভাবে করেছেন—বিভিন্ন পদের ভাববস্তু জেনে বুঝতে পারবেন।
- ব্রজ বুলি ভাষা, অলংকরণ মণ্ডনকলা, ছন্দসিক প্রকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের মৌলিকত্ব কোথায় এবং কোন পদে কিভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আপনাকে অর্জন ক রবেন।

- চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের এ বং বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের মিল কোথায়? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদা বলীর রসবিচার ও বিভিন্ন কবির পদ মূল্যায়ন করে আপনারা নিজে র ভাষায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্য রস ও কবিকৃতি সম্পর্কে মনের ভা বকে প্রকাশ ক রতে পা রবেন।

## ২৯.২ প্রস্তাবনা

চণ্ডীদাসের ‘পূর্বরাগ’ ও ‘ভাবোচ্ছ্বাস ও মিলন’, বিদ্যাপতির ‘মাথুর’ ও ‘প্রার্থনা’, জ্ঞানদাসের ‘প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানু রাগ’ ও ‘রূপানু রাগ, এ বং গোবিন্দদাসের ‘অভিসার’ ও গৌ রাঙ্গ বিষয়ক পর্যায় থেকে মোট ৮টি পদ সম্পর্কে আলোচনা ক রা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রত্যেক কবির পরিচিতি ও তাঁদের পদগুলি র কা ব্য মূল্যায়ন ক রা হয়েছে। বিভিন্ন পদের বহু শব্দে র শব্দার্থও দেওয়া হয়েছে। পদগুলি দু’তিন বা র পাঠে র পর, আলোচনা ও শব্দার্থ ভালোভাবে শিখে আপনারা প্রতিটি পদের ভা ব বস্তু ও কবিদের সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে জানতে পা রবেন। পদা বলী র বিভিন্ন স্তরে র পদগুলি র ভা ব-ভা বনা, রস-ব্যঞ্জনা র দিক গুলিও স্পষ্ট অনুধা বন করে নানা প্রশ্নে র উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পা রবেন।

### চণ্ডীদাস - ১

## পূর্বরাগ ও অনুরাগ

১

সই কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম।  
 কানের ভিতর দিয়া ম রমে পশিল গোঁ  
 আকুল করিল মোর প্রাণ।।  
 না জানি কতক মধু শ্যাম-নামে আছে গোঁ  
 বদন ছাড়িতে নাহি পারে।  
 জপিতে জপিতে নাম অ বশ ক রলি গোঁ  
 কেমনে পাই ব সই তারে।।  
 নাম-পরতাপে যার ঐছন ক রল গোঁ  
 অঙ্গের পরশে কি বা হয়।  
 যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গোঁ  
 যুবতী-ধ রম কৈছে রয়।।  
 পাসরিতে কবি মনে পাসরা না যায় গোঁ  
 কি করিব কি হবে উপায়।  
 কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুল বতী কুল নাশে  
 আপনার যৌ বন যাচায়।।

## ভাবোচ্ছ্বাস ও মিলন

২

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।  
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব  
কপাল কহিয়া গেল।।  
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে  
পুলক যৌ বন-ভার।  
বাম অন্দগ আঁখি সঘনে নাচিছে  
দুলিছে হিয়ার হার।।  
প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি  
আহার বাঁটিয়া খায়।  
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে  
উড়িল বসিল তায়।।  
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে  
দেবের মাথার ফুল।  
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ  
বিহি ভেল অনুকুল।।

বিদ্যাপতি - ২

১

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।  
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর  
শূন্য মন্দির মোর।।  
বাম্পি ঘন গর- জম্বি সম্ভতি  
ভুবন ভারি বরিখম্বিয়া।  
কাম্ব পাহুন কাম দাবুণ  
সঘনে খর শর হম্বিয়া।।  
কুলিশ শত শত পাত মোদিত  
ময়ূর নাচত মাতিয়া।



মত্ত দাদু রী                      ডাকে ডাহুকী  
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥  
তিমির দিগ ভরি                      ঘোর যামিনী  
অথি র বিজুরিক পাঁতিয়া ।  
বিদ্যাপতি কহ                      কৈছে গোঙায়বি  
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

২

তাতন সৈকত                      বারিবিষ্ণু সম  
সুত-মিত-রমণী-সমাজে ।  
তোহে বিসরি মন                      তাহে সমর্পিণু  
অ ব মঝু হ ব কোন কাজে ॥  
মাধ ব, হাম পরিণাম নি রাশা ।  
তুহুঁ জগ-তা রণ,                      দীন-দয়াময়,  
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥  
আধ জনম হাম                      নিঙ্গে গোঙায়লুঁ  
জ রা শিশু কতদিন গেলা ।  
নিধু বনে রমণী-                      বস রঙ্গে মাতলুঁ,  
তোহে ভজ ব কোন বেলা ॥  
কত চতুরানন                      মরি মরি যাওত  
ন তুয়া আদি অ বসানা ।  
তোহে জনমি পুন,                      তোহে সমাওত,  
সাগ র-লহ রী সমানা ॥  
ভগয়ে বিদ্যাপতি,                      শেষ শমন-ভয়  
তুয়া বিনু গতি নাহি আ রা ।  
আদি-অনাদিক-                      নাথ কহায়সি,  
অ ব তা রণ-ভা র তোহা রা ॥



বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে ॥  
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলি ব তা ।  
দ রশ প রশ লাগি আউলাইছে গা ॥  
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার ॥  
লহু লহু হাসে পহুঁ পি রীতি র সা র ॥  
গু রু-গ রবিত মাঝে রহি সখী-সন্দেগ ।  
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসন্দেগ ॥  
পুলক ঢাকিতে করি কত প রকার ।  
নয়নের ধারা মোর বহে অনি বার ॥  
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি ।  
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে, ভেজাই আগুনি ॥

গোবিন্দদাস — ৪

## অভিসা র

১

কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল  
মঞ্জীর চী রহি ঝাঁপি ।  
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল  
চলতহি অঙ্গগুলি চাপি ॥  
মাধব তুয়া অভিসা রক লাগি ।  
দূত র পণ্ডথ- গমন ধনি সাধয়ে  
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥  
ক র-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী  
তিমির-পয়ানক আশে ।  
ক র-কঙ্কন-পণ ফণিমুখ-বগুধন  
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে ॥  
গুরুজন-বচন বধির সম মানই  
আন শুনই কহ আন ।  
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

## গৌ রঙ্গ-বিষয়ক

১

নী রদ নয়নে	নী র ঘন সিঞ্চনে
	পুলক-মুকুল-অ বলস্ব।
স্বেদ-মক রঙ্গ	বিষুঃ বিষুঃ চুয়ত
	বিকশিত ভা ব-কদম্ব।।
	কি পেখলুঁ নট বর গৌ র কিশোর।
অভিন ব হেম	কলপত বু সঞ্চরু
	সুরধুনী-তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ-	কমল-তলে ঝন্দক বু
	ভকত-শ্মরগণ ভোর।
পরিমলে লু বধ	সুরাসুর ধা বই
	অহনিশি রহত অগোর।।
অবি রত প্রেম-	রতন-ফল-বিতরণে
	অখিল-মনোরথ পুর।
তাক রচরণে	দীনহীন বঞ্চিত
	গোবিন্দদাস রহু দুর।।

বৈষ্ণব পদা বলীতে ‘শাম্ভু, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর’ — এই পঞ্চরসের প্রকাশ থাকলেও মূলত ‘মধুর’ রসের ধারায় দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহের নানা সুরের বাঙ্কত পদগুলি কেন হৃদয়স্পর্শী তা বুঝতে পেরে প্রতিটি পদের যাতে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন তার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চণ্ডীদাসকে কেন সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি বলা হয়, জ্ঞানদাস কেন চণ্ডীদাসের ভা বশিষ্য, বিদ্যাপতি কেন ঐশ্বর্যের ও সুখের কবি, গোবিন্দদাস কেন ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ নামে চিহ্নিত—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরও আপনারা পাবেন। বৈষ্ণব পদা বলীর ঐতিহ্য ও চিরন্তনতার ভিত্তি কি? তার সত্ত্বধানও এই এককের বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়ে এ বং আলোচনার নানা ধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নির্দিষ্ট পদকর্তাদের পদগুলি ভালোভাবে পাঠ করুন এ বং তার সন্দেহ কাব্য মূল্যায়ন অংশ অনুধাবন করুন।

---

২৯.৩ মূলপাঠ : চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের দুটি করে নির্বাচিত পদ

---

## ২৯.৪ মূলপাঠের সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন

— চণ্ডীদাসের পদ —

পূর্বরাগ ১ নং

“সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম.....”

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :

বৈষ্ণব পদা বলী সাহিত্যের কবি শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের এই পদটি ‘শ্রবণজাত’ পূর্বরাগের অন্যতম নিদর্শন। শ্রী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সঙ্গীত মুর্ছনাময় নাম শ্রবণ করে আকুল হয়েছেন। তাঁর মর্ম লোকে সঞ্চরিত হয়েছে এমন এক ভাব বিহবলতা যা তিনি আগে অনুভব করেন নি। শ্যাম নামে যে এত মধু — তা রাধিকার কাছে ছিল অজ্ঞাত। শ্যাম-নামে বিমুগ্ধা রাধা সা রাক্ষণ আপনমনেই উচ্চরণ করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম। নাম জপ করতে করতে রাধার দেহ-মন অবশ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুল বাসনা রাধাকে করে তুলেছে পাগলিনী। যার নাম শ্রবণেই হৃদয় এমন উদ্বেল, তাঁর অঙ্গের স্পর্শে না-জানি কি অনির্বচনীয় সুখা লুকিয়ে আছে? শ্রীকৃষ্ণের বসতি কোথায়? তাঁর নয়ন-বিমোহন মূর্তি কী রূপ? এসব ভেবে শ্রী রাধিকার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে তাঁর যুবতীধর্ম রক্ষা ক’রই হয়তো কঠিন হবে। শ্রীকৃষ্ণের মধুর নাম কিছতেই বিস্মৃত হবার নয়। চণ্ডীদাসের মতে কুলগ রবিনী ও যৌবন গ রবিনী নারীরা নিরুপায় ভাবেই তাঁদের জী বন-যৌবন কুলমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেন। তাই শ্রী রাধিকার উদ্বেগ ও উপায়ন্তর বিহীনতাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস এই পদটিতে শ্রী রাধিকার পূর্বরাগের উদ্বেগ দশাটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — /চণ্ডীদাস প্রেমকে জগত বলিয়া জানিয়াছেন।\*— মস্তব্যটি যথার্থ। চণ্ডীদাসের কাছে জগৎ প্রেমময়। তাঁর সৃষ্ট রাধিকা প্রেম-সর্বস্ব। সখীদের সঙ্গে দিনকটানোর মুহূর্তে শ্রুতিপথে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশমাত্রই সেই নামের প্রভাবে তাঁর হৃদয় মন আবিষ্ট হয়। হৃদয়ের গভীরে দেখা দেয় নব-অনুরাগ রঞ্জিত পূর্বরাগের ভাব ব্যাকুল চেউ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তাঁর মন হয় উতলা। নিরঙ্গকৃত ভাষায় ভগবৎ প্রেমের ভাব-ব্যঞ্জনা বাস্তব জী বন আঙ্গিনার ছোঁয়ায় বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ভাবের প্রগাঢ়তায় ও রচনা নৈপুণ্যে পদটি নিঃসন্দেহে রস-সমৃদ্ধ হয়েছে।

/নাম-পরতাপে যার

ঐছন করলগো

অঙ্গের পরশে কি বা হয়।\*

পদ্যাংশে কবি মনস্তত্ত্বের গভীরতায় প্রবেশ করে রাধার উপায়ন্তর বিহীনতার রূপটি সার্থক ভাবে অঙ্কিত করেছেন। তার অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত। ভগবৎ প্রেম ব্যাকুলতার উৎস নিদর্শন এই পদটি।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** এই পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। বাস্তব জীবনে শুধু নাম শুনাই প্রেম উৎপন্ন হয় না। এছাড়া নামে মাধুর্য ভগবৎ প্রেমে রই বিশেষ লক্ষণ। /জপিতে জপিতে নাম’— অর্থাৎ নাম জপের উল্লেখ আছে। এর মধ্যেও ভগবৎ প্রেমে রই নির্দেশ রয়েছে।

শব্দার্থ : পরতাপে — প্রতাপে, নাম-পরতাপে — নামের প্রতাপে বা শঙ্কিতে বা প্রভাবে।  
ঐচ্ছন — এই রূপ, যাচায় — সেধে দান করে,  
পাসরিতে — ভুলতে, ধরম — ধর্ম, কৈছে — কেমন করে।

চণ্ডীদাসের পদ ২ নং  
ভাবোচ্ছাস ও মিলন  
/সই, জানি, কুদিন সুদিন ভেল।.....,”

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :

দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণার পর ভাব-বন্দা বনে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের শুভমুহূর্ত আসন্ন — এই আশায় শ্রী রাধিকার মন প্রাণ পুলক বন্যায় ভেসে গেছে। সখীদের ডেকে রাধিকা বলেছেন যে তাঁর জীবনের অন্ধকার দিন শেষ হয়ে সুদিন ফিরে আসছে। মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যে শীঘ্রই ফিরে আসবে তা তাঁর অদৃষ্টই যেন বারবার বলছে। মিলন আনন্দের স্বপ্নে বিভোর রাধার চুল স্ফূরিত হচ্ছে, বসন উড়ছে, যৌবন পুলক বন্যায় ভাসছে। রাধার বাঁ চোখ নাচছে— আনন্দে গলার হার দুলছে। কাকে র মুখে প্রিয়ের আগমন বার্তা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রাধা খাবার দেয়। এতদিন কাকে রাখা বার খেয়ে চলে যেতো। কিন্তু আজ অন্য ছবি। রাধার ডাকে কাকে রামের আনন্দে তাঁর কাছে উড়ে এসে বসেছে। মুখের পান আপনা-আপনি খসে পড়ছে। দেবতার মাথা থেকে আশীর্বাদী ফুল পড়ছে। চণ্ডীদাস বলেন—সব দিক থেকেই শুভ, বিখাতা অনুকূল হয়েছেন।

/ভাবোচ্ছাস ও মিলন’ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি রূপে বিদ্যাপতি চিহ্নিত হলেও এই পদে চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় ভাবের জগতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন প্রত্যাশাটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। মঙ্গলসূচক লৌকিক বিশ্বাসের এক একটি দৃষ্টান্তের মালা গেঁথে শ্রী রাধিকার ভাব সন্মিলনের মানসিক প্রস্তুতি ও আশার আনন্দ রসঘন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রাধার অন্তরে চির প্রশান্তির পূর্বপর্বে প্রকাশ পেয়েছে। ভগিতায় চণ্ডীদাস দীর্ঘ বিরহকাতরা শ্রী রাধার প্রত্যাশা বিশ্বাসকে দৃঢ়করবার জন্যই শুভদিনের আগমন বার্তা ও বিখাতার আনুকূল্যের কথা বলেছেন। নিরলঙ্কার সহজ সৌন্দর্যই চণ্ডীদাসের পদগুলির লাবণ্য। এই পদটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। ‘মাথুর’ পর্যায়ের চণ্ডীদাসের লেখনীতে বিচ্ছেদের বেদনার চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক গভীরতর প্রেম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধি রইক্রম-পরিণত প্রকাশ ঘটেছে এই পদে। বিরহের দহনজ্বালা সহ্য করে চিরন্তন বাঙালি নারীর মতো সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক রূপিনী রাধা এই পদে আশার প্রদীপ জ্বলে মিলনোন্মুখ হয়েছেন।

শব্দার্থ : সই — সখি (সম্বোধন)। ভেল — হ’লো। কপাল কহিয়া গেল — অদৃষ্ট যেন বলে গেল। চিকুর ফুরিছে- আনন্দে চুলগুলি স্ফূরিত হচ্ছে। তাম্বুল — পান, বিহি — বিধি, পিয়া — প্রিয়া। তুরিতে তুরিতে — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র।

— বিদ্যাপতির পদ —

মাথুর-ঙ্গ৩৮

/এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।\*

**সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :**

প্রাণাধিক প্রিয় সখীর কাছে বিরহিনী রাধিকা তাঁর বিরহ বেদনার কাহিনী নিবেদন করছেন। কৃষ্ণ দীর্ঘদিন ধরে বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরায় চলে গেছেন। তার ফলে রাধার জীবনে দেখা দিয়েছে সীমাহীন বিরহ আর্তি। পূর্ণ বর্ষাকাল — ভাদ্রমাস। রাধার গৃহ মন্দির শূন্য। আকাশ মেঘে ঢাকা। সর্বদা মেঘের গুরু গুরু গর্জন। পৃথিবী বৃষ্টি ধারায় স্নাত। কিন্তু শ্রী রাধিকার প্রিয়তম কাছে নেই, হয়েছেন সুদূর প্রবাসী। কামদেবের বাণে তাঁর দেহ আজ জর্জর। মেঘের ডাকে মিলন পিপাসু ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নাচছে, ভেকে রা মত্ত, ডাহুকী, কলরবে মুখর। প্রকৃতি জগতের এই আনন্দরসঘন মুহূর্তে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। দিক-দিগন্ত-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকার রাত — আকাশের বৃকে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক-দমক। কবির প্রশ্ন, কৃষ্ণবিরহী শ্রী রাধিকার রাত কাটবে কী করে?

এই পদটিতে বিদ্যাপতি শ্রী রাধিকার হৃদয় বেদনাকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সুরে-ছন্দে, ভাবে বর্ষা প্রকৃতির উন্মাদনাময় পরিবেশে শ্রী রাধার হৃদয় চাঞ্চল্যকে কবি অনুপমভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা নেই, আছে রসাবেশ। হৃদয়ের বেদনাকে কবি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতেই কবি বর্ষা দিনের মত্ততাকে পটভূমিকায় রেখেছেন। বিদ্যাপতির চরম রূপ দক্ষতার প্রকাশ এই পদে আছে। মদনের বাণে শ্রী রাধিকার হৃদয় জর্জরিত। শেষ চরণে কবি-প্রশ্ন করেছেন—

‘কে ছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।’

পদটিতে অলৌকিক আবেদনের চেয়ে লৌকিক আবেদনের প্রাধান্যই দেখা যায়। শ্রী রাধার অনির্বচনীয় মানসিক উদাসভাব পদটিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। শব্দের ঐশ্বর্য ও ভাবের মাধুর্যে পদটি সার্থক।

**শব্দার্থ :** ওর — সীমা। বাদর — বাদল, বর্ষা। মাহ — মাস, ঝম্পি — ঝাঁপিয়া। গরজন্তি — গর্জন করছে। সম্মতি — সতত। বরিখন্দিয়া — বর্ষণ করছে। পাতুণ — প্রবাসী। কুলিশ — বজ্র। দাদুরী — ভেক, ব্যাঙ। অথির — অস্থির। বিজুরিক পাঁতিয়া — বিদ্যুতের গঞ্জি বা সারি। গোঙায়বি — কাটাবি। রাতিয়া — রাত্রি।

**বিদ্যাপতির পদ — ২ নং**

॥ প্রার্থনা ॥

/তাতল সৈকত

বারিবিষ্ণুসম

সুত-মিত-রমনী সমাজে।\*

**সার-সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :**

উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরে বৃষ্টির ধারা পড়ামাত্র শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পুত্র-মিত্র-স্ত্রী পরিবৃত সংসারও ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরই একমাত্র চিরন্তন। কিন্তু বিদ্যাপতি সেই শাস্ত্র ঈশ্বরকে ভুলে ক্ষণকালের সংসারেরই নিমগ্ন থেকেছেন। মায়াময় সংসারের মোহে আবদ্ধ থেকেই কবি জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির ভাবনা — তিনি আজ কোনো কাজে লাগবেন ঈশ্বরের? তাঁর চোখের সামনে ব্যর্থতার ঘন অন্ধকার। তিনি বুঝতে পেরেছেন দীন দয়াময় ভগবানই একমাত্র মুক্তি দাতা। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ভাবছেন—ঈশ্বরই

তাঁকে দেখাবে প্রকৃত মুক্তি র পথ।

কবির সমগ্র জীবন কেটে গেছে চেতনাহীন অবস্থায়। অর্ধেক জীবন তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, অজ্ঞানতায় শৈশবকাল, যৌবনে নারীসঙ্গ লাভের নেশায়, আর জরা ব্যাধিতে বার্কক্যকাল কাটানোর ফলে ঈশ্বরের ভজনা র সময় কবি পাননি। স্রষ্টা ব্রহ্মারও মৃত্যু লয় আছে। কিন্তু ঈশ্বর অনাদি-অনন্যচা সমুদ্রের বুকে চেউ যেমন জাগে এ বং সমুদ্রের বুকেই তা বিলীন হয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বর থেকে জীব-জগতের সৃষ্টি এ বং ঈশ্বরের মধ্যেই তার বিলয়। সেইজন্য ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন, ভগবানই একমাত্র গতি, মুক্তি দাতা। কবির আত্ম বিশ্লেষণের পর ঈশ্বরের কাছে তাঁর কবুণ প্রার্থনা—ভগবান যেন তাঁকে মুক্তি পথের যাত্রী করেন।

‘প্রার্থনা’ পর্যায়ে র পদ রচনায় বিদ্যাপতি তুলনা রহিত। এই পদে কবির আত্মসমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। মায়া মোহে সারা জীবনে যে ভাবে দিন অতিবাহিত করেছেন তার জন্য কবি অনুক্ত মরুময় জীবনে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের সম্পর্কে যে সুগভীর বিশ্বাস জন্মেছে তা রই ঐকান্তিক নিবেদন—

‘তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।\*

হতাশার হাহাকারের পাশাপাশি ঈশ্বরের কবুণপ্রার্থী কবি ভক্তি বিনয়চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন ঈশ্বরের রই পদতলে। পরিশুদ্ধ আত্মনিবেদনের সুরে পদটি স্নাত। রূপ, মোহ, তৃষ্ণা, প্রেম সব মিথ্যা। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই একমাত্র ঈশ্বরের পূজা উপাচার এই দার্শনিক ভাবনায় উত্তরণে পদটি সুসমৃদ্ধ। পদলালিত্য, উপমা প্রয়োগ ইত্যাদি গুণে পদটি শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়েছে।

**শব্দার্থ :** তাতল — উত্তল, সৈকত — বালু।

সুত-মিত-রমণী সমাজে — পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী-সমাবেশে বা সন্দেহ। তোহে — তোমাকে। বিসরি — বিস্মৃত হয়ে। বিশোয়াসে — বিশ্বাস। আধ-জনম — অর্ধেক জন্ম। নিদ্রে — নিদ্রায়। জরা — বার্কক্য। চতুরানন — যাঁর চার মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা। তুয়া — তোমার। সমাওত — প্রবেশ করে। ভণয়ে — বলে।

**জ্ঞানদাসের পদ**

॥ প্রেম বৈচিত্র্য ও আক্ষেপানু রাগ ॥

/সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু

আনলে পুড়িয়া গেল।\*

**ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :**

চণ্ডীদাসের ‘ভা বশিষ্য’ জ্ঞানদাস এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ শ্রীরাধিকার মর্ম ব্যথাকে আক্ষেপানু রাগের হাহাকারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে সুখে দিন কাটা বার আশায় শ্রীরাধিকা তৈরী করেছিলেন যে স্বপ্নের ঘর তা চরম হতাশার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতসাগরে ডুব দিতে গিয়ে পেলেন বিষ। শ্রীরাধিকা জানেন না তাঁর কপালে কী আছে? স্নিগ্ধ চাঁদের আলো তার কর্ম দোষে পরিণত হয়েছে সূর্যের প্রখর রৌদ্রে, উঁচু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে তিনি পড়েছেন অগাধ জলে। লক্ষ্মীদেবীর কবুণা চেয়ে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে চরম দারিদ্র্য। অবহেলায় মণি-মাণিক্য সব হারিয়েছেন। নগর পত্তন করেছেন, মাণিক্য লাভের আশায়



সমুদ্র বণ্ডুঠন করেছেন, কিন্তু কপাল দোষে সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, মাণিক্য হারিয়ে গেছে। পিপাসা নিবারণের জন্য মেঘের কাছে জল চেয়ে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে বজ্র। এই বজ্রপতনই যেন তাঁর ভাগ্যলিপি। জ্ঞানদাসের মতে, কৃষ্ণপ্রেম-মৃত্যু-যন্ত্রণার মতোই বেদনা কণ্টকিত।

এই পদটির রচয়িতাকে ঘিরে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস দুই কবির নামই গবেষকগণ চিন্তা ভাবনা করে পদটি যে জ্ঞানদাসেরই রচনা এ সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন।

/সুখে র লাগিয়া                      এঘর বাঁধিনু  
আনলে পুড়িয়া গেল।  
অমিয় সাগরে                      সিনান করিতে  
সকলি গরল ভেল।\*

পদের সূচনায় এই চিরন্তন আশাহত জীবনের হৃদয়স্পর্শী বেদনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বিষম-অলঙ্কারের সুখ—দুঃখ (অনল) অমিয় — গরল এই বৈষম্যই আলঙ্কারির সৌন্দর্য সঞ্চর করেছে। অপূর্ব প্রয়োগে শ্রীরাধার দীর্ঘ শ্বাসভরা হাহাকার ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষার পারিপাট্যের পাশাপাশি বিষম অলঙ্কার সংযোজনায় কবির প্রকাশ ক্ষমতার কৌশল প্রকাশ পেয়েছে।

**শব্দার্থ :** উচল — উঁচু। আনলে — অনলে, আগুনে। অচল — পর্বত। লছমী — লক্ষ্মী। বেঢল — ঘিরে ধরলো। পিয়াস — তৃষ্ণা। বজ্র — বজ্র। সেবিনু — সেবা করলাম। হেলে — অবহেলায়। জলদ — মেঘ। ভানু — সূর্য। অমিয় — অমৃত। মরণ অধিক শেল — মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক।

#### জ্ঞানদাসের পদ (২ নং)

পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ে র—  
প্রকৃতপক্ষে ‘রূপানুরাগের’ পদ  
/ রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর।\*

#### ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :

রূপানুরাগের এই পদটিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের রূপে পাগলিনী হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। কৃষ্ণের গুণে তাঁর মন বিভোর। কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের জন্য রাধার প্রতিটি অঙ্গ কাঁদে। হৃদয়ের স্পর্শের জন্য হৃদয় কেঁদে ওঠে। কৃষ্ণ প্রেমের জন্য রাধার প্রাণ-মন অস্থির। মনের বাসনা, পূরণের জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুখা রূপসুখা পান করে রাধার হৃদয় আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর শরীরের স্পর্শলাভের জন্য রাধার দেহ মন উদ্বেলিত। সখীদের নিয়ে এমনকি গুরুজনদের সঙ্গে থাকার সময়েও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ দেহ-মনকে পুলক বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সকলের সামনে তার জন্য অপদস্থ হতে হয় — এই ভেবে পুলক প্রচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে চোখের জল অবিবরণ ধারায় বয়ে যাবার জন্য সব চেপ্তাই ব্যর্থ হয়। রাধার এই অবস্থা দেখে ঘরের লোকজন কানাকানি করে।

কৃষ্ণের রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এই পদটিতে। যথাযথ ভাষার ব্যবহারে অনন্ত বাসনার তীব্র হাহাকার

প্রতি চরণে ধবনিত হয়েছে। ভাব ও ভাষার গাঢ় বদ্ধতায় পদটি সমৃদ্ধ। চণ্ডীদাস গভীর অনুভূতির মর্মস্পর্শী গীতিকার।

কিন্তু তাঁর ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস অল্প রতম প্রাণবেদনার সফল চিত্রকর। এ র প্রমাণ পদটিতে আছে। অলংকারের সার্থক ব্যবহারে কবি রাধার ব্যাকুল হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন। কবির প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুন্দর। প্রাণ তন্ময় হয়েও জ্ঞানদাস-গুরুর মতো আত্মহারা নন। প্রকাশভঙ্গির আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর নজর আছে। হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার'। এখানে রাধার হাসি মধুর ধারার সঙ্গে তুলনা করে সার্থক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।

**শব্দার্থ :** আঁখি বুঝে — চোখের জল পড়ে। আরতি নাহি টুটে — আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। দরশন — দর্শন। পরশ — স্পর্শ। পহু — প্রভু। গুরু — গরিবত মাঝে — গুরু ও পূজনীয়দের মধ্যে। পরসঙ্গে — প্রসঙ্গে। লাজ — লজ্জা। পরকার — প্রকার। ভেজাই — জ্বালিয়ে দিলাম।

### গোবিন্দদাসের পদ - (১নং)

॥ অভিসার ॥

“কণ্টক গাড়ি কামল-সম পদতল

মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।\*

### ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সংকেত স্থানে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিসারের পথ, দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ। রাধা ঘরের দরজা বন্ধকরে মেঝেতে জল ঢেলে মেঝে কাদা করে তাতে কাঁটা পুঁতে পায়ে নুপুর দুটিকে কাপড়খণ্ড দিয়ে বেঁধে পায়ে আঙ্গুল চেপে চুপি চুপি চলার অভ্যাস করছেন। রাধার ঈশ্বর সাধনার এ যেন গোপন মহড়া। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুচোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে অন্ধকার পথ অতিক্রমের অভ্যাস করছেন। বর্ষণসিক্ত অন্ধকার পথে সাপের ভয় আছে। সাপের দংশন থেকে বাঁচবার জন্য হাতের কঙ্কন বন্ধক রেখে সাপুড়ের কাছে সাপের মুখ বন্ধনের কৌশল জেনে নিয়েছে। গুরুজনদের কথা তিনি শুনতে পান না। এককথা শুনে উত্তর দেন অন্যকথা। আত্মীয় পরিজনের কথা শুনে মুক্তার মতো শূধা হাসেন। রাধিকার এই মানসিক অবস্থার একমাত্র সাক্ষী গোবিন্দদাস কবিরাজ।

‘অভিসার’ পর্যায়ে র শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজ বুলি ভাষায় অলঙ্কারের চাতুর্যে, রসের নিবিড়তায় ও অভিনব পরিবেশ সৃষ্টিতে পদটি অতুলনীয়। এই পদে কবির সখ্যভাবে র সঙ্গে সম্ভোগভাবও যুক্ত হয়েছে। চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছে। রাধিকার অভিসারের র দুস্তর পথ অতিক্রমের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ এর সঙ্গে দুঃখজয়ের সাধনা পদটি সমৃদ্ধ।

**শব্দার্থ :** কণ্টক — কাঁটা। গাড়ি — শ্রোথিত করে। কামলসম — পদ্মের মতো। মঞ্জীর — নুপুর। চীরহি

— বস্ত্রে। গাগরি-বারি — কলসী র জল। পীছল — পিচ্ছিল। দূত র — দুস্তর। পণ্ডথ — পথ। যামিনী — রাত্রি।  
ভামিণী — রমণী। পয়ানক — কাটানোর। আশে — আশায়। ক র-কক্ষন — হাতের কাঁকন। ভূজগ — সাপ,  
পরমান — প্রমাণ।

### গোবিন্দদাসের পদ — (২ নং)

॥ গৌ রাঙ্গ-বিষয়ক পদ ॥

/নী রদ নয়নে                      নী র ঘন সিধনে

পুলক-মুকুল অ বলম্ব ।\*

### ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন :

গোবিন্দদাস রচিত এই পদটিতে শ্রীচৈতন্য দেবের কৃষ্ণ ব্যাকুলিত দেহ-মনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শ্রী রাধিকার মতো চৈতন্যদেবের দু চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে। বর্ষার জলে যেমন গাছ সজীব হয়, ফুল ফোটে, তেমনি কৃষ্ণ প্রেমে আকুল চৈতন্যদেবের শরীর যেন কৃষ্ণের স্পর্শ লাভের জন্য রোমাঞ্চিত। কদম ফুলের মতো চৈতন্যদেবের পুলকিত দেহ থেকে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসৃত হচ্ছে, তা যেন ‘ভাবকদম্ব’ নটবর গৌর কিশোরের রূপমাধুর্য দৃষ্টি নন্দন। কবির কল্পনায় তা যেন যমুনা তীরের স্বর্ণতরু, যা ভাবাবেগে সঞ্চরণশীল। তাঁর গতিময় শ্রীচরণ পদতলে ভক্ত স্নান রগণ প্রেমে ভক্তিতে আকুল হয়ে গুঞ্জরণ করছে। চৈতন্যদেবের শ্রীচরণকমলের সৌভে বিমুগ্ধ দেবদানবেরা রাত-দিন তাঁর প্রতি আত্মভোলা হয়ে ধাবিত হচ্ছে। চলমান, ‘সোনার কল্পতরু (অর্থাৎ প্রেমামগ্ন শ্রীগৌর রাঙ্গ দেব সকলের মনো বাসনা পূর্ণ করে প্রেমরত্ন ফল বিতরণ করছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে পারেননি বলে কবির অশেষ অনুতাপ।

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও বিদ্যাপতির শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ কবি-কর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোবিন্দ দাস যে পাদমঞ্জরী উপহার দিয়েছেন তা শিল্প রস ও লালিত্যে অনুপম। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীগৌর রাঙ্গের অশ্রুস্নাত ভাব-বিহ্বল-নৃত্য রস মূর্তিকে কবি /অভিনব হেম কল্পতরু\* রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভক্তি নম্র রূপ বিকশিত ভাব কদম্ব রূপে চিহ্নিত। বৈষ্ণব ভক্তদের গুঞ্জনমুখর স্নান রগণের সঙ্গে শ্রীগৌর রাঙ্গের চঞ্চলপদ পদমুখে রসে তুলনা করেছেন। প্রতিটি উপমা সার্থক। পদের ভণিতায় কবির গভীর হৃদিবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যথাহত প্রাণে কবি দূর থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি-বিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন।

**শব্দার্থ :** নী রদ — মেঘ। স্বৈদ-মক রন্দ — ঘাম রূপ ফুলমধু। পেঘলু — দেখলাম। নট বর — শ্রেষ্ঠ নর্তক।  
হেমকল্পতরু — কল্পিত সোনার গাছ। তাক র — তাঁর।

## ২৯.৫ বিভিন্ন পর্যায়ে র পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ

গোবিন্দদাসের ‘গৌ রাঙ্গবিষয়ক’ পদটি বাদে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদসমূহে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্নস্তরের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই ভগবৎলীলার নানা স্তর এই এককে সন্নিবেশিত। সংক্ষেপে প্রতিটি স্তরের তত্ত্বগত দিক তুলে ধরা হলো।

চণ্ডীদাসের ১নং পদ ‘সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম’—‘পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ে র। যে রতি সঙ্গমে পূর্বে স্পর্শ ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন অর্থাৎ বিভাবাদির সহযোগে চরম আনন্দ হয়, পণ্ডিতগণ তাকেই পূর্বরাগ বলেছেন। এই দর্শন ও শ্রবণ নানা ভাবে হয়, যেমন—

১। দর্শন—(ক) সাক্ষাৎ দর্শন, (খ) চিত্রপট দর্শন, (গ) স্বপ্নে-দর্শন।

২। শ্রবণ—(ক) বংশীধবনি শ্রবণ, (খ) বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, (গ) দূতীমুখে শ্রবণ, (গ) সখীমুখে শ্রবণ, (ঙ) গুণিজনের কাছে শ্রবণ।

পূর্বরাগের দশদশার কথা রূপ গোস্বামী বলেছেন—দশাগুলি হলো—ঙ্১ব লালসা, ঙ্২ব উদেগ, ঙ্৩ব জাগর্যা, ঙ্৪ব তাণব, ঙ্৫ব জড়তা, ঙ্৬ব ব্যগ্রতা, ঙ্৭ব ব্যাধি, ঙ্৮ব উন্মাদ, ঙ্৯ব মোহ এ বং ঙ্১০ব মৃত্যু।

চণ্ডীদাসের পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। শ্যামনাম শ্রবণের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্বরাগ (Love at first sight) উৎপন্ন হয়েছে। কবি সহজ সরল ভাষায়-রাধার আকুল প্রাণের বার্তা তুলে ধরেছেন পদটিতে। পূর্বরাগের ধ্যানমগ্ন চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয়-আর্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বরাগের উদেগ দশা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের ২নং পদটি ‘ভাবোচ্ছ্বাস ও মিলন’ পর্যায়ে র। ‘সই, জানি কুদিন-সুদিন ভেল।’—এই পদটিতে মিলনানন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধা-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে যে মিলন এ বং রাধিকার মনে সেই মিলনজনিত অনির্বচনীয় ভাবের উচ্ছ্বাস - তাকেই — ‘ভাবোচ্ছ্বাস’ রূপে চিহ্নিত করা যায়। দীর্ঘ বিরহের পরে এই মিলনানন্দ। তবে এ মিলন বাস্তব মিলন নয়, ভাববৃন্দা বনের মিলন। রাধিকা আশার প্রদীপ জ্বলে বসে আছেন শীঘ্রই সুদিন ফিরে আসবে। সংস্কারের নানা চিত্রের সাহায্যে কবি রাধার প্রত্যাশিত আনন্দ মধুর মিলন মুহূর্তটিকে এঁকেছেন।

মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির ১নং পদটি ‘এ সখি হামারি দুখে র নাহি ওর।’ ‘মাথুর’ পর্যায়ে র। ‘মাথুর’কে প্রবাস বলা যায়। পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশ-দেশান্তরে র দূরত্বকে প্রবাস বলে। ভাবী, ভবন, ভূত—এই তিন ভাগে প্রবাসকে ভাগ করা যায়। সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দা বন ছেড়ে মথুরায় চলে যাবার সংবাদ শুনে ‘ভাবী’ বিরহ স্মরণ করে রাধার হৃদয় গভীরে যে বিরহের কল্পনা তাকে ‘ভাবী বিরহ’ এ বং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘঅবস্থানে র ফলে রাধা যে বিরহ ভোগ করেন তাকে ‘ভবনবিরহ’ এ বং কথা দিয়েও ফিরে না আসার যন্ত্রণাকে ‘ভূতবিরহ’ রূপে চিহ্নিত করা যায়। প্রবাসজনিত বিরহের দশদশা-চিত্তা, জাগর, উদেগ, তাণ, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

বিদ্যাপতির পদটিতে বিরহিণী রাধিকা তাঁর বিরহ আর্তি প্রকাশ করেছেন প্রিয়সখীর কাছে। বর্ষাকালের মিলন-মধুর-মুহূর্তে-রাধিকার জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের হাহাকার। রূপদক্ষ বিদ্যাপতি আনন্দ মধুর প্রকৃতির পটভূমিকায় রাধার অন্ধকারাচ্ছন্ন উদাসভাব সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিদ্যাপতির ২নং পদটি ‘প্রার্থনা’ পর্যায়ে র। রাধা-কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্ত-ভগবানের লীলা—এই প্রার্থনা পর্যায়ে কোথাও মুখ্যস্থান গ্রহণ করেনি। অন্যান্য স্তরের পদে কবির হৃদয়ানুভূতি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে পল্লবিত হলেও বিদ্যাপতির এই পদে কবির হৃদয় আর্তি ভক্তি রসকে অবলম্বন করে বাধা বন্ধাহীন ভাবে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করেছে। প্রার্থনা বিষয়ক-পদের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিদ্যাপতি আত্ম সমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের নৈবেদ্যগুলি

সাজিয়েছেন। সা রা জী বনে র ব্যর্থতা, গ্লানি, বিপথগামিতা সব কিছু তুলে ধরে জী বন সায়াহে ভগ বানে র চরণ-প্রাপ্তিই যে মুক্তির একমাত্র পথ—এই উপলব্ধির জগতে পৌছেছেন।

জ্ঞানদাসে র ১ নং পদটি প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানু রাগে র পদ। এখানে কবি শ্রী রাধিকা র হৃদয় আর্তিকে বিষম অলঙ্কারে র সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি জী বনকে মধুময় ক রতে যা যা চেয়েছেন কপালদোষে তা র বিপরীত ফল পেয়েছেন। শ্রী রাধিকা র মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পদটির পরতে পরতে আছে।

প্রেমবৈচিত্র্যে র মূল কথা হলো, প্রেমে র উৎকর্ষ এ বং এই প্রেমে র উৎকর্ষে র জন্য নিজে র ভাগ্যে র প্রতি আক্ষেপ। বৈষম্যবপদা বলী সাহিত্যে এই মূল তত্ত্বটিই আক্ষেপানু রাগ নামে চিহ্নিত। রূপ গোস্বামী র মতে আট রকমে র আক্ষেপ আছে।

ঙ্গ ১ব শ্রীকৃষ্ণে র প্রতি আক্ষেপ, ঙ্গ ২ব নিজে র প্রতি আক্ষেপ, ঙ্গ ৩ব সখী র প্রতি আক্ষেপ, ঙ্গ ৪ব দূতী র প্রতি আক্ষেপ, ঙ্গ ৫ব মুরলী র প্রতি আক্ষেপ, ঙ্গ ৬ব বিধাতা র প্রতি আক্ষেপ, ঙ্গ ৭ব কন্দর্পে র প্রতি আক্ষেপ এ বং ঙ্গ ৮ব গুবুজনদে র প্রতি আক্ষেপ।

জ্ঞানদাসে র এই পদে শ্রী রাধিকা নিজে র প্রতি ও বিধাতা র প্রতি আক্ষেপকেই প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানদাসে র ২নং পদটি ‘রূপানু রাগে’ র পদ। কৃষ্ণে র রূপে পাগলিনী শ্রী রাধিকা র মন-প্রাণ অস্থির। শ্রীকৃষ্ণে র দর্শন ও তাঁ র দেহে র স্পর্শ পা বা র জন্য রাধা তা র স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাকে হারিয়ে ফেলেছে। এইজন্য তাকে ঘিরে নানা কানাকানি। ভাব ও ভাষায় পদটি সুসমৃদ্ধ।

গোবিন্দদাসে র ১ নং পদটি ‘অভিসার’ পর্যায়ে র। ‘পূর্বরাগে’ যে প্রেমে র সূচনা ‘অভিসারে’ র ক্ষুরধা র পথে সেই প্রেমে র অগ্নি পরীক্ষা। প্রিয় মিলনে র উদ্দেশ্যে সংকেত কুঞ্জে যাত্রাকেই অভিসার বলা হয়। দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিলম্ব পেরিয়ে ভক্ত ভগ বানে র সঙ্গে মিলিত হতে চান। রূপ গোস্বামী র মতে ছয় প্রকার অভিসারিকা র। উল্লেখ আছে। যথা— ঙ্গ ১ব জ্যোৎস্নাভিসারিকা, ঙ্গ ২ব তিমিরাভিসারিকা, ঙ্গ ৩ব লণ্ণালীনা অভিসারিকা, ঙ্গ ৪ব নিঃশব্দাভরণা অভিসারিকা, ঙ্গ ৫ব কুতা বগুণ্ঠিতা অভিসারিকা, ঙ্গ ৬ব স্নিগ্ধক সখীযুগ্মা অভিসারিকা।’ পীতাম্বর দাস অভিসারকে ৮টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—জ্যোৎস্না, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুণ্ঠিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্ততা, সঞ্চরা।

তামসী ও বর্ষা অভিসারে র প্রস্তুতি রয়েছে, গোবিন্দদাসে র পদে। শ্রী রাধিকা র কুস্ত-সাধনা র গোপন মহড়া দেখা যায়। অগুধকার র রাত, বিদ্যুতে র চমকদমক, বজ্রপাত, সর্প দংশনে র ভয় ইত্যাদি র কথা মেনে রেখে সব কিছুকে জয় করে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণে র সন্দেশ মিলিত হওয়া যাবে তা র জন্যই রাধিকা র দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। কবি রাধা র দুঃখ জয়ে র সাধনা র চিত্রটিকে শিল্প সৌন্দর্য দান করেছেন।

গোবিন্দদাসে র ২নং পদটি গৌ রান্দগ বিষয়ক। একই অন্বেগ রাধা ও শ্রীকৃষ্ণে র প্রতিভূরূপে শ্রীগৌ রান্দগ বৈশ্ব ব সমাজে পূজিত। চৈতন্যদেবে র তিরোভাবে র পর গোবিন্দদাস পদটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাননি বলে পদটিতে আক্ষেপে র সুরও ধ্বনিত হয়েছে। কৃষ্ণ প্রেমে পাগল গৌ রান্দগদেবে র ভাববিহতল মূর্তিটি কবি সার্থক উপমা র সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। পদটি শিল্প রস ও লালিত্যে মধুর।

## ২৯.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

১। চণ্ডীদাসঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে 'চণ্ডীদাস' নামযুগ্ম বহু কবি পদ রচনা করেছেন। তবে চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুগ্ম বিভিন্ন পদা বলী র মধ্যে রসগত পার্থক্য ও ক্রমভঙ্গগজনিত ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে আবিষ্কারের পর 'চণ্ডীদাস' সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। আজও এ সমস্যা র সমাধান হয়নি। তবে নির্দিষ্টায় বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাস ও পদা বলী র চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন। তবে দীন চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা—এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক গবেষকগণ আজও একমত হতে পারেননি।

পদা বলী র চণ্ডীদাস প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি। বীরভূমের নানুর বা নানুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে র অধিবাসী। বাশুলী পূজারী চণ্ডীদাস গ্রাম বাংলার ভোগ-বিলাসহীন অকৃত্রিমভাবে তন্দয় কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। মিলনেও তাঁর সুখ নেই। তিনি শত দুঃখকে সহ্য করেছেন। কবি সুখের মধ্যে দুঃখ এ বং দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করেছেন। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসের রাধা আত্ম নিবেদিতা—'যোগিনীপা রা'। তাঁর কাব্য সম্ভার নিরাবৃত্ত প্রাণের শাস্ত্র-কোমল স্নিগ্ধতায় ভরা। বাঙালির প্রাণের কবি রূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত। বিলাস-ঐশ্বর্যের ধারে কাছেও তিনি যাননি। তিনি বিরহ-বেদনার শাস্ত্র রসের আত্মনিমগ্ন কবি। পূর্বরাগ অনুরাগ থেকে শুরুর করে ভাবোজ্জ্বাস মিলন পর্যায় পর্যন্ত চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় মনের কথাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি যেন কবি সরস্বতীকে ডাক দিয়ে বলেছেন—/যেমন আছ তেমনি আসো আর করো না সাজ।\* প্রেমের প্রগাঢ় রূপ চণ্ডীদাস তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখনীতে রাধা ও কৃষ্ণ 'পরাণে পরান বাণ্ডা আপনি আপনি' মিলনমুহুর্তেও হারাই হারাই ভাব।

/দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিহে২৬দ ভাবিয়া'

আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।\*

লৌকিক জীবনে এই প্রেম দুর্লভ।

অভিসারের পদেও চণ্ডীদাসের পদ মর্মস্পর্শী বেদনায় স্পঞ্জিত। নৈশ-বর্ষাভিসারের

/এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা

কেমনে আইলে বাটে।\*

পদটিতে কবি কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা ও প্রেম ব্যাকুলতাকে একাকার করে রাধার হৃদয় বেদনাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'আক্ষেপানু রাগে'র পদগুলিতেও কবির ভাব-নিবিড়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদনের পদে চণ্ডীদাস সুদূর বৈরাগ্যের মোহিনী মায়ায় সংযত বাক্, আত্মসমপণী ভাব রসে নিমগ্ন।

'ভাবোজ্জ্বাস'-এর পদে—'সহ্য করিবার কবি' রূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত।

পদা বলী র প্রতিটি পর্যায়ে র পদেই চণ্ডীদাসের হাতে শ্রী রাধিকা বাঙালি নারীর চিরম্বন সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক রূপে সু-অন্দিকত।

২। বিদ্যাপতিঃ বংশগত সূত্রে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা কবি রূপে বহু গ্রন্থাদি লিখলেও ব্রজ বুলি ভাষায় রচিত তাঁর বৈষ্ণব পদগুলির জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে চির আসন লাভ করেছেন। কবি 'অভিনব জয়দেব' 'মেথিল কোকিল' নামে চির পরিচিত। তাঁর হাতে রাধা ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে যৌবন লগ্নে পূর্ণ লীলাময়ী রূপে

লাভ করেছেন। পূর্বরাগ অনুরাগ পর্যায়ে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছেন বানুরাগের চাপল্য। বিদ্যাপতি ঐশ্বর্যের কবি, সুখের কবি। রূপানুরাগের পদে তিনি দেহ-সম্ভোগের কবি হয়েছেন। রূপ ও ভাবে রাধাকে বিদ্যাপতি যেভাবে সাজিয়েছেন—তা তুলনা রহিত।

অভিসারের যাত্রায় তাঁর রাধার অন্দগ-প্রত্যন্দগের জ্যোতি ও অলন্দকারের দ্যুতিতে উচল। ‘মাথুরে’ রাধিকার ক রুণ আর্তি ধবনিত হয়েছে। ‘ভাবোদ্ধাস’ ও ‘মিলনে’ বিদ্যাপতির হাতে রাধার ভাবকুতি এক আর্ছ্য রসাবেশে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। অপার্থিব ভাব-সম্মিলনের নিদর্শন।

/আজু রজনী হাম ভাগেপোঁ হায়লুঁ\*—পদটি।

ভাবের অতলম্ভ গভীরতায়, শব্দবাংকারের লালিত্যে, ছন্দে অপ রূপ সুষমায় ও অলন্দকারের মগুনকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাম্বিত পদগুলি অতুলনীয়। তাঁর মতো রস-নিপুণ স্রষ্টা বিরল।

**৩। জ্ঞানদাস :** চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজন বৃন্দে মধ্যমণি—কবি জ্ঞানদাস। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পদে কবির জন্ম। তিনি ‘খেতুরী’ উৎসবেও যোগ দিয়েছিলেন। কবি নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব ভণ্ড ছিলেন। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজ বুলি ভাষায় পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সংযত হৃদয় রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর রূপানুরাগের পদগুলি হৃদয়-স্পঞ্জিত অনুভূতিতে ও ভাব-ব্যাকুলতায় গাঢ় বদ্ধা ‘রূপোদ্ধাসে’ র

/ রূপের পাথারে আঁখি ডুবে সে রহিল

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।\*

পদটি স্মরণীয়। আক্ষেপানুরাগের পদে শ্রী রাধার হৃদয় বেদনা ও প্রেম তন্দ্রয়তা কবির লেখনীতে আধুনিক কালের সীমাকে স্পর্শ করেছে। রূপমুগ্ধতা ও শ্রী রাধিকার হৃদয়-বেদনা প্রকাশে কবির চিত্র প্রতীক ও আবেগ অপূর্ণ সমন্বয় লাভ করেছে।

**৪। গোবিন্দদাস :** বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য—‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’—গোবিন্দদাস মহাজন রূপে বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ সঁচান দখল করেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্শ্ব চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবির অতুলনীয় কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে ‘কবিরাজ’ বা ‘কবীন্দ্র’ উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি বিদ্যাপতির ভাব-ভাষাকে আত্মসংস্থ করে অভিনব গীতি ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর ‘গৌরান্দগ বিষয়ক’ পদ বাক্‌মূর্তি ও আবেগে অনন্য। তিনি চাতুর্যের সন্দেহ মাধুর্য মিশিয়ে ব্রজ বুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। অভিসারের পদে গোবিন্দদাস সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর

‘মন্দির বাহির কঠিন কপাট।

চলিতে শব্দিকল পন্দিকলপাট।’

পদটি এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবিমিশ্র ব্রজ বুলি ভাষা, ছন্দে বৈচিত্র্য ও অলংকারের সার্থক প্রয়োগে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার চিরকালের সম্পদ হয়েছে। ভাব-মাধুর্য ও হৃদয়বেগের ঐশ্বর্যে তাঁর পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

## ২৯.৭ অনুশীলনী

---

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর শেষে উত্তর সংকেত মিলিয়ে নিন।

- ১। নীচের শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ কৰুন :
- ভ্ৰুকৰ গোবিন্দ্ৰদাস ————— নামে পৰিচিত।  
ভ্ৰুখৰ বিদ্যাপতি অভিনব ————— ৰূপে চিহ্নিত।  
ভ্ৰুগৰ জ্ঞানদাস ————— ভা বশিষ্য।  
ভ্ৰুঘৰ বিদ্যাপতি ————— ভাষায় পদ রচনা কৰেছেন।  
ভ্ৰুঙৰ অভিসাৰ পৰ্যায়ের শ্ৰেষ্ঠ কবি হলেন —————।
- ২। নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলি র ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরগুলি র মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি র পাশে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত কৰুন।

ভ্ৰুকৰ চণ্ডীদাস —

ভ্ৰুস সুখেৰ কবি  
ভ্ৰুস দুখেৰ কবি  
ভ্ৰুস নৈরাশ্যবাদী কবি  
ভ্ৰুস আশাবাদী কবি

ভ্ৰুখৰ 'কবিৰাজ' উপাধিধাৰী হলেন —

ভ্ৰুস চণ্ডীদাস  
ভ্ৰুস বিদ্যাপতি  
ভ্ৰুস গোবিন্দ্ৰদাস  
ভ্ৰুস জ্ঞানদাস

ভ্ৰুগৰ 'প্ৰাৰ্থনা' পদের শ্ৰেষ্ঠ কবি হলেন —

ভ্ৰুস চণ্ডীদাস  
ভ্ৰুস বিদ্যাপতি  
ভ্ৰুগৰ জ্ঞানদাস  
ভ্ৰুস গোবিন্দ্ৰদাস

- ৩। 'ব্ৰজবুলি' ভাষা সম্পৰ্কে ৪ লাইনে আপনাৰ বশু ব্য লিখুন।

.....  
.....  
.....  
.....

- ৪। 'পাসৰিতে কৰি মনে পাসৰা না যায় গো



কি কৰিব কি হ'বে উপায়।'

এই পদ্যাংশটি কাৰ লেখা? কোন্ পৰ্যায়ৈ? পদ্যাংশটি ৪টি চরণে ব্যাখ্যা কৰুন।

.....

.....

.....

.....

৫। 'তুয়া বিনা গতি নাই আৰ'

কে? কোন্ পৰ্যায়ৈ? কাৰ কাছে এই আবেদন কৰেছেন?

.....

.....

.....

৬। /এ ভৱা বাদৰ

মাহ ভাদৰ

শূন্য মঞ্জিৰ মোৰ।\*

এই পদ্যাংশটি কাৰ লেখা? কোন্ পৰ্যায়ৈ? পদ্যাংশে কোন্ জী বনৰস প্ৰকাশ পেয়েছে?

.....

.....

.....

৭। নীচেৰ শব্দগুলিৰ শব্দার্থ লিখুন।

এছন, পাসৰিতে, ভেল, ওৰ, পাহুন, অথিৰ, তাতল, অমিয়, চীৰহি, পৰমান।

---

## ২৯.৮ উত্তৰমালা

---

১। ঙ্গকৰ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, ঙ্গখৰ জয়দেব, ঙ্গগৰ চণ্ডীদাসেৰ, ঙ্গঘৰ ব্ৰজ বুলি, ঙ্গঙৰ গোবিন্দদাস।

২। ঙ্গকৰ ২, ঙ্গখৰ ৩, ঙ্গগৰ ২

৩। ব্ৰজ বুলি ভাষা মাগধী অপভ্ৰংশ ভাষা থেকে জাত। কিন্তু সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়েৰ মতে বিদ্যাপতিৰ ব্ৰজ বুলিৰ প্ৰধান উপাদান মাগধী অপভ্ৰংশ হলেও, তাতে শৌৰসেনী অপভ্ৰংশেৰ কিছু মিশ্ৰণ আছে। সুতৰাং উপাদানেৰ দিক থেকে ব্ৰজ বুলি ভাষা মৈথিলী, বাংলা এ বং আংশিক হিছনী তথা শৌৰসেনী অপভ্ৰংশেৰ মিশ্ৰণে গঠিত।

৪। অংশটি চণ্ডীদাসেৰ লেখা। পদ্যাংশটি 'পূৰ্বৰাগ' পৰ্যায়ৈৰ কৃন্তেৰ নাম শ্ৰবণে রাখা দিশেহাৰা। কি কৰবেন—তাৰ ভবিষ্যৎ কী—কিভাবে শ্ৰীকৃন্তেৰ সন্দেগ মিলিত হবেন—এই সব চিন্তায় রাখা রমন ব্যাকুল হয়েছে। কৃন্তকে ভুলে যেতে চান কিন্তু তা তাঁৰ পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'বে না।

৫। এই অংশটি র রচয়িতা ‘মেথিল কোকিল বিদ্যাপতি। অংশটি ‘প্রার্থনা’ পর্যায়ে র। ভগ বানে র কাছে কবি এই ঐকান্তিক কৰেছেন।

৬। পদ্যাংশ বিদ্যাপতি র লেখা। পদ্যাংশটি ‘মাথু র’ পর্যায়ে র। বি রহ-বেদনা দন্ধ রাধা র জী বনে র ক বুণ রস এই অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৭ষএই রূপ, ভুলে যেতে, হলো, শেষ, প্র বাসী, অসিঁথ র, উত্তে, অমৃত, বদ্রখণ্ড, প্রমাণ।

---

## ২৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

---

- ঙ্ৰস বান্দগালা সাহিত্যে র ইতিহাস — সুকুমা র সেন,  
ঙ্ৰস শ্ৰী রাধা র ক্রমবিকাশ— শশীভূষণ দাশগুে,  
ঙ্ৰস মধ্যযুগে র কবি ও কা ব্য— শন্দক রীপ্রদাস বসু  
ঙ্ৰস বৈম্ভ ব পদা বলী ঙ্ৰচয়নৰ—

অধ্যাপক শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ,  
শ্ৰীসুকুমাৰ সেন,  
শ্ৰীবিশ্বপতি চৌধুৰী,  
শ্ৰীশ্যামাপদ চক্ৰ বৰ্তী,  
সম্পাদিত ৩ ভূষষ্ঠ সংস্কৰণৰ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

---

## একক ৩০ □ ৰামায়ণ — জ্ঞানৰণ্যকাণ্ড — কৃষ্ণি বাস ওঝা

---

গঠন

- ৩০.১ উদ্দেশ্য
- ৩০.২ প্ৰস্তাৱ বনা
- ৩০.৩ মূলপাঠ—অৰণ্যকাণ্ড—কৃষ্ণি বাস
- ৩০.৪ সাৰাংশ
- ৩০.৫ সাৰ সংক্ষেপ
- ৩০.৬ জ্ঞানৰ প্ৰকৃতি চিত্ৰ, জ্ঞানৰ যুদ্ধ বৰ্ণনা, জ্ঞানৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰণ
- ৩০.৭ অৰণ্য কাণ্ডেৰ বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীৰ বিশ্লেষণ
- ৩০.৮ কৃষ্ণিবাসেৰ কবি পৰিচিতি ও কবিকৃষ্ণি আলোচনা
- ৩০.৯ অনুশীলনী
- ৩০.১০ উক্ত ৰমালা
- ৩০.১১ গ্ৰন্থপঞ্জী

---

### ৩০.১ উদ্দেশ্য

---

এই একক পাঠ কৰিলে আপনি—

- কৃষ্ণিবাসেৰ বাঙলা ভাষায় অনুদিত ‘শ্ৰী ৰাম পাঁচালী’ৰ—সাতটি কাণ্ডেৰ অন্যতম ‘অৰণ্যকাণ্ড’ সম্পৰ্কে বিস্তাৰিতভাৱে সব কিছু জানতে পাৰিবেন। সেই সন্দেগ অন্যান্য ছ’টি কাণ্ড সম্পৰ্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্যদি জানিবেন।

- অরণ্যকাণ্ডে র ঘটনা বিন্যাস, প্রকৃতি চিত্রণ, চরিত্রাদি র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সব কিছু জেনে—এই খণ্ডে র যে কোনো প্রশ্ন আলোচনা ক রতে পা রবেন এ বং নিজে র ভাষায় লিখতে পা রবেন।
- অনুবাদক হিসাবে কৃতি বাসে র কৃতিত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন ক রতে পা রবেন।
- কৃতি বাসে র কল্পনাশক্তি, গল্প রসবোধ, বাঙালি র হৃদি রসজাড়িত চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতা, সহজ সরল ভাষা র প্রকাশ-নৈপুণ্য ইত্যাদি দিক থেকে কবি র যথার্থ মূল্যায়ন ক রতে পা রবেন।
- কৃতি বাসে র কা ব্যকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে কেন ভা বানুবাদ বলা হয় তা রও পরিচয় পা বেন।
- বাল্মীকি র রামায়ণে র বাঙলা ভাষায় অনূদিত কা ব্যগ্রন্থখাদি র মধ্যে কৃতি বাসে র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে র নানা তত্ত্ব ও তথ্যাদিও জানতে পা রবেন।

## ৩০.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে কৃতি বাসে র ‘শ্রী রাম পাঁচালী’ র ‘অরণ্যকাণ্ড’ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই কাণ্ডে র ঘটনা বিন্যাস নিম্নরূপ—

- ৩০২০১ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা র দণ্ডকা রণ্য প্রবেশ ও ঋষিগণে র দ্বা রা সং বর্ধনা।
- ৩০২০২ বি রাধে র সীতাহ রণ।
- ৩০২০৩ বি রাধে র রাম-লক্ষ্মণ হ রণ।
- ৩০২০৪ বি রাধ সম্পর্কে নানাকথা এ বং বি রাধ বধ।
- ৩০২০৫ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা র শ রভদ্রেগ র আশ্রমে গমন, ইন্দ্রদর্শন ও শ রভদ্রেগ র আগুনে প্রবেশ।
- ৩০২০৬ নিশাচ রণে র অত্যাচারে র কথা শুনে রামচন্দ্রে র আশ্বাসদান এ বং সুতীক্ষ্ণে র তপো বনে যাত্রা।
- ৩০২০৭ সুতীক্ষ্ণে র আশ্রমে রামচন্দ্রে র অভ্যর্থনা ও বাক্য বিনিময়।
- ৩০২০৮ দণ্ডকা রণ্যে র ঋষিগণে র আশ্রম দর্শনে র জন্য রামে র ই ২৬।
- ৩০২০৯ দণ্ডকা রণ্য ঋতুমণ-সম্বন্ধে সীতাদে বী র কথা।
- ৩০২১০ দণ্ডকা রণ্য ঋতুমণ সম্পর্কে রামে র বশু ব্য।
- ৩০২১১ পঞ্চপস র সরো বেরে র কথা, অগস্ত্যমুনি র আশ্রমে র নানা কথা, ইষমা বাহে র আশ্রমও অগস্ত্যমুনি র আশ্রমে র উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রে র যাত্রা।
- ৩০২১২ অগস্ত্যে র অতিথি ও আপ্যায়ন ও অস্ত্রপ্রদান।
- ৩০২১৩ পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা র যাত্রা।
- ৩০২১৪ জটায়ু র সন্দেহ রামচন্দ্রে র সাক্ষাৎ, অর্চনা ও পঞ্চবটী বনে প্রবেশ।
- ৩০২১৫ লক্ষ্মণে র পঞ্চবটী বনে আশ্রম তৈরী ও সেখানে তিনজনে র অবস্থান।
- ৩০২১৬ শীত-ঋতু র বর্ণনা।

১৫৭ লক্ষ্মণের কাছে শূর্পনখার আগমন ও তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণের প্রস্তাব।  
 ১৫৮ লক্ষ্মণের দ্বারা শূর্পনখার নাক-কান ছেদন।  
 ১৫৯ শূর্পনখার অনুরোধে খরের রাক্ষস প্রেরণ।  
 ১৬০ রামের রাক্ষস বধ।  
 ১৬১ খরের কাছে শূর্পনখার বিলাপ ও ভর্ৎসনা।  
 ১৬২ খরের ক্রোধ ও যুদ্ধ যাত্রা।  
 ১৬৩ রাক্ষসগণের অত্যাচার, উৎপাত।  
 ১৬৪ দল বল সহ খরের আগমন।  
 ১৬৫ রামচন্দ্রের সন্দেহ খরের যুদ্ধ বর্ণনা।  
 ১৬৬ চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ।  
 ১৬৭ রামের ত্রিশিরা বধ।  
 ১৬৮ খরের পরাজয়, নিধন এবং দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা রামের সংবর্ধনা।  
 ১৬৯ অকম্পনের লঙ্কায় গমন, রামের বীরত্ব কাহিনী, বর্ণনা, রাবণের মারীচ অশ্রমে গমন ও ফিরে আসা।  
 ১৭০ শূর্পনখার লঙ্কায় গমন।  
 ১৭১ রাবণকে শূর্পনখার ভর্ৎসনা।  
 ১৭২ সীতাকে হরণের জন্য শূর্পনখার উৎসাহ দান।  
 ১৭৩ রাবণ-মারীচ সংবাদ।  
 ১৭৪ মারীচের কাছে রাবণের সাহায্য প্রার্থনা।  
 ১৭৫ মারীচ ও রাবণের পারস্পরিক ভর্ৎসনা ও রাবণের আদেশ দান।  
 ১৭৬ সোনার হরিণের রূপ ধরে মারীচের দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ।  
 ১৭৭ রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।  
 ১৭৮ মারীচ বধ।  
 ১৭৯ সীতা-লক্ষ্মণ সংবাদ।  
 ১৮০ ব্রাহ্মণবেশে রাবণের আগমন রাবণ-সীতার কথোপকথন, সীতাহরণ ও সীতার বিলাপ।  
 ১৮১ রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ—জটায়ুর পরাজয়।  
 ১৮২ সীতাকে নিয়ে রাবণের আকাশপথে গমন।  
 ১৮৩ সীতার ভর্ৎসনা ও বিলাপ।  
 ১৮৪ সীতার মনোরঞ্জনের নানা চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে অশোক কাননে সীতাকে বঙ্কী করে রাখা।  
 ১৮৫ রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ। 149  
 ১৮৬ সীতাহারা রামের বিলাপ।  
 ১৮৭ বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ ও রামের কাতরতা।  
 ১৮৮ রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের প্রবেশ দান।  
 ১৮৯ জটায়ুর কাছ থেকে সীতাহরণের সংবাদ প্রাপ্তি।  
 ১৯০ জটায়ুর মৃত্যু ও সৎকার।  
 ১৯১ কবচের সন্দেহ দেখা—তার বাহু ছেদন—লক্ষ্মণের পরিচয় দান।

ঙ্গ্ৰেব কবন্ধ -রাম সংবাদ এ বং কবন্ধর দ্বারা सुग्रीवের সঙ্গে रामের मित्रता স্থাপনের উপদেশ ও তার  
বাসস্থান নির্দেশ করে কবন্ধের স্বর্গারোহণ।

(৫৩ৰ রাম-শবরী সংবাদ ও শবরীৰ স্বৰ্গ গমন।

(৫৪ৰ রাম-লক্ষ্মণের পম্পা দর্শনে গমন ও रामের বিলাপ।

অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাসের ক্রম-পরম্পরার যেন বৈচিত্র্য তেমনি নিবিড় ঐক্য দেখতে পাবেন। রাম-সীতার দাম্পত্য জীবনের মধুর ও বিরহ রূপটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। লক্ষ্মণের আতৃভক্তি, রামচন্দ্রের শৌর্য-বীর্যের পাশাপাশি স্নেহ-ভালো বাসা নিবিড় রূপটি আকর্ষণীয়। প্রকৃতি চিত্রণে খণ্ডটিতে ভিন্নস্বাদ-সৃষ্টি হয়েছে। বাঙ্গালিকি ‘শূরধর্মী’ কাব্য কৃতি বাসের হাতে কিভাবে ‘গৃহধর্মী’ হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ ‘অরণ্যখণ্ড’টি। রামের প্রেম-করণাঘন মূর্তি, লজ্জানন্দ বধুরূপী সীতা ও সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের আতৃভক্তি অতুলনীয়। ‘বাঙালির জাতীয় কবি’ রূপে চিহ্নিত কৃতি বাসের ‘শ্রী রাম পাঁচালী’র অনন্য খণ্ড হল ‘অরণ্যখণ্ড।’ এই খণ্ডের ঘটনা ধারার সারাংশ পরের এককে আপনারা পাবেন। সেই সারাংশে প্রস্তাবনায় চিহ্নিত ঘটনাধারার সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। কৃতি বাসের কল্পনা শক্তি, ঘটনা বিন্যাস, ভাষা ও ছন্দ শৈলী, অলঙ্কার প্রয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়েও আপনারা সমৃদ্ধ হতে পারবেন।

### ৩০.৩ মূল □ পাঠ অরণ্যকাণ্ড

মূলং ধর্মতরোধিবকজলধঃ পূর্ণেচ্ছু মানন্দং।  
বৈরাগ্যম্বুজ ভাস্করং ত্রঘহরং ধান্তাপহং তাপহম্।।  
মোহাস্তৌধরপুঞ্জপাটর্নববৌ স্বেশস্ত বং শঙ্করং।  
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রী রামভূপপ্রিয়ম্।।  
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌ ভগতনং পীতাম্বরং সুন্দরং।  
পাগৌ বাণশরাসনং কটিলসত্ত্বণী রভারং বরম্।।  
রাজী বায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং।  
সীতালক্ষ্মণংসংযুতং পথিগতং রামানি রামং ভজে।।

### চিত্রকূট পর্বতে শ্রী রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্ম তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

করিলেন অযোধ্যয় ভারত গমন।  
চিত্রকূট পর্বতে রহেন তিনজন।  
চিত্রকূট পর্বতে অনেক মুনি বৈসে।  
ভালমন্দ যখন যে রামের জিজ্ঞাসে।।  
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।  
জিজ্ঞাসা করেন সবে রাম রঘুমণি।।  
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা।

আমারে না কহ কেন বাড়িও যন্ত্রণা।।  
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।  
একে র ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি।।  
যদি কোনো বিপদ হয়েছে উপস্থিত।  
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।  
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।  
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে।।

যে মন্ত্রণা করিতে ছিলেন রঘুবর।  
 তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।।  
 রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।  
 তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর।।  
 তাহার সামন্ত গণ চতুর্দিকে ঙ্গে।  
 কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে।।  
 যজ্ঞ আরম্ভণ মাত্র আসিয়া নিকটে।  
 যজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে।।  
 রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।  
 ফল মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গয়ে কলসী।।  
 এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।  
 কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ।।  
 মূনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।  
 শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন।।  
 সীতা অতি রূপবতী এই বন মাঝে।  
 কেমনে রাখিবে রাম রাক্ষস সমাজে।।  
 বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে।  
 কত সম্বরিয়া রাম থাকি বা কাননে।।  
 আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।  
 তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই।।  
 স্ত্রী-পুরুষে মূনিগণ চলেন সত্বর।  
 যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর।।  
 উঠে গেল মূনিগণ শূন্য দেখা যায়।  
 শ্রী রাম ভাবেন তবে তাহার উপায়।।  
 কৃতিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।  
 গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি।।

অত্রি মুনির আশ্রমে শ্রী রামের গমন ও উক্ত  
 মুনিপত্নির নিকট সীতার জন্মাদি কথন  
 এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরোধ বধ।

আমরা নিতে ভারত আইল পুনর্বার।  
 কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার।।  
 চিত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহু দূর।

ভারত ভারত ভারত আমাতে প্রচুর।।  
 রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।  
 চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে।।  
 কতদূর যান তারা করি পরিশ্রম।  
 সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম।।  
 প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপো বন।  
 বঞ্চনা করেন অত্রি মুনির চরণ।।  
 রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।  
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে।।  
 আপনার পত্নী ঠাই সমর্পিলা সীতা।  
 পালন করহ যেন আপন দুহিতা।।  
 দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।  
 মূর্ত্তিমতি কবুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।।  
 শুল্ক বস্ত্র পরিধান শুল্ক সর্ব বেশ।  
 করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ।।  
 তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।  
 জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা।।  
 কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।  
 আশীর্বাদ করিলেন অত্রি বনিতা।।  
 মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।  
 কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে।।  
 রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলে রাজকুলে।  
 দুই কুল উজ্জ্বল করিলে গুণে শীলে।  
 এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।  
 হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়।।  
 সীতা কহিলেন মা সম্পদে কি বা কাম।  
 সকল সম্পদ মম দুর্বাদল শ্যাম।।  
 স্বামী বিনা স্ত্রীলোকে র কার্য কি বা ধনে।  
 অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে।।  
 জিতেদ্রিয় প্রভু মম সর্বগুণে গুণী।  
 হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি।।  
 ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।

আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।  
 শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনি দারা।  
 আপনার যেমন সীতার সেই ধারা।।  
 সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।  
 দিব্য অলঙ্কার আর বহু মূল্য ধন।।  
 তুষ্ট হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী।  
 তব পূর্ব বৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী।।  
 জানকী বলেন দেবী কর অবধান।  
 আমার জন্মের কথা অপূর্ব আখ্যান।।  
 একদিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে।  
 তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য পড়ে।।  
 সেই বীর্যে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।  
 উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে।।  
 অযোনি সম্ভবা মম জন্ম মহীতলে।  
 লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে।।  
 নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।  
 হেনকালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী।।  
 দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি।  
 জন্মিল তোমার বীর্যে কন্যা রূপবতী।।  
 অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।  
 লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা।।  
 এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।  
 দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন।।  
 প্রধান দেবীর ঠাঞি দিলেন আমারে।  
 আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে।।  
 দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ে পালনে।  
 আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে।।  
 যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।  
 তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে।।  
 দাবুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।  
 তের লক্ষ বর এল রাজার কুমার।।  
 ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।

না সন্তাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে।।  
 প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।  
 কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া।।  
 হেনকালে উপস্থিত শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন।।  
 ধনুকেতে দিতে গুণ সর্বলোকে বলে।  
 ধনুখান ধরি রাম বাম হাতে তোলে।।  
 গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।  
 সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে।।  
 ধনুকের শব্দে যেন পড়িল বাঙ্কনা।  
 স্বর্গমর্ত্য পাতালেতে কাঁপিল সর্বজনা।।  
 শিরে পঞ্চাঙ্গুটি রাম বিক্রম বিস্তর।  
 চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার।।  
 বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।  
 না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে।।  
 রাজ্যসহ দশরথ আসিয়া সম্বাদে।  
 রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে।।  
 শ্রী রাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।  
 লক্ষ্মণের দারকর্ন উর্শ্মিলার সহ।।  
 কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।  
 ভরত শত্রুঘ্ন দৌহে বিবাহ করিল।।  
 ভগবতী পূর্বকথা এই কহিলাম।  
 হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম।।  
 এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।  
 পরিতুষ্ট হইলেন মুনির গৃহিণী।।  
 ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিঙ্গুর।  
 কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর।।  
 কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন কঙ্কন।  
 নূপুরে শোভিত হয় কমল চরণ।।  
 নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।  
 পটু বস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায়।।  
 প্রদোষ হইল গত প্রবেশ রজনী।



রামের নিকটে যান শ্রী রাম রমণী।।  
 উমা রামা নাহি পান সীতার উপমা।  
 চরাচরে জনক দূহিতা নিরুপমা।।  
 দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।  
 মুনির আশ্রমে সুখে বধেক্স রজনী।।  
 প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।  
 তিন জন বন্দিলেক মুনির চরণ।।  
 আর্শীর্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।  
 কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী।।  
 শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশ।  
 সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ।।  
 অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।  
 তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।  
 মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।  
 দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি।।  
 আগে যান রঘুনাথ পছাতে লক্ষ্মণ।  
 জনক তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন।।  
 ফল পুষ্প দেখেন গণ্ডেধতে আমোদিত।  
 ময়ূরের কেকাধবনি শ্রমরের গীত।।  
 নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।  
 সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।  
 বন মধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।  
 শ্রী রামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।।  
 রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সম্মান।  
 যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান।।  
 রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।  
 আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।।  
 দেখিতে হইল ইহা দণ্ডক কানন।  
 তিন জনে মনসুখে করেন ভ্রমণ।।  
 আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।  
 নানা স্থলে কৌতুকে করেন নিরীক্ষণ।।  
 হেনকালে দুর্জয় রাক্ষস আচম্বিত।

বিকট আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত।।  
 রান্ধগা দুই অঁখি তার কঠিন হৃদয়।  
 বনজন্তু ধরে মারে কারে নাহি ভয়।।  
 দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান।  
 জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।  
 শিরে দীর্ঘজটা কাটা দীর্ঘ সর্বকায়।  
 লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায়।।  
 বাঙ্কিয়া লইয়া যায় মাংস ভার স্কন্ধে।  
 পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে।।  
 মেঘের গর্জনে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।  
 মহাভয়ঙ্কর মূর্তি রাক্ষস বিরাধ।।  
 সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।।  
 তর্জন গর্জন করে থাকে অন্তরীক্ষে।।  
 সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।  
 শ্রী রামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন।।  
 তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস্ কাননে।  
 দেখাইয়া কামিনী ভুলাস্ মুনিগণে।।  
 বলিল মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।  
 ঝাঁট পরিচয় দেহ তোরা কোনজন।।  
 শ্রী রাম বলেন আমি ক্ষত্রিয় কুমার।  
 লক্ষ্মণ অনুজ জায়া জানকী আমার।।  
 দেখি হে তোমার কেন বিকৃতি বদন।  
 বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জন।।  
 রাক্ষস বলিল আমি যে হই সে হই।  
 সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।  
 বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।  
 কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্বথা।।  
 কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।  
 অভেদ্য শরীর মম ভয় করি কারে।।  
 লক্ষ্মণেরে শ্রী রাম কহেন পেয়ে ভয়।  
 জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জয়।।  
 আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।

সীতারে খাইবে আজ দারুণ রাক্ষসে।।  
 লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।  
 রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।  
 লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।  
 মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে।।  
 সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।  
 হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে।।  
 তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।  
 জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান।।  
 জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।  
 অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ।।  
 ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ সূত।  
 পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত।।  
 খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রশ্মে ভাসে।  
 মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে।।  
 আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়েতে ব্যগ্রতা।  
 ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্ছিতা।।  
 যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।  
 তব বাণ স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি।।  
 শাপে মুক্ত করিলা আমার এই শরীর।  
 লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর।।  
 ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যার পতি।  
 তোমা পরশিয়া হয় শাপ অব্যাহতি।।  
 পূর্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।  
 কুবেরের শাপেতে এই আমার দুর্গতি।।  
 কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।  
 আমারে সর্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর।।  
 একদিন কুবের লইয়া নারীগণে।  
 রণস্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে।।  
 কন্দদোষে আমি তথা হই উপনীত।  
 আমারে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত।।  
 কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর।

দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর।।  
 পছাতে কবুণা করি বলেন বচন।  
 শ্রীরামের শরে হবে শাপে বিমোচন।।  
 পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।  
 মৃতদেহ পোড়ালে পাইব নিষ্কৃতি।।  
 লক্ষ্মণের উদ্যোগে দানব দেহ পুড়ে।  
 দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে।।  
 রাম দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।  
 রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃষ্ণিবাস।।  
 শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন  
 ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দান  
 এবং মুনির স্বর্গে গমন।  
 শ্রীরাম বলেন চল জানকী লক্ষ্মণ।  
 গোমতীর পাড়ে শরভঙ্গ নিকেতন।।  
 হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।  
 অদ্ভুত দেখি বা সে মুনির তপোবন।।  
 তপের প্রতাপ যেন জ্বলন্ত অনল।  
 শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল।।  
 সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেইস্থানে।  
 প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে।।  
 হেনকালে উপনীত তথাত্মা শচীনাত্ম।  
 করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ।।  
 রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।  
 দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে।।  
 রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা।  
 বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথের ত্বরা।।  
 চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।  
 দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তায়।।  
 অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ।  
 জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্‌জন।।  
 ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।  
 নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার।।

শূনি মুনি রামবৃপী ত্রিলোকে র নাথ।  
 আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ।।  
 রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।  
 ত্রিকালজ্ঞ আপনি জানাইব কি আর।।  
 তবস্থানে রাখিলাম এই ধনুর্বাণ।  
 আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান।।  
 এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।  
 প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর।।  
 প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।  
 আশীর্বাদ পূর্বক কহেন মুনি তাঁরে।।  
 অনাথ ছিলাম বলে হইলা হে নাথ।  
 যোগে যঁারে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ।।  
 আইলা আপনি কিন্তু আমার নিবাস।  
 তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস।।  
 শত বৎসরের তপ করিলাম দান।  
 এই লও ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্বাণ।।  
 শরীর ছাড়ি ব আমি অতি পুরাতন।  
 প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ।।  
 ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে।  
 অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যামানে।।  
 শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।  
 জুলিয়া উঠিল অগ্নি গগণমণ্ডল।।  
 কৌতুক দেখেন সীতা শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 মুনিবর সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন।।  
 রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি উর্ধ্বতুণ্ডে।  
 অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে।।  
 পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।  
 অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার।।  
 গোলোকে গেলেন মুনি পুণ্যফলোদয়।  
 দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়।।  
 রাম দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।  
 রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃষ্ণিবাস।।

দশবৎসর কাল শ্রী রামচন্দ্রের নানা বনে  
 ভ্রমণান্তর পঞ্চবাটী বনে তাঁহার অবস্থিতি  
 ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পনখার  
 নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র  
 কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষস বধ।  
 সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।  
 কেহ কেহ ফল খান কেহ উপবাসী।।  
 অনাহারে কেহ বা বরিষা চারিমাস।  
 কেহ কেহ সর্বকাল করে উপবাস।।  
 গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।  
 মৃগচন্দ্র ধরে কেহ কমণ্ডলু করে।।  
 মুনিগণে দেখিয়া উঠিল রঘুনাথ।  
 করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড় হাত।।  
 মুনিরা করেন স্তুতি রামেরে গোচর।  
 শ্রী রাম বলেন প্রভু না করিহ ডর।।  
 তপোবনে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চর।  
 অবিলম্বে হইবে রাক্ষস সংহার।।  
 মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 তপোবন দরশনে করেন গমন।।  
 ধনুকে টঙ্কার দিলে রাম রঘুবীর।  
 দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির।।  
 বনে প্রবেশে রাম হাতে ধনুর্বাণ।  
 নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান।।  
 রাক্ষসের সহ কেন করহ বিবাদ।  
 অকারণ প্রাণী বধে ঘটিবে প্রমাদ।।  
 পূর্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।  
 দূর্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান।।  
 শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।  
 কহিলেন পিতা পূর্ব আখ্যান আমারে।।  
 দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।  
 তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়গ রাখে একজনে।।  
 পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্যধন।  
 তেঁই যত্নে খড়গ খানি রাখেন ব্রাহ্মণ।।

এক বৃদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে।  
 নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে।।  
 মুনিরে কু বুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।  
 সে খড়েগর চোটে লয় পক্ষীর জীবন।।  
 হাতে অস্ত্র করিলে লোকে র জ্ঞান নাশে।  
 হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে।।  
 সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।  
 রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।  
 সরলা জনক বালা কহিল এমতি।  
 বুঝান প্রবোধ বাক্যে তাঁরে সীতাপতি।।  
 কনক কমলমুখী জনক কুমারী।  
 আমার নাহিক ভয় কি ভয় তোমারি।।  
 মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।  
 তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে।।  
 যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।  
 শুনেন অপূর্ব গীত তাহার ভিতর।।  
 বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।  
 জলের ভিতর গীত শুনি কেন মুনি।।  
 মুনি বলিলেন হেথা ছিল এক মুনি।  
 করিত কঠোর তপ দিবস রজনী।।  
 তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।  
 পাঠায় অঙ্গরিগণে যথা মুনিবর।।  
 আইল অঙ্গরিগণ মুনির নিকটে।  
 দেখিয়া পড়িল মুনি মদন সঙ্কটে।।  
 সেই স্থান খ্যাত পঞ্চ অঙ্গরা বলিয়া।  
 অদ্যপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া।।  
 নৃত্য-গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।  
 এমন অপূর্ব কথা পুরাণেতে লেখা।।  
 শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রী রাম।  
 তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজধাম।।  
 আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।  
 তিন জন বঞ্ছিলেন সুখে বিভাবরী।।

কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশমাস।  
 কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস।।  
 এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।  
 অতীত হইল দশ বৎসর তখন।।  
 একদিন সীতা সহ শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 ক রপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ।।  
 সুতীক্ষ্ণ মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।  
 অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ।।  
 মুনি বলে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।  
 তথা গিয়া তাঁহার পুরাণ মনস্কাম।।  
 তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্ললীর বনে।  
 অদ্য গিয়া কর বাস তাঁর তপোবনে।।  
 কল্য গিয়া পাইবে অগস্ত্য-তপোবন।  
 তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন।।  
 বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।  
 উপনীত হইলেন পিপ্ললীর বনে।।  
 রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।  
 তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি।।  
 প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।  
 লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন।।  
 এই বনে ছিল এক দুর্জয় রাক্ষস।  
 তারে বধি মুনি করিলেন এ নিবাস।।  
 শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।  
 মুনি হ'য়ে রাক্ষসে মারেন কি প্রকার।।  
 শ্রী রাম বলেন ভাই শুন তদন্তর।  
 ইন্ডল বাতাপি ছিল দুই সহোদর।।  
 মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।  
 বাতাপি হইয়া মেঘ ব্রহ্মবধ করে।।  
 তার ভাই ইন্ডবল সে জানিত সঙ্গীত।  
 লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত।।  
 আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।  
 মেঘ মাংস দিয়া তারে করায় ভোজন।।

ব্রাহ্মণের উদরে মেঘের মাংস থাকে।  
 বাতাপি বাহির হয় ইন্ডল যবে ডাকে।।  
 পেট চিরি বাহিরায় বিপ্রগণ মরে।  
 এই রূপ করি ভমে দুই সহোদরে।।  
 ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।  
 ইন্ডলের ঠাই দান মাগিল আপনি।।  
 দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।  
 মেঘ মাংস মোরে আজি ক রাও ভোজন।।  
 মুনির বচন শুনি ইন্ডল উচ্ছ্বাস।  
 কহিল কতেক মুনি খাবে মেঘ মাংস।।  
 বাতাপি গাড়র হয় মায়ার প্রবন্ধে।  
 গাড়র কাটিয়া মাংস রাখিল আনন্দে।।  
 বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে।  
 হাতে থালা করিলা ইন্ডল তার পাশে।।  
 গঙ্গাদেবী ব'লে মুনি মনে মনে ডাকে।  
 অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে।।  
 মুনি বলে বহু দিন মম উপবাস।  
 ভোজন করিব আমি গাড়বের মাস।।  
 গঙ্গান্নান করি মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।  
 মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে।।  
 মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।  
 বাহিরে ইন্ডল ডাকে ঘন ঘন ডাক।।  
 মুনি বলে তুমি কোথা দেখ বাতাপিরে।  
 ইন্ডল বলিল এস বাতাপি বাহিরে।।  
 যেমন গর্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ হাতী।  
 ইন্ডল মারিতে যুক্তি করে মহামতি।।  
 পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।  
 তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে।।  
 সেই কথা পাসরিল রাক্ষস আপনা।  
 মুনি বাতকর্ন করে যেমন ঝঞ্ঝনা।।  
 সে অগ্নিতে ইন্ডল পুড়িয়া তবে মরে।  
 এই মত মুনি দুই রাক্ষসের মারে।।

এই মত মারিয়া সে রাক্ষস দুর্জয়।  
 তপো বন রক্ষা করিলেন মহাশয়।।  
**রামায়ণ।**  
 আইলাম সেই অগস্ত্যের তপো বনে।  
 সর্ব কার্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে।।  
 যাইতে ছিলেন রম অগস্ত্যের দ্বারে।  
 হেনকালে শিষ্য এই আইল বাহিরে।।  
 তাঁহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষ্মণ।  
 আইলেন রাম অদ্য সম্ভাষ কারণ।।  
 এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যস্তরে।  
 কহিল রামের কথা মুনির গোচরে।।  
 শ্রী রাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।  
 আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন।।  
 রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত।  
 আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত।।  
 সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।  
 যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে।।  
 সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।  
 দেখিয়া মুনির মনে ভ্রম দূরে যায়।।  
 অগস্ত্য বলেন কি অপূর্বদরশন।  
 অগস্ত্যের চরণ বন্দন তিন জন।।  
 গোলোক ছাড়িয়া হে করিলে বনবাস।  
 না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ।।  
 লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।  
 দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।।  
 পথশ্রান্ত আছে রাম ক রাও ভোজন।  
 আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন।।  
 মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।  
 তিন নিশি তথায় বঞ্চেণ তিন জন।।  
 করিয়া প্রভাত কৃত্য শ্রীনন্দনন্দন।  
 অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।।  
 পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।

আঞ্জা কর অগস্ত্য থাকি ব কোন্ স্থানে।।  
 অগস্ত্য বলেন শূনি রামের বচন।  
 যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন।।  
 গোদাবরী তীরে রাম দিব্য শোভে বন।  
 পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন।।  
 বিশ্বকর্মার নিৰ্মাণ দিব্য ধনুর্বাণ।  
 রামেরে অগস্ত্য মুনি করিলেন দান।।  
 নানা আভরণ আর সোনার টোপর।  
 বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর।।  
 অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়।  
 চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়।।  
 জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।  
 পাইয়া রামের বার্তা আসে শীঘ্রগতি।।  
 শ্রী রামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।  
 আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত।।  
 জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন।  
 তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন।।  
 পক্ষীরাজ সম্প্রতি আমার ছোট ভাই।  
 আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই।।  
 পূর্বে দশরথের করেছি উপকার।  
 তেঁই সে তাহার সঙ্গে মিত্রতা আমার।।  
 আইস আইস রাম কীতা ল'য়ে ঘরে।  
 ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে।।  
 তিন জন অনুরজি লৈয়া গেল পাখী।  
 পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রী রাম বড় সুখী।।  
 লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর।  
 গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর।।  
 লক্ষ্মণ বলেন রাম আপন প্রধান।  
 কোন স্থানে বান্ধি ঘর কর সন্নিধান।।  
 দেখেন শ্রী রাম স্থান গোদাবরী তীরে।  
 সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তুরে।।  
 নিকটে প্রসর ঘাট তাহে নানা ফুল।

মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল।।  
 শ্রী রাম বলেন হেথা বান্ধ বাসঘর।  
 জানকীর মনোমত করহ সুন্দর।।  
 শ্রী রামের আঞ্জাতে বান্ধে দিব্য ঘর।  
 একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর।।  
 পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।  
 অগ্নি পূজা করি হইলেন গৃহবাসী।।  
 পাতা লতা নিৰ্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।  
 অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া।।  
 জটায়ু বলেন রাম আসিহে এখন।  
 যখন করিবে আঞ্জা আসি ব তখন।।  
 এত বলি পক্ষীরাজ উড়িল আকাশে।  
 দুই পাখা সারি গেল আপনার দেশে।।  
 রজনী বধিলা রাম উঠি প্রাতঃকালে।  
 স্নান করিবারে যান গোদাবরী জলে।।  
 সুগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।  
 নিত্য নিত্য করেন শ্রী রাম নিত্যক্রিয়া।।  
 ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।  
 অযত্ন সুলভ গোদাবরীর জীবন।।  
 ঋষিগণ সহিত সর্বদা সহ বাস।  
 করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস।।  
 সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।  
 পাসরেন তখনি শ্রী রাম দরশনে।।  
 রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।  
 আত্মা রাম শ্রী রাম নাহি কোন ক্লেশ।।  
 লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।  
 শ্রী রামের বন বাসে যিনি বনবাসী।।  
 রহেন এ রূপে পঞ্চবটী তিন জন।  
 হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন।।  
 রাবণের ভগ্নি সেই নাম সূৰ্পণখা।  
 অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা।।  
 ভমিতে ভমিতে গেল রামের সদনে।

শ্রী রামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে ॥  
 শত কাম জিনিয়া শ্রী রাম রূপ বান ॥  
 সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান ॥  
 এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী ॥  
 নবরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥  
 জিতেদ্রিয় রামচন্দ্র ধার্মিক শিরোমণি ॥  
 রামে ভুলাইবে কিসে অধর্মাচারিণী ॥  
 পবর্তত নাড়িতে চাহে হইয়া দুবর্তলা ॥  
 ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা ॥  
 হাবভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী ॥  
 রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্য বদনী ॥  
 রাজপুত্র বট কিম্বু তপস্বীর বেশ ॥  
 এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ ॥  
 দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস ॥  
 হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস ॥  
 বহুদূর নহে তারা আইল নিকটে ॥  
 হেন রূপ বান তুমি পড়িলে সন্দকটে ॥  
 সন্দেগ দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার ॥  
 এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার ॥  
 সরল হৃদয় রাম দেন পরিচয় ॥  
 মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয় ॥  
 ইনি ভাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী সীতা ইনি ॥  
 সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী ॥  
 শুনিয়া আমারে দেহ নিজ পরিচয় ॥  
 কে বট আপনি কোথা তোমার আলায় ॥  
 পরমাসুন্দরী তুমি লোকে নিরূপমা ॥  
 মেনকা উবর্তশী কি হইবে তিলোত্তমা ॥  
 জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল হৃদয় ॥  
 সূৰ্ণখা আপনার দেয় পরিচয় ॥  
 লন্দকাতে বসতি আমি রাবণ ভগিনী ॥  
 নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী ॥  
 দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাই ভয় ॥

তোমার কামিনী হই মনে বাঞ্ছা হয় ॥  
 লন্দকাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা ॥  
 নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভাতা মহাতেজা ॥  
 অন্য ভাতা সুশীল ধার্মিক বিভীষণ ॥  
 ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন ॥  
 অতি আশ্রমের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী ॥  
 তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি ॥  
 সুমেরু পবর্তত আর কৈলাস মঞ্জর ॥  
 তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর ॥  
 তথা যাব যথা নাই মনুষ্য সঞ্চর ॥  
 তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার ॥  
 মনসুখে বেড়াইব অস্ত্র রীক্ষ গতি ॥  
 এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী ॥  
 প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ ॥  
 রাখিয়া নাহিক কার্য করিব ভক্ষণ ॥  
 আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ ॥  
 সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ ॥  
 কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত ॥  
 হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত ॥  
 যখন যেখানে ই২৬০ সেখানে তখনি ॥  
 বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী ॥  
 শ্রী রাম বলেন সীতা না করিহ ত্রাস ॥  
 রাক্ষসের সহিত করিব পরিহাস ॥  
 পরিহাস করেন শ্রী রাম সুচতুর ॥  
 রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর ॥  
 আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী ॥  
 লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে যে বড় গুণী ॥  
 সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ ॥  
 যৌবন সফল কর কহি উপদেশ ॥  
 লক্ষ্মণ কনক বর্ণ পরম সুন্দর ॥  
 লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর ॥  
 সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে ॥

তোমা হেন রূপবান পাব কোন্ সস্থলে।।  
 তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।  
 রসক্ৰীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।  
 লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রী রামের দাস।  
 সে বকের প্রতি কেন কর অভিলাষ।।  
 ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।  
 তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা।।  
 কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।  
 তোমায় সীতায় দেখি অনেক অস্ত্র র।।  
 শুনহ সুচ্ছরী তুমি আমার বচন।  
 শ্রী রামের সন্নিধানে করহ গমন।।  
 উপহাস না বুঝে বচন মাত্র ধায়।  
 লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়।।  
 পুনর্বর্তার আইলাম রাম তব পাশে।  
 ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে।।  
 বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলি বারে।  
 ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসের ডরে।।  
 ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা।  
 দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা।।  
 যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী।  
 রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী।।  
 শ্রী রাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।  
 ইন্দিগতে বলেন কর ইহারে বিনাশ।।  
 ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।  
 এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান।।  
 খাচ্ছা নাকে খাচ্ছা কানে রশু পড়ে স্রোতে।  
 ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে।।  
 সূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে।  
 নাকে হাত দিয়া কাচ্ছে গাত্র রশু ভাসে।।  
 কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি।  
 কোন্ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি।।  
 এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।

মরিবার ঔষধ কে বাঞ্ছিল দুস্মৃতি।।  
 দূষণ খরের থানা যমের সমান।  
 যোদ্ধা চৌদ্দহাজার যার নিরূপণ।।  
 রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।  
 মরিবার উপায় সৃজিল কোন জনে।।  
 বসি তবে সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।  
 আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে।।  
 মুনি তুল্য বেশ ধরে কিম্ব নহে মুনি।  
 সন্দেহ লয়ে শুমে এক সুচ্ছরী কামিনী।।  
 এক কার্যে গিয়া শুষ্ঠা কহে আর কাজ।  
 মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ।।  
 গেলাম মনুষ্য মাংস খাইবার সাধে।  
 নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে।।  
 ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান সেনাপতি।  
 যুঝি বারে খর সবে দিল অনুমতি।।  
 রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।  
 গৃধ্র আর কাক খাক তাহার শোণিত।।  
 যার ঠাই ভগিনী পাইল অপমান।  
 তার রশু মাংস সবে কর গিয়া পান।।  
 লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদগর।  
 সেনাপতি ধায় যেন যমের কিন্দকর।।  
 মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর।  
 কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগন্ত র।।  
 সকলে আইল যথা শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন।।  
 ফল মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।  
 বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে।।  
 এইমত বিনয়ে কহিল রঘুবর।  
 রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর।।  
 তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।  
 ভগিনীর নাক কাণ কাট কি কারণ।।  
 যেই কর্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।



কোন মুখে বলিস না করি অপরাধ।।  
 তোরা দুই মনুষ্য আমরা বহুজন।  
 আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন।।  
 এইমত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।  
 করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস।।  
 এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।  
 খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদগর মুষল।।  
 চতুর্দশ বাণ রাম পুরেণ সগুধান।  
 চতুর্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ।।  
 নেউটিয়া বাণ এল শ্রী রামের তুণে।  
 রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রী রামের গুণে।।  
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্বলোকে।  
 পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।।  
 খর দুষণের যুদ্ধে আগমন।  
 চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।  
 ত্রাস পেয়ে কহে গিয়ে খরের সম্মুখে।।  
 যুঝি বারে পাঠাইলে ভাই চৌদ্দজন।  
 অবশ করিল না সাধিল প্রয়োজন।।  
 যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণ স্থান।  
 রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ।।  
 খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ।  
 যুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।  
 লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ।  
 নিশাচর চতুর্দশ হাজার প্রধান।।  
 প্রবল প্রস্তুত ছটা তাহে নানা মণি।  
 বিচিত্র পতাকা ধবজ রথের সাজনি।।  
 রথগুলা চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া উচল।  
 প্রবাল মুণ্ডার হার করে ঝলমল।।  
 কনক রচিত রথ বিচিত্র নিৰ্ম্মাণ।  
 বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।।  
 অস্ত্র শস্ত্র যাবৎ তুলিয়া রথোপর।  
 রথস্তুস্ত ধরি উঠে মহাবলী খর।।

আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধবজে।  
 না চলে রথের ঘোড়া চলে মস্ত্র তেজে।।  
 মেঘের গর্গ নে গর্গে রাক্ষস দূষণ।  
 রামেরে মারিব আগে পছাৎ লক্ষ্মণ।।  
 রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে।  
 কৃষ্ণিবাস রামায়ণ রচে মনসুখে।।  
 শ্রী রামের সহ যুদ্ধে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সহ  
 দূষণ ও খরের মৃত্যু।  
 শ্রী রাম বলেন শুন সৈন্যের কলকলি।  
 সীতা ল'য়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী।।  
 থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।  
 কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর।।  
 বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।  
 সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর।।  
 এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রাম।  
 দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন তখন।।  
 দেব দৈত্য গণ্ডধ বর্ষ আইল সর্বজন।  
 অস্ত্র রীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ।।  
 একা রাম চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস।  
 কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস।।  
 ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।  
 মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ।।  
 দূষণের বচন শুনিয়া রাম হাসে।  
 রাক্ষস হাজার খর সহিত আইসে।।  
 ত্রিশিরার সন্দেগ দুই হাজার রাক্ষস।  
 খর সৈন্য যত তত দূষণের বশ।।  
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।  
 রামেরে বুঝিয়া যায় খর মহাবলী।।  
 বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।  
 শৃগাল বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।।  
 সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।  
 রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া।।

সগুধান পুরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।  
 তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান।।  
 দুইজনে বাণ বর্ষে দৌঁহে ধনুর্ধর।  
 দৌঁহে দৌঁহা বিগুধি বাণে করিল জর্ন র।।  
 উভয়ের গা বহিয়া রশু পড়ে স্রোতে।  
 উভয় গায়ের রশু দুই বীর তিতে।।  
 জুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রী রাম ধনুকে।  
 অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুক।।  
 নিশাচরগণের উঠিল কলকলি।  
 মার মার বলিয়া পলায় কতগুলি।।  
 সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রী রামের বাণে।  
 জোড়েন গগুধবর্ত অস্ত্র ধনুকে র গুণে।।  
 সকল রাক্ষস হৈল যেন রশু ময়।  
 আপনা আপনি লড়ে নাহি পরিচয়।।  
 আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।  
 খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার।।  
 সকল পড়িল বীর খর মাত্র আছে।  
 দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে।।  
 আপনি নিকট হ'য়ে প্রবেশ সংগ্রামে।  
 মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রী রামে।।  
 যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।  
 শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে।।  
 পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।  
 ত্রিভুবনে সেই শূল অন্যথা কে করে।।  
 বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।  
 শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে।।  
 দূষণের দুই হাত চক্রনে ভূষিত।।  
 কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মুহিত।।  
 পলায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।  
 দেবগণ শ্রী রামের করিছে বাখান।।  
 দূষণ পড়িলে খর লাগিল ভাবিতে।  
 কাতর হইল বীর নেত্র জলে তিতে।।

হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইল আগুসরে।  
 এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।।  
 রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।  
 দশদিক জলস্খল বাণে অগুধকার।।  
 অববুদ অববুদ বাণ এড়িয়া সে খর।  
 ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর।।  
 মানুষ হইয়া তোর এত অহন্দকার।  
 দেবগণ নাহি পারে তুই কোন্ ছার।।  
 কত বাণ মারিস্ অগ্রেতে যাক দেখা।  
 আমার হাতেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা।।  
 শ্রী রাম বলেন খর লব তোর প্রাণ।  
 মুনি সঁস্থানে পেয়েছি অজেয় ধনু বর্ষণ।।  
 শরভন্দগ দিয়াছেন এ অক্ষয় তুণ।  
 যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন।।  
 শ্রী রামের বচনেতে লাগে চমৎকার।  
 ত্রাসে খর চিঞ্জিল সংশয় আপনার।।  
 ত্রাস বুঝি খরের এড়েন রাম বাণ।  
 খান খান করেন খরের ধনুখান।।  
 কাটা গেল ধনুক চিঞ্জিত হ'য়ে খর।  
 লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর।।  
 রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।  
 চতুর্দিকে জলস্খল ছাইল গগণ।।  
 নানা অস্ত্র দশদিক করিল প্রকাশ।  
 জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে আস।।  
 যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ।  
 রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন।।  
 যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।  
 সে ধনুকে সগুধান পুরেন রঘুবর।।  
 স্বয়ং বিদ্বু রঘুবীর পুরিল সগুধান।  
 কাটিলেন খরের হাতের ধনু বর্ষণ।।  
 রথধবজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।  
 ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড।।

অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া।  
 কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া।।  
 রামের দুর্ঘ য বাণ তারা যেন ছোটে।  
 আরবার খরের হাতের ধনু কাটে।।  
 মস্ত্র পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে।  
 যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে।।  
 গাছের নিকটে গেলে গাছ সবুলে।  
 আলো করি আসে গদা গগনমণ্ডলে।।  
 অগ্নিলে গদাতে না হয় শাস্ত্র বাণে।  
 ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।  
 আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মস্ত্র পড়ে।  
 পৃথিবীতে কত ধরে অস্ত্র রীক্ষে যোড়ে।।  
 অগ্নিসম বাণুলে পবর্তত আকার।  
 অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার।  
 পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।  
 খরের শরীর বাণে করেন জর্ঘর।।  
 সবর্ত কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।  
 রশ্মে রান্ধগা হ'য়ে বীর চাহে চারিভিতে।।  
 হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।  
 রামেরে বুধিয়া যায় খাইতে কামড়ে।।  
 রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।  
 শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে।।  
 বজ্রঘাতে যেমন পবর্তত দুইচির।  
 গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।  
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।  
 শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে।।  
 বিরিঞ্চি বলেন রাম কর অবধান।  
 সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ।  
 আইলেন শন্দকর তোমায় হয়ে সুখী।  
 মহেন্দ্র তোমায় তুষ্ট তব রণ দেখি।।  
 কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।  
 অষ্টলোক পাল আসি করেন স্তবন।।

তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বঃ৬ঃ।  
 যথা তথা দেব দেবী রহিবে আনন্দে।।  
 রামেরে বঞ্ছন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।  
 করেন সকলে বসি ইষ্ট সন্তাষণ।।  
 অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।  
 জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।  
 তাঁহারে কহেন রাম রণ বিবরণ।  
 দেখি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ।।  
 রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।  
 শন্দকাকুলা লন্দকায় চলিল মনোদুঃখে।।  
 রাবণে কহিতে যায় আত্ম সমাচার।  
 নাক কান কাটা তার বিভৎস আকার।।  
 যার কাছে যার রাঁড়ী সেই ভয় পায়।  
 খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে যায়।।  
 সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।  
 সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি।।  
 নিজ নিজ সস্থানে বসিয়াছে মন্ত্রীগণ।  
 হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন।।  
 নাক কাণ কাটা তার মুর্ত্তিখানি কালি।  
 সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি।।  
 শন্দগার কৌতুকে রাজা থাক রাত্র দিনে।  
 রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে।।  
 স্ত্রী মাত্র তাহার সন্দেগ কেহ নাহি আর।  
 যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার।।  
 হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।  
 কতক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।  
 শূনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।  
 হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন।।  
 কতক কটক তার কি প্রকার বেশ।  
 ভয়ন্দকর বনে কেন করিল প্রবেশ।।  
 কাহার নঞ্ছন রাম কেমন সম্মান।  
 কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুবর্তণ।।

সূৰ্ণখা বলে দশরথের নঙ্কন।  
 পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন।।  
 তপস্বীর বেশ ধরে নহে কোন্ মুনি।  
 সন্দেগ করি ল'য়ে ঝমে সুঙ্করী রমণী।।  
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।  
 একা রাম সকলেরে সংহার করিল।।  
 রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।  
 তার সহ সমরে হইবে কে বা স্থির।।  
 রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।  
 ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা কামিনী।।  
 সীতার রূপের সম আর নাই নারী।  
 উবর্তশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি।।  
 যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে।  
 তার রূপ কে বল তোমাকে মাত্র সাজে।।  
 রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।  
 আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এইক্ষণে।।  
 যেমন সম্ভাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।  
 তেমনি মরুক সেই সীতা শোকানলে।।  
 সূৰ্ণখা যত বলে রাজা সব শূনে।  
 সুঙ্করী সীতার কথা ভাবে মনে মনে।।  
 যুষ্টি করে রাবণ আসিয়া সভাস্থানে।  
 রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে।।  
 রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে।  
 সূৰ্ণখা কাঙ্ক্ষিল রাবণ বধিবারে।।  
 কেহ সূৰ্ণখার কথায় মঙ্ক হাঙ্গে।  
 গাইল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃতিবাসে।।  
 সীতা হরণ করিতে রাবণকে  
 মারীচের নিষেধ।।  
 আরদিন দশানন আইল বাহিরে।  
 বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে।।  
 আনিল পুষ্পক রথ অপূর্ব গঠন।  
 সে রথের সারথি আপনি সমীরণ।।

হীরা মুণ্ডা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।  
 খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে।।  
 মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।  
 অষ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে দেখিতে আছর্য্য।  
 সেই রথে আরোহণ করে লন্দেকশ্বর।  
 বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর।।  
 নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।  
 সাগর লন্দিঘয়া যায় শতক যোজন।।  
 শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।  
 অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল।।  
 চারি ডাল দেখি যেন পবর্ততের চূড়া।  
 সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া।।  
 তপ করি বালখিল্য আদি মুনিগণ।  
 মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ।।  
 যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।  
 রথে চাপি তথা গেল রাজা লন্দেকশ্বর।।  
 মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি।  
 সর্প যেন ভীত হয় গরুড়ে নিরখি।।  
 ত্রাস পায় লোক যেন যম দরশনে।  
 পাইলা মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে।।  
 রাবণ বলিল তুমি মারীচ প্রধান।  
 লন্দকায় না দেখি পাত্র তোমার সমান।।  
 অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।  
 দেবতা গণ্ডবর্ত সদা ভীত তব ডরে।।  
 বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।  
 সাগর লন্দিঘয়া আসি বনের ভিতর।।  
 দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।  
 সবাকারে সংহারিলা রাম একেশ্বর।।  
 ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।  
 সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই।।  
 ধিক্ ধিক্ আমারে তোমায় ধিক্ ধিক্।  
 তুমি আমি থাকিতে কলন্দক কি অধিক।।

সূৰ্ণখা ভগিনীৰ কাটে নাক কান।  
 হইয়া মনুষ্য কীট করে অপমান।।  
 আপনি রাবণ আমি পুত্র মেঘনাদ।  
 ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতক প্রমাদ।।  
 না করি ইহাৰ যদি আমি প্রতিকার।  
 ত্রিলোকে র আধিপত্য বিফল আমার।।  
 আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।  
 পাত্রকার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন।।  
 শূনি তার পরমা সুচ্ছরী এক নারী।  
 তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি।।  
 তাহাৰে হরিব করি তোমার সহায়।  
 শূনিয়া মারীচ কহে করি হয় হয়।।  
 আবোধ রাবণ একি তোমার যুক্তি।  
 কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমাৰে সম্প্রতি।।  
 প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুচ্ছরী।  
 হরিলে তাঁহাৰে কী রহিবে লন্দকাপুরী।  
 রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।  
 শ্রী রামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী।।  
 কুম্ভকৰ্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।  
 মরিবে কুমারগণ হবে সৰ্বনাশ।।  
 লন্দকাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।  
 সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিন্তে দেহ ক্ষমা।।  
 পায় পড়ি লন্দকানাথ করি হে মিনতি।  
 ক্ষমা কর রক্ষা কর লন্দকার বসতি।।  
 আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।  
 সৰ্বাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ।।  
 কুমন্ত্ৰীৰ বচনে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।  
 সুমন্ত্ৰী মন্ত্ৰণা দিলে লক্ষ্মী তাৰে ভজে।।  
 যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অন্দকুশে।  
 লন্দকাপুরী তেমন মজিবে তব দোষে।।  
 বিদিত রামের গুণ আছে সৰ্বলোকে।  
 প্রাণ দিল দশরথ রাম পুত্রশোকে।।

সীতা বিনা রামের অন্যে না যায় মন।  
 সীতাৰ শ্রী রাম পদে মন সমর্পণ।।  
 কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।  
 জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতুহলে।।  
 বহু ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী।  
 আনিতে না কর মন শ্রী রামের দেবী।।  
 রাম বিনা সীতাদেবী অন্যে নাহি ভজে।  
 তবে তাৰে রাবণ হরিবে কোন্ কাজে।।  
 পর-স্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।  
 সৰ্বংশে মরিবে রাজা কিছু নাহি দেখি।।  
 রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি।  
 ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি।।  
 মারীচ বলেন মৃগবেশে যার তাঁর কাছে।  
 আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে।।  
 কাৰ্য্য সিদ্ধি না হইবে পড়িবে সন্দকটে।  
 অপরাধ না করিও রামের নিকটে।।  
 পরিণাম ভাল মন্ত্ৰ বিভীষণ জানে।  
 জিজ্ঞাসা করিও সে ধাৰ্ম্মিক বিভীষণে।।  
 ধাৰ্ম্মিক ত্রিভুজ আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিত।  
 যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা।।  
 নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ।  
 নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম।।  
 মনে না করিও সূৰ্ণখার অবস্থা।  
 মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্তথা।।  
 দূষণ ত্রিশিৰাদিৰ না ভাবিহ দুঃখ।  
 আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সুখ।।  
 চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মাৰে।  
 সৰ্বংশে মরিবে রাজা আনিয়া সীতাৰে।।  
 তোমার বিক্রম জানি শূন লন্দকেশ্বৰ।  
 শ্রী রাম তোমায় দেখি অনেক অস্ত্র র।।  
 আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।  
 তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি।।

ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্গ লন্দকাপুরী।  
 তপস্বী হইয়া তব শ্রী রামেরে ডরি।।  
 তথাপি তোমার সস্থানে নাহিক এড়ান।  
 পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ।।  
 আমার বচন তুমি শুন লন্দেকশর।  
 সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর।।  
 যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে।  
 রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃতি বাসে।।

রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা  
 প্রদান।

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।  
 যত বলে মারীচ তা না শূনে রাবণ।।  
 বুধিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।  
 কু বুদ্ধি ঘটিল তোর শূন্যে দুস্মতি।।  
 নরের গৌরব রাখ মন্ত্র বল মোরে।  
 আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।।  
 আমার প্রতাপে সদা কম্পিতা মেদিনী।  
 মনুষ্যের কি বা কথা দেব দৈত্য জিনি।।  
 আইলাম আমি ঘরে কর তিরস্কার।  
 আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার।।  
 বল বুদ্ধি হীন রাম হয় নরজাতি।  
 নিশাচর কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি।।  
 নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চনন।  
 তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন।।  
 ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।  
 হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পুর।।  
 আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।  
 যুদ্ধ না করিব আমি দেখহ নিছয়।।  
 মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।  
 সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।।  
 হ'রেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।  
 না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার।।

পুত্র মিত্র কলত্র বাণ্ডধব পরিবার।  
 এই বার সবাকার হইবে সংহার।।  
 এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী।  
 এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লন্দকাপুরী।।  
 সাগরের দর্প কর সাগরে কি করে।  
 সবংশে তোমারে রাম ডু বাবে সাগরে।।  
 আগেতে মরিব আমি রাম দরশনে।  
 পছাৎ মরিবে তুমি পরে পুরীজনে।  
 শ্রী রাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।  
 না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়।।  
 আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।  
 একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর।।  
 যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন।  
 সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন।।  
 যথা তথা যাহ তুমি বলি লন্দেকশ্বর।  
 না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।  
 হরিতে গেলাম সীতা না হরিলাম তায়।  
 দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায়।  
 যদি সীতা আনিতো নিতান্ত কর মন।  
 পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ।।  
 রাজা পাত্রে করে যুগি হ'য়ে এক মতি।  
 রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি।।  
 ফুলিয়ার কৃতি বাস গায় সুধাভাণ্ড।  
 রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড।।

— ০ঃ

মারীচের মৃগরূপ ধারণ।  
 তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রী রাম মহাত্ম্য।  
 আর তিন কাণ্ড শূন্য রাবণ চরিত্র।।  
 সূৰ্ণখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী।  
 এই সস্থানে কাটা গেল নাক কাণ দুটি।।  
 রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।  
 রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুইজনে।।

মারীচের করে ধরি কহে লন্দেকশ্বর।  
 মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুজ্বর।  
 মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে।  
 বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীরে।।  
 নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর।  
 শ্বেতবর্ণ চারি খর দেখিতে সুজ্বর।।  
 দুই শৃঙ্গ তার যেন প্রবাল প্রস্তর।  
 সোনার বিষকি গলে যেন দিবাকর।।  
 ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণ-মৃগ মনোহর।  
 দুই গুণ্ড শোভে তাহে যেন নিশাকর।।  
 স্ট্রানে স্ট্রানে রান্দগা মধ্যে ক৭ লের রেখা।  
 রান্দগা জিহতা মেলে যেন বিজলী ঝলকা।।  
 লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।  
 দুই চক্ষু লে যেন রতনের বাতি।।  
 নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলী।  
 রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী।।  
 মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।  
 গাইল অরণ্য কাণ্ড কবি কৃতিবাসে।।  
 মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ।  
 বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।  
 আলো করি মায়া মৃগ করিল গমন।।  
 দেখিয়া আপন মূর্তি আপনি উলটে।  
 চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে।।  
 রাম সীতা বসিয়া আছেন দুইজন।  
 সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।।  
 রাক্ষসের বংশ, ধবংস করিবার তরে।  
 ডুবাইতে জানকীরে বিপদ সাগরে।।  
 দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।  
 বিধাতা করিল হেন মৃগের নিসর্গ।।  
 রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।  
 অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন।।  
 এই মৃগচর্মা যদি দাও ভালবাসি।

কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।।  
 আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।  
 ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন।  
 অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখি বিদ্যমান।  
 অপূর্বত সুজ্বর রূপ কাহার নিসর্গ।।  
 দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।  
 ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী।।  
 রান্দগা জিহতা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।  
 আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি।  
 দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।  
 রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ।।  
 জানকী চাহেন এই হরিণের চর্মা।  
 বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কি বা কর্মা।  
 লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।  
 রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।  
 মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে।  
 পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে।।  
 রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।  
 বনে গিয়া রশু মাংস করিবে আহার।।  
 নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলী।  
 আমা সব ভাঙিবারে পাতে মায়াজালী।।  
 অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।  
 নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চর।।  
 ভালমতে ইহা আমি করিব নির্ণয়।  
 মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়।।  
 লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।  
 যত যুগি বলেন সকলি সে ঘটে।।  
 লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।  
 মারীচ আইল কেন কর ভাই স্থিথর।।  
 যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধ পাপী।  
 মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি।।  
 সাথি থাকে যদ্যপি রাক্ষস অন্যজন।

মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপো বন ॥  
 রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি ॥  
 রত্ন মৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি ॥  
 ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে ॥  
 মৃগচন্দ্র লইয়া আসি ব এইখানে ॥  
 যা বৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে ॥  
 তা বৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে ॥  
 আমার বচন কভু না করিহ আন ॥  
 প্রমাদ না পড়ে যেন হ'য়ো সাবধান ॥  
 বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে ॥  
 মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে ॥  
 যখন যা হবে তাহা বিধির লিখন ॥  
 সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ ॥  
 শ্রী রাম করেন সৎ হাতে ধনুশর ॥  
 যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর ॥  
 শ্রী রামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে ॥  
 পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে ॥  
 আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ ॥  
 আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ ॥  
 বরষা রামের হাতে মরণ মন্দগল ॥  
 রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কে বল ॥  
 মারীচ সশন্দক হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে ॥  
 আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে ॥  
 ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে বহুদূর ॥  
 নানা রন্দেগ চলে মৃগ মায়া র প্রচুর ॥  
 ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অস্তরে ॥  
 শ্রী রাম নিকটে গেলে পলায় অস্তরে ॥  
 প্রাণে মরিবেক মৃগ না মারেন বাণ ॥  
 নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কান ॥  
 এমন চিত্রিয়া রাম বুঝেন কারণ ॥  
 স্বরূপত মৃগ নহে হবে দুষ্ট জন ॥  
 ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি ॥

মায়া রূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী ॥  
 ঐষিক বিশিখ রাম পুরেন সগুধান ॥  
 মারীচের বৃকে বাজ বজ্রের সমান ॥  
 বেদনায় মারীচ সে পড়িল অস্তরে ॥  
 রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে ॥  
 তখন মারীচ করে রাবণের হিত ॥  
 রামের ডাকে র তুল্য ডাকে আচম্বিত ॥  
 আইস লক্ষ্মণ ঝাট কর পরিত্রাণ ॥  
 রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ ॥  
 মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি ॥  
 রামের বচন মানি আসিবে এখনি ॥  
 লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উইচঃস্বরে ॥  
 শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে ॥  
 মারীচেরে সংহারিয়া বাণ ল'য়ে হাতে ॥  
 সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে ॥  
 মারীচের বৃকে বাণ কসে টান দিতে ॥  
 কৃতি বাস মারীচ বধ গায় অরণ্যেতে ॥  
 রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ॥  
 দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধবনি ॥  
 রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শূনি ॥  
 হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন ॥  
 বলিলেন ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ ॥  
 আর্ন্তস্বরে শ্রী রাম ডাকেন যে তোমারে ॥  
 দেখ গিয়া তাহারে কি রাক্ষসেতে মারে ॥  
 লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্রী রামের ভয় ॥  
 মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিষয় ॥  
 শ্রী রামের মুখে নাই কাতর বচন ॥  
 এত ব্যস্ত হও সীতা কিসের কারণ ॥  
 রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন ॥  
 তুমি কি জাননা সীতা ধনুক ভন্দগন ॥  
 রামের বচন সীতা আমি নাই শূনি ॥  
 প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী ॥



কাৰে রাখি তোমাৰ নিকট কে বা ৰহে।  
 শূন্য ঘৰে থাকা তব উপযুগু নহে।।  
 তাহা না মানেন সীতা হ'য়ে উতৰোলী।  
 শিৰে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি।।  
 বৈমাত্ৰেয় ভাই কভু নহেত আপন।  
 আমা প্ৰতি লক্ষ্মণ তোমাৰ কাছে মন।।  
 ভৱত লইল ৰাজ্য তুমি লহ নাৰী।  
 ভৱতেৱ সনে সড় আছয়ে তোমাৰি।।  
 মনেৰ বাসনা কী সাধিবে এই বেলা।  
 আমাৰ আশাতে কী ৰামেৰ কৰ হেলা।।  
 অপৰ পুৰুষে যদি যায় মম মন।  
 গলায় কাটাৰি দিয়া ত্যজিব জী বন।।  
 লক্ষ্মণ ধাৰ্মিক অতি মনে নাহি পাপ।  
 সকলেৱে সাক্ষী কৰে পেয়ে মনস্তাপ।।  
 জলচৰ সট্খলচৰ অস্ত্ৰ ৰীক্ষ চৰ।  
 সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দূৰক্ষৰ।।  
 প্ৰবেধ না মানে সীতা আৰো বলে ৰোষে।  
 আজি মজিবেক সীতা আপনাৰ দোষে।।  
 গণ্ডি দিয়া বেড়িলেক লক্ষ্মণ সে ঘৰ।  
 প্ৰবেশ না কৰে কেহ ঘৰেৰ ভিতৰ।।  
 স্বয়ং বিম্বু ৰঘুনাথ তাৰ পত্নী সীতা।  
 শূন্য ঘৰে রাখি ওহে সকল দেবতা।।  
 আমাকে বিদায় কৰ সীতা ঠাকু ৰাণী।  
 আৰ কিছু না বলহ দূৰক্ষৰ বাণী।।  
 শিৰে ঘা হানেন সীতা নেত্ৰজলে তিতে।  
 সীতা প্ৰণমিয়া যান লক্ষ্মণ হুৱিতে।।  
 হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ।  
 থাকিয়া বৃক্ষেৰ আড়ে দেখিছে ৰা বণ।।  
 এতক্ষণে ৰা বণেৰ সিদ্ধ অভিলাষ।  
 তপস্বীৰ বেষ ধৰি যায় সীতা পাশ।।  
 ভিক্ষা বুলি কৰি কাণ্ডেধ কৰে ধৰে ছাতি।  
 সকল বসন ৰান্ধগা ধৰে নানা গতি।।

পৰমাসুখ্ৰী সীতা বচন মধুৰ।  
 তাঁৰ ৰূপ দেখিয়া ৰা বণ কামাতুৰ।।  
 ৰা বণ মধুৰ বাক্যে সীতাৰে সম্ভাষে।  
 কোন্ জাতি নাৰী তুমি থাক কোন্ দেশে।।  
 কাহাৰ বিয়াৰী তুমি কাৰ প্ৰিয়তমা।  
 মনুষ্য নহত তুমি সোনাৰ প্ৰতিমা।।  
 সুললিত দুই স্তন শোভা কৰে হাৰে।  
 উত্তম বসন শোভে তোমাৰ শৰীৰে।।  
 বিষম দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্ৰ বৈসে।  
 এমন সুখ্ৰী থাক কেমন সাহসে।।  
 পৰিচয় দেয় সীতা তপস্বীৰ জ্ঞানে।  
 অমৃত সেবিল যেন মধুৰ বচনে।।  
 জনকনছ্ৰিনী আমি নাম ধৰি সীতা।  
 দশৰথ পুত্ৰ বধু ৰামেৰ বনিতা।।  
 ৰহ দ্বিজ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।  
 সেই ফল দিব তুমি কৰিও ভক্ষণ।।  
 অতিথিৱে ভণ্ডি ৰাম কৰেন যতনে।  
 বড় প্ৰীতি পাইবেন তোমা দৰশনে।।  
 জিজ্ঞাসি তোমাৰে মুনি শিৰে ধৰি শিখা।  
 কি জাতি কি না ধৰ কেন কৰ ভিক্ষা।।  
 এতেক বলেন সীতা তপস্বীৰ জ্ঞানে।  
 নিজ পৰিচয় দেয় ৰাজা দশাননে।।  
 জ্যেষ্ঠ ভাই কুব্ৰেৰ ধনেৰ অধিকাৰী।  
 এই বনে বহুকাল আমি তপ কৰি।।  
 ৰা বণ আমাৰ নাম জানে মুনিগণে।  
 বড় প্ৰীতি পাইলাম তোমা দৰশনে।।  
 ফল মূল দিয়া কৰি উদৰ পূৰণ।  
 গৃহস্বেথৰ ঘৰে গেলে ক ৰায় ভোজন।।  
 তোমাৰ সহিত আজি অপূৰ্ত দৰ্শন।  
 ভিক্ষা দিলে চলে যাই নিজ নিকেতন।।  
 হইল অনেক বেলা কৰ যে বিধান।  
 তোমাৰ পুণ্যেতে গিয়া কৰি স্নানদান।।

শ্রী রামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি।  
 হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী।।  
 জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন।  
 পঞ্চফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ।।  
 রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে।  
 আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে।।  
 জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি।  
 আঞ্জা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি।।  
 রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্ত্বর।  
 নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।  
 জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।  
 ধর্ম কস্ম নষ্ট হবে প্রভু কী বলিবে।।  
 বিধির নিবর্তগুণ কভু না হয় অন্যথা।  
 বিধির লিখন মত ঘটবেক তথা।।  
 ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।  
 লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।।  
 ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।  
 জানকী বলেন হায় একি বিপরীত।।  
 দুরাচার দূর হ'রে পাপিষ্ঠ দুর্ব ন।  
 আমা লাগি হবে তো'র সবংশে মরণ।।  
 রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন।  
 আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন।।  
 রাক্ষসের রাজা আমি লন্দকা নিকেতন।  
 কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন।।  
 তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।  
 অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন।।  
 ইন্দ্রের অমরাবতী যিনি লন্দকাপুরী।  
 জগৎ দুর্লভ ঠাই দেখিবে সুচ্ছরী।।  
 তোমার রূপেতে আমি বড় ভালবাসি।  
 অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী।  
 সবেতর্গপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী।  
 তুমি অন্ন দিলে পাবে অন্য সব রাণী।।

হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান।  
 সুবর্ণ মাণিক্যময় রবে তব সঁস্থান।।  
 করিয়া রামের সেবা জন্মদ গেল দুঃখে।  
 করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে।।  
 ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পবান।  
 মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট জ্ঞান।।  
 অল্প বুদ্ধি যে রামের অতল্প জীবন।  
 যুগ যুগে চিরজীবী আমি দশানন।।  
 সীতে তুমি সুচ্ছরী লাবণ্য আর বেশে।  
 তোমা হেন সুচ্ছরী আমাকে অভিলাষে।।  
 কোপাঘ্নিতা সীতাদেবী রাবণ বচনে।  
 রাবণেরে গালি দেয় আসে যত মনে।।  
 অধস্মিষ্ঠ অগণ্য অধর্ম দুরাচার।  
 করিবেন রাম তোমার সবংশে সংহার।।  
 শ্রী রাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।  
 কি সাহসে তাঁহারে বলিস কুবচন।।  
 বিস্ত্রু অবতার রাম তুই নিশাচর।  
 রাম আর তোকে দেখি অনেক অল্পর।।  
 যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।  
 করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ।।  
 একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।  
 হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তো'র লাজ।।  
 করে দুষ্ট কুড়িপাটা দস্ত্র কড়মড়ি।  
 জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।।  
 প্রকাশে রাক্ষস মূর্তি অতি ভয়ন্দকর।  
 অধিক তর্ক ন করে রাজা লন্দেকেশ্বর।।  
 কিগুণে রামের প্রতি মজে তো'র মন।  
 বঙ্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন।।  
 দেখিবে কেমনে করি তোমা'রে পালন।  
 তাহা শূনি জানকীর উড়িল জীবন।।  
 জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ।  
 আপনি মজিলে বেটা আমার কারণ।।

দৈবের নিবর্তণ্ডুধ কভু না হয় খণ্ডন।  
 নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন।।  
 যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।  
 যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি।।  
 আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী অবতার।  
 তাহারে রাক্ষসে হরে অতি চমৎকার।।  
 ত্রাসেতে কাঙ্ছেন সীতা হইয়া কাতর।  
 কোথা গেল প্রভু রাম গুণের সাগর।।  
 সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।  
 শূন্যঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ।।  
 তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।  
 বাট আইস দেবর কর পরিব্রাণ।।  
 অত্যন্ত্র চিত্তিত সীতা করেন রোদন।  
 এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন।।  
 সীতারে ধরিয়া রখে তুলিল রাবণ।  
 মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন।।  
 বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রী রাম।  
 চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুবর্তাদলশ্যাম।।  
 সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে।  
 রাম আইল বলিয়া দেখে চারিভিতে।।  
 জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।  
 প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ।  
 হয় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।  
 এমন না দেখি বণ্ডু সীতারে যে রাখে।।  
 বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।  
 রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা।।  
 মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।  
 শোকেতে জানকী তত করেন রোদন।।  
 আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।  
 তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির।।  
 হয় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।  
 লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়।।

রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ।  
 পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্ জন।।  
 জানকী বলেন শুন দুষ্ট নিশাচর।  
 অন্লায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর।।  
 কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।  
 চলাইল রথখান ত্বরিত গমনে।।  
 জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নঙ্খন।  
 দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রঙ্খন।।  
 আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দিকে চায়।  
 দেখিল রাবণ রাজা সীতা ল'য়ে যায়।।  
 ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।  
 দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লন্দেকশ্বর।।  
 দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।  
 রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাত।।  
 ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর।  
 আপনা না জানিস তুই পাপী দুরাচার।।  
 কোন্ দোষে হরিলি রামের সুঙ্করী।  
 রঘুনাথ নাহি হিংসে তো'র লন্দেকাপুরী।।  
 সুর্পনখা গিয়াছিল রমণের সাধে।  
 নাক কাণ কাটে তার সেই অপরাধে।।  
 দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।  
 হরিলি তাঁহার বধু নাহি কোনো ডর।।  
 কি কব হইয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।  
 নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।  
 পাখসাত মারে পক্ষী আর দেয় গালি।  
 রাবণের সন্দেগ যুদ্ধ করে মহাবলী।।  
 আকাশে উড়িয়া দেখে রাম বহুদূর।  
 আঁচড় কামড়ে তার রথ কৈল চূর।।  
 আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে  
 রাবণের পৃষ্ঠের মাংস থাকে থাকে ফাড়ে।।  
 ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।  
 রথধবজ ভান্দিগয়া করিল খণ্ড খণ্ড।।

অতি ব্যস্ত দশাননুলে ক্রোধানলে।  
 রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে।।  
 ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।  
 সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে।।  
 পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।  
 চতুর্দিকে মহাবন বেষ্টিত পবর্তত।।  
 ভয়েতে কাঙ্ক্ষেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।  
 অস্ত্র রীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা।।  
 যুঝে পক্ষী রাজ কিম্বু অস্ত্র রেতে ত্রাস।  
 বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস।  
 বলহীন পক্ষী রাজে দেখিয়া রাবণ।  
 মায়া করি রথখান করিল সাজন।।  
 আরবার রাবণ সীতারে তুলে রথে।  
 চলিল সে মহাবলী পূর্ণ মনোরথে।।  
 আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।  
 মহায়ুদ্ধ করে পক্ষী অতি যোরতর।।  
 রাবণ বলিল পক্ষী শুনহ বচন।  
 পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ।।  
 অতঃপর পক্ষী রাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।  
 যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ।।  
 দুইজনে যোর রবে হইল গালাগালি।  
 দুইজনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।।  
 অন্দকুশ না মানে মত্ত মাতন্দগ যেমন।  
 কেহ কার করিতে নারিল নিবারণ।।  
 রাবণের মুকুট সে রত্নের নির্মাণ।  
 ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান।।  
 পূর্বর্তপুণ্যে রাবণের রহে দশমাথা।  
 শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা।  
 কিম্বু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।  
 নিক্ষেপ হইল রাবণের দশমুণ্ড।।  
 পক্ষী যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।  
 ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ।।

আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।  
 রথ শূদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্ফালে।।  
 বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।  
 সবর্তান্দেগ ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল।।  
 দুর্গ য় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।  
 কি করিতে পারে তাহা পক্ষীর পরাণে।।  
 রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।  
 প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর।।  
 রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।  
 অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুইপাখা কাটে।।  
 ভূমিতা পড়িয়া পক্ষী করে ছট ফট।  
 আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট।।  
 আমা লাগি শ্বশুর হারালেন জীবন।  
 রাবণের হাতে পাছে আমার মরণ।।  
 আমার হইল জন্মদ রাবণ কারণ।  
 আর না পাইব শ্রী রামের দরশন।।  
 যাবৎ না দেখা পান শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 তাবৎ কহিবে তুমি মম বিবরণ।।  
 প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।  
 বলিও তোমার সীতা নিল লন্দেকশ্বর।।  
 সাগরের পার ঘর বৈসে লন্দেকাপুরী।  
 অস্ত্র রীক্ষে ল'য়ে গেল তোমার সুজ্ঞরী।।  
 জটায়ু বলে সীতা নাহি মোর হাত।  
 যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ।।  
 আমার বচন শুন না কর ক্রঙ্কণ।  
 তোমাতে উদ্ধারিকেন শ্রী রাম লক্ষ্মণ।।  
 উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।  
 রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে।।  
 পুনর্বর্তার সীতারে তুলিল রথোপরে।  
 সীতার বিলাপ শুনি পাষণ বিদরে।।  
 অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কুল।  
 অতি কৃশা দীনবেশা কাঙ্ক্ষিয়া আকুল।।

সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।  
 গবুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী।।  
 সীতা যত গালি দেন রাবণ না শূনে।  
 রথে চড়ি বায়বেগে উঠিল গগনে।।  
 রাবণ পাখীর যুদ্ধে হৈল লণ্ড ভণ্ড।  
 কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড।  
 এই ভয়ে রাবণ পলায় উর্দ্ধ্বাসে।  
 তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে।।  
 রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।  
 সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগণ।।  
 আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।  
 সে ভূষণে সুশোভিত হইল পৃথিবী।।  
 ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুকুতার ঝারা।  
 হিমালয় শৈল যেন বহে গন্ধগাধারা।  
 শ্রী রাম বলিয়া সীতা করেন ক্রুদ্ধন।  
 অস্ত্র রীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ।।  
 জানকী বলেন কোথা শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 অভাগীরে দেহ দেখা আসি এইক্ষণ।।  
 ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর।  
 চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।।  
 নল নীল গবাক্ষ পবন নক্ষত্রন।  
 জানুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন।।  
 পক্ষী যেন বসিয়াছে পবর্ত্তের মাঝ।  
 ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ।।  
 শ্রী রামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।  
 গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী।।  
 রামের সহিত যদি হয় দরশন।  
 তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ।।  
 হেনকালে সুগ্রীবের বলে হনুমান।  
 সীতা রাখি রাবণের করি অপমান।।  
 এই যুগি দশানন শুনিল আকাশে।  
 সীতা ল'য়ে পলাইল শ্রী রামের ত্রাসে।।

সীতা লৈয়া দক্ষিণদিকে চলিল রাবণ।  
 দৈবে পথে সুপার্ষের সহ দরশন।।  
 সম্পাতির নক্ষত্রন সুপার্ষ নাম তার।  
 বিগুধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার।।  
 জটায়ুর ভাতপ্পুত্র সম্পাতি-নক্ষত্রন।  
 সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ।।  
 জটায়ুর মরণ সুপার্ষ যদি জানে।  
 রাবণেরে মারিত সে দিন সেইক্ষণে।  
 শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।  
 সহস্র জম্বু ঠোঁটে করি আনে।।  
 সাগরের জলজম্বু যখন সে ধরে।  
 তিন ভাগ জল তার আশ্রয়দান করে।।  
 এক ভাগ সাগরের জলমাত্র রয়।  
 এমন বৃহৎ কায় বিহন্দ্রগ দুর্গ য়।।  
 জটায়ুর ভাতপ্পুত্র গবুড়ের নাতি।  
 অস্ত্র রীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি।।  
 পাকসট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।  
 ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি উর্ধ্বে চাহে।।  
 শ্রী রাম বলিয়া সীতা করয়ে ক্রুদ্ধন।  
 শুনিল সে পক্ষীরাজ উপর গগন।।  
 পাকসট মারে পাখী তর্কে গর্বে ডাকে।  
 দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে।।  
 তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।  
 সীতারে হরিয়া ল'য়ে যায় দশানন।।  
 দেবতার বাক্য শূনি পক্ষী কোপেলে।  
 রথশুদ্ধ গিরিবারে দুই ঠোঁট মেলে।।  
 রথ মধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।  
 ভাবে নারী হত্যা করি হব কি নারকী।।  
 রথ খান বদ্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।  
 রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া।।  
 লন্দকায় বসতি আমার নাম যে রাবণ।  
 তোমার করিনা কোন্ শত্রু আচরণ।।

করিয়াছে রাঘব আমারে অপমান।  
 সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।।  
 ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি।  
 সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুজ্ঞরী।।  
 ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্ঘ য।  
 তব ঠাঁই পক্ষী রাজ মানি পরাজয়।।  
 সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।  
 সেইক্ষণে রথ ল'য়ে চলিল রাবণ।।  
 এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।  
 সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মুহির্ভতা।।  
 দেখিয়া সমুদ্র তীর রাবণ উল্লাস।  
 জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস।।  
 ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।  
 কৃপার আধার রাম করিবেন পার।।  
 অধোমুখী জানকী কাঙ্ক্ষেন আশঙ্কায়।  
 উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়।।  
 রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।  
 কোথায় রাখিব বলি চিত্তিল অস্ত্র র।।  
 শত্রুতা হইল রাম লক্ষ্মণের সনে।  
 নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে।।  
 রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।  
 এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।  
 এতেক যুঝি র রাম লক্ষ্মণের সনে।  
 কি করিতে পারি মোরা আছি যত জনে।।  
 রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।  
 সাগরের পার থাক সতর্ক অস্ত্র র।।  
 রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।  
 ধিক্ ধিক্ তোসবারে যারে স্ত্রানান্ত্ররে।।  
 রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।  
 লঙ্ককা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে।।  
 রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।  
 সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সবর্তক্ষণ।।

সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন।  
 লঙ্ককাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন।।  
 চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।  
 মোর আঞ্জা বিনা কেহ না আসে নিকটে।।  
 চারিদিকে সাগর তার মধ্যে লঙ্ককা গড়।  
 দেব দৈত্য না আইসে লঙ্ককার নিয়ড়।।  
 দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।  
 দাসী করে রাখিব তোমার সে সবারে।।  
 নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।  
 আঞ্জা কর সীতাদেবী সকলি তোমার।।  
 তোমার সে বক আমি তুমি ত ঈশ্বরী।  
 আঞ্জা কর সীতা ল'য়ে যাই অস্ত্রপুরী।।  
 সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।  
 কোপ না করিও মোরে চন্দ্রমুখী সীতা।।  
 রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অস্ত্ররে।  
 বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে।।  
 রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রী রাম দেবতা।  
 রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।।  
 শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।  
 তাঁর কাছে নিযুগু করিল চেড়িগণ।।  
 সীতারে রাখিল ল'য়ে অশোক কাননে।  
 সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়িগণে।।  
 সুপর্ণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।  
 গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন।।  
 খাচ্ছা মুখে গর্বে খাচ্ছা সভয় অস্ত্ররে।  
 রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে।।  
 সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।  
 হৃদয়ে সবর্তদা রাম সলিল নয়নে।।  
 জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।  
 ইন্দ্রে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন।।  
 লঙ্ককামধ্যে থাকিবেন সীতা দশ মাস।  
 এতদিন কেমনে করেন উপবাস।।

জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।  
 এই পরমাত্ম লৈয়া যাহ দেবরাজ।।  
 ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।  
 জানকী আছেন যথা অশোক কানন।।  
 বাসব বলেন সীতা না ভাবিহ চিতে।  
 আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে।  
 শ্রী রাম লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।  
 হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্য ঘরে।।  
 সাগর বাণ্ডিয়া রাম সৈন্য করি পার।  
 রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।  
 শোক পরিহর সীতে স্থির কর মন।  
 পরমাত্ম আনিয়াছি তোমার কারণ।।  
 জানকী বলেন লন্দকা নিশাচরময়।  
 ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয়।।  
 সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।  
 সহস্র লোচন হইলেন সেইক্ষণে।।  
 ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।  
 তাঁহার প্রতীতি মনে জন্মিল তখন।।  
 দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমাত্ম সুধা।  
 যাহা ভক্ষণেতে যায় তৃপ্তা আর ক্ষুধা।।  
 আগে পরমাত্ম দেন রামের উদ্দেশে।  
 আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে।।  
 পায়স ভক্ষণে তৃষ্ণী কী হইবে তাঁহার।  
 রামের বিরহানলুলে অনিবার।।  
 মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও বিকল।  
 প্রতিদিন আমি যোগাইব সুধা ফল।।  
 সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।  
 অস্ত্রেরে জানকী দুঃখ পান নিরস্তর।।  
 লন্দকাতে রহেন সীতা অশোক কাননে।  
 বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে।।  
 কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।  
 অরণ্যেতে গান রামশোকে র নিদান।।

স্ট্রানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।  
 রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ।

—০—

শ্রী রামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার  
 অশ্বেষণ।

হাতে ধনুবর্ষণ রাম আইলেন ঘরে।  
 পথে অমন্দগল কত দেখেন গোচরে।।  
 বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।  
 তোলাপাড়া করেন শ্রী রাম কত মনে।।  
 বিপরীত ধবনি করিলেক নিশাচর।  
 লক্ষ্মণ আসেন পাছে শূন্য রাখি ঘর।।  
 মারীচের আহতানে কী লক্ষ্মণ ভুলিবে।  
 সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে।।  
 দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।  
 যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিধাতা।।  
 বলেন শ্রী রাম শূন্য সকল দেবতা।  
 আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা।।  
 যেমন চিত্তের রাম ঘটিল তেমন।  
 আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।।  
 লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।  
 ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি।।  
 কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।  
 শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি।।  
 প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।  
 জ্ঞান হয় যে ভাই হারালাম জানকী।।  
 আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।  
 রাখিয়া আইলে কোথা মম স্ট্রাপ্য ধন।।  
 মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।  
 আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।  
 কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।  
 যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে।।  
 শূন্য ঘরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলি।  
 শূন্যঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।

দু রত্ন দণ্ডকারণ্য মহাভয়ন্দক র।  
 হিংস্রজন্তু কতমত কত নিশাচর।।  
 কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।  
 কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ।।  
 এই বনে দুষ্টগণ রাক্ষসের থানা।  
 মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা।।  
 পূর্বর্তাপর লক্ষ্মণ তোমাকে আছে জানা।  
 তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা।।  
 তোমাতে কি দিব দোষ মম কৰ্মফল।  
 যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল।।  
 আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল।  
 কৰ্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল।।  
 মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।  
 হের সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে।।  
 ভয়ন্দক র বিকট মুষল ডানি হাতে।  
 দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে।।  
 এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই।  
 বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।।  
 উপনীত হইলেন কুটিরের দ্বারে।  
 সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।।  
 শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী।  
 মূর্ধাপন্ন অবসন্ন শ্রী রাম ধানুকী।।  
 শ্রী রাম বলেন ভাই একি চমৎকার।  
 সীতা না দেখিলে প্রাণ রাখিব না আর।।  
 তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।  
 শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।  
 প্রতি বন প্রতি সস্থান প্রতি তবুমূল।  
 দেখেন সবর্ত্ত রাম হইয়া ব্যাকুল।।  
 পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।  
 উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর।।  
 গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।  
 নানা সস্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।।

এক বার যেখানে করেন অন্বেষণ।  
 পুনর্বর্তার যান তথা সীতার কারণ।  
 এই রূপে একসস্থানে যান শতবার।  
 তথাপি না পান দেখা শ্রী রাম সীতার।।  
 কাঙ্ক্ষিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।  
 রামের ক্রুদ্ধনে কাঙ্ছে বন্যপশু পাখী।।  
 রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।  
 রামেরে কহেন যত প্রবোধ বচন।।  
 উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রী রাম।  
 সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।।  
 সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।  
 করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রী রামেরে কোলে।।  
 রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।  
 হাহাকার বারে বারে করে দেবলোকে।।  
 বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।  
 ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।  
 কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।  
 কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।  
 মন বুঝি বারে বুঝি আমার জানকী।  
 লুকাইয়া আছে কি লক্ষ্মণ দেখ দেখি।।  
 বুঝি কোনো মুনিপত্নী সহিত কোথায়।  
 গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।  
 গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন।  
 তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।।  
 পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।  
 রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।।  
 চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।  
 চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল গরাস।।  
 রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তাশ্রিতা।  
 হরিলেন পৃথিবী কী আপন দুহিতা।।  
 রাজ্যহীন যদ্যপি হ'য়েছি আমি বটে।  
 রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।।



আমার সে রাজ লক্ষ্মী হারাইল বনে।  
 কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে।।  
 সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।  
 লুকাইল তেমন জানকী বনাস্তরে।।  
 কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা।  
 বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।।  
 দিবাকর নিশাকর দী৫ তারাগণ।  
 দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ।।  
 তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।  
 এক সীতা বিহনে সকল অগুধকার।।  
 দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।  
 সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে।।  
 সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।  
 সীতা বিনা আমি যেন মণিহারী ফণী।।  
 দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।  
 সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।  
 আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান।  
 তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।।  
 তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।  
 শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে।।  
 শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা।  
 কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।।  
 কাঙ্ক্ষিয়া কাঙ্ক্ষিয়া রাম ভ্রমণ কানন।  
 দেখিলেন পথমধ্যে সীতার ভ্রমণ।।  
 দেখিল যে পড়ে আছে ভগ্নরথ চাকা।  
 কনক রচিত আছে পতিত পতাকা।।  
 রথচূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি।  
 মণি মুণ্ডা পড়িয়াছে আর তার কাঁঠি।।  
 শ্রী রাম বলেন দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ।  
 এখানে সীতারে করহ অন্বেষণ।।  
 সম্মুখে পবর্তত বড় অতি উঁচ দেখি।  
 লুকাইয়া রাখিল পবর্তত চন্দ্রমুখী।।

যমদগু সম আমি ধরি ধনুবর্তাণ  
 পবর্তত কাটিয়া আজি করি খান খান।।  
 মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।  
 লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ তার দেখ বিদ্যমান।।  
 লক্ষ্মণ বলেন ইহা নহে কোনোমতে।  
 সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পবর্ততে।।  
 পবর্তত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।  
 সীতা লয়ে অস্ত্র রীক্ষে গেল কোনো জন।।  
 নানামতে শ্রী রামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।  
 শোকাকুল শ্রী রাম না মানেন বচন।।  
 ধনুক দিলেন গুণ সর্প যেন গর্বে ।  
 বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন্ কার্যে।।  
 বিশ্ব পুড়াইতে রাম পুরেন সগুধান।  
 দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান।।  
 লক্ষ্মণ চরণ ধরি করেন মিনতি।  
 এক কথা অবধান কর রঘুপতি।।  
 সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।  
 কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর।।  
 সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।  
 অপরাধে একের অন্যেরে নাহি বধি।।  
 তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।  
 অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার।।  
 কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।  
 দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার।।  
 গ্রাম আর তপোবন পবর্তত শিখর।  
 নদনদী দেখি আর গিয়া সরোবর।।  
 তবে যদি সীতার না পাই দরশন।  
 পছাৎ করিহ চেষ্টা যাবা লয় মন।।  
 শূনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তুণে।  
 সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুইজনে।।  
 ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক।  
 যেমন উন্মত্ত রাম বলেন অনেক।।

জলে স্ট্রালে অম্র রীক্ষে করেন উদ্দেশ।  
 বনে বনে ভুমিয়া অনেক পান ক্লেশ।।  
 যেখানে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।  
 দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে।।  
 ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।  
 কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।।  
 হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য-বৃক্ষগণ।  
 কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।।  
 এই রূপে শ্রী রাম ভ্রমে চারিদিকে।  
 রশ্মে রান্ধগা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে।।  
 পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।  
 খাইলি সীতারে তুই বধি তার প্রাণ।।  
 পক্ষী রূপে আছিলি রে তুই নিশাচর।  
 পাঠাইব এক বাণে তোরে যমঘর।।  
 সগুধান পুরেন রাম তাকে মারিবারে।  
 মুখে রশ্ম উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে।।  
 অশ্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।  
 এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ।।  
 সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।  
 সীতাকে লইয়া লন্দকা গেল সে রাবণ।।  
 দু ভাই তোমরা যবে নাহি ছিলে ঘরে।  
 শূন্যঘর পাইয়া হরিল লন্দেকশ্বরে।।  
 আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি বৃদ্ধ করি তায়।  
 রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়।।  
 দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।  
 মুখে রশ্ম উঠে রাম যায় এ জীবন।।  
 ইতঃস্তুত ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।  
 চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ।।  
 তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।  
 আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি।।  
 প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।  
 সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি এইক্ষণ।।  
 আপনা নিশ্চেষ্ট রাম জানি পরিচয়।  
 দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়।।

জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত।  
 রামের নয়নে বহে বারি অবিরত।।  
 শ্রী রাম বলেন পক্ষী তুমি মম বাপ।  
 কহিয়া সীতার বার্তা দূর কর তাপ।।  
 রাবণের সন্দেগ মম নাহিক বৈরিতা।  
 বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা।।  
 কোন্ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্ পুরে।  
 কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে।।  
 অনেক শক্তি তে পক্ষী তুলিলেক মাথা।  
 কহিতে লাগিল শ্রী রামেরে সর্ব কথা।।  
 সংহারিলা চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস।  
 লক্ষ্মণ করেন সূর্ণগাথার অযশ।।  
 এই কোপে রাবণ হরিল জানকীর।  
 রাখিল লন্দকায় ল'য়ে সমুদ্রের তীরে।।  
 বিশ্বশ্রবা পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।  
 বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা।।  
 কোনো চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রুদ্ধন।  
 জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।  
 তব পাদদোক রাম দেহ মোর মুখে।  
 সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।।  
 এত বলি পক্ষীর মুখেতে রশ্ম ভান্ধেগ।  
 কহিল সীতার বার্তা শ্রী রামের সন্দেগ।।  
 মৃত্যু কালে বক্ষে পক্ষী শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 দিব্য রথে চাপি স্বর্গে করিল গমন।।  
 জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধম্মজ্ঞান।  
 কৃতিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ।।

—o—

জটায়ু উদ্ধার

শ্রী রাম বলেন পক্ষী পিতার সমান।  
 সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ।।  
 বনজন্তু খাইলে অধর্ম অপযশ।  
 অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ।।  
 তবেত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।  
 আলিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি।।

তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষীরাজ।  
 দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ।।  
 সংকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।  
 গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ।।  
 রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।  
 অরণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃন্তিবাস।।  
 ক বণ্ডু এ বং শবরীর স্বর্গে গমন।  
 রজনী আইল সঁস্থান থাকি বার নাই।  
 শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই।।  
 বাহিরেতে ছিলেন রাম বরণ সুস্থ।  
 শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত।।  
 শ্রী রাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।  
 গোদাবরী তীরেতে তাজিব এ জীবন।।  
 এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।  
 গাঁথিল মুণ্ডার হার নয়নের জলে।।  
 রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস।  
 সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস।।  
 সীতার বিহে ৬৬দে রাম পাইলেন ক্লেশ।  
 বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ।।  
 রজনী প্রভাত হ'ল উদিত অরুণ।  
 সীতার উদ্দেশে রাম চলেন দক্ষিণ।।  
 ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে।  
 প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে।।  
 সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।  
 দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে।।  
 বুদ্ধিতে বিক্রম বড় চতুর লক্ষ্মণ।  
 রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।  
 কেন রাম হয় হস্ত লোচন স্পন্দন।  
 বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন।।  
 বিষম কুশের বন দেখি করি ভয়।  
 নানা অমন্দগল দেখি না জানি কি হয়।।  
 দুই ভাই পাশাপাশি বনে প্রবেশয়।  
 পথ আগুলিয়া রাখে অতি ভীমকায়।।

পেটের ভিতর নাক কাণ চক্ষু মাথা।  
 শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্বত সে কথা।।  
 রাম লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্ক না।  
 দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুইজন।।  
 ক বণ্ডু বলিল তোরা আমার আহা।  
 মোর হাতে পড়িলে কি পাইবে নিস্তার।।  
 এ বিষম বনে তোরা এলি কি কারণ।  
 পরিচয় দেহ শূনি তোরা কোন্ জন।।  
 শ্রী রাম বলেন ভাই হইল সংশয়।  
 প্রাণরক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয়।।  
 লক্ষ্মণ বলেন ভাই বুদ্ধি কেন ঘাটি।  
 রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি।।  
 ক বণ্ডুধর ডান হাত কাটেন শ্রী রাম।  
 খড়গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম।।  
 দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।  
 পড়িয়া ক বণ্ডুধর বীর করে ছটফটি।।  
 ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।  
 কোন দেশে বৈস তুমি হও কোন্ জন।।  
 লক্ষ্মণ বলেন রাম জগতের রাজা।  
 রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা।।  
 শ্রী রামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।  
 পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন।।  
 তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃতি আকৃতি।  
 বনের ভিতরে থাক হও কোন জাতি।।  
 এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।  
 পূর্বত কথা ক বণ্ডুধর হইল স্মরণ।  
 কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুচ্ছর।  
 কচ্ছর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর।  
 সকল দেবতা নিচ্ছর করি নিজ রূপে।  
 ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে।।  
 যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।  
 বিরূপ হউক সব রূপ যাক নাশ।।  
 যখন হবেন বিস্তুর রাম অবতার।  
 তাঁর বাণস্পর্শে তোর হইবে নিস্তার।।

আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।  
 করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত।।  
 বজ্রাঘাত প্রবেশিল আমার উদরে।  
 চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে।।  
 গতিশক্তি নাহি কিসে মিলিবেক ভক্ষ।  
 তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ।।  
 দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পবর্তত।  
 দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ।।  
 দুই প্রহরের পথে যত বনচর।  
 দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর।।  
 কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন।  
 তোমা দরশনে মোর শাপ বিমোচন।।  
 তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।  
 কেন রাম বনে ভ্রম কোন্ অভিলাষ।।  
 শ্রী রাম বলেন সীতা হরিল রাবণ।  
 যুষ্টি বল কেমনে পাইব দরশন।।  
 কবণ্ড বলিল রাম কহি উপদেশ।  
 যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ।।  
 যাবৎ আমার তনু না হয় সংকার।  
 তাবৎ না দেখি কিছু সব অণ্ডকার।।  
 রাক্ষস শরীর গেলে পাব অব্যাহতি।  
 তবেত বলিতে পারি ইহার যুক্তি।।  
 তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।  
 কবণ্ডধরে দহিলেন করি পরিপাটি।।  
 শরীর পুড়িয়া তার হইল অন্দগার।  
 অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার।।  
 আকাশে উঠিয়া করে রামে সন্তাষণ।  
 দেবমূর্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন।।  
 পুরুষ বলেন শুন শ্রী রাম লক্ষ্মণ।  
 সাবধান হয়ে শুন আমার বচন।।  
 সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমুকে।  
 আঞ্জা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে।।  
 রাম দরশনে কবণ্ডধর স্বর্গবাস।  
 কুশের বনেতে রাম করেন প্রবেশ।।

প্রভাত হইল নিশা উদয় মিহির।  
 চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী তীর।।  
 কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিনী সহিত।  
 দেখিলেন মৃগ মৃগী বিহেউদ বঞ্চিত।।  
 রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।  
 দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে।।  
 জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী।  
 দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী।।  
 পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।  
 সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন।।  
 প্রবেশ করেন রাম মাতন্দগ আশ্রমে।  
 তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রী রামে।।  
 শবরী আনন্দে ভরি ধরিতে না পারে।  
 শ্রী রামের প্রতি বলে আঞ্জা অনুসারে।।  
 মাতন্দগ মুনির সেবা করি বহুকাল।  
 বৈকুণ্ঠে গেলেন মুনি হ'য়ে প্রাণেকাল।।  
 কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।  
 আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি।।  
 শবরী যখন পাবে রাম দরশন।  
 তখনি হইবে তব শাপ বিমোচন।।  
 রাম রাম শ্রী রাম রাঘব রঘুপতি।  
 হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি।।  
 শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।  
 আনিয়া লালিল অগ্নি নানা শূক কাঠে।।  
 করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।  
 তাহার চরিত্রে রাম চমকিত মন।।  
 অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অন্দগার।  
 তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার।।  
 যাঁহার স্মরণমাত্র মুক্তি সন্দেহ ধায়।  
 তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়।।  
 শ্রী রাম প্রসাদে তার পাপ নাশ।  
 অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস।।  
 শ্রী রাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।  
 এতদূরে সমাৎ হইল অরণ্যকাণ্ড।।

## ৩০.৪ সা রাংশ

কৃতিবাসের সঙ্কোপে রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডের নাম ‘অরণ্যকাণ্ড’। ‘বালকাণ্ড’ ও ‘অযোধ্যাকাণ্ডে’র পর এই কাণ্ডটি বিন্যস্ত। দেবর্ষি নারদের নিকট বাল্মীকির রামচরিত শ্রবণ দিয়ে বালখণ্ডের শুরু। দশরথের অযোধ্যায় আগমন ও মন্দগলাচারণ, ভরতের মাতুলালয়ে গমন এবং রাম-লক্ষ্মণের পৌর কাজকর্মে মগ্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কাণ্ডের সমাপ্তি। ‘অযোধ্যাকাণ্ডে’র শুরু রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য দশরথের সন্দকল্প এবং শেষ রামের পাদুকা নিয়ে ভরতের প্রস্থান, রামচন্দ্রের চিত্রকূট পরিত্যাগ ও রাব্রিশেষে গহন কাননে প্রবেশ। ‘অরণ্যাকাণ্ডে’ এই গভীর বনে প্রতিকূল অনুকূল পরিবেশে রামচন্দ্রের কর্মকাণ্ড, প্রকৃতি বর্ণনা ও মিলন-বিবাহের নানা চিত্রাদিতে পরিপূর্ণ। চিত্রকূট পর্বতে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাতের জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

‘অরণ্যাকাণ্ডে’র প্রারম্ভের এই অংশে রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং চিত্রকূট পর্বতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অবস্থানের কথা আছে। এই পর্বতে বহু মুনির বাস। তাদের কানাকানি শুনে রামচন্দ্র এর কারণাদি জানতে চায়। বৃদ্ধমুনি সবিস্তারে সব কিছু খুলে বলেন। রাবণের খর ও দূষণ নামে দুই দুষ্ট নিশাচর তাঁদের সান্দগ-পান্দগ নিয়ে এই আশ্রমে প্রায়ই উপদ্রব করে। তারা যজ্ঞ নষ্ট করে, ফল-মূল কেড়ে খায়। তাদের এই অত্যাচারের জন্যই এ বন ত্যাগ করে অন্য বনে চলে যাবার পরামর্শ করছে। সীতাদেবী রূপবতী। রাক্ষসবেষ্টিত এই বনে তাকে রামচন্দ্র কী করে রাখবে? বৃদ্ধমুনি রামচন্দ্রের বিপুল শক্তি র কথা জানেন, তবু বন ছেড়ে যাবার আগে এই বনে রামচন্দ্রকে সাবধানে থাকবার কথা বলে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মুনিগণ তাঁদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ির দিকে রওনা হন। মুনিগণ চলে যাবার পর নির্জন বনে কী করে তিনজন বাস করবেন তার চিন্তায় মগ্ন হন।

/অত্রিমুনির আশ্রমে স্ত্রী রামের গমন ও উশু মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ\* এই অংশে অযোধ্যা থেকে চিত্রকূটের দূরত্ব বেশি নয়। ভরতের ভাতৃভক্তি ও অসীম, যে-কোনো সময় সে আবার এসে যেতে পারে, হৃদয় দুর্বল হতে পারে—ইত্যাদি ভেবে চিত্রকূট ত্যাগ করে রামচন্দ্র দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। অনেক পথ হেঁটে তারা উপস্থিত হন অত্রিমুনির আশ্রমে। মুনির চরণ বজ্রনা করে তাঁর কাছে সীতাকে সমর্পণ করেন এবং বলেন—‘পালন করহ যেন আপন দুহিতা’। মুনিপত্নীকে দেখে সীতার মনে হলো তিনি যেন ‘মুনি তামতী - কবণা’। সীতা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করলে মুনিপত্নী তাঁকে দুহিতে আশীর্বাদ করেন। রাজ ঐশ্বর্য ও রাজকুলের মর্যাদা সব কিছু ত্যাগ করে স্বামীর সন্দেগ বনবাসে আসার কথা বললে পতি ভক্তি ই যে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, পার্থিব জগতের অন্য কিছুই কাম্য নয়। আজীবন পতিভক্তি যাতে অটুট থাকে সে কথা বলেন। সীতার কথায় তুষ্ট হয়ে মুনিপত্নী সীতাকে অলন্দকা রাদিতে সাজিয়ে সমাদরে কাছে বসিয়ে তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে চান। মেনকাকে দেখে জনক রাজার বীর্যমাটিতে পড়ে। মাটির অভ্যন্ত্রের তার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙলের ফলায় সে দি বালোকে আসে। রাজা নিজে র কন্যা মনে করে আমাকে সাদরে ঘরে নিয়ে যায়। এই সময় দৈববাণীতে রাজা সব কিছু জেনে এবং ঐ বাণী অনুসারে তার নাম রাখেন সীতা। প্রধান দেবীর স্নেহ-মায়ায় সীতা বড় হন। যে হরধনুতে গুণ পরাতে পারবে তার গলায় বরমাল্য অর্পণ করবে সীতা—এই বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হয়। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে। পিতার আদেশে রামচন্দ্রের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন সীতা। আর উর্মিলার সন্দেগ লক্ষ্মণের বিয়ে হয়। কুশধবজের দুই কন্যার সন্দেগ ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মুনি গৃহিণী সব শুনে আনন্দিত হয়ে সীতার সিঁথিতে পরিণয় দেন। বিচিত্র অলন্দকারে তাঁকে সজ্জিত করেন। মুনির আশ্রমে পরমানন্দে রাত কাটে। পরের দিন সকালে স্নান করে তিনজন মুনির চরণ বজ্রনা করেন। সেই সময় অত্রিমুনি সেই স্থানে রাক্ষসদের ভয়ানক উৎপাতের কথা বলে

রামচন্দ্রকে সার্থক প্রেমিক রূপে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি শুধু চোখে র জলে র বুক ভাসিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। সীতা উদ্ধারের জন্য মন প্রাণ দৃঢ় করে এগিয়ে গেছেন। শবরীকে শাপমুগ্ধ করে ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সুগ্রীবের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

সার্বিক বিচারে চরিত্রটি কোমলে কঠোরে আকর্ষক হয়েছে। শ্রী রামচন্দ্রে র শৌর্য ও মাধুর্য একাকার হয়ে গেছে। বীরত্ব, প্রেম, পরিহাস রসিকতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি সর্বগুণে গুণান্বিত চরিত্রটি নিঃসঙ্কেহে ‘অমৃতে র ভাণ্ড’।

**সীতা :** কৃষ্ণিবাসে র হাতে সীতা চরিত্রটি সর্বসহা বাঙালি কুল বধুর রূপ লাভ করেছে। স্বামী র বন বাসী জী বনে র সন্দিগনী হয়ে সুখে-দুঃখে স্বামী র সম ভাগী হয়েছেন। বাঙলা র কোমল-পেল বমাটির গুণ্ড চরিত্রটিকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে। পতিভক্তি র আদর্শ সীতা র জী বনে র পরতে পরতে লক্ষ্য ক রা যায়। রূপে-গুণে তিনি অতুলনীয়া।

‘অ রণ্যকাণ্ডে’ সীতা ছায়া র মতো রামে র সন্দেগ বনে বনে ঘুরেছে। অত্রিমুনি আশ্রমে মুনিপত্নী র স্নেহ ভালো বাসায় উদ্ভল সীতা র জন্মদ বৃত্তান্ত পরিবেশন স্নিগ্ধ মধুর। দশ বছর নানা বনে ঘুরে পঞ্চবটী বনে এসে সীতা স্বামীকে অনুনয়ে র সুরে বলেন—

/সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।  
রাক্ষস মারিয়া ত ব কোন্ প্রয়োজন।।\*

স্বামী র অমন্দগল চিত্রা করেই সীতা কথাটি বলেছেন। স্বামী ভক্তি র পবিত্রতা এতে প্রকাশ পেয়েছে। খর-দূষণে র যুদ্ধে রামচন্দ্রে র রশ্মি ষ্ণু দেহ দেখে—

/জানকী র নেত্রনী র ঝা র ঝা র ঝারে।।\*

স্বামী র প্রতি শ্রদ্ধা ভালো বাসা র অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

স্বর্ণমৃগ দেখে মধুর বচনে সীতা রামকে অনুরোধ করেন—

/এই মৃগ চর্ম যদি দাও ভাল বাসি।  
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।।\*

পত্নী র আশা পূরণে রামচন্দ্রে র হরিণ শিকারে যাত্রা এং মা রীচে র নকল আর্ত কণ্ঠস্বরে ভীত চকিত সীতা র লক্ষ্মণে র প্রতি ক রুণ আবেদনে র মধ্যে শুচীশুভ প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শূন্য ঘরে সীতাকে একাকী ফেলে সে যেতে অস্বীকার ক রলে সীতা জ্ঞান শূন্য হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন—

/বৈমাত্রের ভাই কভু নহেত আপন।  
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।।  
ভ রত লইল রাজ্য তুমি লহ না রী।  
ভ রতে র মনে সড় আছয়ে তোমারি।।\*

এই বশু ব্যে র মধ্যে সীতা র হীনমন্ত্রতা র পরিচয় থাকলেও গভীর ভাবে যদি ঘটনা র পরিবেশ ও পটভূমিকা বিশ্লেষণ ক রা যায় তাহলে দেখা যাবে স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চিত্র ই সীতাকে পেয়ে বসেছিল। ঞ্জতুভশু লক্ষ্মণকে চ রম আঘাত না দিলে সে ঞ্জতু আদেশে অটল থাকবে এতে রামচন্দ্রে র চ রম বিপদ ঘটতে পারে—এই আশঙ্কাকালেই সীতা কথাগুলি বলেছেন। এস ব তাঁ র মুখে র কথা মনে র কথা নয়।

অতিথি প রায়ণ সীতা অতিথ্য নিষ্ঠা র জন্যই লক্ষ্মণে র আদেশ অমান্য করে গণ্ডীর বাইরে এসে রা বণে র হাতে

বজ্রিনী হন। অনেকে একে হঠকা রী বলে চিহ্নিত করতে পারেন কিন্তু আমরা মনে হয় বাঙালির চিরন্তন আতিথেয়তার আদর্শেই সীতা এমনটি করেছেন। রাবণ সীতাকে আকাশ পথে নিয়ে যাবার দৃশ্যে হীনমন্য রাবণের প্রতি সীতার তীব্র ঘৃণা ও স্বামীর প্রতি অনন্ত প্রেমাম্বু বারে পড়েছে। গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আবেদনে আমরা স্বামীর বিহীন বেদনাতুর সতি-সাধবী-মহিয়সী নারীর রূপটিই প্রত্যক্ষ করি। পথ রেখা ধরে রামচন্দ্র যাতে অনুসুপ্তানী হতে পারেন তার জন্য সীতা তাঁর গায়ের গহনাদি পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে চরিত্রটির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের শত প্রলোভন সীতা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর কণ্ঠে এক বাণী—

“রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রী রাম দেবতা।  
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।\*  
/সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।  
হৃদয়ে সর্বদা রাম মলিন নয়নে।।\*

এই অংশেই সীতার পতিব্রতের নৈষ্ঠিক রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। অশোক কাননে বজ্রিনী সীতা নীরব নিখর।

হৃদয়ে সর্বদা রাম মলিন নয়নে।।\*

বিরহ অনলে সীতা চরিত্রটি প্রেম পবিত্র রূপধারণ করেছে।

**লক্ষ্মণ :** শ্রী রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছর বনবাসী জীবনে ছায়াসন্দর্ভী ছিল লক্ষ্মণ। কৃতিবাসের হাতে ‘অরণ্যখণ্ডে’ লক্ষ্মণ শূন্য রামচন্দ্রের ছায়া নয় কায়ারূপধারণ করেছে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দুর্বল অসহায় রামের মনে শিশু ও আশা স্বপ্ন জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, আত্মতৃপ্তির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সীতার কটুশি র প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজে সৎযমের শাসনে বেঁধে সীতার নিরাপত্তা বিধানে কার্পণ্য করেনি। স্বীকৃতি-সিঁথির অটল-স্বল্পভাবী লক্ষ্মণের চরিত্রটিকে কৃতিবাস দু-একটি তুলির টানে জীবন্ত করে এঁকেছেন।

দণ্ডকারণ্যের পথে আগে রাম মধ্য সীতা ও পিছনে লক্ষ্মণ পথ চলছে। তিনজনে প্রকৃতির কোলে আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় ভীষণ রাক্ষস বিরাধের আগমন। সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে সে ভক্ষণ করতে চায়। শূন্য সীতা নয় দুই ভাইকেও সে হত্যা করতে উদ্যত। এই চরম সন্দ্বকট মুহূর্তে রাম ভীত হয়ে পড়েন। তাঁদের সামনে সীতাকে রাক্ষস গিলে খাবে অথচ নিরুপায়ভাবে তা দেখতে হবে এই ভাবনায় রাম যখন দিশেহারা, তখন লক্ষ্মণ দাদার মনো বল ফেরাতে—

/লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।  
রাক্ষসের মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।\*

লক্ষ্মণের এই উদ্দীপন মস্তেই রামের শৌর্য-বীর্যের জাগরণ ঘটে। সুতরাং চরম সন্দ্বকট মুহূর্তে লক্ষ্মণকে আমরা দৃঢ়চেতা যুবক রূপে দেখতে পাই। অগস্ত্য মুনির লক্ষ্মণ সম্পর্কে মন্ত্র ব্য—

/দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।\*

লক্ষ্মণ চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন। রাম-সীতার সুখ-দুঃখের সমঅংশভাগী সে। আত্মসর্বস্বতার কোনো মলিনতা চরিত্রটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। লক্ষ্মণের পরামর্শেই গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র কুটার নির্মাণ করেন। দাদার স্বপ্নকে সে একদিনে সূত্রের কুটার তৈরী করে সার্থক করে। তার ছিল গভীর সৌজ্ঞেয়বোধ। কুটার সম্পর্কে কবির ‘মনোহর’ শব্দটি এবং ‘পূর্ণকুণ্ড দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি’—এই বর্ণনাতার সাক্ষ্য বহন করে।

খর-দূষণের সন্দেহ যুদ্ধে রামচন্দ্রের সহযোগী যোদ্ধার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে লক্ষ্মণ। ‘ভয়’ শব্দটি তার চরিত্র অভিধানে লেখা নেই। পরিহাস করে রামচন্দ্র সূর্ণগণাকে লক্ষ্মণের কাছে যেতে বজ্রো সূর্ণগণা তার দিকে ধাবিত হয়ে শূন্দগার রস ঢেলে দেয়।

লক্ষ্মণ নিজেকে ‘শ্রী রামের দাস’ বলে তাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু সূর্ণগণা বাড়া বাড়ি করে সীতাকে গিলে খেতে গেলে রামের ইন্দ্রিগতমাত্র বাণ দিয়ে তার নাক কান কেটে দেয়। একদিকে ঞাতৃভণ্ডি অন্যদিকে দুষ্টকে শায়েস্তা করা—দুটি কাজ লক্ষ্মণ করে তার চরিত্রের মহাত্ম্য প্রকাশ করেছে।

মারীচের ছলনায় ভুল বুঝে সীতা লক্ষ্মণকে অশালীন ভাষায় গালাগালি ও বুচিহীন ইন্দ্রিগত করলেও—

/লক্ষ্মণ ধার্মিক অতি মনে নাহি পাপ।

সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।\*

কৃতি বাস লক্ষ্মণের নিষ্পাপ চরিত্রকে শত্রুর সন্দেহ অন্দকন করেছেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও কর্তব্য কর্মে তার অবহেলা নাই। তাই সীতাকে সাবধান করে গণ্ডী একে দিয়ে যায়। এর মধ্যে তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের মানসিক অবস্থা না বুঝে পরিস্থিতি অজ্ঞাত থাকার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে একাকিনী ফেলে আসার জন্য অপ্রতক্ষভাবে দোষারোপ করলেও সে নিবুত্তর থাকে। বুক ভরালা নিয়েও তার কর্তব্য জ্ঞান ও সংযমের জন্য চরিত্রটি আদর্শস্থানীয় হয়েছে। কবণ্ডেধর দুই-হাত ছিন্ন করার ব্যাপারে লক্ষ্মণের প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তার আহতানেই কবণ্ড মুণ্ডি পাবার পর সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের কাছে তাকে যাবার নির্দেশ দেয়।

সুতরাং লক্ষ্মণ চরিত্রটিকে কৃতি বাস স্বল্প স্থানে র মধ্যে রেখেও অসামান্য করে তুলেছেন। ঞাতৃভণ্ডি, বৌদির প্রতি অসীম শত্রু, চরম বিপদে স্থিতির থেকে বুদ্ধিদান, সাহসীও সংযমী ভূমিকা পালন ইত্যাদি র মধ্য দিয়ে লক্ষ্মণ নিঃসঙ্কেহে দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র হয়েছে।

**রাবণ :** কৃতি বাসের অরণ্যকাণ্ডের শেষের দিকে আমরা লন্দেকশ্বর রাবণকে দেখতে পাই। সূর্ণগণা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রতি দৈহিক কামনা-বাসনা-সঘন প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে সীতাকে আক্রমণ করলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তার নাক, কান কেটে দিলে খর-দূষণকে উত্তেজিত করে চোদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে তারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিধবস্ত হয়। আতন্দেক দিশেহা রা প্রতিশোধের শেষ অস্ত্র হিসাবে সূর্ণগণা রাবণকে বেছে নেয়।

রাবণ-রাজ সভায় আসীন। বিভৎস মুখ নিয়ে সূর্ণগণা রাবণকে প্রথমে গালাগালি দেয় তারপর রামের বন গমন ও রাক্ষসদের হত্যার বিবরণ দিয়ে সীতার রূপ বর্ণনা করে—

/রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।

ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপে পরমা কামিনী।\*

এখানেই শেষ নয়। সীতার সৌন্দর্যের কাছে স্বর্গের অঙ্গরী উর্ষী, মেনকা, রঞ্জাও হার মানে। শেষে রাবণের কামনা আগুন ালতে বলে—

“তার রূপ কে বল তোমাকে মাত্র সাজে।\*

সূর্ণগণা র দূর বসস্থায় রাবণ বিজ্ঞুমাত্র বিচলিত নয়। সে ‘সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে’। এই একটি চরণেই কৃতি বাস কামুক রাবণের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। রূপ বতী সীতাকে তার চাই। মনে মনে পরিকল্পনা গ্রহণ করে মারীচের কাছে সূর্ণগণার নাক কান কাটার কথা বলে সীতাহরণের জন্য মারীচকে হরণ সেজে রামকে মায়াজালে জড়িয়ে ফেলতে



বলে। মা রীচ তাকে অনেক সুমন্ত্রণা দেয়, এমনকি এই কু-কর্মের জন্য লন্দকাপূরী ধবংস হবে এমন কথাও বলে। কিন্তু রা বণ সব মন্ত্রণা নস্যাত্ন করে মা রীচকে তা র আঞ্জা পালন ক রতে বলে নতুবা তা র মৃত্যু অনি বার্য একথাও বলে।

নি রুপায় মা রীচ রা বণে র নির্দেশে সোনা র হরিণ সাজে, সীতাকে প্রলুব্ধ করে, রামকে কুটী র থেকে অ রণ্যে আনে রামচন্দ্রে র কণ্ঠস্বরে সীতাকে প্রতারিত করে লক্ষ্মণকেও কুটী র ছাড়তে বাধ্য করে। রাম-লক্ষ্মণ শূন্য কুটী রে একা সীতা। তপস্বী র বেশ ধরে রা বণ মিষ্টি মধুর কথায় সীতা র মন ভেজায়। নিজে র কথা বলে ভিক্ষা চায়। সীতা ইতস্ততঃ ক রতে থাকলে তা র বজ্র নির্ঘোষ—

/..... ভিক্ষা আনহ সত্ব র।  
নতু বা উত্ত র দেহ যাই নিজ ঘ র।।\*

আতিথেয়তা র ধর্ম নষ্ট হবে বলে লক্ষ্মণে র কথা উপেক্ষা করে গণ্ডী পেরোতেই ছদ্মবেশী রা বণে র আসল চেহা রাটা প্রকাশ পায়। কৃত্তি বাসে র ভাষায় ‘রা বণ পাতকী’। সীতা র মনহ রণে র জন্য স্বর্ণলন্দকা র ঐশ্বর্যে র জগতকে তা র সামনে তুলে ধরে নির্লণ্ণে র মতো বলে—

/সীতে তুমি সুজ্জ রী লা বণ্য আ র বেশে।  
তোমা হেন সুজ্জ রী আমাকে অভিলাষে।।\*

সূর্পণখা দাদা র কামুক চরিত্রে র যে আভাস দিয়েছিল তা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় রা বণে র এই নগ্ন ইন্ডা র মধ্যে। জটায়ু পাখী সীতা হ রণে র জন্য রা বণে র উদ্দেশে কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক। জটায়ু র সন্দেগ রা বণে র তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু সূচতুর রা বণ নিজে র কামাগুণে র কথা চেপে সূর্পণখা র প্রতি রাম-লক্ষ্মণে র নৃশংস ব্য বহার, খ র-দূষণে র নিষ্ঠুর মৃত্যু ইত্যাদি র কথা অনুনয়ে র সূরে বলে, পক্ষী রাজে র কাছে প রাজয় মেনে ক্ষমা ভিক্ষা ক’রে কোনোক্রমে ভান্দগা রথ নিয়ে লন্দকায় আসে। সীতা র সন্দেগ, জটায়ু র সন্দেগ রা বণ যে অভিনয় করেছে তাতে তা র চাণক্যীয় কূট-কৌশল লক্ষ্য ক রা যায়। চতুর কামুক রা বণ অশোক কাননে সীতাকে বজ্রিনী রেখে তা র মনো বাঞ্জা পূরণে র জন্য প্রতীক্ষা ক রতে থাকে। কৃত্তি বাসে র হাতে রা বণ পাপিষ্ঠ, ছল-চাতুরী পূর্ণ কামুক রূপেই চিহ্নিত।

**সূর্পণখা ৩** পঞ্চবটা বনে সূর্পণখা র আবির্ভাব। ‘মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী’— রামচন্দ্রে র রূপে মুগ্ধ হয়ে রূপজ মোহে তাকে জী বনসন্দর্শী করে ভোগসুখে মগ্ন হতে চায়। সীতা লক্ষ্মণে র পরিচয় দিয়ে এ বং বন বাসী হওয়া র কা রণ জানিয়ে রামচন্দ্রে সূর্পণখাকে এড়াতে চায়। খ র-দূষণ দুই ভাই এ র কথা বলে সে নগ্নভাবে রামচন্দ্রে কে প্রস্তাব দেয়—

/সুমে রু প বর্বত আ র কৈলাস মজ্জ র।  
তোমাসহ বেড়াই ব দেখি ব বিস্ত র।।\*

শুধু তাই নয় সীতাকে ভক্ষণ করে একা রামে র সন্দ্বিগনী হবে বলে। রামচন্দ্রে কৌতুক বলে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দিলে সে নির্লণ্ণে র মতো তাকে বলে—

/তুমি যু বা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।  
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমা র সংহতি।।\*

কৃত্তি বাস দেহ সঙ্কোচী সূর্পণখা র চরিত্রটিকে সার্থকভাবে অন্দকন করেছেন। কামনা-বাসনা র স্বপ্ন ব্যর্থ হলে—নাক,

কান কাটা গেলে প্রতিশোধেৰ আগলৈ লে সেই খৰ-দুৰ্গকে যুদ্ধে পাঠায়। তাৰে মৃত্যুৰ পৰা বাণকে নৰমে-গৰমে, চোখেৰে জলে নানা অভিনয় কৰে সীতা হৰণেৰ পৰামৰ্শ দেয়। শুধু তাই নয় নিজেৰ কামাগিকেই সে ছড়িয়ে দেয় বাণেৰ চিন্তায় ভাৰনায়।

সুতৰাং দেখা যায় সূৰ্পণখা চৰিত্ৰটি অৰণ্যকাণ্ডে সম্পূৰ্ণ মসীলি। স্বাধীন শ্ৰেয়শ্ৰদ্ধাৰ অৰ্ঘস্বৰূপ। কিন্তু সূৰ্পণখাৰ নগ্ন শ্ৰেয়শ্ৰেয় নিবেদন ঘণাৰ্হ। লক্ষ্মণ তাৰ নাক-কান কেটে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে। লক্ষ্মণকাপুৰী যে সম্পূৰ্ণ ধবংস হয়েছে তাৰ মৰ্মমূলে সূৰ্পণখাৰ কামনাৰ অনল অন্ততম। সে এই অনলই প্ৰচলিত কৰেছে বাণেৰ হৃদয়ে।

**মাৰীচ :** ‘অৰণ্যকাণ্ডে’ মাৰীচেৰ জন্ম আমাদেৰ সহানুভূতি ও দুঃখ দুই-ই জাগে। সুবিবেচক ভবিষ্যৎ দ্ৰষ্টা নিৰুপায় মাৰীচক বুণাৰ পাৰ। সীতাহৰণেৰ কামনা পূৰ্ণকৰতে বাণ মাৰীচেৰ গুণগানে মুখৰ হলেও সে তাৰ প্ৰস্তাৱকে মনে প্ৰাণে সমৰ্থন কৰেনি। ন্যায়-অন্যায় বোধে চৰিত্ৰটি উদ্দীপিত। সে স্পষ্ট ভাষায় বাণকে সুমন্ত্ৰণা দিয়ে বলে—

/যথা তথা যাহ তুমি বলি লন্দেকশ্বৰ।  
নাকৰ সীতাৰ চেষ্টা চলি যাহ ঘৰ।\*

কিন্তু ‘চোৱা না শুনে ধৰ্মেৰ কাহিনী’— বাণ নাছোড় বাছ্ৰা। সে মাৰীচকে কু-কৰ্মে সহযোগী হতে বলে, না হলে তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য বলে ভয় দেখায়। কিন্তু মাৰীচ মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। তবে এই মৃত্যু বাণেৰ হাতে নয়। ৰামচন্দ্ৰেৰ হাতেই তাৰ কাম্য। তাই আমাৰা শুনতে পাই মাৰীচেৰ মৰ্মকথা।

/বৰঞ্চ ৰামেৰ হাতে মৰণ মন্দগল।  
বাণেৰ হাতে মৃত্যু নৰক কে বল।

পাপ-পুণ্য বোধ চৰিত্ৰটিকে অসামান্য মৰ্যাদা দান কৰেছে। অনি২৬সত্বে তাকে বাণেৰ নিৰ্দেশ মেনে ছলা-কলা নিতে হয়েছিল, যাৰ পৰিণামে সীতাহৰণ, লক্ষ্মণায়ুদ্ধ ও লক্ষ্মণকাপুৰী ধবংস। মাৰীচেৰ আত্মত্যাগ যেন লোভ ও পাপেৰ উচিত ফল প্ৰাৰ্হিৰ নিৰ্দেশক। মাৰীচেৰ শত ছলা-কলা, সীতাৰ অপহৰণ ইত্যাদিৰ জন্ম সাধাৰণ দৃষ্টিতে মাৰীচকে দায়ী বলে মনে হলেও কৃত্তিবাস মানসিক দ্বন্দ্বৰ মধ্য দিয়ে মাৰীচকে উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

---

## ৩০.৭ অৰণ্যকাণ্ডেৰ বিশেষ-কয়েকটি ঘটনা বলীৰ বিশ্লেষণ

---

জুকৰ অত্ৰিমুনি পত্নীৰ সন্দেগ সীতাৰ কথোপকথন, জুকৰ অগস্ত্য মুনিৰ উপদেশ, জুকৰ বাণেৰ প্ৰতি মাৰীচেৰ সুমন্ত্ৰণা, জুকৰ শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰেৰ বিলাপ।

এই অংশে কৃত্তিবাসেৰ ৰামায়ণ গ্ৰন্থেৰ ‘অৰণ্যকাণ্ডে’ৰ বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ল। এই অংশগুলি পাঠ কৰলে অন্যান্য প্ৰধান বা অপ্ৰধান অংশগুলি ও মূল-পাঠ দু-তিন বাৰ পাঠ কৰে আপনাৰা নিজেৰ ভাষায় ব্যাখ্যা কৰতে পাৰে বেন। নিজেৰ ভাৰনা ও প্ৰকাশ ক্ষমতা বাঢ়ানোৰ জন্মই দৃষ্টান্ত স্বৰূপ আলোচ্য অংশগুলি বিশ্লেষণ কৰা হ'ল।

**জুকৰ অত্ৰিমুনিৰ আশ্ৰমে মুনিপত্নীৰ সন্দেগ সীতাৰ কথোপকথন :**

চিত্ৰকূট ত্যাগ কৰে দক্ষিণ দিকে যাত্ৰা কৰে ৰামচন্দ্ৰ অত্ৰিমুনিৰ আশ্ৰমে সমাদৰে স্থান পাবাৰ পৰা মুনি,

সীতাদে বীকে তাঁর পত্নী গৌতমীৰ হাতে সমৰ্পণ করেন। মুনি-পত্নীকে দেখে সীতাৰ মনে হয় ‘মূৰ্ত্তিমতি কৰুণা কি শ্ৰদ্ধা উপস্থিত।’

সীতাকে প্ৰাণ ঢালা আশীৰ্বাদ কৰে মুনিপত্নী তাকে মুখোমুখী বসিয়ে সম্মেহে মধুৰ কথা বলতে শূৰু কৰেন।

সীতাদে বীৰ ভাগ্যপ্ৰসন্ন। পিতৃকুল ও পত্নীকুল উভয়ই ৰাজকুল। দুই বংশকেই সীতা উচল কৰেছেন। ৰামচন্দ্ৰ বহু তপস্যা কৰে এমন স্ত্ৰী লাভ কৰেছেন। ৰাজ সম্পদেৰ মোহত্যাগ কৰে সীতা স্বামী সন্দিগনী হয়ে বন বাসিনী হয়েছেন। সীতাৰ গুণগান মুনিপত্নী পঞ্চমুখে কৰলে, সীতা বিনয়েৰ সন্দ্বেগ বলেন—

‘ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।

আশীৰ্বাদ কৰ যেন ৰামে থাকে মতি।।\*’

স্বামী ভক্তিৰ পৰম নিষ্ঠাৰ কথা শ্ৰবণ কৰে মুনিপত্নী আনন্দ্ৰে আত্মহাৰা। তিনি সযত্নে তাঁকে নানা অলন্দকাৰে সাজিয়ে আদৰে আলিঙ্গন কৰে সীতাকে তাঁৰ পূৰ্বজী বনেৰ ঘটনা বলতে বলেন। সীতা তাঁৰ জন্মদ বৃত্তান্ত তুলে ধৰেন।

স্বৰ্গেৰ অঙ্গ ৰা মেনকা আকাশপথে যা বাৰ সময় তাৰ বস্ত্ৰ উড়ে যায়। তাৰ দৈহিক সৌন্দৰ্য্যে মুগ্ধ হয়ে জনক ৰাজাৰ কামনা বহিঁলে ওঠে এ বং তাৰ বীৰ্যেৰ স্বলন হয়। সেই বীৰ্য মাটিতে পড়ে এ বং তা থেকেই সীতাৰ জন্ম। জমি চাষেৰ সময় লান্দগলেৰ ফলায় সীতাৰ দেহ সূৰ্য্যেৰ আলোতে আসে। নিজেৰ কন্যা অনুমান কৰে জনক ৰাজা তাকে কোলে সঁস্থান দেন। এমন সময় আকাশে দৈব বাণী হয়। এই দৈব বাণীতে সীতাৰ জন্ম কাহিনী পিতা জানতে পাৰেন। লান্দগলেৰ মুখে জন্ম বলে নাম ৰাখলেন সীতা। আনন্দ্ৰে আত্মহাৰা ৰাজা দীন-দুঃখীদেৰ অকাতৰে ধন দান কৰেন। ৰাজমাতাৰ স্নেহে সীতা বড় হন। যে শিবেৰ ধনুকে গুণ পৰাতে পাৰবে তাৰ সন্দ্বেগ কন্যাৰ বিবাহ দেবেন বলে মনে মনে স্থিৰ কৰেন। ৰাজাৰ বাৰ্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তেৰো লক্ষ ৰাজকুমাৰ এসে উপস্থিত। কিন্তু স বাই ধনুক দেখে ভয় পায় এ বং মনেৰ দুঃখে সঁস্থান ত্যাগ কৰে। জনক ৰাজা দুঃখিত্ৰায় পড়েন। এমন সময় ৰাম-লক্ষ্মণেৰ উপস্থিতি। শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ বাম হাতে ধনুক তুলে তাতে গুণ পৰাতে গেলে শি বধনুক ভেন্দ্বেগ যায়। ধনুক ভান্দগাৰ শব্দে ত্ৰিভুবন স্তম্ভ হয়ে যায়। এৰ পৰই মহা ধূমধামেৰ মধ্য দিয়ে ৰাম-সীতা ও কুশধবজেৰ দুই মেয়েৰ সন্দ্বেগ লক্ষ্মণ ও ভৰতেৰ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবে পূৰ্বকথা শেষ কৰে বিনয় নত্ৰভাবে সীতা বলেন—

/ভগবতী পূৰ্বকথা এই কহিলাম।

হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী ৰাম।।\*’

সীতাৰ কথায় পৰিত্ৰে হয়ে মুনিপত্নী সীতাৰ সিঁথিতে সিঁদূৰ দেন আৰ তাৰ সৰ্বান্দ্বেগ মূল্য বান অলন্দকা ৰাদি পৰিয়ে নববেশেন বৰূপে সাজিয়ে দেন।

সীতা ও মুনি পত্নীৰ কথোপকথনে আম ৰা অত্যন্ত আপনজনেৰ হৃদি বিনিময় দেখি। ৰাজদুহিতা ৰাজপত্নীৰ বন বাসিনী মূৰ্ত্তি গুৰু পত্নীকে ব্যথা দেয়—এজন্যই তিনি তাকে অলন্দকা ৰাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। প্ৰথম দৰ্শনেই মুনি পত্নীকে সীতাৰ কৰুণাৰূপিনী মনে হওয়ায় প্ৰাণখুলে তিনি তাঁৰ পূৰ্বজী বনেৰ ইতি বৃত্ত বলতে কুৰ্ণা বোধ কৰেন নি। সীতাৰ বন বাসিনীৰূপ দেখে মুনিপত্নীৰ কথায় বেদনা প্ৰকাশ পেলে সীতা তাৰ পতিভক্তিৰ প্লা বনধাৰায় সে বেদনা দূৰ কৰে দেন। উভয়েৰ কথোপকথন যেমন আন্তৰিক তেমন হৃদিৰসে জাৰিত।

**অখৰ অগস্ত্য মুনিৰ উপদেশ :** পঞ্চবটী বনে দীৰ্ঘদিন বাস কৰে সূতীক্ষ্ম মুনিৰ কাছে অগস্ত্যমুনিৰ নিকট যা বাৰই ২৬ প্ৰকাশ কৰলে মুনি পিঙ্গলী বনে গিয়ে অগস্ত্যেৰ সন্দ্বেগ দেখা কৰতে বলেন। অগস্ত্যেৰ তপো বনে গিয়ে বাতাপি ও

ইন্টবল রাক্ষসকে অগস্ত্য মুনি কিভাবে বধ করেছিল সে কাহিনী শুনায়। তা রপ র মুনি র দ্বারা তাঁরা তিনজন উপস্থিত হন। রামে র কথা শুনে মুনি শিষ্যকে শীঘ্র তাঁদের ডেকে আনতে বলে। তিনজন অগস্ত্যে র চরণ বজ্রনা করে। গোলোক ছেড়ে রামচন্দ্র বন বাসী হয়েছেন। তাঁর আর কি ইং ৬৩ তা মুনি জানতে চান। শ্রাম্ভ বন বাসীদের ভোজনে তৃৎ করে। তিনদিন সেখানে তাঁর থাকার পর চতুর্থদিন ভোরে রামচন্দ্র অগস্ত্যে র সন্দেগ প্রাণ খুলে কথা বললে, অগস্ত্য মুনি তাঁকে গোদা বরী তীরে থাকতে বলেন। তিনি রামচন্দ্রকে বিশ্বকর্মা নির্মিত ‘দি ব্য ধনু বর্তন’ প্রদান করেন। রামচন্দ্রকে ‘সোনা র টোপর’ ও ‘বস্ত্র রত্ন’ দিয়ে আদর করে কাছে টেনে নেন। অগস্ত্য মুনি র আশী বাদ নিয়ে তাঁর নির্দেশেই রাম-লক্ষ্মণ সীতা অগস্ত্যমুনি র তপো বন ত্যাগ করে। দক্ষিণ দিকে গোদা বরী নদী র তীরে র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই অংশে রামচন্দ্রে র ভগ বৎ রূপ অগস্ত্যমুনি জানতে পারেন। পিতৃসন্তে র আদর্শ অক্ষুণ্ন রেখে তিনি যাতে নির্ভা বনায় আনন্দে থাকতে পারেন তা র জন্যই মুনি র ‘দি ব্য-ধনু বর্তন’ দান এ বৎ গোদা বরী নদী র রমণীয় তীরে কুটী র নির্মাণ করে বস বাসে র নির্দেশ দান।

### ঙ্গব রা বণে র প্রতি মা রীচে র সুমন্ত্রণা দান :

সূর্পণখা র কাছে সীতা র রূপ ঙ্রস্বর্যে র কথা শুনে রা বণ কামনা র আগুনে লে সীতাহ রণে র জন্য মা রীচে র সাহায্য চায়। কিন্তু মা রীচ স্পষ্টভাবে বলে—

‘সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর’

রা বণে র অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক রায় রা বণ ভীষণ রেগে যায় এ বৎ তাকে বলে—

‘আমি তোরে মারি ব কে রাখিতে পারে।’

রা বণ নিজে র প্রতাপে র কথা সদন্তে ঘোষণা করে এ বৎ রামচন্দ্রকে হীন মনুষ্যজাতি রূপে তাহি ডল্য করে। মা রীচে র কাছে রা বণ জোরে র সন্দেগ বলে—

/ভাণ্ডাইয়া রামে রে লইয়া যাহ দূর।

হরিয়া আনি ব সীতা পেয়ে শূন্য পূর।\*

বা রণে র কু-প্রস্তা ব ও তাকে হত্যা ক রা র হুমকী অগ্রাহ্য করে মা রীচ বলিষ্ঠভাবে পরিণাম সম্পর্কে বলে—

‘সীতারে আনিলে হবে স বংশে ম রণ।’ রা বণ জী বনে অনেক না রীকে হ রণ করেছে, কিন্তু সীতাকে হ রণ ক রলে তা র আ র নিস্তা র নেই। শুধু রা বণ নয়, লন্দকাপূরী র সকলে র জী বনও হবে সংশয়। একজনে র স্ত্রীকে এনে সকল না রী র মর্যাদা নষ্ট হবে। তাই মা রীচ রা বণকে সীতা র লোভ ত্যাগ ক রা র কথা বলে লন্দকাপূরীতে ফিরে যেতে বলে। রামচন্দ্রে র মুখোমুখি হয়ে আগে মা রীচে র মৃত্যু হবে কিন্তু সীতা হ রণে র পর রা বণ ও লন্দকাপূরী র সকলে র মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। মা রীচ মায়ামৃগ রূপ ধা রণ করে রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে বনে আনতে পা রবে, কিন্তু সীতাকে রক্ষা র জন্য দে ব র লক্ষ্মণ কুটী রে থাকবে। লক্ষ্মণে র উপস্থিতিতে কারো সাধ্য নেই সীতাকে হ রণ করে। সুত রাং মা রীচে র সুমন্ত্রণা দান—

‘যথা তথা যাহ তুমি বলি লন্দেকশ্ব র।

না ক র সীতা র চেস্তা চলি যাহ ঘর।’

শুধু তাই নয় মা রীচ শেষ বারে র জন্য বলে যে তা র মন্ত্রণা উপেক্ষা করে রা বণ যদি সীতাকে হ রণ করে তবে মা রীচে র ভবিষ্যৎ বাণী তাকে স্মরণ ক রতেই হবে। অর্থাৎ তা র ও দেশ বাসী র মহা স বনাশ ঘটবে।

মারীচ যুগ্মি সহ মানবিক সুমন্ত্রণাই দিয়েছে রা বণকে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে রা বণের কু-প রামর্শে ভী রু কাপু রুষে র মতো তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি। বরং সীতা র লোভ ত্যাগ করে, ভবিষ্যৎ এ র সর্বনাশের কথা ভেবে যা২৬ রা বণ কু-ই২৬া দমন করে তা র জন্যই তাকে এই সৎ প রামর্শ দান। এ র মধ্য দিয়ে মারীচের নিভীক আদর্শবাদী চারিত্রিক মাধুর্য়ই প্রকাশ পেয়েছে।

**অঘব শ্রী রামচন্দ্রে র বিলাপ :** কৃতি বাসে র ‘অ রণ্যখণ্ডে’ র শেষ অংশটি ‘শ্রী রামচন্দ্রে র বিলাপ ও সীতা র অন্বেষণ’ রূপে চিহ্নিত।

ধনু বর্ষণ হাতে রামচন্দ্র কুটীরে যাত্রা করেন। পথে অমন্দগলে র বহু চিহ্ন তাঁ র চোখে পড়ে। মারীচের রামকণ্ঠে র আহতানে লক্ষ্মণ কি সীতাকে একাকিনী রেখে বনে আসবে? যদি আসে তবে সীতা র কি হবে?—এইস ব চিন্তায় মগ্ন অ বসস্থাতেই পথে লক্ষ্মণের সন্দেগ দেখা। তাকে দেখেই রামচন্দ্রে র প্রাণ কেঁপে ওঠে। তাঁ র কণ্ঠে মহা বিপদের সংকেত—

“মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।  
আ র বুঝি সীতা র সাক্ষাৎ পাব নাই।।”

ভাই লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রে র বক্ষভেদী বিলাপ—

“শূন্যে লক্ষ্মণ সেই সোনা র পুতুলি।  
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।”

দুরন্ত রাক্ষস পরি বৃত্ত এই গভীর বনে মুনি ঋষিগণ সর্বাদা শব্দকাতুর। লক্ষ্মণ সব জেনে শূন্যে যে কাজ করেছে তা র ভবিতব্য ভেবে রামচন্দ্র নিজের অদৃষ্টকেই বার বার দোষারোপ ক রতে থাকেন। মারীচ বধের দৃশ্য দেখিয়ে ভাইকে নিয়ে রামচন্দ্র দ্রুত কুটীরের দিকে গমন করেন। কুটীর দ্বারে পৌঁছে তা র বুক ফাটা “সীতা-সীতা” ডাক। কোনো উত্তর নেই। কুটীর সীতা শূন্য দেখে তিনি মুহূর্তপ্রায় হন। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র কিভাবে বাঁচবে—সীতাকে না পেলে প্রাণত্যাগ ক রবে ইত্যাদি বিলাপ ক রতে থাকেন। বন-গুহা, ত রুমুল তন্ন তন্ন করে খুঁজে সীতাকে না পেয়ে রামচন্দ্র চোখে র জলে বুক ভাসান। তাঁ র কান্নায় বনের পশু-পাখীও কঁাদে। সীতা র শোকে রাম অস্থির। ত বু আশায় বুক বেঁধে লক্ষ্মণকে মুনি-পত্নী র কাছে, গোদা বরী তীরে খুঁজতে বলে।

“সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।  
সীতাবিনা আমি যেন মণি হা রা ফণী।।”

ফণী ছাড়া সাপের জী বন যেমন ব্যর্থ, তেমনি সীতাহা রা রামচন্দ্রে র জী বনও অগুণ্ধকার। লক্ষ্মণ ভাই-এ র প্রতি তাঁ র ক রুণ আবেদন—

“দেখরে লক্ষ্মণ ভাই ক র অন্বেষণ।  
সীতারে আনিয়া দে হ বাঁচাও জী বন।।”

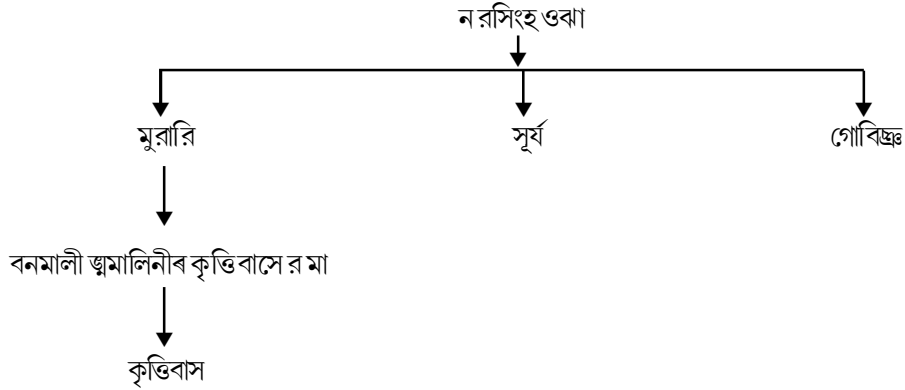
পথে সীতা র অলন্দকা রাদি, রা বণের রথচূড়া র অংশাদি দেখে ঐ সস্থানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বলেন রামচন্দ্র। শ্রী রামচন্দ্রে র বিলাপে বন-বনানী বেদনায় দীর্ঘ। হঠাৎ সামনে আহত জটায়ু পাখী র সন্দেগ দেখা, রা বণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত শ্র বণ এ বং তা র নির্দেশে রাম-লক্ষ্মণের সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা। মূল লক্ষ্য সীতা উদ্ধার।

এই অংশে পত্নী প্রেমের অনন্ত রূপ শ্রী রামচন্দ্রে র বিলাপে র মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সীতাহা রা রামচন্দ্রে র বিলাপ ক রুণ রস ধা রায় স্নাত।

## ৩০.৮ কৃষ্ণি বাসে র কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অগুণ্ডকার। পঞ্চদশ শতাব্দী র মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দুশো বছরের অধিককাল সাহিত্য অন্ধগনে কোনো প্রদীপ প্রচলিত না হবার কারণ তুর্কী আক্রমণ, মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং তার অনুচর বশিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ। বন্দেগম্বর লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ না করেই পশ্চিম বন্দগকে তুর্কী শাসনের কবলে তুলে দেন। শুবুহয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রশে র প্লাবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি র প্রবহমান ধারাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কী শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালো বাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে—এই বোধ ও চেতনা র দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশি শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য ও অল্পশরয়ী বিদ্যোৎসাহিতার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে র জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল রুকনুদ্দীন বারবক শাহ জ্ব ১৪৬৯ খ্রিঃ — ১৪৭৩ খ্রিঃ হুসেন শাহ জ্ব ১৪৯৩ খ্রিঃ — ১৫০০ খ্রিঃ এবং তার পুত্র নসরৎ খাঁ জ্ব ১৫১৮ খ্রিঃ — ১৫৩২ খ্রিঃ। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদি কবি বালন্দীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যের সার্থক বন্দগানুবাদ করেন তিনি হলেন “এ বন্দেগর অলন্দকার” কৃষ্ণিবাস ওবা।

**কবি পরিচিতি :** কবি পরিচিতি প্রদানের আগে সংক্ষেপে কৃষ্ণিবাসের বংশলতিকার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হল।



কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতৃপুরুষেরা পূর্ববন্দেগ বাসকরতেন। পরে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওবা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিম বন্দেগর নদীয়া জেলার ‘ফুলিয়া’ জ্বফুলমালধঞ্জ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়,

“গ্রাম রত্ন ফুলিয়া বাখানি

দক্ষিণে পশ্চিমে বাহে গন্দগাত রন্দীগনী।।”

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবিতার জন্মবৃত্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

“আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস  
তথি মধ্যে জন্মলইলাম কৃতিবাস।।”

এই শ্লোকে সঠিক সাল তারিখে উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্লোকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন তে রশ কুড়ি শকে অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ -এর ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার ‘পুণ্য’ শব্দটিকে ‘পূর্ণ’ ধরে হিসাব করে দেখালেন ১৪৩২ - ১৪৩৩ খ্রিঃ কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস সম্মত তা বিচার্য। কৃতিবাসের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড় গন্দগাপার হয়ে উত্তরবন্দেগ বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোকে রম্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চক্রবর্তী জলে অভিষিক্ত করেন। মাল্যভূষিত করেন, পটু বস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন কিন্তু অর্ধকাণ্ড লেখক তাঁর প্রপৌত্র গৌড়েশ্বরের নামটি কোথায় উল্লেখ করেননি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হইলেন রাজ গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিঃ। যদি কবির জন্ম ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার কৃতিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃতিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমন্দগল বিবৃত কৃতিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বুকনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইতি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কৃতিবাসের জন্ম-বৃত্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিত বজ্রোপাধ্যায় ‘আত্মপরিচয়’ শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, “কৃতিবাস, মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হন, সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃতিবাসের উপস্থিতি যুক্তি যুক্ত মনে করেন।”

**কাব্য পরিচিতি :** পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর কল্যাণকে সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃতিবাস শ্রী রাম পাঁচালী রচনা করেন।

“সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।  
লোক বুঝাইতে কৈল কৃতিবাস পণ্ডিত।।”

কৃতিবাস সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মতো করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হল— ‘আদি’, ‘অযোধ্যা’, ‘অরণ্য’, ‘কিষ্কিন্ধ্যা’, ‘লন্দকা’ ও ‘উত্তরা’। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্প রসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যু বাণ হরণ ইত্যাদি। কৃতিবাস যে

সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মন্দীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন ‘আদি’ ও ‘লন্দকাকাণ্ড’। গল্প রসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি র পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মন্দীকি র হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল কৃতিবাসের হতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল পেল বমাখানো বাঙালি চরিত্রে রমতো হয়েছে। শ্রী রামের প্রেমক রুণাঘন ‘মূর্তি’ কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বন্দগ বধু, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের র স্রৈণ বৃদ্ধস্বামী। কৈকেয়ীর মধ্যে দিয়ে অভিমানক্ষুধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভৃশ্চি রসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির ‘শূরধর্মী’ কাব্য হয়ে উঠেছে ‘গৃহধর্মী’ কৃতিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রে র বৈশিষ্ট্য কাব্যখানি কেমন উচল। কৃতিবাসের রামায়ণ বাংলা র ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালি র সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধবনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, “কৃতিবাস বাঙালি র জাতীয় কবি এ বং তাঁর রামায়ণ বাঙালি র জাতীয় মহাকাব্য।”

কৃতিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান— বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালি র ভোজন রসিকতা, আলস্য পরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে এসবের সন্দেহ ভৃশ্চি প্রেমের উদ্বলতাও লক্ষণীয়। বাঙালির আহা-বিহা র, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সব কিছুই সুছন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভর দ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানর বাহিনীকে খেতে দিয়েছিল—মতিচূর, মণ্ডা, সরুচাকলী, গুড়পিঠে, তাল বড়া, ছানা বড়া, খাজা, জিলিপি, পাপড় ইত্যাদি। এইসব খাবারের সন্দেহ বাঙালি র রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধুর মতই রান্না বান্না করে খাইয়েছেন।

### উদাহরণ ছ

“প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।  
তাহার পরে সুপআদি দিলেন সান্ধ্র।।  
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চশ ব্যঞ্জন।  
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।”

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে ‘পাঁচুটি’, ছয়দিনে ‘ষষ্ঠী পূজা’, তোরোদিনে ‘জননী সৌচান্দ্র’, ছয়মাসে ‘অন্নপ্রাশন’ ইত্যাদি র বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর, ক রুণ রস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অগুণমুনি রপূত্র বধ, সীতাহরণও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের ‘শৃশ্চি শেল’ ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্ত করছে। সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযুর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভৃশ্চি রসের উৎসাহে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবন রসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবন রস ভরায় গ্রন্থখানি তাই যুগাতিত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসূদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃতিবাসের কাব্য বাংলা র জনজীবন অমৃত রসের মতো চিরকাল আনন্দন করবেন।

কৃতিবাসের নামে এমন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পায়ে ৬। কালক্রমে মূল ভাষা রও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃতিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রী রামপুরের প্রিন্সটন মিশনারি উইলিয়াম কে রীর উদ্যোগে



১৮০২ খ্রিঃ — ১৮০৩ খ্রিঃ -এ র মধ্যে কৃষ্ণিবাসী ৰামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সৰ্বপ্ৰথম মুদ্ৰিত হয়। পৰে কৃষ্ণিবাসী ৰামায়ণে ৰ যত সংস্কৰণ মুদ্ৰিত হয়েছে তা ৰ সৰ্বশ্ৰী ৰামপুৰী সংস্কৰণে ৰ উপৰ ভিত্তি কৰেই সম্পাদিত। ১৮৩০ খ্রিঃ — ১৮৩৪ খ্রিঃ জয়গোপাল তৰ্কালন্দকা ৰ পুৰাতন ভাষাকে মেজে ঘষে ৰামায়ণে ৰ এক নূতন সংস্কৰণ বে ৰ কৰেন। সকল দিক বিচা ৰ কৰে বাংলা সাহিত্যে ৰ আদি-মধ্যযুগে ৰ সাৰ্থক প্ৰতিভু হিঁসাবে কৃষ্ণিবাসে ৰ নাম স্বৰ্ণাক্ষৰে লিখিত থাকবে।

## ৩০.৯ অনুশীলনী

১। নীচে ৰ বশু ব্যগুণি ঠিক বা ভুল তা নিৰ্দিষ্ট ঘৰে ঙ্খৰ চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
ঙকৰ কৃষ্ণিবাসে ৰ ৰামায়ণ ৫টি খণ্ডে লিখিত।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ঙখৰ ৰামচন্দ্ৰ পম্পা নদীতীৰে কুটী ৰ নিৰ্মাণ কৰেন।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ঙগৰ ৰামচন্দ্ৰকে দিব্য ধনুৰ্বান প্ৰদান কৰেন অগস্ত্যমুনি।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ঙঘৰ যুদ্ধে খৰ-দূষণে ৰ হাতে ৰামচন্দ্ৰ পৰাজিত হন।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ঙঙৰ মাৰীচ ৰা বণকে সুমন্ত্ৰণা দেয়।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ঙচৰ ৰামচন্দ্ৰ সূৰ্পণখা ৰ নাক-কান কাটে।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ঙছৰ ৰামচন্দ্ৰ আগে পঞ্চবটী বনে পৰে চিত্ৰকূটে যান।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ঙজৰ ৰামচন্দ্ৰে ৰ হাতে বিৰাধ ৰাক্ষসে ৰ মৃত্যু ঘটে।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূৰণ কৰুন।

- ঙকৰ কৃষ্ণিবাসে ৰ কাব্য ———— গ্ৰন্থখ।  
 ঙ্খৰ অৰণ্যকাণ্ডে ৰ প্ৰকৃতি চিত্ৰ ————।  
 ঙ্গৰ ৰামচন্দ্ৰে ৰ বিলাপ অংশে ———— ৰস প্ৰকাশ পেয়েছে।  
 ঙ্ঘৰ ৰা বণ চৰিত্ৰটি ————।  
 ঙ্ঙৰ সীতা ———— বাঙালি বধু হয়েছেন।  
 ঙ্চৰ জটায়ু ———— যুদ্ধকৰে।  
 ঙ্ছৰ খৰ ও দূষণ ৰা বণে ৰ ————।  
 ঙ্জৰ সীতা ———— ৰাজে ৰ কন্যা।  
 ঙ্ঝৰ ৰামচন্দ্ৰ ———— ভেঙে সীতাদে বীকে বিবাহ কৰেন।

৩। নীচে র প্রশ্নগুলি র সংক্ষেপে উত্তর লিখুন।

ভূকৰ ‘শূন্য বনে কেমনে রহি বতিন জন’।  
কে, কোন, বনে র কথা বলেছেন? ‘তিনজন’ কে কে?  
ভূখৰ ‘মূর্তিমতি ক বুণা কি শ্ৰদ্ধা উপস্থিতা।’  
কে, কোথায়, কাকে দেখে একথা ভেবেছিলেন?  
ভূগৰ ‘নানা পক্ষী কল র বশুনিতে মধুর।  
সরো বরে কত শত কমল প্রচুর।।’  
এই প্রকৃতি চিত্র কোথাকার?  
ভূঘৰ ‘মেঘের গর্জন যেন ছাড়ে সিংহনাদ।’  
এখানে কার গর্জনে র কথা বলা হয়েছে?  
ভূঙৰ অগস্ত্যমুনি কোন্ দুই রাক্ষসকে নিঃশেষ করে?  
ভূচৰ কোন মুনি র আশ্রমে রামচন্দ্র ইন্দ্রে র ধনুর্বাণ পান?  
ভূছৰ ‘স বংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।’  
কথাটি কে, কাকে, কখন বলেছে?  
ভূজৰ ‘রণধবজ ভাঙিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।’  
কেস কার রণধবজ ভাঙে এ বং কেন?  
ভূঝৰ ‘সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।’  
কে, কখন, কার কাছে একথা বলেছেন?

৪। নীচে র কা ব্যাংশগুলি র ব্যাখ্যা নিজে র ভাষায় লিখুন।

ভূক্ষ ‘দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।  
মূর্তিমতি ক বুণা কি শ্ৰদ্ধা উপস্থিতা।’  
ভূখৰ ‘দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান।  
লুপ্ত আগুন যেন রান্দগা মুখখান।।’  
ভূক্ষ ‘পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।  
উলটিপালটি যত গোদা বরীতীর।।’

৫। ৩.৬ একক পাঠ করে নীচে র চরিত্রাদি র মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১০ টি বাক্যে প্রকাশ ক রুন।

শ্রী রামচন্দ্র, সীতা, রা বণ।

৬। অনুবাদক কৃষ্ণি বাসে র কবি পরিচিত ও অনূদিত রামায়ণ কাব্যে কবি র মৌলিক প্রতিভা র দিকটি নিজে র ভাষায় আলোচনা ক রুন ১০ টি বাক্যে র মধ্যে।

৭। জটায়ুর সন্ধেগ রা বণে র যুদ্ধে র বর্ণনা সংক্ষেপে লিখুন।

## ৩০.১০ উত্তর রমালা

১। জ্বকৰ ভুল, জ্বখৰ ভুল, জ্বগৰ ঠিক, জ্বঘৰ ভুল, জ্বঙৰ ঠিক, জ্বচৰ ভুল, জ্বছৰ ভুল, জ্বজৰ ঠিক।

২। জ্বকৰ অনুবাদ, জ্বখৰ মনোহর, জ্বগৰ কৰুণ, জ্বঘৰ দেহভোগী, জ্বঙৰ সৰ্বসহা, জ্বচৰ বীৰেৰ মতো, জ্বছৰ দুই ভাই, জ্বজৰ জনক, জ্বঝৰ হরধনু।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর সূত্রঃ জ্বকৰ রামচন্দ্র, চিত্রকূট পর্বত, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। জ্বখৰ সীতা দেবী, অত্রিমুনিৰ আশ্রম, মুনিপত্নী। জ্বগৰ দণ্ডাকারণ্যে, জ্বঘৰ বিরাধ, জ্বঙৰ বাতাপি ও ইন্টবল। জ্বচৰ শরভদ্রগমুনিৰ আশ্রম, জ্বছৰ মারীচ, রাবণ, সীতাহরণ যড়যন্ত্র মুহূর্ত, জ্বজৰ জটায়ু, রাবণ, সীতাহরণেৰ জন্য, জ্বঝৰ রামচন্দ্র, শূন্য কুটীৰ, লক্ষ্মণেৰ কাছে।

### ৪। ব্যাখ্যাৰ সংকেত সূত্রঃ

জ্বকৰ অত্রিমুনিৰ আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সীতাদেবী মুনিপত্নীকে দেখে অভিভূত হন। তাঁৰ সৌম্য-স্নিগ্ধ মধুর কৰুণা নিষিদ্ধ চেহাৰাও মাতৃসম ব্যবহাৰ দুৰ্লভ। আলোচ্য গুণা বলাইৰ দ্বাৰা মুনিপত্নী যেন কৰুণামূৰ্তি লাভ কৰেছেন। শ্রীতি প্ৰেম কৰুণা রূপিনী মুনিপত্নী সীতাৰ কাছে সৰ্ব শ্ৰদ্ধেয় রূপে দেখা দিয়েছেন।

জ্বখৰ আলোচ্য কাব্যংশটি কৃত্তিবাসেৰ রামায়ণ কাব্যেৰ ‘অরণ্যকাণ্ডে’ৰ বিরাধ বধ অংশ থেকে উদ্ধৃত। এখানে কবি বিরাধেৰ ভয়ংকৰ মূৰ্তিৰ চিত্ৰ তুলে ধৰেছেন। অত্রিমুনিৰ আশ্রমে যা বাৰ পৰ মুনিৰ নিৰ্দেশ রামচন্দ্র দণ্ডক কাননে গমন কৰেন। সেই বনে বিরাধ রাক্ষসেৰ বাস। এই রাক্ষসেৰ আকৃতি বিরাট। বিশাল শশি ধৰ। কবিতাৰ উচ্চতাও দৈহিক শশি কে পৰ্বতেৰ তুল্য বলে বৰ্ণনা কৰেছেন। তাৰ রশু বৰ্ণ মুখমণ্ডল যেন দাউ দাউ কৰেলে ওঠা আগুনেৰ মতো। শশিৰ মদমত্ততাও চেহাৰাৰ ভয়ংকৰতা আলোচ্য অংশে সার্থক ভাবে প্ৰকাশ পেয়েছে।

জ্বগৰ কুটীৰে সীতা দেবীকে না দেখে রামচন্দ্র দিশেহাৰা হন। ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনেৰ প্ৰতিটি স্থান, প্ৰতিটি গাছেৰ তলা তল্ল কৰে পাগলেৰ মতো খুঁজে বেড়ান। গোদাবৰী তীৰেৰ স্মৃতিমধুৰ স্থানগুলি ব্যাকুল হয়ে সীতাৰ অনুসন্ধান কৰেন। অজানিত আশঙ্কায় রামচন্দ্রেৰ ব্যাকুল হৃদয়েৰ কৰুণ রূপটি আলোচ্য অংশে প্ৰকাশ পেয়েছে।

৫। রামচন্দ্রঃ বাল্মীকি মুনি রামচন্দ্রকে বীৰচরিত্ৰৰূপে অন্দকন কৰেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁকে ভগ্নেৰ ভগবানৰূপে চিত্ৰিত কৰলেও অরণ্যকাণ্ডে আমৰা তাঁকে বীৰও প্ৰেমিকৰূপে পাই। সীতাৰ প্ৰতি অসীম স্নেহ, সীতাৰ প্ৰতি অনন্ত প্ৰেম উচ্চলভাবে প্ৰকাশ পেয়েছে। মুনিদেৰ প্ৰতি ভক্তি শ্ৰদ্ধা বিরাধ, খৰ-দূষণেৰ সন্দেহ তুমুল যুদ্ধে তাঁৰ বীৰত্ব তুলনাহীন। সূৰ্যপথাৰ সন্দেহ কথোপকথনে তাঁৰ রস-রসিক মনেৰ পৰিচয় পাই।

রামচন্দ্রেৰ পত্নী-প্ৰেম রোমান্টিক মাধুৰ্যেৰা। গোদাবৰী তীৰেৰ কুটীৰে সীতাকে না দেখতে পেয়ে রামচন্দ্রেৰ আকুল-ব্যাকুল আৰ্তিক রুণ-সুধেৰ। চৰিত্ৰটি কোমলে-কঠোৰে, শৌৰ্যও মাধুৰ্যে পূৰ্ণ। রামচন্দ্রেৰ চৰিত্ৰে বাঙালি জী বনছদ্ৰ প্ৰকাশ পেয়েছে। সৰ্বগুণেৰা চৰিত্ৰটি সত্যই ‘অমতেৰ ভাণ্ড।’

জ্বঘৰ সীতাঃ কৃত্তিবাস সীতাদেবীকে সৰ্বসহা বাঙালি গৃহবধুরূপে অন্দিকত কৰেছেন। বিনয়নম্ৰা, ভক্তি স্নাতা সীতা অনন্যা। পতিভক্তিৰ আদৰ্শ সীতাকে অনন্ত প্ৰেমেৰ পূজাৰিণী কৰেছে। পতিৰ জী বন আশঙ্কায় আকুল সীতা লক্ষ্মণকে অনেক কটুকথা বললেও পতিব্ৰত্ৰেৰ উচ্চ আলোতেই তা ভাস্বৰ হয়েছ। ঐতিহ্যপূৰ্ণ আতিথেয়তায় উদ্দীৰ হয়েই তাঁকে বিয়েৰে দহনুলা সহিতে হয়েছ। রাবণেৰ দস্যু বৃত্তিৰ বিৰুদ্ধেৰ মৰ বিপদ মুহূৰ্তেও তাঁৰ কঠে ধবনিত হয়েছ।

একদিকে রাবণের প্রতি ঝিক্কা র অন্যদিকে পতিমিলনের জন্য উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ। পথে প্রান্তরে গায়ে র অলংকারাদি ছড়িয়ে ফেলা র মধ্যে তা দেখা যায়। অশোক কাননে শোকানলে দন্ধ হয়ে সীতার র প্রেম পবিত্র রূপটি আরো উচলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

**রাবণ :** লন্দেক্ষর রাবণে র চরিত্রটি কৃত্তিবাস রূপমোহগ্রস্ত বিবেকশূন্য, ভোগবাদী রূপে অন্দকন করেছেন। ভগিনীর নাক-কান কেটে ফেলা র জন্য সে মোটেই দৃষ্টি দেয় নি। সীতার রূপ ঐশ্বর্যের কথা শুনেই তার ভোগলিপ্সা জেগে ওঠে। সীতা হরণে র কথা শুনে মারীচ রাবণকে অনেক সুপ রামর্শ দেয়, এমন কি এই অপকর্মের জন্য লন্দকাপুরী ধবংস হয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু পাপী দেহলোভী রাবণ তাতে কর্ণপাত করে নি। বরং তাকে হত্যার ভয় দেখায়। এতেই প্রমাণিত যে চরিত্রটি অত্যন্ত নীচুস্তরের। ছল-চাতুরীতেও সে ওস্তাদ। মারীচকে সোনার হরণে র ছদ্মবেশ ধারণে র পরামর্শ, তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ, অতিথি সৎকারের ঐতিহ্য ইত্যাদি কূট-কৌশল অ বলম্বনেও সে পারদর্শী। জটায়ু পাখীর কাছে সূর্ণখার প্রসন্দগ এনে ক্ষমাপ্রার্থীর অভিনয় করে। চতুর, কামুক রাবণ চরিত্রটি কৃত্তিবাস সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষগণ পূর্ববন্দেগ বাস করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ রসিংহ ওঝা অ রাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নদীয়া জেলা র ফুলিয়া গ্রামে বাড়ী করেন। কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী ও মাতা মালিনী। কবির দেওয়া জন্মদ বৃত্তান্তে র নানা ব্যাখ্যা দেখা যায়। ১৪৩২ — ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবির জন্ম হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক সত্যতাও সর্ববাদী সম্মত নয়। নানামূনি র নানামত থাকা সত্ত্বেও কবি রাজা গণেশের সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর আদেশকে পাথেয় করে বালন্দীকির প্রসাদে তিনি ‘শ্রী রাম পাঁচালী’ রচনা করেন। যা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে সুপ্রচারিত।

সহজ সরল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কৃত্তিবাস বালন্দীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনী অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সূত্র রাং তাঁর সৃষ্টিকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলাই সংগত। তাঁর রচিত গ্রন্থে ৭টি কাণ্ড হলো—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুজ্ঞর, লন্দকা ও উত্তরা। মূল রামায়ণে র অনেক প্রসন্দগ কবি যেমন বাদ দিয়েছেন, তেমনি পুরানো উপাখ্যান থেকে অনেক সরস কাহিনী যোগ করেছেন। তাঁর কাব্যখানি গল্প রসে জম-জমাট। কৃত্তিবাসের হাতে রামায়ণে র বলিষ্ঠ মহাকাব্যিক চরিত্র কোমল-মধুর-বাঙালি চরিত্র হয়েছে। অরণ্যখণ্ডে র রাম-লক্ষ্মণ-সীতার চরিত্রে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হাতে বীরধর্মী কাব্য হয়েছে ‘গৃহধর্মী’ কৃত্তিবাসের রামায়ণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল বাঙালি র হৃদয়ে র কাব্য হয়েছে। এইজন্যই সমালোচকে র ভাষায় তাঁর কাব্য হয়েছে “বাঙালি র জাতীয় মহাকাব্য।”

৭। ‘অরণ্যখণ্ডে’ বিরাধ বধ, খর-দূষণে র যুদ্ধ ইত্যাদি থাকলেও জটায়ুর সন্দেগ রাবণে র যুদ্ধটি প্রাণস্পর্শী হয়েছে। রাবণ সীতাকে চুরি করে আকাশ পথে যখন লন্দকার উদ্দেশ্যে রথে চড়ে যাচ্ছে তখন সেই সময় জটায়ু পাখী তার দীর্ঘদুই পাখা দিয়ে রথের গতিতে বাধা দেয়। সীতার কবুণ কান্না শুনে ‘গরুড়নন্দন’ আকাশে পাখা মেলে চারদিক দেখতে থাকে। রাবণকে চিনতে পেরে তার পথ আটকে দেয়। কবির ভাষায়—‘দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।’ সীতাকে হরণ করার জন্য জটায়ু ভীষণ ক্ষুদ্ধ। বৃদ্ধনা হলে বোঁটা থেকে ফলকে যেমন ছিঁড়ে ফেলে তেমনি সে রাবণে র মাথা তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতো। এ রপ র জটায়ুর সন্দেগ রাবণে র তুমুল যুদ্ধশুরু হয়। ‘পাখসটি’ মেরে ‘আঁচড়ে কামড়ে’ সে রাবণে র রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করে। তারপর তীব্র বেগে ছোঁ মেরে রাবণে র পীঠে র মাংস খা বলে নেয়। রথের সারথীর মুণ্ড ঠোঁট দিয়ে ছিন্ন করে। রথের ধবজাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে জটায়ু গাছে র ডালে বসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

এ রপৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যুদ্ধশূৰু। ৰা বণ ও জটায়ুৰ মধ্য তুমুল যুদ্ধচলে। এই যুদ্ধেৰ বৰ্ণনায় কবি লিখেছেন—

“অন্ধকুশনা মানে মত্ত মাতন্দগ যেমন।  
কেহ কৰে কৰিতে নারিল নিবাৰণ।”

মত্ত হাতী যেমন মাহুতেৰ অন্ধকুশকে অগ্রাহ্য কৰে, উন্দত্ত হয়ে সব কিছু লগুভগু কৰে—ঠিক তেমনি দুই জনে ক্ষিঃ হয়ে যুদ্ধকৰে। ৰা বণেৰ সোনাৰ মুকুটটিকে জটায়ু খান খান কৰে দেয়। শিবেৰ দয়াৰ জন্য ৰা বণেৰ দশমাথা ছিন্ন কৰতে না পাৰলেও জটায়ু তাৰ মাথাৰ চুল মুঠো মুঠো ছিঁড়ে ফেলে। দুই দুই বাৰ যুদ্ধে নাস্তানা বৃদ্ধ হয়ে ৰা বণ সীতাকে ভূমিতে রেখে ভাঙা রথ নিয়েই খুব উঁচুতে উঠে বত্রিশ হাজাৰ বাণ জটায়ুৰ দিকে নিষ্কেপ কৰে তাৰ দেহকে ক্ষত-বিক্ষত কৰে। তাৰপৰ ‘অৰ্দ্ধচন্দ্র বাণ’ দিয়ে জটায়ুৰ দুটি পাখা কেটে ফেলে। সন্দেগ সন্দেগ সে মাটিতে পড়ে ছটফট কৰতে থাকে।

বৃদ্ধ জটায়ুৰ সন্দেগ ৰা বণেৰ যুদ্ধ বৰ্ণনা কবি যেভাবে দিয়েছেন তাতে গা শিউৰে উঠে। ৰা বণেৰ অন্যায কাজেৰ প্রতিবাদে ও সীতা উদ্ধাৰেৰ জন্য বিনা অস্ত্রে শুধু পাখা, নখ ও ঠোঁট দিয়ে জটায়ু যেভাবে ৰা বণকে পৰ্যুদস্ত কৰেছে, তাৰ কাছে ৰা বণেৰ বত্রিশ হাজাৰ বাণ ও অৰ্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বাৰা প্রতি আক্রমণ ও প্রতিৰোধেৰ বৃপটি অত্যন্ত লান মনে হয়। কবিৰ ৰা বণেৰ প্রতি ঘৃণা ও জটায়ু পাখীৰ প্রতি মমত্বৰ বাধে—এই যুদ্ধে জটায়ুৰ সাহসিকতা—বীৰেৰ মতে প্রাণত্যাগ বীৰৰ সৈ মণ্ডিত হয়েছে।

---

## ৩০.১১ গ্রন্থথপঞ্জী

---

নিৰ্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক—

- ১। বাঙলা সাহিত্যেৰ ইতিহাস ঙ্গপ্রথম পৰ্যায়ৰ — সুকুমাৰ সেন।
- ২। বাঙলা সাহিত্যেৰ সম্পূৰ্ণ ইতি বৃত্ত — অসিত বহুত্ৰ্যাপাধ্যায়।
- ৩। বাঙলা সাহিত্যেৰ সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।
- ৪। বাঙলা সাহিত্যেৰ ইতিহাস — ক্ষুদিৰাম দাস।

---

## একক ৩১ □ কাব্য পাঠের ভূমিকা

---

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য

৩১.২ প্রস্তাবনা

৩১.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

৩১.৪ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ

৩১.৫ মূলপাঠ—১ কাব্যের আজিক

৩১.৬ সারাংশ

৩১.৭ উত্তরমালা

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ৩১.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্য বা কবিতা কী ও সেটি পাঠ করে রসোপলব্ধি করতে গেলে যে যে বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার সে সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে এবং প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আপনি—

- পদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নির্ধারণ,
  - কাব্যের বিষয় ও গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা,
  - কাব্যের আজিক নিয়ে বিচার করতে পারবেন,
- 

### ৩১.২ প্রস্তাবনা

---

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন বর্তমান এককটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে গদ্য পদ্যের পার্থক্য ও কাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিমত সংক্ষেপে আলোচনা করে একটি সাধারণ ধারণা দিয়ে দ্বিতীয় অংশে কাব্যের বিষয় ভিত্তিক ও গঠনগত বিভাজন করে সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে গীতিকাব্য ও মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা একটু বিশেষ গুরুত্বসহ বিস্তৃত করা হয়েছে। পরবর্তী এককগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আজিক বা উপস্থাপনার প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্যের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন। পরবর্তী এককগুলি পাঠের সময় কাব্যের গঠনগত ও আজিক বিচারে অনেকটা সহায়ক হবে।

এই এককটিতে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য যে শুধু পঠনগত নয়, ভাব প্রকাশেও সেটি আলোচনা করা হয়েছে। কালক্রমে গদ্যও যে ক্রমশ ছন্দস্পন্দের টানে কাব্যের সীমানায় বা পদ্য সমাজ বাস্তবতার প্রয়োজনে

গদ্যের কাছাকাছি পৌছাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। অপরদিকে একদিকে বিষয়নির্ভর, বর্ণনামূলক, বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, অন্যদিকে ব্যক্তিনিষ্ঠ, সময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কবিতা অথবা হৃদয়বেগনির্ভর গীতি-কবিতা, প্রচলিত বা কল্পিত কোন রোমান্টিক কাহিনী বা আখ্যান অবলম্বনে রচিত আখ্যানকাব্য এবং মহাকাব্য—সব কিছুই কথাই আমরা জানব। মহাকাব্যে সমগ্র জাতির জীবনের চিন্তাভাবনা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত সংহত রূপ লাভ করে। যে কাব্যে বিষয় ও ভাবনায় বিরাটত্ব ও বিস্তৃতবোধের সঙ্গে বিস্ময়বোধের সঞ্জার করে, তাকেই সাধারণভাবে মহাকাব্য বলা হয়। এই এককের দ্বিতীয় পর্যায়ে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আঙ্গিকের প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ বা ভাষা, কাব্যের ভাবানুভূতির তরঙ্গ বা ছন্দ, কাব্য দেহের অলংকার বা শব্দ ব্যবহারের প্রত্যক্ষ বা ব্যঞ্জনাগত চমৎকারিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এককটি প্রথমে পূর্বাপর পাঠ করে পরে প্রতিটি পর্যায় স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করলে উপকৃত হবেন। প্রতিটি অংশ নিবন্ধিত পাঠের পর অনুশীলনীগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। পরে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

### ৩১.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বাগ্যুত্থের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিগুচ্ছ হল ভাষা। মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও মনন যখন কবিতায় ছন্দ ছাড়াই কোন বস্তুবাক্যে বাগ্যুত্থের সাহায্যে প্রকাশ করে তখন যে অর্থবহ ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাই হল গদ্য। দৈনন্দিন মুখের কথা যেহেতু ছন্দে সাজানো নয়, তাও গদ্য। তবে সাধারণভাবে ছন্দ ও মিলহীন লিখিত ভাষাই গদ্য নামে অধিক পরিচিত।

গদ্য মানুষের মনীষার তার যুক্তি-বুদ্ধি মননের বাহন। মানুষের চিন্তা ও যুক্তির ভাষা, বিচারে ভাষা। কাব্য হল আবেগ-অনুভূতি আর কল্পনার বাহন। অনুভব আবেগের তাড়নায় ভাষায় তরঙ্গ স্পন্দন সৃষ্টি হয়। আর ভাবের তরঙ্গিত প্রকাশ সূত্রেই ছন্দের স্ফূর্তি। কাব্যমাত্রেরই আবেগ ও রূপের স্বতঃপ্রকাশ। মানুষের মনে যেমন ভাবের অজস্রতা আছে কাব্যেও তেমনি আছে রূপের তথা ছন্দের বৈচিত্র্য। শুধু ছন্দ নয়, স্তবক পদ ইত্যাদির সজ্জাও কাব্যের শরীরে বৈচিত্র্য আনে।

এই কাব্যের স্বরূপ নিয়ে মত-মতান্তরের সীমা পরিসীমা নেই—এদেশে—ওদেশে। প্রাচ্যে ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্যে ইউরোপে—গ্রীসে, ইংলণ্ডে সাহিত্য তাত্ত্বিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রাচ্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা নিজনিজ দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেহেতু কাব্যের শিল্পকর্মের মাধ্যমে শব্দ-কাব্য শব্দার্থময়, তাই শব্দ ও অর্থের মিলনেই কাব্য একথা জনৈক আলঙ্কারিক বলেছেন। অপর একজন বলেছেন ‘অভীষ্ট (ইচ্ছানুযায়ী) অর্থ-সংবলিত পদাবলিই কাব্য। এ মতবাদের বস্তু অর্থের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যজনের মতে মাধুর্য ইত্যাদি গুণমুক্ত পদ রচনাই কাব্য। মহাকবি কালিদাস বাক্য ও অর্থের সংযোগকে গুরুত্ব দিয়েছেন।<sup>১</sup> কিন্তু শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়।

কাব্যশাস্ত্রকার আনন্দ বর্ধনের মতে, যদি কোন শব্দার্থময় রচনা সহৃদয়ের হৃদয়ে আনন্দময় অনুভূতম সঞ্জার করে, সেটি হল কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের আত্মা বলতে তিনি শব্দের প্রধান অর্থ বা বাচ্যকে অতিক্রম করে বিশেষ

১. “বাগর্থো ইব সম্পৃক্তো বাগর্থ প্রতিপত্তরে”—রঘুবংশ।

বর্ণের যে ব্যঞ্জনা পাঠক হৃদয়ে সৃষ্টি করে তাকেই নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ-এর মতে আনন্দদায়ক বা রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। উপরিউক্ত মতবাদগুলির মধ্যে ধ্বনিবাদীদের মতবাদ বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অনেকটা সমন্বয় আনলেও একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়।

পাশ্চাত্য কাব্যসংজ্ঞার প্রথম প্রবক্তা প্লেটোর মতে ‘শিল্প সৃষ্টি হল অনুকরণ।’ কবিরা অপরিবর্তনীয় ভাবসত্যকে নয়, প্রতীয়মান বস্তুকে অনুকরণ করেন। তিনি শিল্পের সঙ্গে নীতির আত্মিক সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন। অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি যা ঘটতে পারে তাই বলেন। তিনি বিশেষকৈ অবলম্বন করে নির্বিশেষের কথা বলেন। কিন্তু ইয়োরোপের রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের কালে কাব্যকে কল্পনাবৃত্তির ক্রিয়ারূপে দেখা হল। মনস্তত্ত্বের আলোকে সাহিত্য বিচার প্রবণতা এল। ইংল্যান্ডের রোমান্টিক যুগের প্রথম কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে কাব্য হল গভীর অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলন (Spontaneous overflow of powerful feelings) অর্থাৎ কাব্য প্রবল আবেগের উচ্ছলিত স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু আর এক রোমান্টিক কবি কোলরিজ আবেগের চেয়ে কল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় একদল সাহিত্যিক নিছক রস সৃষ্টি সাহিত্যের কাজ বলে মানলেন। আর একদল সাহিত্যে নিছক বাস্তবকে ও সত্যের অলংকারহীন মূর্তিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন। দ্বিতীয় মতটি থেকে বস্তুতন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছে। আবার ফ্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হল বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রকাশ। ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতে কাব্য হোল জীবনের সমালোচনা (Criticism of life)।

কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের আলোচনা থেকে শব্দ, অর্থ প্রকাশ কবি প্রতিভা, কল্পনা প্রভৃতির সম্পর্ক যে গভীর ও অনেকটা ওতপ্রোত তা বোঝা যায়। উপসংহারে বলা যায়। কবিতা বা কাব্য হল প্রতিভার স্পর্শে নির্বাচিত শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে গড়ে ওঠা গভীর আবেগ বা অনুভবের ব্যঞ্জনাময় ছন্দোবন্ধ প্রকাশ। কোনো দেখা অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায়, কিংবা স্মৃতির জাগরণে, কবি যখন তাঁর কল্পনাকে অবাধে মুক্ত করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে যে অনুরণন সৃষ্টি হয়, তার প্রকাশ হয় সুরস্য শব্দরন্ধ্রে, ছন্দ মিলের গ্রন্থনায়। এভাবে কবি তাঁর অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার (যে প্রতিভা যা ছিল না তা তৈরি করে) সাহায্যে সহৃদয় পাঠকের অন্তরে কবি যে অলৌকিক আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করেন কবিতা তার অবলম্বন।

### অনুশীলনী—১

আপনার পাঠের অগ্রগতি বোঝার জন্য নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠায় উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। তিন চারিটি বাক্যে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

.....  
.....  
.....  
.....

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) \_\_\_\_\_ সাহায্যে উচ্চারিত \_\_\_\_\_ ধ্বনিগুচ্ছ হোল \_\_\_\_\_ ।



- (খ) গদ্য মানুষের মনীষার তার \_\_\_\_\_ বাহন, কাব্য হল \_\_\_\_\_ বাহন ।
- (গ) আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে \_\_\_\_\_ বা \_\_\_\_\_ হল কাব্য ।
- (ঘ) অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি \_\_\_\_\_ বলেন । তিনি বিশেষকে \_\_\_\_\_ করে \_\_\_\_\_ কথা বলেন ।
- (ঙ) ওয়ার্ডসওয়ার্থে মতে কাব্য হল \_\_\_\_\_ ।
- (চ) ক্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হোল \_\_\_\_\_ প্রকাশ ।
- ৩ । কাব্যের শব্দার্থবাদী মতবাদগুলি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন ।
- ৪ । কাব্যের সংজ্ঞায় প্লেটোর মতাদর্শ ৩-৪টি বাক্যে লিখুন ।
- ৫ । পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের ‘কাব্য’ সম্পর্কে বস্তব্য অবলম্বনে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন ।
- ৬ । কাব্যের সংজ্ঞা একটি বাক্যে উপস্থিত করুন ।

### ৩১.৩ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়ভিত্তিক বর্ণনামূলক তন্ময় (objective) কবিতা — এই শ্রেণির কবিতায় জীবনের কোন গভীর অনুভব নয়, বস্তুবিশ্বের বর্ণনাই প্রধান প্রতিপাদ্য । বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, বহির্জগতের কোন ঘটনা, বিষয় নিয়ে বা কোন জ্ঞানগর্ভ নীতি আদর্শ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনার্থে যে সমস্ত কবিতা লেখা হয় সেগুলি এই শ্রেণিভুক্ত ।

নীতি কবিতা (Didactic poem) — যে কবিতায় সুভাষণের মাধ্যমে নীতিকথা প্রচার করে পাঠকের জ্ঞানোদয় বা চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়, তাকে নীতি কবিতা বলে । এই ধরনের কবিতায় কবি জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব ও নীতি প্রচারের প্রয়োজনে লঘু বা গুরুগভীরভাবে কবিতাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করেন । প্রসঙ্গত, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারে ‘সম্ভবশতক’, ‘নীতিসূধা’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । ব্যঙ্গ কবিতা, লঘু বৈঠকি কবিতা ও লালিকা (Parody-প্যারেডি) বাংলা ব্যঙ্গকাব্যের উৎপত্তি বাঙালির রঙ্গপ্রিয়তায়—নামকরণ থেকেই এটি স্পষ্ট । প্রথম দুটিতে মানুষের আচার-আচরণ চরিত্র-সমাজ রীতিনীতিকে তির্যক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয় । ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্ববিরোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতার প্রধান উপজীব্য । প্রসঙ্গত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাজীমাৎ’, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভারত-উদ্ধার’ প্রভৃতি কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের ‘দামু ও চামু’, ‘হিংটিং ছট’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘নন্দলাল’, মোহিতলাল মজুমদারের সরয়মতী প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য । এসব কাব্য ও কবিতার লক্ষ্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক ত্রুটি সংশোধন । প্রথমোক্তটিতে কিছু আক্রমণাত্মক উপাদান থাকলেও, দ্বিতীয়টি লঘু বৈঠকি মেজাজে উপস্থাপিত হয় । দ্বিতীয়টির সঙ্গে Parody বা লালিকার অনেকটা সাদৃশ্য আছে । ‘লালিক’ কোন প্রতিষ্ঠিত রচনার কায়িক অনুকরণ । এটি ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি হলেও সেখানে হাস্যরসের একটা স্বহৃদ মোড়ক থাকে ; রচনাটির মাধুর্য তার কৌতুকময় উপস্থাপনায় । ‘লালিকা’ সকল পাঠকের কাছেই আনন্দদায়ক ।

**Elegy** (এলিজি) বা **শোককাব্য**—মৃতের উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথায় মৃত ব্যক্তির কীর্তি ও তার সম্পর্কে কবি হৃদয়ের বেদনার আর্তি জ্ঞাপক শোকোচ্ছ্বাসই এ কবিতার প্রধান বিষয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘স্মরণ’ কবিতাগুচ্ছ, সত্যেন্দ্রনাথক দত্তের মৃত্যুতে ‘সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত’, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা “২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮” শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যেকোন উৎকৃষ্ট ‘এলিজি’র সঙ্গে তুলনীয়। শোকার্ভ কবির শোক জ্ঞাপক ছোট কবিতাকে ইংরাজিতে ডার্জ (Dirge) বলা হয়। এ পর্যন্ত আলোচিত সবকটি কবিকর্মই বিষয় নির্ভর ও বর্ণনামূলক হলেও কবির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে উপজাত। কিন্তু বর্ণনামূলক অপর একটি ধারা যা কিংবদন্তি, লোক প্রচলিত বা ইতিহাস পুরাণ আশ্রয়ী কাহিনী মূলক কাব্য—যথা গাথা কাব্য (Ballad), আখ্যান কাব্য (Narrative poem), মহাকাব্য (Epic) নামে পরিচিত। এর প্রত্যেকটির আকৃতি ও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। গাথা ও আখ্যানকাব্য উভয়ই আখ্যান কেন্দ্রিক। প্রথমটি মধ্যযুগের শেষে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রোমান্টিক লোকগাথা হিসেবে জনজীবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল। এতে প্রেম, বীরত্ব, দেশপ্রেম, মহত্ব আত্মত্যাগ ইত্যাদির পরিচয় থাকে। গাথার রচয়িতা প্রায়ই অজ্ঞাতনামা। এতে লিরিক অনুভূতি ও সমষ্টি-চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে। গাথায় পরিবেশ বর্ণনার পাশাপাশি ঘটনায় নাটকীয় দ্রুততার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এই শিল্পকলাটির অনুকরণে আধুনিক কালেও বহু গাথা জাতীয় কাব্য-কবিতা রচনা করা হয়েছে। ‘ময়মনসিংহ গীতিকার’ প্রেম ও আত্মত্যাগের পাশাপাশি, স্বদেশীয়ুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের ‘কথা ও কাহিনী’র অনেক রচনাই মহত্ব, বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমেরক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আখ্যানকাব্য গাথা থেকে একটু স্বতন্ত্র। এখানেও প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাস-এর অবলম্বন। রচনারীতি বর্ণনামূলক। রঞ্জালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাঞ্চীকাবেরী’, ‘রঞ্জমতী’, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যোগেশ’ কাহিনী কাব্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’, ‘পুরাতন ভূত’ উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রাচ্য কাব্যশাস্ত্র প্রণেতাদের মতে অর্থাধিক সর্গবন্ধযুক্ত পদ্যময় কাব্য বিশেষ হোল মহাকাব্য। এর নায়ক ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বীর এবং সঙ্গশজাত। কাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর ও শাস্ত্রসের একটি। এতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভাত-সন্ধ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা থাকবে। কাব্যটি পাঠ করলে পাঠকের মনে একটি বিশালতার ধারণা জন্মাবে, যার পরিক্রমা ফল বিস্ময়বোধ। মহাকাব্যের কাহিনী ইতিহাস থেকে গৃহীত হবে। উপস্থাপনায় নাটকের মত সূচনা, মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভসন্ধি ও উপসংহার থাকবে।

পাশ্চাত্য কাব্য শাস্ত্রীদের অন্যতম অ্যারিস্টোটল-এর মতে মহাকাব্যে সমগ্রত একটি মাত্র ঘটনা ও একজন নায়ক থাকবে, তার বিষয়বস্তু হবে ভাবগাঙ্ঘীর্যপূর্ণ, আর একাধিক উপকাহিনী মূল কাহিনীর অংশ স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। মহাকাব্য বর্ণনামূলক কাব্য। এখানে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ ঘটে, ফলে এর ঘটনার পরিধিও হয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে অনেকটা বিস্তৃত।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য মহাকাব্যের শুধু আলংকারিক ব্যাখ্যা নয়, মহাকাব্যের রসাস্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ এর যে পরিচয় দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্য হল ‘বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথ’, এ সেই কবির রচনা যার রচনার ভিতর দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ নিজ হৃদয়ের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে মানবজীবনের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে। মহাকাব্য বস্তুত সমাজ জীবনের মহনীয়তার ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। মানব সভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় এই কাব্যে তুলে ধরা হয়।

এবারে কাব্যের অপর ধারা ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্বয় ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ হৃদয়াবেগ নির্ভর কবিতা—গীতিকবিতা প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। ইংরাজি Lyric শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এক সময় lyre (লায়ার) বা বীণাযন্ত্র বাজিয়ে হৃদয়ের একান্ত আবেগের কথা পল্লী কবি সুর দিয়ে গাইতেন। সেই গানের কথা লিরিক কবিতা হিসেবে পরিচিত হয়। Lyre থেকে নীম হয় লিরিক। কবির ব্যক্তিগত চেতনাই এখানে মুখ্য। একান্ত আত্মগত আবেগানুভূতি এর উপজীব্য। নানা অভিজ্ঞতা আঘাতে উঠে আসা কবিজীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দের কথাই গীতিকবিতায় বিষয়। গীতিকবিতা তাই কবির মনের অব্যক্তভাবে অভিব্যক্তি বিশেষ। যে কবিতা কবি হৃদয়ের অনুভব পাঠকচিন্তে সঞ্চারিত হয়ে, তার হৃদয়ে দোলা দেয় আর আনন্দের হিল্লোল তোলে তাই হল গীতিকবিতা।

‘ওড’ (Ode)—লিরিক কবিতারই রকমফের। মহৎ ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে তার গুণগ্রাম ঘোষণা করতে ছন্দোবিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে এর ধরনের ‘ওড’ লেখা হত। এ কবিতার প্রধান গুণভাবের স্বচ্ছতা এবং ভাষা ও ছন্দের বিশুদ্ধতা।

‘সনেট’ (Sonnet) অর্থ মৃদুধ্বনি। চৌদ্দটি পঙ্ক্তির সাহায্যে সুর তুলে আবেগের একটি শীর্ষকে স্পর্শ করা এ কবিতার বৈশিষ্ট্য। সনেটের আজিক ও পঙ্ক্তির ছন্দ বিন্যাস অনেকটা সুনির্দিষ্ট। সনেট সম্পূর্ণ গীতিকাব্যধর্মী হলেও রীতিমতো ভাবগম্বীর। গঠনে কিছুটা ধরা বাধা ব্যাপার থাকলেও প্রেমের মতো ভাবাবেগপ্রধান বিষয়বস্তুর টানে সনেট আবেগোচ্ছল লিরিক কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

## অনুশীলনী—২

বর্তমান পর্যায়ে একাধিকবার পড়ে নিন। এরপর নিজের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠার উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

### ১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- (ক) গীতিকবিতা পাঠকের \_\_\_\_\_ বা \_\_\_\_\_ চেষ্টা করে।
- (খ) ‘লালিকা’ কোন \_\_\_\_\_ রচনার \_\_\_\_\_।
- (গ) শোকাক্ত কবির \_\_\_\_\_ ছোট কবিতাকে ইংরেজিতে \_\_\_\_\_ বলা হয়।
- (ঘ) গাথা মধ্যযুগের শেষে \_\_\_\_\_ শতক পর্যন্ত \_\_\_\_\_ হিসেবে \_\_\_\_\_ থেকে উৎসারিত হয়েছিল।
- (ঙ) মহাকাব্যের নায়ক \_\_\_\_\_ গুণসম্পন্ন \_\_\_\_\_ এবং \_\_\_\_\_।

### ২। সঠিক উত্তরে টিক (☑) চিহ্ন দিন।

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| (ক) নীতি কবিতার কবি — | ১। উপদেশপ্রবণ  |
|                       | ২। আক্রমণাত্মক |
|                       | ৩। আনন্দদায়ক। |

(খ) রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’ —	১। গাথাকাব্য
	২। আখ্যান কাব্য
	৩। গীতি কাব্য।
(গ) মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান রস —	১। কৌতুক
	২। বিস্ময়
	৩। বীর।
(ঘ) সনেট —	১। গীতিকাব্য ধর্মী
	২। বর্ণনামূলক কবিতা
	৩। ওড জাতীয় কবিতা।

৩। ৩-৪টি বাক্যে ‘লঘু বৈঠকি কবিতা’ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মহাকাব্য কাকে বলে? মহাকাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের বক্তব্য একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করুন।

### ৩১.৫ মূলপাঠ — ৩ কাব্যের আঙ্গিক

ভাষা : কবি যখন কোন ঘটনা, বিষয় বা অনুভবের দ্বারা তাড়িত হন, তখন তাঁর মনে যে ভাবের বা অনুভূতির সঞ্চার করে, তাই কবিতার উৎস। কবিতা বা কাব্যের কায়া গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আর কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। শব্দগুচ্ছের তাৎপর্যময় বিন্যাস কাব্যের কায়া গঠন করে। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বিন্যাস যখন কোন অভাবিত ইঞ্জিত ও অনুষণ বিশেষ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে কবিমনের ভাবের প্রকাশ ঘটায়, তখনই তা কাব্য হয়ে ওঠে। কবির একান্ত নিজস্ব হৃদয়াবেগ যখন কবিপ্রতিভার স্পর্শে কাব্যদেহের শব্দগঠিত বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনায় নূতনতর অভিব্যক্তি পায়, তখন আমরা তাকেই কাব্য বলি। এই কাব্য দেহের শব্দ কখনও কখনও অর্থরশ্মি ভেদ করে বর্ণময় দীপ্তি পায়, নূতন নূতন বাক প্রতিমা রচনা করে নিয়ে আসে নূতনতর অনুভূতি। কবিতার ভাষা অলঙ্কৃত বা অলংকৃত যাই হোক তা নির্ভর করে প্রকাশ মুহূর্তে কবির আবেগময় অভিব্যক্তির ওপর। কোনো কোনো কাব্যশাস্ত্রী তাই কাব্যকে শব্দার্থময় বলেছেন। কাব্যের মাধ্যমে যেহেতু শব্দ তাই কাব্য শব্দকায়। তাই বিচিত্র বাণী বন্ধ কৌশলকে কেউ কেউ কাব্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পরিশেষে শব্দের শব্দে অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্কের উপমা দিয়ে তাঁরা বুঝিয়েছেন, ভাবের সঙ্গে শব্দময় কাব্যদেহ ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িত। তাই কোনো কাব্য পাঠ করে তার ভাষা শিল্পটিকেও বিচার করতে হয়। কাব্য বিচারে ভাবপ্রকাশের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে বোঝাতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে সমার্থক শব্দ ব্যবহার, ব্যাকরণ দৃষ্ট শব্দ, অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বিন্যাস, ছন্দ-পতন, পুনরুক্তি, অশ্লীল শব্দ ও অর্থ প্রয়োগ, দেশ-কাল, কলাশাস্ত্র, লোক ব্যবহার বিরোধী বর্ণনা ইত্যাদি পরিহার, তার পরিবর্তে কাব্যের মাধুর্য, সৌকুমার্য প্রসাদগুণ কান্তি ওজঃ প্রভৃতির অবতারণা কাব্যভাষায় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আলংকারিক আনন্দ বর্ধনের মতে যা রসসৃষ্টিতে বাধা দেয় তাই দোষ। সাহিত্য দর্পণের বিশ্বনাথের মতে কাব্যে দোষ থাকাটা আশ্চর্য নয়, দোষ প্রাধান্য কাব্যের রসবোধের অন্তরায়।

ছন্দ : কবিতার বা কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ। ছন্দই কবিতাকে সাধারণতঃ অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে পরিচয় দেয়। লঘু ও গুরুদল বা সিলেবলের সুনিয়মিত বিন্যাস যে ধ্বনিতরঙ্গ বা রীদম সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। ছন্দ, ছন্দঃস্পন্দ কবিতার প্রাণ। কবির অন্তরের ভাব শব্দধ্বনি স্পন্দনে ভর করেই কাব্য পাঠকের মনে অনুভবে প্রতিফলন তৈরি করে। তাই প্রতীকবাদীরা ছন্দস্পন্দকেই কবিতার আত্মা বলেছেন, এবং ছন্দস্পন্দের দ্বারা চালিত হয়ে শব্দ পরস্পরা কবিতার বাণীশিল্প তৈরি করে। এ বাণীশিল্প বস্তুত কবি মনে সঞ্চারিত ভাবেরই বীজ বহন করে, সেই বীজকে ছন্দস্পন্দে বিন্যস্ত করে গড়ে ওঠে কবিতা। ছন্দস্পন্দ শব্দকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। ধ্বনির উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে একটি সুরস্পন্দিত সৃষ্টি হয়। এর ফলে কবিতা পাঠকের মনে প্রত্যাশা, পরিতৃপ্তি, আনন্দ বা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এটিই হল ছন্দ। ছন্দের সঙ্গে সচরাচর মিল (rhythm) বা মিত্রাক্ষর যুক্ত হয়ে ছন্দের আবেদন আরও সমৃদ্ধ করে। তাই কাব্য বিচারে কবি এই ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন, ছন্দ-স্পন্দের সাহায্যে, অভিনব কোন সূক্ষ্ম শিল্প কর্ম গড়ে উঠল কি না, বস্তু ও তার প্রকাশ কতটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বা মাত্রা, ধ্বনি, পদ, পর্ব বিন্যাসের সৌকর্য প্রভৃতি কাব্যের ছন্দ বিচারে অপরিহার্য অঙ্গ।

কাব্য ছন্দের আলোচনায় স্বভাবতই ছন্দের প্রকৃতি পরিচয় তথা রীতি এবং আকৃতি বিন্যাস—যথা পর্ব সমাবেশ, মিলের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয়। প্রাচীন বাংলা ছন্দ আলোচনায় ছন্দে ব্যবহৃত শব্দের উৎসসূত্র বিচার করে তৎসম (অর্থতৎসম), তদ্ভব ও দেশি বিভাজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের প্রকৃতি বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিচারের পথ প্রশস্ত করেন। তিনি ছন্দের তিনটি জাতিকে চিহ্নিত করতে পারলেও নামকরণে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

বাংলা ছন্দের ত্রিবিধ জাতি বা রীতির পরিয় নিয়ে মতদ্বৈধ না থাকলেও ছান্দসিকদের মধ্যে নামকরণের ব্যাপারে ভিন্নতা আছে। প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথমে তিন জাতীয় ছন্দের—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত-এর কথা বললেও পরে এদেরই তিনি মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত বলেছেন। পরবর্তী ছান্দসিকরা এই তিনটি রীতিকেই যথাক্রমে তানপ্রধান অক্ষর মাত্রিক, ধ্বনি প্রধান স্বরমাত্রিক, স্বাসাঘাত বা বল প্রধান দলমাত্রিক বলেছেন। ছন্দের প্রকৃতি বিচারে এই বিভাজন ছাড়াও গঠনগতভাবে ছন্দ, বিশেষত তার পদবন্ধের দিক থেকে পয়ার মহাপয়ার, ত্রিপদী দীর্ঘত্রিপদী, চৌদপী, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা প্রবাহমান পয়ার, প্রভৃতিতে বিন্যস্ত করা যায়। তবে এগুলি ছন্দের ‘জাতি’, নয়, ছন্দের নানা ‘রূপ’ মাত্র। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

অলঙ্কার : কাব্যের রস-লোকে পৌঁছবার অন্যতম উপায় অলঙ্কার। অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে, অলঙ্কারের সুনিপুণ বিন্যাস কাব্যকে রমণীয় করে। একজন অলঙ্কারিকের মতে অলঙ্কারের জন্যই কাব্য গ্রাহ্য। অপরজন বললেন, দোষহীন কিন্তু গুণযুক্ত অলঙ্কৃত শব্দার্থের নাম কাব্য। অলঙ্কার অলঙ্কারে কাব্য নিয়ে দেখা যাচ্ছে মতভেদ আছে। কিন্তু যদি বলি, শব্দের সাহায্যে সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত কোনো চমৎকারিত্ব যখন সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে অলঙ্কার। অলঙ্কার বস্তুত, শব্দের অন্তরের জিনিস। কবির কাব্য আর কাব্যের অলঙ্কার, কাব্য-ভাষা ও ছন্দের মতো, একই সৃষ্টির প্রয়াসে স্বতঃউৎসারিত। সাধারণ মানুষও প্রতিনিয়ত ব্যাকরণ-শাস্ত্র বা নন্দন তত্ত্বের কোনো জ্ঞান না থাকলেও, অলঙ্কৃত বাক্য ব্যবহার করে। শব্দের উচ্চারিত ধ্বনি (শব্দ) ও শব্দগুচ্ছের অর্থের ভিত্তিতে অলঙ্কারের দুটি শ্রেণি শব্দালংকার ও অর্থালংকার। আধুনিক কবিরা গতানুগতিক একঘেয়ে অলঙ্কার ব্যবহারে অনেকটা বীতরাগ হয়ে এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ব্যাঞ্জনার তাগিদে

জগৎ থেকে আহৃত নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সূত্রে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দ, চিত্র রচনা করছেন। ফলে কাব্যেও নব নব ব্যঞ্জনার দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। কাব্যের সার্থকতা বিচারে অলংকারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক—অলংকার প্রয়োগের মূল্যায়ন করে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে তার কতটা যোগ তা নিরূপণ করা হয়। প্রাচীন অলংকারের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণ নয়। কাব্যে ব্যবহৃত অলংকারের চমৎকারিত্বেই কবির সাফল্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব। কবি কবিতা রচনা করেন প্রকাশের তাগিদে ; কবিতাও অলংকৃত হয় তাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও তার প্রয়োগের সৌন্দর্য সন্ধান কাব্যালোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়।

কাব্যে অলঙ্কার শব্দটির ব্যবহার বহু অর্থ জ্ঞানপ—রস, রীতি, ধ্বনি ছাড়াও অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলিকেও বোঝায়। এখানে বিশিষ্ট অর্থে অলঙ্কার বলতে শব্দালঙ্কার (অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক) এবং অর্থালঙ্কার (উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক) প্রভৃতিকেই বোঝান হয়েছে। শব্দ উচ্চারণে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তার ওপর ভিত্তি করে শব্দালঙ্কার। আর শব্দার্থের ওপর ভিত্তি করে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকেই অর্থালঙ্কার বলা হয়। অর্থালঙ্কারে শব্দের ধ্বনি সৌন্দর্য প্রধান নয় আর অর্থগত তাৎপর্যই মুখ্য। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন এককে করা হয়েছে। এখানে এই আলোচনা প্রধান বিষয় নয়।

### অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১২ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এককটির প্রাসঙ্গিক অংশ পুনরায় পাঠ করে তৈরি করুন।

#### ১। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

- (ক) কবির একান্ত নিজস্ব \_\_\_\_\_ কবি প্রতিভার স্পর্শে \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ অতিক্রম করে \_\_\_\_\_ নূতনতর \_\_\_\_\_ পায়।
- (খ) লঘু ও গুরু দল বা সিলেবলের \_\_\_\_\_ বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা \_\_\_\_\_  
সৃষ্টি করে তাই \_\_\_\_\_।
- (গ) কবির কাব্য আর কাব্যের \_\_\_\_\_, কাব্য-ভাষাও \_\_\_\_\_ মতো একই সৃষ্টির  
প্রয়াসে \_\_\_\_\_।
- (ঘ) বাংলা ছন্দের \_\_\_\_\_ জাতি বা রীতির পরিচয় নিয়ে \_\_\_\_\_ না থাকলেও  
\_\_\_\_\_ মধ্যে \_\_\_\_\_ ব্যাপারে \_\_\_\_\_ আছে।

#### ২। সঠিক উত্তরে টিক (☑) চিহ্ন দিন :

- (ক) কাব্য দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত —
- |            |
|------------|
| ১। ছন্দ    |
| ২। শব্দ    |
| ৩। অলঙ্কার |
- (খ) অলঙ্কার বস্তুত শব্দের —
- |                     |
|---------------------|
| ১। অস্তরের জিনিস    |
| ২। বাহ্য প্রসাধন    |
| ৩। অপ্রয়োজনীয় অংশ |

(গ) অর্থালঙ্কার বলতে বোঝান হয়েছে —	১।	শ্লেষ
	২।	রূপক
	৩।	যমক

- ৩। ছন্দ ও অলঙ্কারের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
- ৪। “কাব্যের কায়াকল্প গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।”—উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করুন।
- ৫। কাব্য বিচারে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সহৃদয় পাঠককে বিচার করতে হয় সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।
- ৬। “কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ।” মন্তব্যটি কি আপনি সমর্থন করেন? আপনার বক্তব্য তিন চারটি পংক্তিতে লিপিবদ্ধ করুন।
- ৭। শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে কোনটিকে আপনি কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন এবং কেন, সে সম্পর্কে ১০০টি শব্দে অভিমত দিন।

### ৩১.৬ সারাংশ

গদ্য ও কাব্য প্রকাশের দিক থেকে ভিন্ন। একটি যুক্তি-বুদ্ধি মননের, অপরটি আবেগ অনুভূতির বাহন। কাব্যের সংজ্ঞা প্রকৃতি নিয়ে প্রাচ্য ভারতে ও পাশ্চাত্য ইউরোপে অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা মত প্রকাশ করা হয়েছে। তাত্ত্বিকেরা কেউ বা কাব্যে প্রকাশ বা ভাবাবিব্যক্তির উপস্থাপনা অথবা বিষয়ের ব্যঞ্জনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দুটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী নয়, দুয়ের সমন্বয়েই কাব্যের কাব্যত্ব। তাই প্রাচ্য ধর্মান্বিতারা প্রকাশবাদ ও ভাববাদ—এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনিকে মেনে নিয়ে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেউ কেউ অনুকরণ, অনুভূতি, রসানুভূতির গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর অপর তাত্ত্বিকেরা নগ্ন বাস্তব ও সত্যের উল্লেখমূলিকে তুলে ধরাকেই কাব্যের প্রধান কাজ মনে করেছেন। ক্রোচে ও আর্নল্ডের মতে কাব্য হল অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি এবং জীবনের সমালোচনা।

কাব্যের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ভিত্তিক বা আজিকাগত দিন থেকে করা যায়। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবি মনের যে দিকগুলি প্রধান হয়ে ওঠে তারই উপর ভিত্তি করে আজিক গড়ে ওঠে। নীতি কবিতা, শোককাব্য, গাথা ও আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি উপস্থাপনায় যেমন স্বাভাবিক আছে, তেমনি এদের বিষয়বস্তু ও মননের গভীরতা ও ব্যাপ্তিরও তারতম্য আছে। গাথার প্রেম, বীরত্ব, মহত্ব, আত্মত্যাগ অজ্ঞাতনামক লোকায়ত কবিদের রচনায় ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক আখ্যান কাব্যের অবলম্বন কিংবদন্তি বা ইতিহাস। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উপলব্ধিতে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অনেকটা ঐক্য আছে। বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর নায়ক বীর ও সঙ্গীতজাত, একাধিক উপাখ্যান কাব্যে বিশালতার ধারণা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, সমগ্র যুগ, মানবসভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় ফুটে ওঠে। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিচেতনাই মুখ্য। একান্ত আত্মগত ভাবানুভূতিই এর উপজীব্য।

কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। কবির মনের কোনো সৌন্দর্যময় আবেগ যখন শব্দ ও ছন্দের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে কাব্য। তাই কাব্য আলোচনায় ভাষা শিল্পেরও বিচার করতে হয়।

**ছন্দ :** কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধ্বনিনির্মিত লঘু ও গুরু দলের (সিলেবলের) সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা রিদম (rhythm) সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। এই ছন্দ কবিতার অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে। তাই কাব্যবিচারে কবি ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে করেছেন সেটি বিচার্য। কাব্য ছন্দ বিচারে ছন্দোন্নয়ন ও ছন্দবন্ধের গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছন্দের শ্রেণি নিয়ে, গঠন নিয়ে মতভেদ না থাকলেও নামকরণে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে প্রবোধচন্দ্র সেনের মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত নামগুলিই এখন গ্রহণ করা যেতে পারে।

**অলঙ্কার :** অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে। অলঙ্কার শব্দধ্বনি ও শব্দ ব্যঞ্জনা ভিত্তিতে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার দু-ভাগে বিভক্ত। শব্দালঙ্কার ধ্বনি সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যনির্ভর ; অর্থালঙ্কার অর্থনির্ভর ভাবব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক তার মূল্যায়নে কবিকৃতি বিচার করা হয়।

---

## ৩১.৭ উত্তরমালা

---

### অনুশীলনী—১

- ১। সংকেত নিম্প্রয়োজন। মূলপাঠ-১-এর প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়লেই উত্তরটি দিতে পারবেন।
  - ২। (ক) বাগ্যস্ত্রের, অর্থবহ, ভাষা।  
(খ) যুক্তি, বুদ্ধি, মননের, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনার।  
(গ) আনন্দদায়ক, রসাত্মক, বাক্যই।  
(ঘ) যা ঘটতে পারে তাই, অবলম্বন, নির্বিশেষের।  
(ঙ) গভীর, অনুভূতির, স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছলন।  
(চ) বস্তু, অন্তর্নিহিত, সৌন্দর্যের।
- ৩-৬ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠের প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভাগ করে আরও বার কয়েক পড়ুন। তা হলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

### অনুশীলনী—২

- ১। (ক) জ্ঞানোদয়ের, চৈতন্য সঞ্চারের।  
(খ) প্রতিষ্ঠিত, কায়িক, অনুকরণ।  
(গ) শোকজ্ঞাপক, ডার্জ।  
(ঘ) সপ্তদশ, রোমান্টিক, লোকগাথা, জনজীবন।  
(ঙ) ধীরোদাও, বীর, সঙ্গশজাত।



২। (ক) তাত্ত্বিক, (খ) আখ্যান কাব্য, (গ) বীর, (ঘ) গীতিকাব্য ধর্মী।

৩-৪ নং প্রশ্নের জন্য মূলপাঠ—২-এর ব্যঙ্গ কবিতা বৈঠকি কবিতা এবং মহাকাব্য অনুচ্ছেদগুলি বার বার পড়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হন।

### অনুশীলনী—৩

১। (ক) হৃদয়াবেগ, কাব্যদেহের, শব্দ, বাচ্যার্থকে, ব্যঞ্জনায, অভিব্যক্তি।

(খ) সুনিয়মিত, ছক, রীদম, ছন্দ।

(গ) অলঙ্কার, ছন্দের স্বতঃউৎসারিত।

(ঘ) ত্রিবিধ, মতদ্বৈধ, ছান্দসিকদের, নামকরণের, ভিন্নতা।

২। (ক) শব্দ, (খ) অস্তরের জিনিস, (গ) রূপক।

৩-৭ নং প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি একাধিকবার পাঠ করলেই আপনি লিখতে পারবেন।

---

### ৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

---

এককে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানতে আপনি নিম্নলিখিত বইগুলি পড়তে পারেন :

(১) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — কাব্যতত্ত্ব বিচার (১ম খণ্ড)

(২) ড. শুম্ভসত্ত্ব বসু — সাহিত্যের নানারূপ, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা।

(৩) সাহিত্যের রূপ-রীতি — উজলকুমার মজুমদার

(৪) ড. তারাপদ ভট্টাচার্য — ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ মীমাংসা।

(৫) সাহিত্য সন্দর্শন — শ্রীশচন্দ্র দাস।

(৬) সাহিত্য প্রকরণ — হীরেন চট্টোপাধ্যায়।

---

## একক ৩২ □ আধুনিক বাংলা কাব্য

---

গঠন

৩২.১ উদ্দেশ্য

৩২.২ প্রস্তাবনা

৩২.৩ মূলপাঠ—১ আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা বিচার, লক্ষণ-নির্দেশ ও উনিশ শতক

৩২.৪ সারাংশ—১

৩২.৫ মূলপাঠ—২ : আধুনিক কবিতা—বিশ শতক

৩২.৬ সারাংশ—২

৩২.৭ উত্তরমালা

৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ৩২.১ উদ্দেশ্য

---

পূর্বোক্ত এককটিতে আপনি কাব্য কাব্যের শ্রেণিবিভাগ ও তার আজিক বা গঠনগত বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনেছেন। বর্তমান এককে আপনি দেশে দেশে কালের বিবর্তনে সভ্যতারও যেমন বিবর্তন হয়, মানুষের চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন একটি বিশেষ কালসীমার পর বিরাট বলে মনে হয়। মনে হয় যেন জীবনবোধের একটি পর্ব থেকে আরেকটি পর্বে গিয়ে পৌঁছেছি। এই যে পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাওয়া একেই বলে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এটিকেই ঐতিহাসিকেরা যুগচিহ্নিত করেছেন।

এককটিতে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে আপনি—

- আধুনিক কবিতার লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
  - আধুনিক বাংলা কবিতায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝতে পারবেন।
  - কবিদের ভাষা ছন্দ অলঙ্কার ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য এসেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 

### ৩২.২ প্রস্তাবনা

---

এই এককটি পড়ে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন, তেমনি উনিশ-বিশ দুই শতাব্দী ব্যবধানে তার পরিবর্তনের ধারাটিও বুঝতে পারবেন। এই পরিবর্তন যেহেতু একটি দেশ কালের মধ্যে তার ইতিহাস, সমাজ পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাই, সমাজের প্রতিফলন কবিদের চিন্তা-ভাবনায় ও কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু উনিশ শতকের ভাবনা আর বিশ শতকের ভাবনা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। এই পরিবর্তন সম্পর্কে দুটি পর্যায়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটি পর্যায় ধরে পড়ে দুটি শতকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। আমরা বলব প্রতিটি পর্যায় ভাল করে পড়ে দুটি অনুশীলনীর সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই অসুবিধা হবে না। সবশেষে উত্তর সংকেত দেখুন।

## ৩২.৩ মূলপাঠ—১ : আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা বিচার, নির্দেশ ও উনিশ শতক

মানুষ একসময় পৃথিবীর প্রভাত-সন্ধ্যা, দিন-রাত্রি, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-বসন্ত, চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে অপার রহস্যের স্থান পেয়ে বিস্ময় বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অলৌকিক, অতিলৌকিক ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্য—দেবত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে মানুষের দৃষ্টি মর্ত্য পৃথিবীর দিকে পড়লে দেখে মানুষের বিচিত্র জীবনলীলা—সেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টির পরিচয়ই প্রধান। এই সমষ্টির মধ্যেও কালক্রমে সুন্দর পৃথিবীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ জনিত কারণে জাতিতে-জাতিতে, সভ্যতায়-সভ্যতায় নিরন্তর সংঘর্ষ সংগ্রামও সমন্বয় চলছে। এ যুগে মানুষ দেবশ্রিত হলেও মানবচরিত্রের অসামান্য মহিমায়—তার বীরত্বে, মহত্বে তার প্রেমে স্থান করে নেয়। সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে, অ-সাধারণ মানুষকে দেবোপম বা অতিপ্রাকৃত করে নেবার চেষ্টা ফুটে উঠেছে। এরই পাশাপাশি আবার মানুষের আদর্শে, দেবতাকে মানবিক করার আকাঙ্ক্ষায় তাকে মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসে কালক্রমে ঘরের মানুষে রূপান্তরিত করেছে। কালের সঙ্গে চিন্তা বিবর্তনে এই ধারা অনুসরণ করেই বাংলা কাব্যে ১৯শ শতকে মানবকেন্দ্রিক নতুন ভাববোধের সঞ্চার ঘটেছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়গুলি। সেই সঙ্গে নিসর্গ চেতনার একটি স্বতন্ত্র বোধ, যথা, নিসর্গে যে একটি নিজস্ব রূপ-মাধুরী আছে এবং সে আপনাতেই স্বতন্ত্র—বর্ষায়, শরতে, শীতে, বসন্তে তার যে বিচিত্র মাধুরী ফুটে ওঠে তা অনুভূত হয়েছে। এই সময়ই মানবতার জয়ধ্বনির সঙ্গে পৃথিবীর ধূলা-মাটি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম, শান্তি-সংগ্রাম ভরা জীবনের সুন্দর কুৎসিত সবকিছু গভীর ও অতলস্পর্শ মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে জেগেছে সমাজ ও স্বদেশের চেতনা, সমাজের মধ্যে যে আচার-অনাচার, সুব্যবস্থা-কুব্যবস্থা বিরাজমান কবির মনে তা নূতন প্রেরণা জোগাল। কাব্যে তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। সমাজের সঙ্গে স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক মমতা থেকে দেশের সঙ্গে নিজের মঞ্জলামঞ্জলের ধারণা ওতপ্রোত হয়েছে। আর স্বদেশপ্রেমী থেকে জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার ধ্বনি তাকে ক্লিষ্ট করেছে। এভাবে বিশ্বপ্রকৃতি তার বুকে লালিত মানুষ এবং মানুষের সুখদুঃখ বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কবিতায় প্রকাশিত হল তাই আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিতার মানব প্রাধান্যের কারণে মানুষের জীবন, ভাগ্য ও চরিত্র, তার সূক্ষ্ম অনুভূতি, ভাবনা কাব্যের প্রধান বিষয় হয়েছে। পুরাণ, ধর্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ কাব্যে যা এসেছে, তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এ যুগের প্রকৃতি বোধেও বিশ্বপ্রকৃতির নানা রূপ-বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নানাভাবে রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যথার্থ অর্থে নিসর্গ চেতনার কবিতা রচনা যেমন হয়েছে, কার সঙ্গে মানুষ আর প্রকৃতির অন্তরঙ্গা যোগটিকে তুলে ধরা হয়েছে। কাব্যসাহিত্যে গতানুগতিক ধর্মান্বিত কাব্যের পরিবর্তে এ যুগের কাব্য নব নব রূপে বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে প্রকাশ পেয়েছে। যুরোপীয়, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের অন্তপ্রেরণায় ১৯ শতকের বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে।

কাব্যরূপের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় মধ্যযুগীয় সংস্কার অতিক্রম করে আধুনিক ধ্যানধারণার সূচনা করেছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী গীতিকবিতা, রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক আখ্যানকাব্য, মধুসূদন মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট রচনা করে এই পর্বেই কাব্য শিল্প কর্মের অসামান্যতা তুলে ধরেছেন। দেশকালের প্রভাবে এই আধুনিক মানসিকতাই প্রাচ্যের সংস্কৃত তামিল প্রতীচিব গ্রিক ল্যাটিন ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা উপকরণ উপাদান নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ সময় আরমা দেখেছি জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ-ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ভাষাশৈলীতে স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে বাংলার গ্রামগঞ্জ, মাঠ-ঘাট ও অন্তরসুরের সহজ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি। সব মিলিয়ে এ সময়ের সাহিত্যে ব্যক্তি,

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দেশ জাতির উত্থান পতন সবকিছুর পরিচয় ভাষার স্ফুট-অস্ফুট বর্ণচ্ছটায় ফুটে উঠেছে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা কাব্যে এরই ধারাবাহিক পরিচয় আছে। এই পরিবর্তনের কালপ্রবাহের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, পশ্চিমের অভিঘাত এই বাস্তব অবস্থাটিকে সম্ভবত অনেকটা ত্বরান্বিত করেছিল। অষ্টাদশ শতকে মনীষী কোঁৎ (Comte) যে দার্শনিক বক্তব্য তুলে ধরে ছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি স্বর্গের থেকে মর্ত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার কথা বলেছেন। স্বর্গ এবং স্বর্গবাসীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যেহেতু জানিনা, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমরা নিশ্চিত করে জানি পৃথিবীকে, সেখানকার সুখ দুঃখময় মানুষকে, তাই আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা উচিত এই মানুষের দিকে, এই প্রত্যক্ষের রাজ্যে। এই বক্তব্য অভিনব। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত বাঙালীর মন ও তার সৃজনশীল মনীষার চিন্তাধারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এ সময়ের কাব্যকলার তাই, বিশ্বজীবন, মানুষ ও কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

## ৩২.৪ সারাংশ—১

সভ্যতার আদিযুগে মানুষ বিশ্বকে দেখেছে অপার বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে, সেখানে খুঁজে পেয়েছে অনন্ত রহস্য, অলৌকিক শক্তির লীলাল। কল্পনা করে নেপথ্যচারী দেবতার। এযুগ ধর্মের যুগ। কাব্যে দেবতার প্রাধান্য। এরপর দেবতাকে ছেড়ে যখন দৃষ্টি পড়ল মানুষের প্রতি, তখন মানুষ মানে বড়ো মানুষ, রাজা-বাদশা, আমির-ওমরাহ ক্রমে জমিদার তালুকদার অভিজাতদের কথা সাধারণভাবে মানুষের কথা এসেছে। গভীরভাবে মানবজীবন ও বিশ্ববোধে চিন্তা জগৎ আক্রান্ত হয়েছে। ভাষায় প্রকাশভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। পশ্চিমের দার্শনিক কোঁৎ একে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে।

## অনুশীলনা—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

- ১) (ক) মানুষের দেবত্বে বিশ্বাস কীভাবে জন্মাল লিখুন।  
(খ) মানুষ কীভাবে দেবতার পাশে স্থান করে নিয়েছে বুঝিয়ে দিন।
- ২) বাংলা কাব্যে মানবকেন্দ্রিক ভাবনার সঞ্চার কীভাবে ঘটেছে আলোচনা করুন।
- ৩) মনীষী কোঁৎ-এর বক্তব্য সংক্ষেপে বলুন।
- ৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন :  
(ক) আধুনিক কবিতার \_\_\_\_\_ কারণে মানুষের জীবন \_\_\_\_\_ ও চরিত্র তার \_\_\_\_\_, ভাবনা, কাব্যের প্রধান বিষয় হয়েছে।  
(খ) (১৯ শতকে) সাহিত্যের \_\_\_\_\_ হয়ে উঠেছে \_\_\_\_\_ খুঁটিনাটি \_\_\_\_\_ বিষয়গুলি।  
(গ) স্বদেশে প্রীতি থেকেই \_\_\_\_\_ গ্লানি তাকে \_\_\_\_\_ করেছে।

- (ঘ) আধুনিক মানসিকতা থেকেই প্রাচ্যের \_\_\_\_\_ প্রতীচীর \_\_\_\_\_  
ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা \_\_\_\_\_ নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।
- ৫) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :
- ক) বিহারীলাল রচনা করেছেন—
- ১। আখ্যান কাব্য  
২। গীতিকবিতা  
৩। নীতি কবিতা
- খ) যেহেতু আমরা নিশ্চিত করে জানি পৃথিবীকে,  
সেখানকার সুখদুঃখময় মানুষকে, তাই আমাদের
- ১। ক্রোচে  
২। মধুসূদন  
৩। কোঁৎ
- দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা উচিত এই প্রত্যক্ষের রাজ্যে।  
বলেছেন—

## ৩২.৫ মূলপাঠ—২ আধুনিক কবিতা—বিশ শতক

আধুনিক শব্দটি দেশকাল নিরপেক্ষ নয়। দেশ ও কালের ব্যবধানে আধুনিকতার সংজ্ঞা বদলায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯ শতকে যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল সেখানে যুরোপীয় বিশেষত ইংরেজি সাহিত্য থেকে অন্তর্প্রেরণা নিয়ে বাংলা কাব্য নবভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মধ্যযুগীয় সংস্কার বর্জন করে নবজাগৃতির ঐতিহাসিক নিয়তিকেই বরণ করে নিয়েছিল। এ যুগে মানবিমহিমা, যুক্তিবাদ, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, স্বদেশচেতনার সঞ্চার হয়েছে। কবিমন চিন্তার সুনীল আকাশে মুক্তি পাওয়ায় কাব্য কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে রোমান্টিক ভাববিন্যাসে।

কিন্তু বিশ শতকে পর পর দুটি মহাযুদ্ধ—প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়ম এবং নানা দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন তোলায় বাংলার সমাজ জীবনেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এরসঙ্গে অসহযোগ, সত্যগ্রহ আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা উদ্বাস্তু নরনারীর দুঃসহ জীবন সংগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গে উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবদানও এসময় মানবিক চেতনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েড, মার্ক্স, সার্ত্র প্রমুখ মনীষীর চিন্তা মানবিক চেতনার গভীরে আলোড়ন তোলে। লেলিনের কৃতি রাশিয়ার কথা স্মরণে রেখে তরুণ কবিদের একাংশে সমাজ-পরিবর্তনের মতাদর্শ নতুন ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে। এভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক নতুন পটভূমি তৈরি হয়েছে। কবি ও কবিতা যেহেতু সমাজের মানব-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে তাই কবিতায় এই ইতিহাস সঞ্জাত চেতনাবোধ নতুন বাঁক নেয়। এই কালচিহ্নিত কবিতাই হল আধুনিক কবিতা।

কাব্যে বিশ শতকের এই কালপ্রভাবকে আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্ভবের কারণ বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রপ্রভাব উদ্ভরণ থেকে আধুনিকতার সূচনা মনে করেন। প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কল্লোলের তরুণ কবিকুল মুখ্যত রবীন্দ্র ঐতিহ্যে পুষ্ট হলেও রবীন্দ্র কবি-মহিমা এরা সর্বতোভাবে অনুভব

করেননি অথবা স্বীকার করতে চাননি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই নানারূপে বিকশিত হয়েছেন। এটি তরুণতর কবিদের উপলব্ধিতে ছিল না। অপরদিকে তাঁরা তৎকালীন ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি কাব্যে এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে নিজেদের সম্পর্কে কতকগুলি বন্ধমূল ধারণা তৈরি করে কাব্য রচনা ও তার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন রবীন্দ্রমুগ্ধ বাঙালি পাঠককুলই তাদের রচনার জনসমর্থনের প্রধান বাধা। সুতরাং পাঠকের রবীন্দ্র অনুরাগ-এর প্রতিকূলতা তথা রবীন্দ্র বিরোধিতাকেই তাঁদের কাব্যশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় বলে ধরে নেন। আত্মশক্তিতে আস্থাবান অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ‘আবিষ্কার’ কবিতায় লিখলেন—

“পশ্চাতে শত্রুরা শর অগনন হানুক ধারালো  
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,  
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো  
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।”

এই কবি-ভাষণ তরুণ কবিদের বিদ্রোহ প্রকাশ করলেও এঁরা প্রত্যেকেই অন্তরে ছিলেন রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত। কারণ এদের প্রত্যেকেরই মনের লালন-ভূমি রবীন্দ্র-শাসিত বাংলা কাব্য সংসার। তাই এঁদের বক্তব্যে, প্রকাশে নূতনত্বের অঙ্গীকার থাকলেও আজিকার পরিবর্তনই কবিতার আধুনিকতার একমাত্র শর্ত নয়। প্রতিভার স্পর্শে ভাব ও আজিকার যুগ সন্মিলনেই কবিতায় আধুনিকতার প্রকাশ। তাই আধুনিক কবিতা বিচারে কালের পরিচয় নিয়েও কাব্য বিচারের সময় তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হবে। কালের বিচারে আধুনিক কবিতা একালের সৃষ্টি হলেও, তার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা চরিত্রধর্মেও নতুনতর। এই বিশেষ চরিত্র-ধর্মই রচনাকে অন্যান্য সমকালীন রচনা থেকে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত করে।

কল্লোলের বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ কবি-গোষ্ঠী নতুন ও স্বতন্ত্র ধ্যানধারণায় নিবিষ্ট হতে চেয়েছিলেন। এ সময় সমাজ চিন্তাতেও একটা নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। সোভিয়েত সমাজবিপ্লবের সাফল্যের পর মানুষ ও মানবসমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। এই পর্বেই যুদ্ধোত্তর যুরোপীয় লেখকদের রচনাবলি তরুণ লেখকদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। স্মরণ করা যেতে পারে ‘কল্লোল’ পূর্ববর্তী সবুজপত্র ও ফরাসি ভাষা অভিজ্ঞ তার সম্পাদক সে সময়ে আধুনিক চিন্তাধারা ও মননসাধনাকে লালন করেছিলেন। ওই পত্রিকাতেই সাহিত্য-সমাজ-দর্শন-সমাজকল্যাণ-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। ‘সবুজপত্র’ অবশ্যই মন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার উপর জোর দিয়েছিল। তবু কল্লোলের কবিকুলের তার সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে তাঁদের স্বল্পস্থায়ী আন্দোলনটি সাড়া জাগাতে পেরেছিল। তাঁদের কবিতার বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এঁদের শব্দপ্রয়োগ, চিত্রকল্প, ছন্দ কোনোটিই ঐতিহ্যবিরোধী বা ঐতিহ্যবিচ্যুত ছিল না। ‘বরা পালক’ ‘প্রথমা’ ও ‘বন্দীর বন্দনায়’ সে পরিচয় আছে। কিন্তু বক্তব্য হয়তো ছিল কিছুটা ব্যক্তিবিরোধের সূচক—যা রোমান্টিকতার অঙ্গ। বক্তব্য, উপাদান, উপস্থাপনা কাব্য নির্মিতি ও ব্যঞ্জনাৎ অব্যবহিত সমকালের কবি অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দেব মধ্যেও অনুরূপ আধুনিক চরিত্র-লক্ষণ ভিন্নতর ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। এদের সামগ্রিক কবিভাবনা ও কাব্যচর্চায় আধুনিক বাংলা কবিতা বিশ্ব কাব্য সাহিত্যের সমীপবর্তী হয়েছে।

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকায় আধুনিক কবিতার মৌল লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, “একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লাস্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম, আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে”—এ কবিতায়। অপর একটি আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলনের ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব আরও সংক্ষিপ্ততর এবং অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন—“কালের দিক থেকে মহায়ুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী।”

উপসংহারে আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বলা যায়—

- ১) এ কবিতা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাতজাত। পরিণামে কবিতায় জীবনের ক্লাস্তি ও নৈরাশ্যবোধ-এর পরিচয় ফুটেছে।
- ২) দেশি বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে বিশ্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মনস্কতা এ যুগের কবিতার অন্যতম লক্ষণ।
- ৩) ফ্রেয়েডীয় মনোবিজ্ঞান, মার্ক্সীয় দর্শন, আধুনিক কবিতায় অনেকটা স্থান করে নিয়েছে।
- ৪) জগৎ জীবন সম্পর্কে একটি অনিকেত ধারণা থেকে প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সংশয় ; ফলত দেহজ কামনা বাসনা এবং প্রেমের শারীরী রূপের বর্ণনায় আসক্তি।
- ৫) কবিতায় মননের প্রাধান্যের কারণে দেশ বিদেশের ইতিহাস, দর্শন রাষ্ট্র ও সমাজ, কাব্যভাষা ও চিত্রকল্পে বহুব্যবহারে ও কাব্যে দুরূহতা এসেছে।
- ৬) কাব্যদেহে বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটায় গদ্য ও কাব্যের ব্যবধান কমেছে। গদ্যছন্দের চলতি ও গ্রাম্য দেশি শব্দের সঙ্গে বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার ঘটেছে।
- ৭) প্রচলিত কাব্যভাষা ও উপমা-চিত্রকল্পের পরিবর্তে বিদেশি এবং নতুন নতুন উপমা-চিত্রকল্প রচনা করে বিশেষ ব্যঞ্জনা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পর্বের অনেকের কবিতায় শব্দ প্রয়োগ হল সুমিত ও অর্থঘন।
- ৮) বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।

একালের কবিরা উপরিউক্ত লক্ষণগুলি পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাব্যচর্চায় প্রয়োগ করে রাবীন্দ্রিক ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শৈলীতে রূপায়িত করে এবং আধুনিক চিন্তা ও দর্শনকে রাবীন্দ্রিক প্রকাশভঙ্গি, শব্দ, ছন্দ ও চিত্র রচনা করে রবীন্দ্র ঋণের সদ্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য ধারা এ কালের কবিদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ২০ শ শতকের কবিদের অবস্থান হেতু তাদের রচনায় এ সময়ের বিষয়বস্তুর নবত্ব ও বক্তব্যের স্পর্ধিত ও সরল উপস্থাপনা, সংহত কাব্যকলায় প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এ কালের এই কবিতাগুলিকে বুঝি।

বর্তমান এককে মূলপাঠ—১ ও মূলপাঠ—২ পর্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শতকে আধুনিক কবিতার কালগত পরিবর্তনের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী চারটি এককে যথাক্রমে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের মধ্যে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কী ভাবে ঘটেছে, ও তার স্বরূপ কাব্য আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

## ৩২.৬ সারাংশ—২

ইংরেজ অধিকারের পর এদেশে ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার পত্তন ঘটেছিল। সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। ফলে দেশের নতুন অর্থব্যবস্থা হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক-সামন্তবাদী এক মিশ্র রূপ। ইংরেজ সংস্পর্শে ও রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটল, আর আধুনিক পৃথিবীর ভাবনাচিন্তা দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে উদ্ভূত হল বাংলার নবজাগৃতি, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, স্বদেশচেতনা এবং শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণশক্তি। মধুসূদনের হাতে বাংলা কাব্য সাহিত্যের নবজন্ম ঘটল। নতুন ধারার আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য রচিত হল।

বিংশ শতকে একদিকে রবীন্দ্র ঐতিহ্য অপদিকে রাষ্ট্র-দেশ-সমাজে নানা বিপর্যয়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডের সচেতন-অবচেতন-চেতন মনের রহস্য সন্ধান, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মারীমন্ত্রস্তর, সোভিয়েতে সামাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিস্ময়—মার্ক্সীয় সাম্যচিন্তার বিকাশ, দেশভাগ, স্বাধীনতা, দেশের অর্থনৈতিক সংকট গভীর থেকে গভীরতর হওয়ায় সমাজে জীবনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হল। কাব্য ভাবনার রূপান্তর ঘটল। রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা একদল কবির ধ্যানজ্ঞান হল। অন্য কবিরা বিশ্ব কাব্য সাহিত্যে সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে ভাবনা ও বাগভঙ্গি ও ব্যবহার করলেন। কাব্য ভাষারও পরিবর্তন এল—গদ্যকবিতার জন্ম হল, আবার গদ্য-পদ্য বাগরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটল। ২০শ শতকের আধুনিকগতা ১৯শতক থেকে ভিন্নতর নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবজাত এবং অপেক্ষাকৃত জটিল।

### অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন এবং উত্তর শেষে ————— পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত দেখুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) পাঠকদের রবীন্দ্র অনুরাগের \_\_\_\_\_ তথা রবীন্দ্র \_\_\_\_\_ তাঁদের \_\_\_\_\_ প্রতিষ্ঠার প্রধান \_\_\_\_\_ বলে ধরে নেন।

খ) পশ্চাতে \_\_\_\_\_ অগনন হানুক ধারালো  
সম্মুখে থাকুন বসে পথ বুধি \_\_\_\_\_  
আপন চক্ষের থেকে \_\_\_\_\_ যে তীর তীক্ষ্ণ আলো  
\_\_\_\_\_ জ্ঞান তার কাছে।

গ) আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্য :

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি \_\_\_\_\_ ধারণা থেকে \_\_\_\_\_ সুন্দর \_\_\_\_\_  
কল্যাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত \_\_\_\_\_ সংশয়।

২) বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিতার রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩) আধুনিক কবিদের কিছু রচনায় রবীন্দ্র বিরোধিতার সুর স্পষ্ট। এই বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।



---

## ৩২.৭ উত্তরমালা

---

### অনুশীলনী—১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ—১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

- ৪। ক) মানব, প্রাধান্যের, ভাগ্য, সূক্ষ্ম অনুভূতি।
- খ) বিষয়, বস্তু, জীবনের, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র।
- গ) জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার, ক্লিষ্ট।
- ঘ) সংস্কৃত, তামিল, গ্রিক, লাতিন, উপকরণ, উপাদান।

### অনুশীলনী—২

- ১। ক) প্রতিকূলতা, বিরোধিতাকেই, কাব্য-শক্তি, উপায়।
- খ) শত্রুরা, শর, রবীন্দ্র, ঠাকুর, জ্বালিব, যুগসূর্য।
- গ) অনিকেত, প্রেম, কল্যাণ, মূল্যবোধে, সংশয়।

২নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য আধুনিক কবিতার সূত্রাকারে উপস্থাপিত বৈশিষ্ট্যগুলি ৬-৮ অংশটি ভালো করে পড়ুন।

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর বর্তমান পাঠ্য অংশটি পড়লেই আপনি লিখতে পারবেন।

---

## ৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

---

- ১) আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)—আধুনিক কবিতার ইতিহাস।
- ২) দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়।

---

## একক ৩৩ □ মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ সর্গ

---

গঠন

৩৩.১ উদ্দেশ্য

৩৩.২ প্রস্তাবনা

৩৩.৩ মধুসূদন দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

৩৩.৪ মূলপাঠ

৩৩.৫ সারাংশ—১

৩৩.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (৬ষ্ঠ সর্গ) : শব্দার্থ টীকা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৩.৭ মহাকাব্য : স্বরূপ, বৈচিত্র্য

৩৩.৮ মেঘনাদবধ কাব্য—কাহিনী বিন্যাস (৬ষ্ঠ সর্গ)

৩৩.৯ মেঘনাদবধ কাব্য—দেশী-বিদেশী প্রভাব, রসবিচার, ট্রাজেডি ও নিয়তিবাদ

৩৩.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

৩৩.১১ মেঘনাদবধ কাব্যের (৬ষ্ঠ সর্গ) : ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার

৩৩.১২ সারাংশ

৩৩.১৩ উত্তরমালা

৩৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ৩৩.১ উদ্দেশ্য

---

যদি আপনি এই এককটি সময়ে পাঠ করেন এবং অনুশীলনগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারেন তাহলে আপনি—

- উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কাব্যধারার অন্যতম মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- মহাকাব্য-শৈলীর অন্যান্য কবিকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহাকাব্যপাঠ ও বিশ্লেষণ-এর সূত্রগুলির ধারণা করতে পারবেন।

---

### ৩৩.২ প্রস্তাবনা

---

আপনারা এই এককটি পড়ে উনিশ শতকের নবজাগৃতির বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে যুগ্মর মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ মহাকাব্যে কীভাবে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের একটি সামগ্রিক প্রচ্ছন্ন চিত্রের পটভূমিকায় তুলে ধরেছেন সেটি বুঝতে পারবেন। মেঘনাদবধের কাহিনী-উপকরণ কোনো একটি বিশেষ রামায়ণ নয়, বলা যেতে

পারে বাঙালির রামায়ণ-সংস্কার থেকে আহরণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধুসূদনের মাদ্রাজ সূত্রে তামিল-কম্বন রামায়ণের প্রভাব। কম্বন রামায়ণে রাবণ কুৎসিত বা অত্যাচারী শাসক নয়। মধুসূদন রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনায় বাস্তবিক কৃতিবাসের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটিয়ে আর্য়জাতিসুলভ উন্নতগন্য মূঢ়তা ভেঙে দিয়েছেন। এভাবে তিনি পুরাণকে যে নতুনতর অর্থে ব্যঞ্জিত করেছেন তার পেছনে সে সময়ের মানসপটভূমিটি কাজ করেছে।

ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, মায়াদেবী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলি কাব্যের চরিত্র বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে রাম লক্ষ্মণের প্রতি কবির মমতা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হলেও রাবণ-ইন্দ্রজিৎের প্রতি তাঁর গভীরতর পক্ষপাত ফুটে উঠেছে। এটি কবির ব্যক্তিগত ; কিন্তু সমকালের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রাচীন ধারণা ও সংস্কারের পুনর্বিচার করার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। মধুসূদনের এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছত্রশেষে মিলের বিলোপ এবং যতি স্থাপনের স্বাধীনতা। তিনি বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনার প্রয়োজনে ছন্দোবন্ধনকে ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইচ্ছামত সাজিয়েছেন। ফলে দেখা দিয়েছে ছত্র-উল্লঙ্ঘনকারী প্রবহমানতা (enjambment)।

ষষ্ঠ সর্গটি ভালো করে পড়ে কাব্যগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে নানা নতুন বিষয় আপনার নজরে পড়বে যার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। মরমি রসগ্রাহী পাঠক শুধু কাব্য পাঠ করেন না, তিনি কীভাবে এবং কোন্ বিশেষ রীতির মাধ্যম ব্যবহার করে কবি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তার কারণ সম্বন্ধে কবির শিল্পকৃতিরও বিচার করেন। এ সম্পর্কে কিছু ধারণা এককের ৪৮.৯, ৪৮.১১, ৪৮.১২, ৪৮.১৪ উপবিভাগে দেওয়া হয়েছে। সর্গটি বিশ্লেষণ করে পড়বার সময় কিছু আভিধানিক শব্দ ও গুরুত্বপূর্ণ কাব্য-বাক্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে মনে করে ৪৮.৬ উপবিভাগটি প্রস্তুত করা হয়েছে, এতে আপনাদের সুবিধা হবে। এছাড়াও আপনারা কিছু বিশেষ পঙ্ক্তি নির্বাচন করে গভীর ও সযত্নে পাঠ করতে পারেন।

আপাতত ষষ্ঠ সর্গ পড়ে কাব্যটি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। সঙ্গে কিছু অনুশীলনী দেওয়া আছে, সেগুলি এবং লেখক ও রচনা সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা আছে তা পাঠবস্তু বুঝতে সাহায্য করবে বলে মনে করি।

### ৩৩.৩ মধুসূদন দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন স্বরচিত সমাধি লিপিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন :

‘যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে  
জন্মভূমি, জন্মদাতা, দত্ত মহামতি  
রাজনারায়ণ, নামে, জননী জাহ্নবী।’

কবির জন্ম ২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, আম-জাম-কাঠাল গাছের শ্যামলতাম্বিন্ধ একটি সাধারণ গ্রাম। এই গ্রামে জন্মের পর আরও সাত বছর কাটিয়েছেন। এর স্মৃতি তাঁর মানসলোকে স্থায়ী হয়ে ছিল। পিতৃসূত্রে তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, মাতৃসূত্রে তাঁর জমিদারি রক্তের সঙ্গে যোগ ছিল। মা ছিলেন জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। মধুসূদন চার-পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। সে সময় আইন-আদালত ফারসির চলন ছিল। তাই সেই ছয়-সাত বছর বয়সেই মধুসূদন ভিন্ন গ্রামের এক মৌলবির কাছে ফারসি পড়তেন। বাড়িতে মায়ের কাছে সাগ্রহে রামায়ণ, মহাভারত মঞ্জলকাব্যের পাঠ নিয়েছেন। বারো বছর বয়সে কলকাতায় আসেন। রাজনারায়ণ তখন কলকাতার সদর

দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করতেন। পরে খিদিরপুরে একটি বাড়ি কিনে (১৮৩২) স্থায়ী হন। মধুসূদনের পিতা তাঁকে কলকাতায় এনে হিন্দু কলেজে ভর্তি করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কিছু কবিতা খ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিলাত যাওয়ার আগ্রহ ও বাবা-মার ঠিক করা বিবাহ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত মধুসূদনের হিন্দু কলেজে পড়া হল না, তাই তিনি বিশপস্ কলেজে (শিবপুর) ভর্তি হলেন। পিতাই তাঁর শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করতেন। এখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পরে অসভুষ্টি রাজনারায়ণ আর্থিক সাহায্য বন্ধ করায় তিনি ভাগ্যক্ষেপে মাদ্রাজ চলে যান (১৯৪৮)। শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। এখানেই রেবেকা ম্যাক্সভিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও খ্রিস্টীয় মতে বিবাহ। মাদ্রাজ প্রবাসে তিনি তামিল, তেলুগু, গ্রিক ও হিব্রু ভাষা নিয়মিত চর্চা করতেন।

মধুসূদনের প্রথম বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামক আর এক ইংরেজ মহিলাকে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রেবেকা পরাজিত হলেন। আত্মনিবেদন পরায়ণা হেনরিয়েটা শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন। ১৮৫৬ তে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতার পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। সে সময়ই তাঁর বাংলা লেখনী চর্চা শুরু। শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক, ১৮৫৯ সালে দুটি প্রহসন—‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌঁ’ এবং ১৮৬০-এ পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘পদ্মাবতী’ রচনা করেন। এখানেই প্রথম অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা করেন। ১৮৬০ অমিত্রাক্ষরে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ আর ১৮৬১ ‘মেঘনাদবধ কাব্য’\* ও ‘ব্রজাঙ্গনা’ এবং ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক প্রকাশিত হয়। তারপর ‘বীরাঙ্গনা’ (১৮৬২)। এ সময় পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের পর বিলি ব্যবস্থা করে, ১৮৬২-র ৯ জুন বিলাত যাত্রা করেন। ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ‘গ্রেজ ইনে’ ভর্তি হন। ওই বৎসরই ১৯শে আগস্ট পাশ করে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন। মধুসূদন বিদেশে বাসকালেই রচনা করেন ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’। জীবন সায়াহ্নে ‘হেক্টর বধ’ (১৮৭১) গদ্যকাব্য ও ‘মায়াকানন’ নাটক (১৮৭৪) রচনা করেছিলেন।

মহাকবির শেষজীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে জর্জরিত। অসুস্থ কবি আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩-এ। তাঁর তিনদিন পূর্বে ২৬শে জুন হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়।

বর্তমান এককের পাঠ্যবস্তু মেঘনাদবধ কাব্য-এর ৬ষ্ঠ সর্গ। মহাকাব্যের রীতি অনুযায়ী এ সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে—‘বধ’—‘ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ’

ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাকালের সূচনা রামরাবণের যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন সকালে। স্থান—নিকুন্ডিল্লা যজ্ঞগার, বিষয়বস্তু লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ। ‘বধে’—এর মূল ঘটনাটি রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরিত্রে, ঘটনা উপস্থাপনা ও পরিণতিতে রামায়ণ অনুসরণ করা হয়নি। রামচন্দ্রের আশঙ্কা, বিভীষণের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা, রামের দৈববাণী শোনা ও আকাশে সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দেখা, মায়ালক্ষ্মী সংলাপ, বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণের মায়াবলে লঙ্কা প্রবেশ, নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ, মেঘনাদকর্তৃক কোষা দিয়ে লক্ষ্মণকে আক্রমণ ও ফলে তাঁর মূর্ছা, মেঘনাদ-বিভীষণ সংবাদ, মায়ার যত্নে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ ও দৈবাস্ত্রের সাহায্যে মেঘনাদকে তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ করা, রক্তাক্ত মেঘনাদের উক্তি—‘দুঃখ যে, একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে।’

\* ১ম খণ্ড - ১ম সর্গ - ৫ম সর্গ, ১২৬৭ সন,  
২য় খণ্ড - ৬ষ্ঠ সর্গ - ৯ম সর্গ ১২৬৮ সন  
একে খণ্ডে ১৮৬১ খৃঃ

## ৩৩.৪ মূলপাঠ : মেঘনাদবধ কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী  
চলিলা ; শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু  
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,  
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা  
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে  
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর<sup>১</sup> সংগ্রাম ।

কতক্ষণে মহাযশাঃ উত্তরিল যথা  
রঘুরথী । পদযুগে নমি, নমস্কারি  
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—  
“কৃতকার্য আজি, দেব, তব আশীর্বাদে ১০  
চিরদাস ! স্মরি পদ, প্রবেশি, কাননে,  
পূজি চামুণ্ডে<sup>২</sup>, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে ।  
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা  
মায়াজল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,  
মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখি দুয়ারে  
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি  
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ<sup>৩</sup> যথা  
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !  
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জিয়া  
সিংহ ; বিমুখি তাকে ; ভৈরব হুঙ্কারে ২০  
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ  
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে  
বনরাজী ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি  
বায়ুসখা, বায়ুদেব গোলা চলি দূরে ।

সুরবালাদলে এরে দেখি সন্মুখে  
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে  
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে  
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি  
সুদেশ । সরসে পশি, অবগাহি দেহ,  
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজি মায়েরে ৩০  
ভক্তিভাবে । আবির্ভাবি বর দিলা মায়া ।  
কহিলেন দয়াময়ী,—‘সুপ্রসন্ন আজি,  
রে সতীসুমিত্রাসূত, দেব দেবী যত  
তোর প্রতি । দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে  
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা  
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে ।  
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,  
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,  
নিকুঞ্জিলা<sup>৪</sup> যজ্ঞগারে, পূজে বৈশ্বানরে ।  
সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৪০  
নাশ্ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে  
অদৃশ্য ; পিধান<sup>৫</sup> যথা অসি, আবরিব  
মায়াজলে আমি দাঁহে । নির্ভয় হৃদয়ে,  
যা চলি, রে যশস্বি !—কি ইচ্ছা তব, কহ,  
নৃমণি ? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে ।  
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !”

উত্তরিলা রঘুনাথ, “হায় রে, কেমনে—  
যে কৃতাস্ত্রদূতে দূরে হেরি, উর্ধ্বশ্বাসে

১. নশ্বর — নাশশীল, এখানে ‘বিনাশক’ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ।
২. চামুণ্ডে — বালীর নাম । ইনি ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেছিলেন বলে চামুণ্ডা নামকরণ হয়েছে ।
৩. মহোরগ — মহাসর্প ।
৪. নিকুঞ্জিলা—লঙ্কার পশ্চিমদিকের গুহা বিশেষ, সেখানে অবস্থিতা দেবী ।
৫. পিধান—কোষে, খাপে ।

ভয়াকুল জীবকুল খায় বায়ুবেগে  
 প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিধে ; ৫০  
 কেমনে পাঠাই তোরে সে সপবিবরে,  
 প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি ।  
 বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;  
 অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;  
 আনিবু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে  
 সসৈন্যে ; শোণিতশ্রোতঃ হায়, অকারণে,  
 বরিষার জলসম, আর্দ্রিল<sup>৬</sup> মহীরে !  
 রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে-  
 হারাইবু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল  
 অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে ৬০  
 (হে বিধি ; কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)  
 নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে ?  
 আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি  
 রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?  
 চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,  
 লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে,  
 এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইবু আমরা !”

উত্তরীলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;  
 “কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি  
 এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে ৭০  
 ডরায় সে ত্রিভুবনে ! দেব-কুলপতি  
 সহস্রাক্ষী<sup>৭</sup> পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী  
 বিরূপাক্ষ<sup>৮</sup> ; শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী !  
 দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম  
 দেবক্রোধ আবারিছে স্বর্ণময়ী আভা  
 চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,  
 এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে  
 ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;

অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে ।  
 বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল ৮০  
 দেব-আঞ্জা ? ধর্মপথে সদা গতি তব,  
 এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি ?  
 কে কোথা মঞ্জালঘট ভাঙে পদাঘাতে ?”

কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী  
 মিত্র, —“যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী ।  
 দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে  
 রাবণি, বাসবত্রাস,<sup>৯</sup> অজেয় জগতে ।  
 কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে ।  
 স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,  
 রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি, ৯০  
 উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,  
 কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—‘হায় ! মত্ত মদে  
 ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে  
 কি সাথে করি রে বাস, কলুষদেষিণী  
 আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে  
 পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত<sup>১০</sup> গগনে কে কবে  
 হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে  
 সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি  
 শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,  
 তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে ১০০  
 করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,  
 যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী  
 ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি  
 তুই তার ! দেব-আঞ্জা পালিস্ যতনে,  
 রে ভাবী কর্বুররাজ<sup>১১</sup> ! উঠিনু জাগিয়া ;—  
 স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;  
 স্বর্গীয় বাদিত্র<sup>১২</sup>, দূরে শুনিনু গগনে  
 মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে

৬. আর্দ্রিল—আর্দ্র, সিন্ত করল বা ভেজাল। ৭. সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র। ৮. বিরূপাক্ষ—শিব। ৯. বাসবত্রাস—বাসব বা ইন্দ্রের ভয়ের কারণ। ১০. জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছন্ন। ১১. কর্বুররাজ—(কর্বুর—রাক্ষস), রাক্ষসরাজ। ১২. বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র।

মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !  
 গ্রীবদেশে আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী ১১০  
 কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি !  
 কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা  
 মেঘমালা ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা  
 জগদম্বা । বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া  
 সত্বল-নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল  
 মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা ।  
 শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা  
 মন দিয়া । দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,  
 যথা যজ্ঞগারে পুজে দেব বৈশ্বানরে  
 রাবণি । হে নরপাল, পাল সযতনে ১২০  
 দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে  
 তোমার, রাখব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে !”

উত্তরিলে সীতানাথ সজল-নয়নে ;—  
 “স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,  
 আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব  
 এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?  
 হায়, সখে, মন্থরায় কুপন্থায় যবে  
 চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে  
 নির্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি  
 পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল ১৩০  
 রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !  
 কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে  
 কাঁদিলা উর্মিলা বধু ; পৌরজন যত—  
 কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?  
 না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে  
 (ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,  
 জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে ।  
 কহিলা সুমিত্রা মাতা ; — ‘নয়নের মণি

আমার, হরিলি, তুই রাখব ! কে জানে,  
 কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে ! ১৪০  
 সঁপিণ্ড এ ধন তোরে ! রাখিস্ যতনে  
 এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি !  
 “নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্धारি ।  
 ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্বীর সমরে,  
 দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !  
 সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে  
 অঙ্গাদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,  
 ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;  
 ধুম্রশঙ্ক, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম  
 অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী ১৫০  
 বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,  
 দেবাকৃতি, দেববীর্য ; তুমি মহারথী ;—  
 এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে  
 যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী  
 যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী  
 আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,  
 অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা !”

সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা  
 সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;  
 “উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি, ১৬০  
 সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়  
 তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?  
 দেখ চেয়ে শূন্য পানে !” দেখিলা বিস্ময়ে  
 রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে  
 শিখী । কেকারব মিশি ফণীর স্বননে<sup>১৩</sup>  
 ভৈরব আরবে<sup>১৪</sup> দেশ পুরিছে চৌদিকে !  
 পক্ষচ্ছায়া আবারিছে, ঘনদল যেন,  
 গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,

১৩. ফণীর স্বননে—সর্প গর্জন শব্দে ।

১৪. আরবে—শব্দে । রব > আরব, আরাব ।

হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে ।  
মুহুর্ত্তুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল ১৭০  
উথলিয়া জলদল । কতক্ষণ পরে,  
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;  
গরজিলা অজগর<sup>১৫</sup>—বিজয়ী সংগ্রামে ।

কহিলা রাবণানুজ ; —“স্বচক্ষে দেখিলা  
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,  
কহিনু বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে !  
নহে ছায়াবাজি<sup>১৬</sup> ইহা ; আশু যা ঘটিবে,  
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—  
নির্বীরবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী !”

প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি ১৮০  
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে । আহা,  
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি—  
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি  
তারাময় ; সারসনে বল বল বলে  
বলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে ।  
রবির পরিধি সম দ্বীপে পৃষ্ঠদেশে  
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চে  
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ<sup>১৭</sup> দুলিল  
শরপূর্ণ । বাম হস্তে ধরিলা সাপটি  
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাতিল মস্তকে ১৯০  
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি  
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে  
সুচুড়া, কেশরিপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি  
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,  
তেজস্বী-মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী !

শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে  
ব্যগ্র, তুরঙ্গাম যথা শৃঙ্ককুলনাদে,  
সমরতরঙ্গ যাবে উথলে নির্ঘোষে !

বাহিরিলা বীরবর, বাহিরিলা সাথে  
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে ! ২০০  
বরিষলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে  
মঞ্জালবাজনা ; শূন্য নাচিল অঙ্গরা,  
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !

আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,  
আরাধিলা রঘুবর ; “তব পদ্যশুভে,  
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,  
অস্থিকে ! ভুল না, দেরি, এ তব কিঙ্করে !  
ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু  
আয়াস, ও রাজ্যা পদে অবিদিত নহে ।  
ভুঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,<sup>১৮</sup> ২১০  
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,  
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !  
দুর্দাস্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,  
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,  
মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে !”

এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে ।  
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে  
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা  
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে ।  
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবোঃ<sup>১৯</sup> ; পবন অমনি । ২২০  
চলাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে ।  
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,  
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা ।

হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,  
আশা যথা আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,  
দুঃখতমোবিনাশিনী ! কূজনিল পাখী  
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে  
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্বরী,

১৫. অজগর - অজগর - বড়ো সাপ বিশেষ । ১৬. ছায়াবাজি—অলী মায়াজাল । ১৭. নিষঙ্গ—শরাধার, তৃণীর ।  
১৮. মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবাপ্রিয়ে । ১৯. দিবিন্দ্র দিবোঃ—দেবরাজ ইন্দ্র-স্বর্গে ।



তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; উষার ললাটে  
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে ! ২৩০  
ফুটিল কুস্তলে ফুল, নব তারাবলী !

লক্ষ্য করি রক্ষাবরে রাঘব কহিলা ;  
“সাবধানে যাও, মিত্র । অমূল রতনে  
রামেব, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমাতে  
রথিবর ! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে-  
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে !”

আশ্বাসিলা মহেশ্বাসে<sup>২০</sup> বিভীষণ বলী ।  
“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;  
কাহারে উরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে  
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে ।” ২৪০

বন্দি রাঘবেন্দ্র পদ, চলিলা সৌমিত্রি  
সহ মিত্র বিভীষণ । ঘন ঘনাবলী  
বেড়িল দৌহারে, যথা বেড়ে হিমালীতে  
কুস্তলিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি ।  
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দৌছে !

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা-  
রক্ষঃকুলে-রাজলক্ষ্মী-রক্ষাবধু-বেশে,  
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ দেউলে ।  
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—  
“কি কারণে, মহাদেবী, গতি এবে তব ২৫০  
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঞ্জিণি ?”

উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—  
“সম্বর, নীলাম্বুসুতে,<sup>২১</sup> তেজঃ তব আজি ;  
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী  
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,  
নিকুস্তিলা যজ্ঞগারে দস্তী মেঘনাদে ।—  
কালানলসম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;  
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?  
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,

রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে ২৬০  
ধর্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা ইন্দ্রি ;—  
“কার সাধ্য, বিশ্বধোয়া,<sup>২২</sup> অবহেলে তব  
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে  
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে  
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,  
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে  
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বর, দেবি,  
তেজঃ প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?  
কহ সৌমিত্রের তুমি পশিতে নগরে ২৭০  
নির্ভয়ে । সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,  
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন  
বলী — অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !”

চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—  
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যয়ে যেমতি  
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঞ্জিণী  
সঙ্গে মায়া । শুখাইল রক্তাতরুরাজি ;  
ভাঙিল মঞ্জলঘট ; শুষিলা মেদিনী  
বারি রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্তরে  
তেজোরশি, যথা পশে, মিশা-অবসানে, ২৮০  
সুধাকর-কর-জাল রবি-কব-জালে !  
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি !  
কুস্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !  
গস্তীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা  
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;  
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,  
আক্ষেপে, রে রক্ষপুরি, তোর এ বিপদে,  
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !

প্রাচীরে উঠিয়া দৌছে হেরিলা অদূরে  
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুস্তলিকাবৃত ২৯০

২০. মহেশ্বাসে—মহাধনুর্ধর (রামচন্দ্র) । ২১. নীলাম্বুসুতে—সমুদ্রে কন্যা—লক্ষ্মী । ২২. বিশ্বধোয়া—বিশ্ববাসীর আরাধ্যা (মায়াদেবী) ।

যেন দেব ত্রিষাম্পতি,<sup>২৩</sup> কিম্বা বিভাবসু  
ধুমপুঞ্জ। সাথে সাথে বিভীষণ রথী-  
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্বার সমরে ।  
কে আজি রক্ষিবে, হয়, রাক্ষসভরসা  
রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা  
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,  
সুযোগপ্রয়াসী, কিম্বা নদীগর্ভে যথা  
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে  
যমচক্রবৃপী নক্র<sup>২৪</sup> ধায় তার পানে  
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে, ৩০০  
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে ।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,  
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দ্রিরা সুন্দরী ।  
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শূষিলা  
অশ্রুবিন্দু বসুধরা—শুষে শুক্তি যথা  
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,  
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে  
ভাতে যবে স্নাতী সতী গগনমণ্ডলে ।

প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে  
বীরদ্বয় । সৌমিত্রির পরশে খুলিল ৩১০  
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিঙ্কু কার কানে  
পশিল আরাব ? হয় ! রক্ষোরথী যত  
মায়ার ছলনে অস্ত্র, কেহ না দেখিলা  
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,  
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !

সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে  
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গো নিষাদী,  
তুরঙ্গমে সাদীবন্দ, মহারথী রথে,  
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-  
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য ; অজেয় সংগ্রামে । ৩২০

কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভূকবৃপী  
বিরুপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়নধারী,<sup>২৫</sup>  
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ;<sup>২৬</sup> তালবৃক্ষাকৃতি  
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা  
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে  
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,  
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত  
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—  
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-৩৩০  
চিরদ্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;  
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি  
শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল<sup>২৭</sup>, বিপণি,  
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালায়ে,  
গজালায়ে গজবন্দ ; স্যন্দন অগণ্য  
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা চারু নাট্যশালা,  
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—  
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে-  
দেবলোভে, দৈত্যকুলে-মাৎস্য ? কে পারে  
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ? ৩৪০

নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে  
রক্ষোরাজরাজগৃহ । ভাতে সারি সারি  
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে  
গৃহচূড় ; হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা  
বিভাময়ী । হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ  
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,  
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি  
সৌরকর ! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ  
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,  
কহিলা,—“অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে, ৩৫০

২৩. ত্রিষাম্পতি—সূর্য। ২৪. নক্র—কুমীর। ২৫. প্রক্ষেড়ন—লৌহময় বাণ, নারাচ। ২৬. স্যন্দন—রথ। ২৭. দেউল—  
দেবকুল—দেবালয়, মন্দির।।

রক্ষাবর, মহিমার অর্ঘব জগতে ।  
 ও হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?”  
 বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী  
 বিভীষণ,—“যা কহিলে সত্য, শূরমণি !  
 এ হেন বিভব, হয়, কার ভবতলে ?  
 কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে ।  
 এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,  
 সাগরতরঙ্গ যথা ! চল ত্বরা করি,  
 রথিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;  
 অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !” ৩৬০

সত্বরে চলিলা দৌঁহে, মায়ার প্রসাদে  
 অদৃশ্য ! রাক্ষসবধু, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,  
 দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,  
 সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে  
 সুহাসি ! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে  
 প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে  
 ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,  
 ত্যাজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে  
 ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী  
 বাজিপাল ; গর্জি গজ সাপটে প্রমদে ৮ ৩৭০  
 মুদগর ; শোভিছে পটু-আবরণ পিঠে,  
 বালরে মুকুতাপাতি ; তুলিছে যতনে  
 সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে ।  
 বাজিছে মন্দিরবন্দে প্রভাতী বাজনা,  
 হয় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা  
 দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,  
 আবির্ভাবি ভবতলে, পুজেন রমেশে !  
 অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী  
 কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,  
 উজলি টৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী ৩৮০  
 উষা যথা ! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে

২৮. প্রমদে—প্রমত্ত হয়ে ।

লইয়া ধাইছে ভারী ; — ক্রমশঃ বাড়িছে  
 কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত ।  
 কেহ কহে, — “চল, ওহে উঠিলে প্রাচীরে ।  
 না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে  
 হেরিতে অঙ্কুর যুদ্ধ । জুড়াইব আঁখি  
 দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,  
 আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে !” কেহ উত্তরিছে  
 প্রগল্ভে,—“কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে  
 মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে ৩৯০  
 যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?  
 দহিবে বিপক্ষদলে শুল্ক তুণে যথা  
 দহে বহি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে  
 দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে ।  
 রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে  
 রণজয়ী সভাতলে, চল সভাতলে !”

কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,  
 কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,  
 দেবাকৃতি, দেববীর্য, দেব-অস্ত্রধারী  
 চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ; — ৪০০  
 নিকুন্তিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে ।

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে  
 নিভূতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,  
 চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে ।  
 পুড়ে ধূপদান ধূপ ; জ্বলিছে টৌদিকে  
 পূত ঘটরশে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,  
 গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা  
 হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী  
 তুমি ! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা,  
 হেম-পাত্রে ; বৃন্দ দ্বার ; বসেছে, একাকী ৪১০  
 রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—  
 যোগীন্দ্র, —কৈলাস গিরি । তব উচ্চ চূড়ে ।

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে  
 যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা  
 মায়াবলে দেবালয়ে । বনবানিল অসি  
 পিধানে ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,  
 কাঁপিল মন্দির ঘর বীরপদভরে ।

চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি ।  
 দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—  
 তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী ! ৪২০

সাস্ত্রাঙ্গো প্রণমি শূর, কৃতাজ্জলিপটে,  
 কহিলা, “হে বিভাবসু, শুব্র ক্ষণে আজি  
 পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি  
 পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে !  
 কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা  
 রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে  
 প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,  
 প্রভাময় ?” পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে ।

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—  
 “নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া, ৪৩০  
 রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !  
 সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে  
 আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে  
 অবিলম্বে !” যথা পথে সহসা হেরিলে  
 উর্ধ্ব ফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি  
 পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে ।  
 সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !  
 প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !  
 গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি  
 তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল ! ৪৪০  
 পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !

বিস্ময়ে কহিলা শূর, “সত্য যদি তুমি  
 রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা

রক্ষোবাহুপরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,  
 যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,  
 রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গাধরসম  
 এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে  
 ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—  
 কোন মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?  
 মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে ৪৫০  
 কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে  
 একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে<sup>২৯</sup> তবে  
 কেন বণ্ণাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,  
 সর্বভূক ? কি কৌতুক এ তব কৌতুকি ?  
 নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে  
 এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ  
 বৃন্দ দ্বার ! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে !  
 নিঃশঙ্ক করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে  
 আজি, খেদাইব দূরে কিঙ্কিন্ধ্যা-অধিপে,  
 বাঁধি আইন রাজপদে দিব বিভীষণে ৪৬০  
 রাজদ্রোহী । ওই শুন, নাদিছে টৌদিকে  
 শৃঙ্গা শৃঙ্গানাদিগ্রাম ! বিলম্বিলে আমি,  
 ভ্রমোদ্যম রক্ষঃ-চমু, বিদাও আমারে !”

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—  
 “কৃতান্ত আমি রে তোমার, দুরন্ত রাবণি !  
 মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে !  
 মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,  
 তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত  
 দেবকুলে ! এত দিনে মজিলি দুর্মতি ;  
 দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে !” ৪৭০

এতক কহিয়া বলী উলঞ্জিলা অসি  
 ভৈরবে ! বলসি আঁখি কালনল-তেজে,  
 ভাতিল কৃপাণবর, শত্রুকরে যথা  
 ইরম্মদময় বজ্র ! কহিলা রাবণি,-

২৯. প্রপঞ্চে—মায়ায়, ছলনায় ।

“সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু  
লক্ষ্মণ সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব  
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু  
রণরঞ্জে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,  
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—  
বক্ষ্যে রিপু তুমি, তব অতিথি হে এবে । ৪৮০  
সাজি বীরসাজে আমি । নিরস্ত্র যে অরি,  
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে ।  
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,  
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;— কি আর কহিব ?”

জলদ-প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—  
“আনায় মাঝারে<sup>৩০</sup> বাঘে পাইলে কি কভু  
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,  
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে  
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব  
তোর সঙ্গে ? মারি অরি যে কৌশলে !”

কহিলা বাসবজ্যেতা, (অভিমন্যু যথা  
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি  
রোষে ।) “ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,  
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই ! ক্ষত্রিয় সমাজে  
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে  
নাম তোর রথিবন্দ ! তস্কর যেমতি,  
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ  
শাস্তিয়া নিরস্ত্র তোরে করিব এখনি !  
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,  
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, ৫০০  
পামর ! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি ?”

চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু  
নিষ্কোপিয়া ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে ।  
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,

পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে  
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল বনঝনি,  
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে ।  
বহিল বুধির-ধারা ! ধরিলা সত্বরে  
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে  
তাহায় ! কার্মুক<sup>৩১</sup> ধরি কর্শিলা ; রহিল ৫১০  
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে  
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে !  
যথা শূড়ধর<sup>৩২</sup> টানে শূড়ে জড়াইয়া  
শৃঙ্গাধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তুণীরে  
শূরেন্দ্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !  
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী ।  
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে  
ভীমতল শূল হস্তে, ধূমকেতুসম<sup>৩৩</sup>  
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণে রণে !  
“এতক্ষণে”—অরিন্দম কহিলা বিষাদে, ৫২০  
“জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল  
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব  
এ কাজ ? নিকষা, সতী তোমার জননী !  
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! শূলীশস্ত্রুনিভ  
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী !  
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?  
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?  
কিস্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি  
পিতৃতুল্য । ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,  
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, ৫৩০  
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে<sup>৩৪</sup> ।”

উত্তরিলা বিভীষণ, “বৃথা এ সাধনা,  
ধীমান্ । রাখবদাস আমি ; কি প্রকারে  
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

৩০. আনায় মাঝারে—ফাঁদে বা জালের মধ্যে । ৩১. কার্মুক—ধনুক । ৩২. শূড়ধর—হাতি । ৩৩. ধূমকেতুসম—ধূমকেতুর মতো অমঙ্গল সূচক । ৩৪. আহবে—যুদ্ধে ।

অনুরোধ ?” উত্তরিলে কাতরে, রাবণি ;—  
 “হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে !  
 রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে  
 আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !  
 স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;  
 পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ৫৪০  
 ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে  
 কে তুমি ? জনম তব কোন মহাকূলে ?  
 কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে  
 করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;  
 যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,  
 শৈবালদলের ধাম ? মুগেন্দ্র কেশরী,  
 কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে, শৃগালে  
 মিত্রভাবে ? অঙ্গ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,  
 অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে ।  
 ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে ৫৫০  
 অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?  
 কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা ?  
 নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শূনি না হাসিবে  
 এ কথা ? ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া  
 এখনি ! দেখিব আজি, কোন দেববলে,  
 বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !  
 দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,  
 রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি  
 ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে ?  
 নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলভে পশিল ৫৬০  
 দস্তী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে ।  
 তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে  
 বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে  
 ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে  
 কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে  
 হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?

তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”  
 মহামন্ত্র বলে যথা নশ্রশিরঃ ফণী,  
 মলিনবদন লাজে, উত্তরিলে রথী  
 রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ; ৫৭০  
 “নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ষ মোরে  
 তুমি ! নিজ কর্ম-দোষে, হয়, মজাইলা  
 এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !  
 বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে  
 পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি  
 বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !  
 রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী  
 তেঁই আমি । পরদোষে কে চাহে মজিতে ?”  
 বুধিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি  
 নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি, ৫৮০  
 কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্মপথগামী,  
 হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে  
 তুমি ; কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শূনি,  
 জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা  
 জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি  
 পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি  
 নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !  
 এ শিক্ষা, হে রক্ষাবর, কোথায় শিখিলে ?  
 কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,  
 হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ? ৫৯০  
 গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি !”  
 হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে  
 সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী ।  
 সম্মানি বিম্বিল শূর খরতর শরে  
 অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা  
 মহেশ্বাস-শরজালে বিঁধেন তারকে ।  
 হয় রে, বুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে  
 বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা)

বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !  
 অধীর ব্যথায় রথী, সাপাটি সত্বরে ৬০০  
 শঙ্খ ঘন্টা, উপহারপাত্র ছিল যত  
 যজ্ঞগারে, একে একে নিষ্কেপিয়া কোপে ;  
 যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে,  
 সপ্তরথি-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা  
 রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,  
 ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে !  
 কিন্তু মায়াময়ী মায়ী, বাহু-প্রসরণে,  
 ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি  
 খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে  
 করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি ৬১০  
 ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জি ভীম নাদে,  
 প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !  
 মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে  
 ভীষণ মহিয়ারূঢ় ভীম দশধরে ;  
 শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা  
 চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে  
 দেবকুলরথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে ।  
 বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী  
 নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা  
 রাহুগ্রাসে ; কিশ্বা সিংহ আনায় মাঝারে ! ৬২০

ত্যাজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ  
 রামানুজ ; বলসিলা ফলক-আলোকে  
 নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী  
 ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে  
 শোণিতার্দ্র । থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;  
 গর্জিলা উথলি সিংধু ! ভৈরব আরবে  
 সহসা পুরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,  
 মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা  
 আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে  
 সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল ৬৩০

কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা  
 রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে ।  
 সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !  
 প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !  
 আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী  
 মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে ।  
 মুছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী  
 আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল  
 শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি  
 ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, ৬৪০  
 আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,  
 রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে  
 কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—“বীরকুলগ্নানি,  
 সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !  
 রাবণনন্দন, আমি, না ডরি শমনে !  
 কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,  
 পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !  
 দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে  
 মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা ৬৫০  
 দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?  
 আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে  
 পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,  
 নরাধম ? জলধির অতল সলিলে  
 ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে  
 রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে !  
 দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে  
 সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি !  
 নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে ।  
 দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন ৬৬০  
 ত্রাণিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ বুঝিলে ?  
 কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,

কলঙ্কি ?” এতক কহি, বিবাদে সুমতি  
 মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলে অস্তিমে ।  
 অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে  
 চিরানন্দ ? লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,  
 অনর্গল বহি, হয়, আর্দ্রিল মহীরে ।  
 লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে ।  
 নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্রিযাম্পতি  
 শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে । ৬৭০  
 কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে,—  
 “সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহু,  
 সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?  
 কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে  
 এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?  
 শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?  
 সুরবালা-প্লানি রূপে দিতিসুতা যত  
 কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃন্দা পিতামহী ?  
 কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি  
 সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি ৬৮০  
 ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শূনিছ,  
 প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি  
 তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,  
 লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !  
 হে কর্বুরকুলগর্ভ, মধ্যাহ্নে কি কভু  
 যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,  
 জগৎনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি  
 এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?  
 নাদে শৃঙ্গানাঙ্গী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;  
 গর্জে গজরাজ, অশ্ব হেঁসিছে ভৈরবে ; ৬৯০  
 সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী<sup>৩৫</sup>, উগ্রচণ্ডা রণে ।  
 নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !

এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !”  
 এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী  
 শোকে । মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী  
 কহিলা,—“সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !  
 কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে  
 বধিনু এ যোধে আমি অপরাধ নহে  
 তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে  
 চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে । ৭০০  
 বাজিছে মঞ্জলবাদ্য শুন কান দিয়া  
 ত্রিংশ-আলয়ে, শূর !” শূনিলা সুরথী  
 ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি—স্বপনে যেমনি  
 মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দৌঁহে,  
 শাদুলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা  
 নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্ধ্বশ্বাসে  
 প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,  
 হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিবাদে !  
 কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বখামা রথী,  
 মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে ৭১০  
 নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,  
 হরসে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা  
 ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুবুক্ষত্ররণে !  
 মায়ার প্রসাদে দৌঁহে অদৃশ্য, চলিলা  
 যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী ।  
 প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী  
 নিবেদিলা করপুটে,—“ও পদ-প্রসাদে,  
 রঘুবংশ-অবতংস<sup>৩৬</sup> জয়ী রক্ষোরণে  
 এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী  
 শত্রুজিৎ !” চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে ৭২০  
 অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—  
 “লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,

৩৫. রক্ষঃঅনীকিনী—রাক্ষস সেনাদল । ‘অনীকিনী’ অক্ষৌহিনীর পূর্ববর্তী সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাপক । বাংলায় শব্দটি সৈন্যদল অর্থেই ব্যবহার হয় । ৩৬ রঘুবংশ—অবতংস-রঘুকুলের শিরোভূষণ (রাম) ।



হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !  
 সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি  
 ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !  
 ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি  
 অযোধ্য ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে  
 চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,  
 প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত  
 মানব ; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে !” ৭৩০  
 মহামিত্র বিভীষণে সপ্তাষি সুস্বরে  
 কহিলা বৈদেহীনাথ,—“শুভক্ষণে, সখে,

পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে ।  
 রাঘবকুলমঞ্জল তুমি রক্ষোবেশে ।  
 কিনিলে রাঘবকুলে আমি নিজগুণে,  
 গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,  
 মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !  
 চল সবে, পুজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি  
 শঙ্করী !” কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে  
 মহানন্দে দেববন্দ ; উল্লাসে নাদিল, ৭৪০  
 “জয় সীতাপতি জয় !” কটক চৌদিকে,-  
 আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে !

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম  
 ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

### ৩৩.৫ সারাংশ—১

ষষ্ঠ সর্গের মূল ঘটনা লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ । দৈবাস্ত্র লাভ করবার পর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে সেটি কীভাবে পেলেন তা বর্ণনা করে । তিনি জানান লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী বলেছেন দেবতারা সকলে তাঁর প্রতি প্রসন্ন । ইন্দ্র দৈবাস্ত্র পাঠিয়েছেন, সেগুলি তিনি লক্ষ্মণকে দিয়ে বলেন সে যেন বিভীষণের সঙ্গে নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করে । দেবী আরও বলেছেন, তাঁর কৃপায় তাঁরা অদৃশ্যভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করতে পারবেন ।

রামচন্দ্র বলেন, যে ভীষণ শত্রুর ভয়ে দেব-নর সকলেই ভীত, সেখানে লক্ষ্মণকে তিনি কেমন করে পাঠাবেন ? সীতা উদ্ভারের জন্য বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ নেই । তিনি রাজ্য সম্পদ, বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব সব হারিয়েছেন—বাকি ছিলেন সীতা, সেও রাবণ কর্তৃক অপহৃত, এখন একমাত্র লক্ষ্মণ আছেন, তাকেও যদি যুদ্ধে হারাতে হয়, এই আশঙ্কায় বলেন আর যুদ্ধে কাজ নেই ।

রামের এই খেদোক্তিতে লক্ষ্মণ বলেন, দেবতা যেখানে সহায় যেখানে এই খেদ অনুচিত । তিনি যদি রামচন্দ্রের আদেশ পান তাহলে লঙ্কায় প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবেন । সুতরাং দেবতাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করা ঠিক হবে না । বিভীষণও অনুরূপে বোঝালেন এবং বললেন স্বপ্নে দেবী তাঁকে আদেশ দিয়েছেন মেঘনাদবধ-এ লক্ষ্মণকে সাহায্য করতে । তবুও রামচন্দ্র আশ্বস্তবোধ করেননি । রামচন্দ্রের জন্য যে লক্ষ্মণ রাজ্যে, মা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছেন সেই লক্ষ্মণের জীবন বিপন্ন করে তিনি কেমন করে সীতা উদ্ভারে পাঠাবেন ? তাই এ চেষ্টায় প্রয়োজন নেই । এমন সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন, দেবাদেশ অবহেলা করা অনুচিত । আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখেন সাপ আর ময়ূরের এক যুদ্ধ বেধেছে । যুদ্ধে ময়ূরের মৃত্যু হলে সাপ গর্জন করতে লাগল । বিভীষণ ব্যাখ্যা করে বললেন সাপের কাছে সর্পভক্ষক ময়ূরের পরাজয় ঘটেছে, তার অর্থই হল লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু হবে ।

রামচন্দ্র আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে দৈবাস্ত্রে সাজিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে দ্রুত অদৃশ্যভাবে যাত্রা করলেন। মায়াদেবী রাক্ষসকুল-রাজলক্ষীর মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর তেজ সস্বরণ করতে অনুরোধ করলেন। রাজপুরলক্ষী মায়াদেবীর সঙ্গে মন্দির ত্যাগ করে লঙ্কার পশ্চিমদ্বারের দিকে গেলেন। লঙ্কায় একের পর এক অঘটন ঘটতে লাগল।

মায়াবলে লক্ষ্মণের স্পর্শমাত্রে লঙ্কার সিংহদ্বার খুলে গেল, কেউ শব্দ শুনতে পেল না, এবং তাঁদের কেউ দেখতে পেল না। লঙ্কার অপরূপ ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তাঁরা নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে পৌঁছলেন—সেখানে নির্জনে বিবিধ উপাচার বেষ্টিত হয়ে মেঘনাদকে ধ্যানে রত দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণের অস্ত্রের শব্দে মেঘনাদের ধ্যান ভঙ্গ হল। লক্ষ্মণের রূপ ধরে অগ্নিদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মনে করে। এভাবে তাঁর আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে লক্ষ্মণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং দেব অসি কোষমুক্ত করে মেঘনাদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, মেঘনাদ বললেন, যদি সত্যি তাঁর যুদ্ধে সাধ জাগে তা পূর্ণ করবেন। কিন্তু নিরস্ত্রকে আক্রমণ করা বীরধর্ম নয়, তাই তাকে অস্ত্র-সজ্জিত হবার সুযোগ দেওয়া বিধেয়। লক্ষ্মণ বললেন রাক্ষসের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম পালন অর্থহীন—শত্রুকে যে কোনো উপায়ে বধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। লক্ষ্মণের এ কথায় মেঘনাদ তার তীব্র নিন্দা করেন। এবং অবশেষে পূজার কোষা তুলে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করেন। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়লে তাঁর দৈবাস্ত্র কেড়ে নিতে গিয়ে পারলেন না, বুঝলেন এ হোল দেবতাদের ষড়যন্ত্র। দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন শূলধারী বিভীষণকে। বিষণ্ণভাবে মেঘনাদ বললেন, এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে লক্ষ্মণ এখানে প্রবেশ করেছেন। বিভীষণের এ হেন কাজের জন্য মেঘনাদ তাঁর নিন্দা করলেন। পিতৃত্বকে অনুরোধ করলেন পথ ছেড়ে দিতে, তাহলে তিনি অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র নিতে পারেন। বিভীষণ নিজেকে রামচন্দ্রের দাস বলায় মেঘনাদ তাঁকে ধিক্কার দিলেন। বিভীষণ লজ্জাবনত মুখে বললেন, তাকে ভর্তসনা বৃথা, রাবণের পাপের জন্যই সবংশে ধ্বংস হতে চলেছেন। মেঘনাদ তখন বললেন হীন সংসর্গে থাকার জন্যই আজ বিভীষণ এতই অধঃপতিত হয়েছেন যে, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

এদিকে মায়ার যত্নে লক্ষ্মণ চেতনা পেয়ে মেঘনাদকে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করতে লাগলেন। মেঘনাদের দেহ থেকে অতিরিক্ত রক্ত স্রবণে মাটি লাল হয়ে গেল। বেদনায় অস্থির মেঘনাদ একের পর এক পূজাপাত্র লক্ষ্মণের দিকে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু মায়ার প্রভাবে তা তাঁর গায়ে লাগল না। গর্জন করে লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হলে মায়ার বলে দেখলেন দেবতারা লক্ষ্মণকে আঁড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে হতাশ হলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ দৈব-অসি দিয়ে মেঘনাদকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পৃথিবী কেঁপে উঠল, সমুদ্র উদবেল হল, ভৈরব রবে বিশ্ব পূর্ণ হল। রাজসভায় রাবণের মাথার সোনার মুকুট খসে পড়ল। প্রমীলা ভুলে অকস্মাৎ কপালের সিঁদুর মুছে ফেললেন, মন্দোদরী বিনা কারণে মূর্ছিত হলেন, রাক্ষস শিশুরা কেঁদে উঠল।

মৃত্যুপথযাত্রী মেঘনাদ বললেন তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না, কিন্তু একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে, এটিই তাঁর দুঃখ। লক্ষ্মণকে দেবদৈত্য মানব কেউই শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন না, তাঁর অপযশ কোনো কালে ঘুচবে না।

মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণও শোকাকর্ষ হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণের কোনো হাত নেই, বিধির বিধানেই সব ঘটেছে। এখন অনতিবিলম্বে ফিরে গিয়ে রামচন্দ্রের উৎকর্ষা দূর করা কর্তব্য। অবশেষে তাঁরা রামচন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে মেঘনাদ নিধনের সংবাদ দিলে, রামচন্দ্র তাঁদের সাধুবাদ ও বিভীষণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শঙ্করীর পূজা করতে

বললেন। আকাশে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, ‘জয় সীতাপতির জয়’ ধ্বনিতে লঙ্কার অধিবাসীরা সচকিত হল।

### ৩৩.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) : শব্দার্থ, টীকা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তজি সে উদ্যান — লঙ্কার যে উদ্যানে ‘চণ্ডীর দেউল’ আছে, সেখানে দেবীর কাছ থেকে বর লাভ করে সুমিত্রা পুত্র লক্ষ্মণ সেই উদ্যান ত্যাগ করে রঘু-রাজ রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে গেলেন।

নীলোৎপলাঞ্জলি — নীলপদ্ম দিয়ে লক্ষ্মণের দেবীর অর্চনার বিষয়টি কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের ঘটনা থেকে পরিকল্পিত।

নাহি কাজ সীতায় উৎসারি — সীতা উৎসারের জন্য মেঘনাদ ও রাবণ বধ প্রয়োজন। কিন্তু মেঘনাদ যে রকম পরাক্রমশালী, তাই লক্ষ্মণকে পাঠালেন, তাঁর জীবনশঙ্কা আছে। তাই লক্ষ্মণের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে বিনাশের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে সীতা উৎসারের চেষ্টা না করার কথা বলেছেন। দেবানুগ্রহ ও দৈবাস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও, ভাইয়ের প্রতি মমত্ব ও মেঘনাদের দুর্বীর শক্তির পরিচয় তুলে ধরবার জন্য এ অংশ পরিকল্পিত হয়েছে মনে করা যায়। কিন্তু এর ফলে মেঘনাদের বীর্যবন্তার পরিচয় পেলেও রামচন্দ্রের চরিত্রমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে — রামের এই হতাশা ও বিলাপের সাহায্যে পরোক্ষ মেঘনাদ-এর গৌরব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আছিল, ডরায় পালিস প্রভৃতি লোকায়ত শব্দ মধুসূদন অনায়াসে মহাকাব্যেও প্রয়োগ করেছেন।

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী — লক্ষ্মণকে এখানে রামচন্দ্রের চেয়ে পৌরুষ-সম্পন্ন করে আঁকা হয়েছে।

কালমেঘসম দেবক্রোধ — দেবতাদের বিরূপতার কারণে স্বর্ণলঙ্কার দীপ্তি মেঘছায়াবৃত হয়েছে—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক শোভা অন্তর্হিত হয়েছে।

দেবহাস্য উজলিছে — দেবতারা যে রামচন্দ্রের প্রতি সুপ্রসন্ন, তা বোঝা যায় রামচন্দ্রের শিবিরের উজ্জ্বলতায়।

কে কোথা মঞ্জলঘট ভাঙে পদাঘাত — পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঞ্জল ঘট। তাকে কেউ পদাঘাতে ভাঙে না। দেবানুগ্রহ পেয়েও মূঢ়ের মতো কেউ তাকে ভীতিবশে প্রত্যাখ্যান করে না।

স্মারিলে পূর্বের কথা — ইতোপূর্বে দুবার মেঘনাদের যে বীরত্বের পরিচয় পেয়েছেন, তা মনে হলে।

নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উৎসারি — বিভীষণকে সম্বোধন করে রামচন্দ্র সীতা উৎসারের আর প্রয়োজন নেই বলেছেন, প্রধানতঃ মহাবিক্রমশালী ইন্দ্রজিতের কাছে লক্ষ্মণের পরাভাবের সম্ভাবনার কাথ ভেবে। এই সর্গের প্রথমদিকেও এ ধরনের উক্তি আছে।

দেবাকৃতি, দেববীর্য — রামচন্দ্রের বানর সৈন্যরাই এ সংকটে একমাত্র সহায়। তাই বানরদের ‘rabble’ বললেও এখানে তিনি তাদের অসামান্য মহিমাকে স্মরণ করেছেন—বলেছেন, তারা দেবতাদেরই মতো শক্তিধর।

আকাশ-সম্ববা সরস্বতী — আকাশ থেকে সৃষ্ট বাণী ; দৈববাণী।

অহিসহ যুঝিছে অম্বরে শিখী — আকাশে সাপের সঙ্গে ময়ূরের যুদ্ধ হচ্ছে। এই চিত্রকল্পটি ইলিয়াড কাব্যের অনুসরণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

জুলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল — যুদ্ধে রত সাপের মুখ থেকে তীব্র বিষ প্রলয়ংকর আগুনের মতো আকাশে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত — হাতির দাঁতে তৈরি।

কালানল সম তেজঃ তব..... এ নগরে ? — শক্তিময়ী তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ শত্রু মনোভাব নিয়ে কে লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ লঙ্কার রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ প্রসন্ন তখন কারও পক্ষে রাবণ তথা লঙ্কার ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রাক্তনের গতি — পূর্বকৃত কর্মফল — অদৃষ্ট।

বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা — লক্ষ্মীদেবীর তেজ সংবরণের ফলে যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল, তা আসলে বৃষ্টি নয়— লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অশ্রু বর্ষণ।

বিরূপাক্ষ ; তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিফুর — এরা সকলেই রাক্ষস সেনাপতি।

দৈত্যকুল-মাৎসর্য — দৈত্যদের ঈর্ষার বস্তু।

মগাশীসঞ্জিনী — মৃগনয়না সুন্দরীদের গর্বহারিণী।

আয়সা-আবৃত — লৌহনির্মিত বর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত।

সাস্তাঙ্গে প্রণমিশূর—ইত্যাদি — সুরক্ষিত লঙ্কার সুরক্ষিততর যজ্ঞগৃহে প্রতিপক্ষ লক্ষণের প্রবেশ কল্পনা তীত। দেহকান্তি-শোভিত লক্ষ্মণকে দেখে দেবতা লক্ষ্মণের রূপধারণ করে তাকে বর দিতে এসেছেন মনে করে ইন্দ্রজিৎ সাস্তাঙ্গে প্রণাম করলেন। সাস্তাঙ্গ (স-অষ্ট + অঙ্গ)—জানুদয়, পদদয়, করদয়, বক্ষ, শির, বুদ্ধি, বাক্য ও দৃষ্টি অথবা দুই জানু, দুই পা, দুই হাত, হৃদয় ও ললাট — এই আটটি অঙ্গ।

রৌদ্র দাশরথি — রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর লক্ষ্মণ।

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে — ধার্মিক নলরাজার প্রতি বিদ্রোহবশতঃ কলি তার শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে চেষ্টা করেও অনেকদিন কোনো সুযোগ পায়নি। নল একদিন ভুলে অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা করায় কলি তাঁকে আশ্রয় করে তাঁকে রাজচ্যুত এবং স্ত্রী দময়ন্তী থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অনুরূপে মেঘনাদের হলেও প্রতিদিন কোনো ভয় স্থান পায়নি। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর মনে ভয় হল। এ থেকেই মেঘনাদের বিনাশ সম্ভাবনা হল।

শত্রু করে যথা ইরম্মদনয় বজ্র — ইন্দ্রের হাতে বজ্রের শক্তিতে পূর্ণ যে বজ্র হাতে তারই মতো চোখ বালসানো বিদ্যুৎ দীপ্তিময় ভয়ঙ্কর তরোয়াল তুলে ধরল।

ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালি ইত্যাদি — লক্ষ্মণের এ হেন উক্তি তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে। পক্ষান্তরে মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ শাস্ত সংযত ও শিষ্ট আচরণ তাঁর চরিত্রমহিমাকে বাড়িয়েছে। ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’—বীরের কথা নয়। এই উক্তি লক্ষ্মণ চরিত্রকে করেছে, সেই সঙ্গে মেঘনাদকে উজ্জ্বল করেছে।

নিশীথে অন্ধরে মস্ত্রে জীমূতেন্দ্র কোপি — রাত্রির নিস্তম্ভতায় আকাশের মেঘের কুস্থ গর্জন যেমন গম্ভীর শোনায়। সেই রকম গম্ভীর কণ্ঠে।

স্থাপিলা বিশ্বুরে বিধি ..... ধূলায় ? — মহাদেবের ললাটের চাঁদের সঙ্গে তুলনার বিষয় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে — মেঘনাদের এটি বক্তব্য। ‘যান গড়াগড়ি’ শব্দযুগল বক্তব্যটিকে পাঠকের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মধুসূদন লোকায়ত শব্দকে এভাবে অনায়াসে প্রয়োগ করে, প্রথাসিন্ধ শব্দ বিন্যাসে স্বাভাবিকতা এনেছেন।

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! — বিভীষণের রাক্ষসরাজ-পক্ষ পরিত্যাগের মতো নিন্দনীয় কাজের জন্য গঞ্জনা করতে গিয়ে মেঘনাদের মনে পড়ে, হীনমতি রামের সংসর্গেই এরকমটি ঘটেছে। সংসর্গজনিত হীনতা ভর্ৎসনায় দূর হবে না। তাই বিভীষণকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা। নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে চরিত্রের অবনতি ঘটে। এই সাধারণ সত্যটির উল্লেখ করে, রামের সংসর্গেই বিভীষণের এমনটি ঘটেছে। মেঘনাদ বোঝাতে চেয়েছেন।

বামেতর নয়ন — বামভিন্ন অন্যতর নয়ন অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। লোকপ্রচলিত বিশ্বাস স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বা চোখ কাঁপা অমঞ্জালের সূচক।

মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী আচম্বিতে — সন্তান যে যত দূরেই বা যেখানেই থাকুক তার কোনো বিপদ ঘটলে, মা অন্তরে তার আভাস পান। যজ্ঞশালায় মেঘনাদের পতনে জননী মন্দোদরী অন্তঃপুরে নিজের ঘরে অকস্মাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

বাজিছে মঞ্জলবাদ্য ইত্যাদি — মেঘনাদবধ যে দেবতার ইচ্ছায় ঘটেছে এবং সেই কারণেই দিব্য বাদ্যধ্বনি দেবতাদের আনন্দ জ্ঞাপন করছে। একথা বলে, তিনি ধর্মপরায়ণ বিভীষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন।

কিন্মা যথা দ্রোণপুত্র ইত্যাদি — পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রোণবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য, পুত্র অশ্বথামা রাত্রে গোপনে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচটি ছেলেকে বধ করে যে আনন্দ ও ভয়ে দ্বৈপায়ন হৃদে আশ্রয় নিয়েছিলে, সেইভাবে।

আতঞ্জো কনকলঙ্কা জাগিল যে রবে — মেঘনাদকে বধ করে লক্ষ্মণ শিবিরে ফিরলে রামচন্দ্রের সৈন্যরা ‘জয় সীতাপতি জয়’ ঘোষণা করলে লঙ্কার অধিবাসীদের সেই ধ্বনি সন্ত্রস্ত করে তোলে।

এই সর্গটিতে কবি তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্যে মেঘনাদ চরিত্রটিকে সবিশেষ মহিমাঘিত করেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় কবি এখানে ততোধিক অনুদার—তাঁর মহিমা নানাভাবে খর্ব করেছেন। মেঘনাদ এখানে শৌর্যে-বীর্যে ও পৌরুষে যেমন উজ্জ্বল, লক্ষ্মণ তেমনি হীন, অমানুষ। দৈববলে বলীয়ান লক্ষ্মণের মেঘনাদ বধ এক অগৌরবের কাজ। সর্গের মূল ঘটনা রামায়ণ বহির্ভূত না হলেও কাহিনী গ্রন্থনা পূর্বাপর রামায়ণ অনুসারী নয়। লক্ষ্মণ চরিত্রের কাপুরুষতা দুর্বলতা রামায়ণ বিরোধী। সর্গ-বর্ণিত রামচন্দ্রের সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দর্শন ইলিয়াড কাব্যে হেক্টরের আকাশে ঈগল পাখির সঙ্গে সাপের যুদ্ধ দর্শনের প্রভাবে রচিত।

## অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬০ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত দেখুন। যেগুলি ভুল হবে, এককের উপরের অংশগুলি আরও ভালো করে পড়লেই সংশোধন করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) \_\_\_\_\_ সদৃশ

\_\_\_\_\_ বেডিল দেশ, পুড়িল চৌদিকে

\_\_\_\_\_ ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি

\_\_\_\_\_ ; বায়ুদেব গেল চলি দূরে।

খ) বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে

বীরবেশে \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ রণে।

বরষিলা \_\_\_\_\_ দেব ; বাজিল আকাশে

\_\_\_\_\_ ; শূণ্যে নাচিলা \_\_\_\_\_,

স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল পুরিল \_\_\_\_\_।

গ) মধুসূদনের জন্ম \_\_\_\_\_ শে \_\_\_\_\_ ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে \_\_\_\_\_।

ঘ) \_\_\_\_\_ পরাজিত হলেন। \_\_\_\_\_ পরায়ণা \_\_\_\_\_ শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন।

ঙ) মধুসূদন \_\_\_\_\_ সালে দুটি গ্রন্থসন \_\_\_\_\_ ও \_\_\_\_\_ এবং পূর্ণাঙ্গা নাটক \_\_\_\_\_ রচনা করেন।

২) সঠিক উত্তরে টিক (☑) চিহ্ন দিন।

ক) মধুসূদন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন —

১। ১৮৪৮

২। ১৮৪৩

৩। ১৮৫৬

খ) মধুসূদন ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্য রচনা কাল —

১। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ

২। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ

৩। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ

- গ) মধুসূদন লাতিন শেখেন —
- ১। মাদ্রাজে
  - ২। হিন্দু কলেজে
  - ৩। বিশপস কলেজে
- ঘ) মধুসূদনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ —
- ১। হেক্টর বধ
  - ২। মায়াকানন
  - ৩। বিষ না ধনুর্গুণ

৩) নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

মহোরগ, পিধানে, আর্দ্রিল, জীমূতাবৃত, বিভাবসু, বায়ুসখা, অবিচয়ি, কাকোদর, পরুষ, অনীকিনী, অবতংস, কার্মুক।

৪) নীচে কয়েকটি শব্দ ও অর্থ দুটি সারিতে বিন্যস্ত আছে। শব্দের সঠিক অর্থটি চিহ্নিত করুন।

বাদিএ	—	কার্ত্তিকেয়
কাদম্বিনী	—	বৃষ্টি
স্কন্দ	—	কুমীর
দিবিন্দ্র	—	মেঘরাজ
নক্রু	—	আকাশ
আনায়	—	মেঘমালা
আহবে	—	সংগ্রামে, যুদ্ধে
জীমূতেন্দ্র	—	জাল
আসার	—	ইন্দ্র
শব্দবাহক	—	বাজনা

৫) নীচের প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিক উত্তর দিন।

ক) ‘নাহি কাজ সীতায় উম্বারি’—কথাটি কে বলেছেন? কেন বলেছেন? বক্তা সম্পর্কে আপনার ধারণা সংক্ষেপে লিখুন।

খ) মূলপাঠ অবলম্বনে রাবণের পাঁচজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করুন।

গ) ‘সাস্ত্রাজ্ঞে প্রণমি শূর’—কে, কাকে সাস্ত্রাজ্ঞে প্রণা করেছেন এবং কেন করেছেন? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) ‘ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব’—বক্তা কে? বক্তা একথা কেন বলেছেন? বক্তা সম্পর্কে আপনার অভিমত লিপিবদ্ধ করুন।

ঙ) ‘আতঙ্কে কনক লঙ্কা জাগিল সে রবে’—কনকলঙ্কা আতঙ্কে জেগে উঠল কেন? বুঝিয়ে দিন।

## ৩৩.৭ মহাকাব্য : স্বরূপ ও বৈচিত্র্য

মধুসূদন দত্তের অন্যতম অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। ‘মেঘনাদবধ’ বাংলা সাহিত্যে প্রথম ও এ পর্যন্ত রচিত সফলতম কাব্যকৃতি। এই কাব্যের অনুসরণে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি মহাকাব্য লেখা হলেও মধুসূদনের মহাকাব্য অর্জনকারী কবিপ্রতিভাকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারেননি।

মধ্যযুগে রাজা বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষণায় সংস্কৃতি রচিত রামায়ণ মহাভারত কাব্যের অংশত বা সমগ্রত অনুবাদ হয়েছে। সেগুলি ছিল ভক্তিমূলক বা বীরত্বজ্ঞাপক কাহিনীর বঙ্গীয় সংস্করণ। বস্তুতঃ এগুলি সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শিল্প রূপ বা মৌলিক সৃষ্টি নয়। মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ সাহিত্যিক মহাকাব্যের (Literary epic) আদর্শে সৃষ্ট। এটি থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার প্রবর্তনা ঘটেছে।

মহাকাব্যই বোধ হয় সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। ইলিয়াড-ওডিসি, রামায়ণ-মহাভারত, বিউলক প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি জাতীয় জীবনের সহস্ররূপকে তুলে ধরেছে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘এপিক (Epic) গ্রিক ‘এপস’ (Epos) শব্দ থেকে এসেছে। এখানে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী থাকে, যে ভাষাতেই লেখা হোক, তা বিষয় ও ভাষায় মহত্বের ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। এ শ্রেণির রচনায় একটা বিশালতা, বিস্তৃতি, ঔদার্য ও সর্বজনীনতা থাকে। এই বিরাটত্ব ও বিস্তৃতি পাঠক হৃদয়ে এক মহিমাম্বিত ভাবের সঞ্চার করে। মহাকাব্যে কবির ব্যক্তিগত প্রকাশের পরিবর্তে ব্যাপকতর সমাজ, গোষ্ঠী, জাতির ঐতিহ্য ও চিন্তাভাবনা পরিচয় পাওয়া যায়।

‘পোয়েটিকস’ রচয়িতা অ্যারিস্টোটল ট্রাজেডির পাশাপাশি মহাকাব্যেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এখানেও কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত থাকে এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে নানা উপাখ্যান যুক্ত হতে পারে। এ শ্রেণির কাব্যের ছন্দ ও ভাষারীতি ওজোগুণ সম্পন্ন। এখানে উপমার ঐশ্বর্য কখনও কাহিনীর গতি অবরুদ্ধ করলেও আবেগের গভীরতা ও বিস্তৃতি ঘটায় কাব্যের উপস্থাপনায় বস্তু নিষ্ঠা যেমন তেমনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব ও কাব্যসম্মতভাবে থাকতে পারে। এপিক শ্রেণির রচনায় দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে সক্রিয় থাকে, এখানে নায়ক হন জাতীয় বীর। উদাহরণ হিসেবে মেঘনাদ বধ-এর পূর্বমূহূর্তে মেঘনাদ কর্তৃক লক্ষ্মণকে আক্রমণের বর্ণনায় এই পরিচয় পাওয়া যায়—

অধীন ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে  
শঙ্খ, ঘন্টা, উপহার পাত্র ছিল যত  
যজ্ঞগারে, একে একে নিষ্ক্ষেপিতা কোপে ;  
যথা অভিমন্যু রক্ষী, নিরস্ত্র সমরে,  
সপ্তরথি অস্ত্রবসে, কভু বা হানিলা  
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি  
ছিল চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে।  
সরোষে রাবণি  
ধাইলা লক্ষণ পানে গর্জি ভীম নাদে,  
প্রহারয়ে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী।



আলংকারিক বিশ্বনাথ ‘সাহিত্যদর্পণে’ মহাকাব্যের কতকগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন, যেমন এতে অষ্টাধিক সর্গ থাকবে। প্রতিটি সর্গে যে কথা প্রাধান্য পাবে সেই কথা বা তাৎপর্য অনুসারে এটির নামককরণ হবে। বিভিন্ন সর্গ একই ছন্দে লেখা হবে। এ ছাড়া মহাকাব্যের নায়ক যিনি হবেন তিনি কোনো দেবতা বা সদংশজাত ধীরোদাতা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। রচনা অলঙ্কার এবং রসভাব-সম্বলিত হবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের যে কোনো একটি মহাকাব্যের অঙ্গী বা প্রধান রস হবে অন্য রসগুলি মূল রসকে পুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন আলংকারিকেরা। আলোচনায় সেগুলি বাহুল্য বিচারে উল্লেখ করা হল না।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশে যে লোকগাথা কিংবদন্তি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী নানাভাবে ও ভাষায় লোকজীবনে বহুল প্রচলিত ছিল, সেগুলি থেকে উপাদান নিয়ে জাতীয় জীবনের একটি সংহত রূপ নিয়ে মহাকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত এভাবেই গড়ে উঠেছে। এগুলিকে তাই স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য (Epic of growth বা authentic epic) বলে। পরবর্তী যুগের সাহিত্যিক মহাকাব্য (literary epic) সঙ্গে এই শ্রেণির কাব্যের সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তটির কবিকল্পনায় আদিম মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের কবি কল্পনায় সরলতা ও প্রত্যক্ষতার পরিচয় থাকে। বিষয়বস্তু ও চরিত্র-পরিকল্পনায় গৌরব মহিমা (sublimity) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই এর কাহিনীর কেন্দ্রে থাকে কোনো বীরত্ব উদ্দীপণাপূর্ণ যুদ্ধ এবং একজন বীরনায়ক এই কাহিনীর মেবুদগুরুপে অবস্থান করেন। এর গঠনরীতি স্থাপত্যধর্মী হলেও ট্রাজেডির তুলনায় অসংহত, কিছুটা শিথিল। ঋজুতাহ এর কল্পনার বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্যিক মহাকাব্য সচেতন শিল্পীর রচনা—এখানে তাঁর তীক্ষ্ণ ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টির প্রভাব অনুভব করা যায়। এখানেও নায়ক বীর, চরিত্রমহিমায় অনন্য। সে যুগের মানব মহিমার চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল বিজয়ীর সম্মান ও জয়মাল্যে। ধর্ম, চরিত্র নীতি ও সমাজনীতির কাছে তার শৌর্যবীর্যের মান্যতা ছিল। তাই সাহিত্যিক মহাকাব্য কেবলমাত্র বীরকাব্য নয়—কিছু পরিমাণে জাতীয় কাব্য। ভার্জিন, মিল্টনের মতো মধুসূদনের কাব্যে মেঘনাদ ও রাবণের প্রতিরোধ-শক্তি এবং দেশরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের বলিষ্ঠ প্রকাশ যুগধর্মকেই প্রকাশ করেছে। মধুসূদন রামায়ণ কাহিনীর যে নির্বাচিত অংশকে কাব্যরূপ দিয়েছেন তাতে নবজাগ্রত মানবিকবোধ ও আত্মগরিমার যোগ আছে। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক সাধারণ বীর নয়, জাতীয় বীর। তাঁর বীরত্ব কেবল দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি-সম্মান আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বৃহত্তর জাতীয় মঞ্জলাদর্শে ব্যয়িত হয়েছে। সাহিত্যিক মহাকাব্যের কবি, যেহেতু তাঁর যুগ পরিবেশের সৃষ্টি, যুগের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাই তাঁর মহাকাব্যও সমসাময়িক যুগের সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রসঙ্গত দেশি বিদেশি সাহিত্যিক মহাকাব্য কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ; ভার্জিনের ‘ইনিড’, তাসসোর ‘জেরজালেমের উম্পার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ব্যঙ্গ মহাকাব্য (Mock epic, mock heroic epic) শব্দটির সঙ্গে মহাকাব্য শব্দ যুক্ত থাকলেও এটি বস্তুত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যের বিদ্রুপাত্মক অনুকরণ। অতিশয় তুচ্ছ বিষয় বস্তু নিয়ে এ ধরনের কাব্যে ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায় গাভীর্যের ছদ্মবেশ থাকে। আলেকজান্ডার পোপের ‘দি রেপ অফ দি লক’ এক সময় হোমারের নামে চালিত একটি ছদ্ম মহাকাব্যের অনুসরণে রঞ্জালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভেক-মুখিক যুদ্ধ’, জগদ্বন্ধু ভদ্রের ‘ছুন্দরীবধ কাব্য’ এই পর্যায়ভুক্ত। সাহিত্য হিসেবে এগুলির কোনো স্থায়ী মূল্য না থাকলেও সমকালীন পটভূমিকায় এর কিছু জনপ্রিয়তা থাকে।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্তসংহার (১৮৭৫) মহাকাব্য প্রকাশ করেন। মধুসূদনের বীরভাবপ্রধান কাব্যের মধ্যে অন্তর্গত করুণ রসের অন্তঃসলিল প্রবাহে কাব্যের বিষয়বস্তুকে হৃদয়বেদ্য করেছেন। ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গে বীর রসপ্রধান যুগ্মযোজনের প্রেক্ষাপটে এই রসসৃষ্টি কাব্যশিল্পের প্রয়োজনে এসেছে। হেমচন্দ্র কাব্যের ঘটনাসংঘটনের নীরসতা দূর করবার জন্য আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে রোমাঞ্চিক সুরের অবতারণা করেছেন। ফলে লৌকিক প্রেমকাব্যের মূল গতি মহাকাব্যের প্রবাহের সঙ্গে অম্লিত হয়নি।

অপরদিকে মধুসূদনের কবিচিন্তের সহানুভূতিতে রাবণ-মেঘনাদ, লঙ্কা ও রাক্ষসকুল অভাবনীয় মহিমায় মহিমাম্বিত হয়েছে। কিন্তু ‘বৃত্তসংহার’ কাব্যে কবির সহানুভূতি কোন্ দিকে তা সহজে বোঝা যায় না। কাব্যে বৃত্ত ও অসুরকুল, ইন্দ্র ও দেবকুল প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বৃত্ত নিধন এ কাব্যের প্রধান বিষয়, কাব্যের সমাপ্তি তার পতনে—পতন চিত্রই কবির বর্ণনীয় বিষয়। বৃত্তের পতনে কাব্যে কোন ট্রাজিক রস সৃষ্টি হয়নি ; তার পতনে পাঠকের ভাললোকে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এদিক থেকে বৃত্তসংহারের তুলনায় সার্থকতর সৃষ্টি। মেঘনাদবধে রাবণের শোকক্লিষ্ট বিদীর্ণ হৃদয়, মন্দোদরীর শোকব্যাকুল চিত্ত ও সর্বোপরি লঙ্কার হাহাকার ট্রাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী মহাকাব্য রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)-এ শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। রৈবতকে সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্রে জটিলতা ও বিস্তার প্রভাসে পরিণতি। কবি নীরস বর্ণনায় কাহিনী বিবৃত করেছেন। স্থানে স্থানে কাহিনী সূত্র ধরে রাখবার জন্য ‘তত্ত্ব’ নিয়ে এসেছেন, কখনও বা লঘু রোমাঞ্চিক আখ্যানসূত্র। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায়শই প্রবন্ধের উপযোগী হয়েছে। একারণে তাঁর কৃষ্ণ চরিত্র পরিকল্পনায় কৃষ্ণের আদর্শ মতবাদকে চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, কৃষ্ণ চরিত্রকে গৌণ করে কাব্যে কৃষ্ণের আদর্শ প্রাধান্য ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবি তখনই সফল যখন তিনি কোন আদর্শকে চরিত্রের জীবনে ও ব্যক্তিত্বে সত্য করে ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের মিলন ঘটান। মধুসূদন পেয়েছেন তাই সফল। নবীনচন্দ্র তা পারেননি।

### ৩৩.৮ মেঘনাদবধ কাব্য : কাহিনী বিন্যাস (ষষ্ঠ সর্গ)

‘মেঘনাদবধ কাব্য’র আখ্যানভাগ রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণপুত্র মেঘনাদ নিধন এর বর্ণনীয় বিষয়। ষষ্ঠ সর্গের বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্তসনা, রামায়ণ থেকে নেওয়া মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপ বাঙালির রামায়ণী সংস্কারের প্রভাবজাত। রাম এখানে অনেকটা আবেগপ্রবণ বাঙালি। চণ্ডীর বর ও দৈবাস্ত্র লাভ করে লক্ষ্মণ মেঘনাদ বধার্থে লঙ্কায় যাওয়ার প্রস্তাব করলে লক্ষ্মণের অমঙ্গল আশঙ্কায় রামচন্দ্র যখন বলেন “নাহি কাজ,—সীতায় উদ্ভারি। ফিরি যাই বনবাসে”—তখন তাঁকে কৃতিবাসের প্রভাবে দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ রূপেই দেখি। সম্ভবত এ জন্যই মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে রাবণ-ইন্দ্রিজিকে ভিন্নতর ধাতুতে গড়েছেন। শৈশব স্মৃতির রামায়ণ-মহাভারত তাকে টানত, ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনী তাঁর কল্পনাকে উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়ণের মহৎ ও স্পষ্টতার সঙ্গে ইলিয়াডের দীপ্ত শৌর্যের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন। মেঘনাদবধের কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদের মৃত্যু। এটি কাব্যকাহিনীর শীর্ষ। প্রথম দুটি সর্গে কাব্যের চরিত্রগুলির বহুমুখী বিকাশ ও দেবতাদের ষড়যন্ত্র, আর এই সর্গ কাব্যের চরম মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনী বিশ্লেষণে তাই, প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া দরকার। কাব্যের শেষ তিনটি সর্গ ক্রমাবগতির মধ্য দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনাকালে তিনদিন দুই রাত্রিতে সীমাবদ্ধ। একে কবি নয়টি সর্গে বিভক্ত করে উপস্থিত করেছেন। প্রথম সর্গের সূচনা দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণের খেদ ও যুদ্ধের উদ্যোগ ঘোষণা এবং সংবাদ পেয়ে প্রমোদকানন থেকে মেঘনাদ রাজসভায় এসে স্বয়ং যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা, অনেক আশঙ্কা এবং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেকে প্রথম সর্গের সমাপ্তি। দ্বিতীয় সর্গে দেব কাহিনী—মুখ্যত মেঘনাদের হত্যার ষড়যন্ত্রের পশ্চাত্তপট। মূল ঘটনার সঙ্গে এর যোগ ঘনিষ্ঠ। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ। শুধু বীরের মৃত্যুতে হাহাকার তীব্রতা পায় না। পাঠকের চিত্তে সহানুভূতি জাগাতে পারে না। এখানে মেঘনাদ শুধু বীর নন, পিতামাতার স্নেহে, স্ত্রীর প্রেমে সম্পূর্ণ মানুষ। প্রমীলাল স্নিগ্ধ প্রেম ও তার বীরাঙ্গনা রূপ তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে। সমাগম নামে এই সর্গ এখানে তাই প্রাসঙ্গিক। চতুর্থ সর্গে সীতা-সরমা চরিত্রের উপস্থাপনা করে পরোক্ষভাবে রাবণ প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পঞ্চমসর্গ সবিশেষ ঘটনাবহুল। মেঘনাদ বধ-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চিত্তাঙ্কিত দেবরাজ, মায়াদেবীর উপস্থিতি, রক্ষকুলচূড়ামণিকে চূর্ণ করবার সংকল্প জ্ঞাপন, রাম লক্ষ্মণকে রক্ষার পরিকল্পনা, লক্ষ্মণের স্বপ্নদর্শন, চণ্ডীপূজার উদ্যোগ, শিবের বাধা দান, লক্ষ্মণের সাহসিকতা, মায়া সুন্দরীদের ছলনা, লক্ষ্মণের সিংহবাহিনী পূজা, রাক্ষসবধের বর প্রার্থনা, দৈবাস্ত্র লাভ, কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, জননী মন্দোদরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা, যুদ্ধে পাঠাতে মায়ের আশঙ্কা, মেঘনাদের আশ্বাস, মেঘনাদের যজ্ঞশালা অভিমুখে যাত্রা, প্রমীলার পারবর্তী কৃপা প্রার্থনা ও বায়ু বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইল তাহায়।

মেঘনাদবধের অন্যান্য সর্গের মতো পঞ্চম সর্গের অধিকাংশ ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কেবলমাত্র লক্ষ্মণ কর্তৃক চণ্ডীপূজা ও বরলাভ কুন্তিবাস অনুসারী। বাকী অংশ পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে কল্পিত হলেও পাঠকের কাছে দেবতাদের ষড়যন্ত্র কতটা গভীর তা বোঝা যায়। তথাপি আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি কবি অসামান্য নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন স্বীকার করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাবর্ত ও কাব্যকাহিনী চরম মুহূর্তটিকে দেখতে হবে। প্রথম ও তৃতীয় সর্গে পিতা-পত্নী স্নেহ ও প্রেমের মাধ্যমে মেঘনাদ চরিত্র যেমন সহনীয় হয়ে উঠেছে তেমনি দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গে দেব-মানবের যৌথ চেষ্টা ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তুলেছে। স্বর্গে-মর্ত্যে এবং (পরে) পাতালে বা নরকে কাহিনীর বিস্তার তাকে এক ধরনের মহত্ত্ব দিয়েছে। চতুর্থ সর্গের সীতাহরণ প্রসঙ্গ মেঘনাদের মৃত্যু ও লঙ্কার ধ্বংসকে বাস্তবায়িত করার যুক্তি তৈরি করেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবৃত্ত ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মধুসূদন সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত যা বলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার—কেবল ঘটনা নয় রচনার দিক থেকেও এ সর্গের সৌন্দর্য অতুলনীয়। এ সর্গের বর্ণনাভঙ্গির বড়ো বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষ্মণ বিভীষণের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণের স্বার্থও প্রয়োজনবোধের বর্ণে চিত্রিত। তাদের ভীতি সংশয় আত্মবিশ্বাস ও দৈববিশ্বাসের সুরাই মুখ্য। কিন্তু বিভীষণ-লক্ষ্মণের লঙ্কা প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত থেকেই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হয়। নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এ কাব্য লক্ষ্মণ বিভীষণকে বর্জন করে মেঘনাদের দৃষ্টিকে আশ্রয় করেছে। লক্ষ্মণ এখানে যে রূপে চিত্রিত হয়েছে, তা কবির দৃষ্টি-নিরপেক্ষ নয়। এ পরিবেশে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের দৃষ্টিতে ঘণা, অবজ্ঞা, ক্রোধ-ধিকার উৎসারিত হয়েছে।

ষষ্ঠ সর্গের সূচনায় লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎ নিধনের যাত্রার কথায় রামচন্দ্রের ভীতি বিহুল রূপ ফুটে উঠেছে। রাম সভয়ে বলেছেন, “নাহি কাজ মিত্রবর, সীতায় উৎসারি। ফিরি যাই বনবাসে। দুর্বীর সমরে, দেব-দৈত্য-নরত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি।” ইন্দ্রজিৎের সেই বীর্যবন্তা অবশ্যস্বভাবী মৃত্যুতে সমাহিত হবে। মেঘনাদের বীরত্বের বহু উল্লেখ কাব্যে থাকলেও তাঁর বীর্যবন্তার কোনো পরিচয় প্রত্যক্ষত কাব্যে তুলে ধরা হয়নি। সে যুদ্ধের অবকাশ পায়নি। তাই তার এই অপঘাত মৃত্যুকে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত ট্রাজেডি বলা যায়। ষষ্ঠ সর্গ এভাবে একটি ট্রাজিক বেদনায় সমাপ্ত হয়েছে।

## অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক) মধ্যযুগে \_\_\_\_\_ পৃষ্ঠপোষণায় রচিত \_\_\_\_\_ কাব্যের অংশত বা সমগ্রত হয়েছে।
- খ) মহাকাব্যের উপস্থাপনায় \_\_\_\_\_ যেমন তেমনি \_\_\_\_\_ জন্য কিছু \_\_\_\_\_ ভাবে থাকতে পারে।
- গ) সাহিত্যিক মহাকাব্য \_\_\_\_\_ রচনা, এখানে তাঁর \_\_\_\_\_ ও \_\_\_\_\_ দৃষ্টির \_\_\_\_\_ অনুভব করা যায়।
- ঘ) শৈশব স্মৃতির \_\_\_\_\_ তাঁকে (মধুসূদন) টানত, \_\_\_\_\_ কাহিনী তাঁর \_\_\_\_\_ উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়ণের মহৎ ও \_\_\_\_\_ সঙ্গে \_\_\_\_\_ দীপ্ত \_\_\_\_\_ সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন।

২) ক) 'স্বতঃস্ফূর্ত', 'সাহিত্যিক' ও 'ব্যঙ্গ' মহাকাব্যের দুটি করে উদাহরণ দিন।

খ) 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যগুলির নাম উল্লেখ করুন।

গ) নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যের শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। পর্ব তিনটি কী?

৩) সঠিক উত্তরের টিক (✓) চিহ্ন দিন :

- ক) মেঘনাদবধ কাব্য—
- ১। বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ  
২। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনুসরণে রচনা  
৩। বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।
- খ) বৃত্রসংহার কাব্যের রচনা কাল—
- ১। ১৮৬৫  
২। ১৮৬১  
৩। ১৮৭৫
- গ) 'দি রেপ অব দি লক' রচনা করেন—
- ১। পোপ  
২। হোমার  
৩। ভার্জিল
- ঘ) 'ভেক মূষিক যুদ্ধ'র রচয়িতা—
- ১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

- ৪) অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেগুলি উল্লেখ করুন।
- ৫) আলংকারিক বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের কতগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন। লক্ষণগুলি আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।
- ৬) ‘স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের’ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ রচনা করুন।
- ৭) সাহিত্যিক মহাকাব্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

### ৩৩.৯ মেঘনাদবধ কাব্য : দেশি-বিদেশি প্রভাব, রসবিচার, ট্র্যাজেডি ও নিয়তিবাদ

মধুসূদন তাঁর মহাকাব্য রচনার কাহিনী বাস্তুবাস থেকেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য উপাদান সমন্বয়ে নূতন যুগের নূতন সৃষ্টি রূপে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ। তাঁর রাম-লক্ষ্মণ, তাঁর মেঘনাদ-বিভীষণ, মায়া-লক্ষ্মীদেবী চরিত্র ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও যুগের অভিনব কল্পনার রঙে রঞ্জিত। ষষ্ঠ সর্গের বিষয় রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ-নিধন। এই মূল ঘটনা উপস্থাপন করতে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, সেখানে হোমারের ইলিয়াড, দাণ্ডের ডিভাইন কমেডি, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, বাস্তুবাস-কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে।

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-নিধন তেমন তাৎপর্যমণ্ডিত না হলেও মেঘনাদ বধ কাব্যে এর গুরুত্ব সমধিক। কবি এটিকে কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে বিন্যস্ত করে ষষ্ঠ সর্গে ঘটনা প্রবাহের সন্ধিক্ষণ বা (climax) তৈরি করেছেন। বিভীষণ প্রদর্শিত পথে নিকুন্তিলা যজ্ঞগারে মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে লক্ষ্মণ প্রবেশ করে উষাকালে মেঘনাদকে নিহত করেছে। বাস্তুবাস বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে অন্যভাবে। সেখানে নিকুন্তিলা কোনো যজ্ঞগার নয়, নীল মেঘের মতো বটবৃক্ষতল, কৃত্তিবাস বলেছেন ‘বটবৃক্ষতলা’—সেখানে লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রাস্ত্রে মেঘনাদের মৃত্যু এবং সময়টিও ‘সূর্যাস্ত কাল’। রামায়ণে ইন্দ্রজিৎের রাক্ষসীয় মায়া অবলম্বনের কথা থাকলেও, মেঘনাদবধ কাব্যে তার উল্লেখ নেই। এভাবে ষষ্ঠ সর্গেও ভারতীয় উপাদানের কিছু পরিবর্তন ঘটালেও এখানে মেঘনাদ বিভীষণ সংলাপে বাস্তুবাসিকে প্রায় সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

বাস্তুবাসী রামায়ণের লক্ষ্মণ মেঘনাদবধে অনেকটা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামকে সে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। সুমিত্রার নির্দেশ মতো রামকে পিতা সীতাকে জননী জ্ঞানে সেবা করেছে। রামের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আত্মবিলোপ ঘটিয়েছে। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণ রামের বিলাপে তাকে ভৎসনা করেছে। লক্ষ্মণ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে মধুসূদন কাজে লাগিয়েছেন। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ নৈতিক শক্তির বলে মায়াকাননের নানা প্রলোভন অনায়াসে অতিক্রম করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো ছলনাময়ী বামাদলকে মাতৃ সম্বোধনে নিবৃত্ত করেছে। নুপুর অলংকৃত চরণের উর্ধ্বে সে কখনও তাকায়নি। কিন্তু এ হেন লক্ষ্মণ চরিত্র ষষ্ঠ সর্গে তাঁর উপরিউক্ত চরিত্রমহিমা বজায় রাখেনি। দেববলে বলীয়ান হয়ে সে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। বীরধর্ম লঙ্ঘন করে ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’র মতো হীন উক্তি করেছে। বীরচরিত্রের আদর্শ বিরোধী এই আচরণ বোধ করি। রাবণ-মেঘনাদের বীর্যের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহের কারণে মধুসূদন লক্ষ্মণকে তাঁর স্বভাব বিপরীত চরিত্ররূপে

অঙ্কিত করেছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতারা মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন। তাদের চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ নেই, পৃথক কোনো দেবীমহিমাও নেই। মানুষের মতো তাঁদের কামনা-বাসনা-লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি আছে। মানুষেরই মতো তাদের গতিবিধি ইচ্ছামতো কার্যসিদ্ধি—এ সবই ভারতীয় পুরাণানুসারী। এই দেবতারা প্রবঞ্চনা ছলনা করতে পরাঙ্ঘু নয়। তাই রাবণের একান্ত ভক্তি সত্ত্বেও রক্ষকুলের রাজলক্ষী বিশ্বাসঘাতকতা করে, ইন্দ্রজিতের কাছে পরাস্ত ইন্দ্র-ইন্দ্রজিদেতর সর্বনাশের উদ্যোগ নেয়। পার্বতী মোহিনী বেশে যোগী শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে। বলা হয় যে, রাবণ পাপী তাই দেবতারা তাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু রাবণও মানুষ—সে পিতা, স্বামী, সে বীর। তাঁর হৃদয় মমত্বময়, বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপ করে, মেঘনাদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়। রাজা তাই শোক জয় করে রাজকর্তব্য পালনে কৃতসংকল্প হয়—এ সব মিলিয়ে মানবপ্রকৃতির পূর্ণ বিগ্রহ। মেঘনাদবধের দেবতারা এর কাছে হীন, তুচ্ছ। এভাবে চরিত্র-পরিকল্পনার পেছনে বাংলা মঞ্জল দেবতার এবং পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রভাব থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

মেঘনাদবধের দেবতাদের আচরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রিক ও লাতিন কাব্যের আদর্শে গড়া বলে মনে হয়। ইলিয়াডে যেমন দেবদেবীরা ছদ্মবেশে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছে, মেঘনাদেও তার অনুসরণ দেখা যায়। মেঘনাদের শিবপার্বতী যেন গ্রিক দেবতা জিউস-হেরা। গ্রিক-সাহিত্যের নিয়তি মেঘনাদবধকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। এতৎসত্ত্বেও বলা হয় মধুসূদনের দেবদেবী চরিত্র-চিত্রণে পাশ্চাত্য প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তথাপি তাদের অচেনা বলে মনে হয় না। দেশীয় পুরাণে ও মঞ্জলকাব্যে এই ধরনের দেবদেবীর ভূমিকা আছে।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শ অনুসারে মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার করতে গেলে দেখা যাবে মধুসূদন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রসম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের অনুকরণে কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু গতিশীলতা। ফলত দুই আদর্শের মিলনে তাঁর কাব্য বিচিত্র রূপ ও রসে সঞ্জীবিত হয়েছে। মেঘনাদবধে বীররসের সঙ্গে করুণ রসের সন্মিলন ঘটেছে। বীররস এর স্থায়ী রস হলেও সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে করুণরসের অন্তঃসলিলা ধারা নিয়ত প্রহমান। প্রথম সর্গেই সে পরিচয় আছে। দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে পিতার রাবণ হাহাকার করেছেন, তারপরই রাজা রাবণ—“সুস্থ হইল মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে কহিলা ; “সাবাসি দূত। তোর কথা শুনি/কোন বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে/সংগ্রামে ?” দীর্ঘ কান্নার পর আবেগকম্পিত হাহাকারই স্বাভাবিক কিন্তু সাবাসি দূত প্রভৃতি কথার কথার মধ্যে দিয়ে বীরত্বের যে উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, তা বিস্ময়কর। রসবিচারে একে বীররস বলতেই হয়। সুতরাং বেদনার হাহাকার আর বীরত্বে উল্লাস—করুণ আর বীরের দ্বৈতসত্তা কাব্যটির প্রথম সর্গে ধ্বনিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বীর আর করুণের প্রতি কবির আকর্ষণ প্রবল। অন্যভাবে বলা যায়, বীরের আশ্রয়ে করুণ রস সৃষ্টি করে মধুসূদন কাব্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির এক অভিনব ও সলার্ক পরীক্ষা করেছেন।

মেঘনাদবধ ধ্বংসোন্মুখ লঙ্কার চিত্র বিশেষ—রাবণ কেমন করে তিলে তিলে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে, কেমন করে নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে দুর্বল করেছে, লঙ্কার ঐশ্বর্য গর্ব ধূলিসাৎ হচ্ছে সেটি বীরবাহুর মৃত্যুতে যার শুরুর মেঘনাদের মৃত্যুতে তার শেষ। অর্থাৎ বিষাদে করুণে শুরু আর বিষাদে করুণেই শেষ। তাই বীররসের অন্তরালে নিগূঢ় করুণ রস প্রবাহিত হওয়ায় রস দুটি পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে। এক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির মহিমা উপলব্ধি সম্ভব নয়। বস্তুত মধুসূদন বারী-কাব্যই লিখেছেন। কিন্তু বীররসের অপর দিকেই আছে বেদনা। যুদ্ধে বীরত্ব এক পক্ষের মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলে, মৃত্যুতে বীরত্ব আরও মহিমা পায়। সুতরাং করুণরস সম্পূর্ণ বর্জন করে যে বীররস, তার মহিমা তত উন্নত নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের ট্রাজিক রস পরিণতি সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু ট্রাজিডি রসসৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি

কী বা কে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং এক্ষেত্রে ষষ্ঠ সর্গের ভূমিকা আলোচিত হতে পারে। এ বিচারের সূচনায় ট্রাজেডি সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা দরকার।

গ্রিক ও ইউরোপের অন্যান্য ট্রাজেডির উদ্ভব, বিকাশ তার স্বরূপ ও রূপান্তর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। আমরা শুধু সংক্ষেপে বলতে পারি করুন কোনো কাহিনী, ঘটনার বর্ণনা ও তার রস পরিণতিই হোল ট্রাজেডি। তাই ট্রাজেডি করুণরসের আশ্রয়। মহৎ ও রাজকীয় কোনো ব্যক্তির শোকাবহ জীবনবৃত্ত বর্ণনা থেকে কালক্রমে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-বিপর্যয় ট্রাজেডির বিষয় হয়েছে। মৃত্যুতেই ট্রাজেডি এ ধারণাও অপরিহার্য নয়। গ্রিক ইউরিপিদেশের রচিত মিলনান্ত ট্রাজেডিও আছে। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় যখন নায়ক বা নায়িকার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিয়তির সঙ্গে অসম যুদ্ধে সে যখন বিধ্বস্ত, তার সেই বীরত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক আর্তির মধ্য দিয়ে পাঠক চিন্তে যে রসপরিণতি ঘটে তাকে ট্রাজেডি বলা যায়। অর্থাৎ প্রাণঘাতী পরিণতি নয়, মানবাত্মার মহিমাপূর্ণ অথচ নিরুপায় শোচনা ব্যক্তিহৃদয়ের দীর্ঘ হাহাকারও ট্রাজেডি সৃষ্টি করতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান বিষয় মেঘনাদের মৃত্যু—ষষ্ঠ সর্গে তাঁর নিধন। একটি বীরের মহৎপ্রাণের বিনষ্টি। কাব্যটি এখানেই শেষ হয়নি। কারণ ট্রাজেডি যার মৃত্যু হয় তার নয়, যে বেঁচে থাকে তার। পরবর্তী তিনটি সর্গে এই ঘটনারই পরিণতি প্রলম্বিত হয়েছে। সপ্তম সর্গে মেঘনাদবধ-এর পর রাবণ মন্দোদরীর ও সমগ্র লঙ্কার হাহাকারের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ নিধনোত্তর ভাবমণ্ডল নতুন মাত্রা পেয়েছে এই শোকের হাহাকারেই প্রমীলার চিতারোহন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের সর্বহারা চিন্তের যে সীমাহীন বেদনা, সমস্ত বিশ্বময় যে অনন্ত শূণ্যতাবোধের সঞ্চার করেছে, সেখানেই এ কাব্যের ট্রাজেডির রসপরিণতি ঘটেছে। তাই মেঘনাদবধ এখানে কেন্দ্রীয় ঘটনা হলেও, কেন্দ্রীয় ভাব রাবণের হৃদয়ে আতনাদ লঙ্কার আসন্ন সর্বনাশ তথা সর্বাঙ্গিক ধ্বংসের আশঙ্কাজনিত বেদনা বোধ সঞ্চারিত হয়েছে। তাই মেঘনাদের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই রাবণের জীবনের ট্রাজেডির সূচনা। মেঘনাদের মৃত্যু গভীর বেদনাবোধ থেকে করুণরস বা Pathos সৃষ্টি করে। একে একে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর রাবণের একান্ত নির্ভর বীরপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু ট্রাজেডির রস পরিণতি এনে দিয়েছে।

যেকোনো ট্রাজেডির মতোই নিয়তিবাদ—এ কাব্যের একটি উপাদান মনে করা হয়। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের আক্ষেপ, বিধি, এ-ভব যার লীলাস্থলী তিনিই যাঁকে, ‘বজ্র আঘাতে’ যে কাতর তার বেদনা, অথবা চিত্রাঙ্গাদার অনুযোগের উত্তরে—‘বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে’, ‘গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ? বিধিবশে দেবি, সহি এ যাতনা।’ উত্তরে চিত্রাঙ্গাদা ‘নিজ কর্মফলে মজালের লাক্ষসকুলে, মজিলা আপিন’, রাজলক্ষীর উক্তি ‘প্রাস্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এপুরে।’ ষষ্ঠ সর্গেও লক্ষ্মীদেবী অনুরূপ উক্তি করেছেন, ‘প্রাস্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ? কৃতকর্মের ব্যাখ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভীষণের উক্তি, ‘নিজ-কর্ম-দোষে, হয় মজাইলা এ কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।’

গ্রীকপুরাণে নেমেসিস বা নিয়তি প্রতিহিংসার দেবী। আধুনিক সাহিত্যে দৈব, পরিবেশ, পরিস্থিতির প্রতিকূল মানবসত্তার অসহায় অবস্থাকে বোঝানো হয়। গ্রিক ধারণায় নিয়তি অপরিরোধ্য। যে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানুষ নিয়ত সংগ্রাম করেও পরিণতিতে জয়ী হতে পারে না তাই নিয়তি। এ যেন মানুষের নিয়ন্ত্রণাতীত এক বিশ্ববিধান যেখানে মানুষ সাধারণ ক্রীড়কমাত্র।

মধুসূদনের রাবণের মতে তিনি নিয়তির দ্বারা আক্রান্ত। দুর্লভ নিয়তি তাঁকে এই কঠোর দশ দিচ্ছে। যদিও

চিত্রাজাদা, রাজলক্ষী এ মত পোষণ করেন না। তাঁরা রাবণের কৃতকর্মকেও দায়ী করেন। মেঘনাদ বধ-এর ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কায় প্রবেশ করার পর বিভীষণের চিত্ত দৌর্বল্য দেখা দিলে লক্ষণ বলেছে, ‘চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে। এক যায় আর আসে জগতের রীতি’—এ উক্তির মধ্য দিয়ে যা ঘটতে যাচ্ছে তা যে বিধির বিধান এটি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। আবার তিনি মেঘনাদকে বলেছেন, দৈবাদেশে রণে আমি আহুনি তোরে। লক্ষণ কর্তৃক মেঘনাদবধের পর বিভীষণের শোকে সান্ত্বনা দিতে ‘বিধির বিধানে বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে তোমার’—প্রভৃতি সমস্ত কাজই যে বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত তাই বোঝাতে চেয়েছেন। মধুসূদন মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে কোনো ফাঁক রাখেননি। তাঁকে আদর্শ নায়ক করে গড়েছেন। সর্বোপরি মেঘনাদের মতো মহৎপ্রাণ, পিতৃভক্ত, পত্নীপ্রেমী, দেশপ্রেমিক বীরের স্বীয় যজ্ঞগারে এই নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অন্যায়াভাবে নিহত হওয়াকেও অশ্ব নিয়তির নির্মমতা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। নিয়তি সৃষ্ট হয়েছে রাবণের ‘পাপে’ এবং তার প্রতিবিধানের জন্য রামের যুদ্ধযাত্রা ও দেবতাদের ষড়যন্ত্রে।

### ৩৩.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

ষষ্ঠ সর্গে রাম-রক্ষণ, মেঘনাদ-বিভীষণ, লক্ষ্মী-মায়ী প্রভৃতি চরিত্র কাব্য-বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই সাদৃশ্যমূলক। মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলার স্বীয় বংশগৌরব বীরত্বমহিমা প্রকাশ করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষ রামচন্দ্রের প্রতি অনুচিত অবজ্ঞা “ভিখারী রাঘব” উক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মধুসূদনও একটি চিঠিতে বলেছেন ‘I hate Ram and his rabble.’। সমগ্র রামায়ণের যিনি নায়ক তাঁর চরিত্র কবি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আঁকতে পারেননি। মধুসূদনের রামচন্দ্র বাস্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র নয়। বাস্মীকির রাম ধীর, স্থির, বীর, নির্ভীক বীর্যশালী পুরুষ। কৃত্তিবাসেও সে বীর, কিন্তু বাঙালির চরিত্র মহিমায় কিছুটা কোমল। এদিক থেকে মধুসূদনের সৃষ্টি দ্বন্দ্বসঙ্কুল এবং অনেকটা বিপীতধর্মী। নবম সর্গে ‘পুত্রের সংক্রিয়া’ সমাধার জন্য রাবণ মন্ত্রী সারণকে রামচন্দ্র সকাশে পাঠিয়েছেন সাতদিন সময় চেয়ে। রাবণ সে সময় প্রসঙ্গাত ‘নরকুলোত্তম’ রঘুকুলমণি যে বিদ্যাবৃষ্টি বাহুবলে অতুল জগতে প্রভৃতি সম্ভ্রমাত্মক বিশেষণ প্রয়োগ করে সাতদিন সময় চেয়ে নেয়। রাবণ আরও বলে, কী কুক্ষণে রক্ষদলপতির সঙ্গে নরদলপতির রিপুভাবে দেখা হয়েছিল। এর উত্তরে রামচন্দ্রও ক্ষমাশীল বীরের ঔদার্য নিয়ে বলেছেন, তাঁর দুঃখে পরম দুঃখিত আমি রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে হৃদয়, বিপদে অপর পর সম মম কাছে’ এ রামচন্দ্র মহৎ, ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, যথার্থ বীর। কিন্তু তৃতীয় ও ষষ্ঠ সর্গে এই চরিত্রই সীমাহীন দুর্বলতার আকড়। তৃতীয় সর্গেও প্রমীলার দূতী রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে লঙ্কায় যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে রামচন্দ্র বলেছেন, ‘আর মম রক্ষঃপতি ; তোমারা সকলে কুলবালা, কুলবধু, কোন্ অপরাধে বৈরি-ভাব আচরি তোমাদের সাথে ?’ শেষে বলেছেন ‘কি প্রসাদ, সুবদনে, দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি।’ এক্ষেত্রে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, তার মহত্ব, সন্নেহ আশীর্বাদ করার মধ্যে যে ঔদার্য তা বীর্যশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। মধুসূদনের সচেতন কল্পনা রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই মহৎ দিকটি দেখলেও, কবির নিজস্ব ভাব-দৃষ্টি তাঁকে অন্যপথে চালিত করেছে। তাই তৃতীয় সর্গেই বিভীষণকে বলেছেন ‘দূতীর আকৃতি দেখি ডরিণু হৃদয়ে, রক্ষাবর যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি। মুঢ় যে ঘাঁটায়, হেন বাঘিনীরে। বা ষষ্ঠ সর্গে ‘চলো ফিরি। পুনঃ মোরা যাই বনবাসে ; বা ‘নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উৎখারি। ফিরি যাই বনবাসে।’ এই বীর্যহীন কাল্পিত কবির রামচন্দ্র সম্পর্কে পূর্বকল্পিত ‘ঘণা’র কারণেই বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে মায়াদেবীর সাহায্য নিয়ে যে নিন্দনীয় উপায়ে মেঘনাদকে বধ করা হয়েছে তা রামচন্দ্রের সপ্রশংস সমর্থন পেয়েছে। এ সমস্ত ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কবির কল্পনায় রামচন্দ্রের যে দুর্বলচিত্ত একটি মানুষের ভাবমূর্তি আছে, এটি তারই প্রতিফলন।



মধুসূদন মেঘনাদের প্রতি আত্যস্তিক মমত্ববশত, রামচন্দ্রকে কালিমালিপ্ত করেছেন। পরিবর্তে মেঘনাদকে বীরত্বে মহত্বে মহতো মহীয়ান করে তুলেছেন।

রামায়ণের লক্ষ্মণ মূলত পুরুষকার-নির্ভর। মেঘনাদবধে দেব-দৈত্য-নরত্রাস অজেয় মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও সে বাল্মীকি রামায়ণের ছায়া মাত্র। তবে এ কাব্যে সে রামের থেকে সক্রিয়। রামচন্দ্রের মতো ভয়-ভীতি কান্নায় সে ভেঙে পড়ে না, অসম সাহসে ভর করে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মতো বীর্যবন্তা ও শক্তি তাঁর আছে। রামচন্দ্র বিপন্ন বোধ করলে, সে তাঁকে সাহস দেয়। একা বনপথে লঙ্কায় চণ্ডীমন্দিরে যাওয়া লক্ষ্মণের পক্ষে অপরিমিত সাহস ও শৌর্য, রুদ্ধ ভৈরবকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে, দানবীয় শক্তিকে পরাস্ত করেছে। সর্বোপরি ভোগবিলাসে প্রলুপ্ত করতে মায়া-সুন্দরীদের চেষ্টাকে প্রতিহত করেছে। সমস্ত প্রলোভন ও কামনাজয়ী এই ব্রহ্মচারী তুলনাহীন। মধুসূদন এদিক থেকে লক্ষ্মণকে মেঘনাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও, লক্ষ্মণের বীরত্ব বৈভব লান হয়েছ, দৈবাত্মে শক্তিশালী হয়ে মায়াদেবীর আনুকূল্যে চোরের মতো লঙ্কায় প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করায়। মেঘনাদ বলেছেন ‘নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুল প্রথা আঘাতে তারে।’ লক্ষ্মণ উত্তরে বলেছেন ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’। নিরস্ত্র মেঘনাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে, বীরধর্ম-বিরোধী এই আচরণ লক্ষ্মণকে কলঙ্কিত করেছে। তাঁর এতদিনের সমস্ত চরিত্র গৌরব মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়েছে। নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে অস্ত্রাঘাতে করায় লক্ষ্মণ মনুষ্যধর্মের অবমাননা করেছেন। বস্তৃত লক্ষ্মণের জয়ে মেঘনাদের বীর-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ রক্ষকুলগৌরব—মধুসূদন-এর—Favourite Indrajit ‘বধ’ নামক কাব্যের বধ্য ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ। তিনি এ কাব্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাল্মীকি রামায়ণেও তিনি অসাধারণ বীর্যবান পুরুষ। সেখানে তাঁর দাম্পত্যজীবনের কোনো ছবি নেই। মধুসূদন তাঁর নায়কের চরিত্রে মানবিক বিস্তারের প্রয়োজনই এদিকটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মধুসূদনের মেঘনাদ প্রেমিক, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত, মাতৃপিতৃভক্ত কর্তব্যপরায়ণ বীর। তিনি ‘লঙ্কার পঙ্কজ-রবি’, রাক্ষস কুল-ভরসা’। নিকুঞ্জিলা যজ্ঞগারে কবির প্রিয়তম নায়কের মৃত্যু ঘটেছে। ইন্দ্রজিৎ তখন, ‘পুজে ইষ্টদেবে নিভৃত্তে’, কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরীয়, চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।’ এই পবিত্র ভূমিকে হীন চক্রান্তের মাধ্যমে লক্ষ্মণ বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত করেছেন। এত দ্বারা ইন্দ্রজিতের ধর্ম পরায়ণতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্মণকে আতিথেয় সেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বীর সাজে সেজে আসার অনুমতি চেয়েছেন। এতে তাঁর রণ নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণে উদ্যত হলে, তিনি কোষার আঘাতে তাঁকে মূর্ছিত করেন। অস্ত্রসূর্যের শেষ দীপ্তি এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে বীরের দেহ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত—লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্ত্রাচলে। মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে স্রষ্টার মধ্যে মেঘনাদের প্রতি একান্ত ভালোবাসার সঙ্গে শিল্পীর গভীর সংযমের অসামান্য মেলবন্ধন ঘটেছে।

অমিতবল মেঘনাদের মৃত্যু ও রক্ষোবংশের পরাভবের মূলে রাবণানুজ বিভীষণ। রামায়ণের বিভীষণ পুণ্যাত্মা। এখানেও সে ধর্মভীরু। পাপী ভাইয়ের পক্ষ ত্যাগ করে সে বনজীবনের দুঃসহ কষ্টকে স্বীকার করেছে। ধার্মিকতার কারণেই আত্মীয় বন্ধুদের বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি। উনিশ শতকীয় স্বাদেশিকতার দৃষ্টিতে আক্রান্ত দেশকে ত্যাগ করে আক্রমণকারীর সহায়তা করা বিশ্বাসঘাতকের দেশদ্রোহিতা বই কি? মেঘনাদ একারণেই বিভীষণকে নিন্দাবাদ করেছেন।

মধুসূদনের বিভীষণ শুধু দেশদ্রোহী নয়, সে শুধু ‘জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি’ কে বিসর্জনই দেয়নি, রাবণের কর্মফল ইত্যাদি বলে নিজের পুণ্যস্বারূপটি তুলে ধরে হীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাও করেছে। নিদারুণ সিংহাসন লোলুপতা তাঁর অন্তরে সুপ্ত ছিল। তার অন্তরবাসনাই স্বপ্নে রূপ পেয়েছে। রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী যেন দেখা দিয়ে বলেছে—“পাইবি শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্র দত্ত সহ তুই”। এর থেকে বোঝা যায়, বিভীষণের যতই ধার্মিকতা থাকুক রামচন্দ্রের মিত্র বলে পরিচিত হয়েও, তার অন্তরে নিহিত ছিল রাজসিংহাসনের কামনা। সংস্কৃত রামায়ণে এর স্পষ্ট উল্লেখ না থারলেও, বালীর উক্তিই এর আভাস আছে। মধুসূদন একেই তাঁর কাব্যে স্পষ্টতর করেছেন।

এতৎসত্ত্বেও বিভীষণ চরিত্রের আরেকটি দিকও স্মরণ রাখতে হবে। বিভীষণেরও যে হৃদয় ছিল, মমত্ববোধ ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপে। বিভীষণের এই বিলাপ, তার স্নেহসিক্ত হৃদয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। স্বার্থক্লিষ্ট দেশদ্রোহী একটি ব্যক্তির হৃদয়েও যে অন্তঃসলিল স্নেহের প্রস্রবণ থাকে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিলাপধ্বনি তার মানবিক ভিত্তিকেই বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে দেবদেবীর ভূমিকাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে এঁদের অসামান্য অবদান আছে। রাবণ মেঘনাদের ভাগ্য এঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ষষ্ঠ সর্গে স্বর্গের লক্ষ্মী ও মায়ার ভূমিকা নিরপেক্ষ দৃষ্টার নয়। প্রধানতঃ এরাই সক্রিয় কুশীলবের মত মেঘনাদবধ কাব্য সম্পন্ন করিয়েছে।

লক্ষ্মী একদা সমুদ্রতলে নির্বাসিতা ছিলেন। মধুসূদন কল্পিত এই দেবী সাগরমন্থনের পর স্বর্গে ফিরে যেতে পারেননি। রাবণের ভক্তিতে লঙ্কায় ঐশ্বর্যলক্ষ্মী হয়ে বিরাজ করছেন। রাবণ বীর্যের দ্বারা ধনসম্পদ অর্জন করায় লক্ষ্মী সেখানে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বর্গে বিদ্রুবে ত্বারায় ফিরে যেতে চান, তাই রাবণের পতন না ঘটলে যেতে পারছেন না। বীরবাহুর পতনের পর তিন ‘প্রভাসা’র ছদ্মবেশে প্রমোদ উদ্যানে সংবাদ দিয়ে মেঘনাদকে লঙ্কায় নিয়ে এসে সৈন্যপত্যে বরণ করান। ইনি আবার বলেন ‘চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী/বিদরে হৃদয় মম শূনি দিবা নিশি/প্রমদা-কুল-রোদন। প্রতি গৃহে কাঁদে/পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা সতী।’ (নবম সর্গ)। রাবণের দুষ্কৃতির জন্য তিনি তাঁর প্রতি বিরূপ, তাই রাবণ নিধনে উদ্যোগী। তিনিই দেবরাজ ইন্দ্রকে মেঘনাদের সৈন্যপত্য গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে, তার বধের উপায় জানবার জন্য ইন্দ্র দম্পতিকে পার্বতীর কাছে পাঠিয়েছেন। ইন্দ্রকে বলেছেন, না হইলে নির্মূল সমূহে/রক্ষপতি ভব রসাতলে যাবে।—এ আগ্রহাতিশয্য শুধুই দুষ্কৃতিবিনাশ হেতু নয়, এর পেছনে বৈকুণ্ঠে ফিরে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষাও। লক্ষ্মীর এই স্ববিরোধী আচরণ তাই শুধু কৃতি-দুষ্কৃতি নয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টও বটে।

বধকাব্যের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভৃতি সর্গে মায়াদেবীর কথা আছে। তিনি মোহিনী বা মায়াজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষের কাছে অনেক ঘটনা আড়াল করেছেন। রামচন্দ্র ষষ্ঠ সর্গে দেবী মহামায়া অস্বিকার কাছে লক্ষ্মণকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছেন। দেবী মহামায়ার আদেশে মায়াদেবী মেঘনাদবধ-এর সহায়িকা শক্তিরূপে কাজ করেছেন। মায়ার আনুকূল্যে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। মায়ার ছলনায় ইন্দ্রজিতের সমস্ত দৈবাস্ত্র ব্যর্থ হলে কোষাঘাতে লক্ষ্মণ মুর্ছা গেছে। মায়াদেবীরই যত্নে পরে তার চেতনা সঞ্চার হয়েছে। তাই বলা যায় মেঘনাদবধে মায়াদেবী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। দেবতাপণ রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মায়ার সাহায্যে দৈবাস্ত্র দেওয়া থেকে সমস্ত সফল আয়োজন শেষে মেঘনাদকে নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারে নিধন সম্পন্ন করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী থেকে বেশ বোঝা যায় মানুষ ও দেবতা এখানে একাকার হয়ে গেছে। তাঁদের মানুষের মতো কামনা-বাসনা-ঈর্ষ্যা-ক্রোধ আছে কিন্তু মানবচরিত্রের মতো তাদের কোনো ক্রমবিকাশ নেই। অতীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে-কোনো কাজই তাদের পক্ষে সম্ভব। তাদের কেউ মানবচরিত্রের মহত্বও পায়নি।

### অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ৪৮.১১ এবং ২৮.১২ আরেকবার পড়ুন।

#### ১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক) মূল রামায়ণে \_\_\_\_\_ তেমন \_\_\_\_\_ না হলেও \_\_\_\_\_ এর গুরুত্ব সমধিক।
- খ) নিকুন্তিলা কোনো \_\_\_\_\_ নয়, নীল মেঘের মতো \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ বলেছেন ‘বটবৃক্ষতলা’ যেখানে লক্ষ্মণ নিষ্কিণ্ত \_\_\_\_\_ মেঘনাদের মৃত্যু।
- গ) মধুসূদন \_\_\_\_\_ অলংকারশাস্ত্র-সম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও \_\_\_\_\_ কাব্য সাহিত্যের \_\_\_\_\_ কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু \_\_\_\_\_।
- ঘ) মেঘনাদবধে \_\_\_\_\_ রসের সঙ্গে \_\_\_\_\_ রসের \_\_\_\_\_ ঘটেছে।
- ঙ) দূতমুখে \_\_\_\_\_ মৃত্যু সংবাদ শুনে \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ হাহাকার করেছেন, তারপরই \_\_\_\_\_ ‘সুস্থ হইল \_\_\_\_\_।’

#### ২) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ক) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায়—
- ১। বাল্মীকির প্রভাব আছে  
২। কৃত্তিবাসের প্রভাব আছে  
৩। পাশ্চাত্য প্রভাব আছে
- খ) মেঘনাদবধ কাব্য লঙ্কার—
- ১। ঐশ্বর্যের চিত্র বিশেষ  
২। ধ্বংসোন্মুখ চিত্র বিশেষ  
৩। যুদ্ধ চিত্র বিশেষ।
- গ) মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্য—
- ১। বীরাজানা  
২। মেঘনাদবধ  
৩। চতুর্দশপদী কবিতাবলী
- ঘ) ষষ্ঠ সর্গের কেন্দ্রীয় চরিত্র—
- ১। রাবণ  
২। মেঘনাদ  
৩। লক্ষ্মণ

- ৩) মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবিন্যাসে মৌলিকতা সম্পর্কে ৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন।
- ৪) ষষ্ঠ সর্গের পাশ্চাত্য প্রভাবিত অংশগুলির পরিচয় দিন।
- ৫) ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত মেঘনাদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিন।
- ৬) লক্ষ্মী ও মায়াদেবী ষষ্ঠ সর্গের মূল চালিকাশক্তি।—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।
- ৭) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় বাণ্মীকি রামায়ণের অনুসরণ কতটুকু, আলোচনা করুন।

### ৩৩.১১ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) : ভাষা, ছন্দ, অলংকার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকরা মহাকাব্যের ভাব-রসের সঙ্গে তার ভাষা-ছন্দ-অলংকার নিয়েও ভেবেছেন। এর বিষয়বস্তু, চরিত্র কল্পনা, ভাব ও রস সমস্তই গুরুগভীর। তাই মহাকাব্যের ওজস্বিতা, বিশালতা ও বিস্তৃতি। ফলে মহাকাব্যের কল্পনায় একটি অসামান্য সমুল্লতি, ভাষায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে—সেখানে প্রাধান্য পায় ওজোগুণ। অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের ভাব ও বাষায় ঐশ্বর্য ও রাসকিগুণ বিশিষ্ট ড্যাকটিলিক ‘হেক্সামিটার’ বা এ জাতীয় ছন্দ ব্যবহার সমর্থন করেছেন। বিশ্বনাথ গুরুগভীর বিষয়ের অবতারণার সঙ্গে একই প্রকারের গাভীর্যপূর্ণ ছন্দ ব্যবহারের কথা বলেছেন, কেবল সর্গের শেষে অন্য পদ্যছন্দ অনুমোদন করেছেন।

যেহেতু ভাষা ভাবের বাহন, কবি ভাষার আশ্রয়েই ভাবকে প্রকাশ করেন। আলংকারিকরাও বলেছেন, ভাবের সঙ্গে ভাষার পার্বতীপরমেশ্বর সম্পর্ক। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষায় ও বর্ণনায় মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাভীর্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এর ভাষা সম্পদ যে কোনো পাঠকের কাছে বিস্ময়ের স্থল। স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের কবির মতো মধুসূদনও তাঁর কাব্য সৃষ্টি চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যবহার করেছেন। যেমন লক্ষ্মণ—সতীসুমিত্রাপুত্র, সৌমিত্রি কেশরী, রামানুজ, রামবানুজ, সৌমিত্রি ভীমবাহু লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র—সীতানাথ রাঘব, রাঘবেন্দ্র, রঘুবর, রঘুকুলমণি, বৈদেহীপতি, বৈদেহীনাথ, দেবকুলপ্রিয়, দশরথাত্মজ। মেঘনাদ—রাবণি, দশাননাথুজ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি। এভাবে বিশেষণ ঋক্ষ ভাষা ব্যবহার করে মধুসূদন বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। আবার শব্দ নির্বাচনেও তিনি বর্ণনায় ওজস্বিতার প্রয়োজনে গুরুগভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত কাব্যে সন্ধিসমান বহুল ভাষা ব্যবহার করে যে ওজোগুণ নিয়ে আসা হত, একালে সেটি অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় মধুসূদন তাকে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন, পরিবর্তে ধ্বনিগাভীর্য সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—‘যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে’। কিংবা ‘উড়িল কলঙ্কুল মলম্বা আকাশে।’ এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও একদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র যেমন একদা তৎসম শব্দের সঙ্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে ভাষায় গতি সঞ্চার করেছিলেন, মধুসূদন, তৎসম শব্দের সঙ্গে ‘দাপিছে, ‘নিবীরিবে’, ‘আশ্বাসিলা’ প্রভৃতি নামধাতু এবং লোকায়ত শব্দ (যথা, ‘জাভাল ভাঙি) ব্যবহার করে সেই গতি এনেছেন। এদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা কিছু ত্রুটি যথা গুরুচালা (ঝড়াকারে ‘ফুলদল দিয়া’)। ব্যাকরণে দুষ্ট (শিরোপরি, ‘প্রফুল্লিত’, গায়কী) শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। বীররসপ্রধান কাব্যভাষার প্রয়োজনে ইংরেজি Blank

Verse-এর ছন্দোন্নয়ন বা বাংলার চতুর্দশ মাত্রার পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) কাঠামোয় পুরে মিলহীন প্রবাহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন। যেহেতু কবিতায় ভাবের গুরুত্ব বেশি, তাই মধুসূদন ছন্দের বন্ধনদশা ঘোচাতে পঙ্ক্তি অস্ত্রে যতি পাত থেকে ভাবকে মুক্তি দিলেন। বন্ধনদশা থেকে মুক্ত এই ভাবরাশি স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল। অর্থাৎ পঙ্ক্তি শেষে ছেদ আর আবশ্যিক রইল না—পঙ্ক্তি থেকে পঙ্ক্তি ক্রমে আপন বেগে চলতে সক্ষম হল, যেখানে প্রয়োজন সেখানে থামবার সুযোগ হল। এর ফলে আট ও ছয় মাত্রার পর নিয়মিত যতি পড়ায় যে একঘেয়েমি তৈরি হয়েছিল তা আর রইল না। নানা ছন্দে, নানা জায়গায় যতি পাতের ফলে কাব্যের গতিতে বৈচিত্র্য এল। বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের পক্ষে উপযোগী। ভাবের এই যে স্বচ্ছন্দ প্রবাহমানতা এটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—মধুসূদন প্রবর্তিত পঙ্ক্তির অস্ত্রে মিল হীনতা বা অমিত্র অক্ষরত্বই অমিত্রাক্ষর ছন্দে একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রবোধচন্দ্র সেন একে অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে প্রবাহমান ছন্দ বলেন। পয়ারের যেমন দুটি ভেদ ৮ ও ৬ মাত্রার পয়ার এবং ১০ ও ৮ মাত্রার, মহাপয়ার প্রবাহমান ছন্দের দুটি প্রধান ভাগ। প্রবাহমান চতুর্দশমাত্রিক ও প্রবাহমান অষ্টাদশমাত্রিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই দুই বৈশিষ্ট্যযুক্ত কবিতায় মিল যুক্ত করে সমিল প্রবাহমান বা জটিল প্রবাহমান পয়ার রচনা করেছেন। যেমন—মধুসূদন রচিত অমিল প্রবাহমান পয়ার :

প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।

আত্মবিস্মৃতিতে, হয়, অকস্মাৎ সতী

মুছিল সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।

মূর্ছিল রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী

আচম্বিতে।

(ষষ্ঠ সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য)

রবীন্দ্রনাথ রচিত সমিল প্রবাহমান পয়ার :

কবিবর কবে কোন্ বিস্তৃত বরষে

কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্ত্র শ্লোক

বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক

রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে

সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে। (মেঘদূত, মানসী)।

প্রাচ্য আলংকারিক আচার্য বামনের মতে কাব্যের গ্রহণ যোগ্যতা তার অলংকার প্রয়োগে। অলংকারেই কাব্যের সৌন্দর্য। আচার্য দণ্ডী ও কাব্যের শোভাকর ধর্মকেই অলংকার বলেছেন। এই অলংকার শব্দটি দুটি অর্থে ব্যঞ্জিত হয়েছে—১) অলংকার কাব্যদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ২) অলংকার কাব্যদেহের অর্থ সামর্থ্য বাড়ায়। এ থেকে বোঝা যায় অলংকার কাব্য দেহের ও ভাবের সৌন্দর্য বিধায়ক। কাব্য দেহ ভাবনা থেকে শব্দ নির্ভর ও ‘ভাব’ থেকে অর্থনির্ভর অলংকার অর্থাৎ শব্দালংকার (অর্থাৎ ধ্বনির অলংকার) ও অর্থালংকারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েরই লক্ষ্য কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি। মেঘনাদবধে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। প্রসঙ্গতঃ ষষ্ঠ সর্গে কয়েকটি শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায়।

মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রাচ্য আধারে, পাশ্চাত্যে আদর্শে পরিকল্পিত সাহিত্যিক মহাকাব্য। হোমার,

ট্যাসো, দান্তে, মিল্টনের কাব্যদর্শের সঙ্গে কালিদাস, মাঘ, ভারবি তাঁর কাব্যদর্শকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধিত করেছে। গ্রিক মহাকাব্যে অলংকার প্রয়োগ বিশেষতঃ উপমার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। হোমার অ্যাকিলিস, হেক্টর-এর সুমাহন ব্যক্তিত্ব এবং বিশালতার অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের উপমাগৌরব সুপ্রসিদ্ধ যার পরিচয় “হোমোরিক সিমিলি”। এই উপমাগুলি দীর্ঘ যার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যিক বিশালতা ও বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। মেঘনাদবধে এর প্রয়োগ প্রাচুর্য আছে।

মধুসূদনের ‘মহাগীত’ যে ‘মধুচক্র’ রচনা করেছে তার মধু পান করে ‘গৌড়জন’ পরিতৃপ্ত ও আনন্দ অনুভব করেছেন। এ কাব্যের ধ্বনুক্তি, অনুপ্রাস প্রভৃতি ধ্বনি প্রধান অলঙ্কার প্রায় প্রতিটি পঙ্ক্তিতে পাওয়া যায়। ‘অসির বনবানি’, কাঞ্চন কঙ্কক বিভা’, নীরব রবার, বীণা, সুরজ, মুরলী’ ও কমলালয়ে, কমল-আসনে/বসেন কমলাজয়ী (১ম সর্গ, অনুপ্রাস) সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর, স্মরিলা শঙ্করে (ষষ্ঠ সর্গ) বা লঙ্কার পঙ্কজ রবি কেলা অস্তাচলে/(ষষ্ঠ সর্গ) প্রভৃতি বৃত্তানুপ্রাস-এর ব্যবহার কাব্যে অসাধারণ ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে।

শব্দালংকারের থেকে অর্থালংকার গঠনে কবির ব্যক্তিমন অধিকতর ক্রিয়াশীল হওয়ায়, কাব্যের রূপকল্পসৃষ্টিতে কবি মানসের সুস্পষ্ট ছাড়া পড়েছে। অলংকার প্রয়োগে বিশেষত ‘হোমোরিক সিমিলি’ বা মহাকাব্যিক উপমা ব্যবহারে মধুসূদন বাংলা কাব্যে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। লঙ্কার পরিচয় দিতে ‘কাঞ্চন-সৌধ কিরীটিনী’ বা ‘হীরাচূড় শিব দেবগৃহ’ প্রভৃতি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর ‘উপমা’ অলংকারে ব্যবহারে ব্রজ, বিজয়া প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন :

মাতৃকালে নিদ্রায় কাঁদিলা/শিশুকুল আত্নাদে, কাঁদিলা যেমতি/

ব্রজে ব্রজকুল শিশু যবে শ্যামমণি/আঁধারি যে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।” (ষষ্ঠ সর্গ)

বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে সদাজাগ্রত চেতনা উপমা হিসেবে তাঁর কাব্য জগতেও নানা ভাবে ও রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, “তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি পাখী।” (চিত্রাঙ্গাদার উক্তি—১ম সর্গ), নিদাঘে যেমতি/ফলশূন্য বনস্থলী, জনশূন্য নদী/, বরজে সজারু পশি বারুইর যথা ছিন্ন ভিন্ন করে তারে’ (১ম সর্গ)—প্রভৃতিতে উপমা ব্যবহারে কবির প্রকৃতি প্রীতি ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ হয়েছে। প্রথম সর্গের ‘শোকেরক ঝড় বহিল সভাতে।’ বা ষষ্ঠ সর্গের—‘কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে প্রাণাধিক—রূপক অলংকারের যেমন, তেমনি ‘কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে, পঙ্কিল?’ কাকু বক্রোক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

## অনুশীলনী—৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৩১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মহাকাব্যে থাকে \_\_\_\_\_ বিশালতা ও \_\_\_\_\_। ফলে মহাকাব্যের \_\_\_\_\_ একটি অসামান্য \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে।

খ) বীর রসপ্রধান \_\_\_\_\_ প্রয়োজনে ইংরেজি \_\_\_\_\_ এর ছন্দোবীতি বাংলার \_\_\_\_\_ পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) \_\_\_\_\_ পুরে মিলহীন \_\_\_\_\_ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন।

- গ) হোমার \_\_\_\_\_ এর \_\_\_\_\_ ব্যক্তিত্ব এবং \_\_\_\_\_ অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক \_\_\_\_\_ আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের \_\_\_\_\_ সুপ্রসিদ্ধ, যার পরিচয় \_\_\_\_\_ ।
- ঘ) মধুসূদনের \_\_\_\_\_ যে \_\_\_\_\_ রচনা করেছে, তার \_\_\_\_\_ পান করে \_\_\_\_\_ ও আনন্দ অনুভব করেছেন।
- ২) প্রতিটি অলংকারের দুটি করে উদাহরণ দিন : ধ্বন্যুক্তি, বৃত্তানুপ্রাস, রূপক।
- ৩) মধুসূদন উপমাঋত্ব ভাষা ব্যবহার করে বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। তিনটি উদাহরণ দিন।
- ৪) মধুসূদন ধ্বনিগাষ্ঠীর সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। পাঁচটি উদাহরণ দিন।
- ৫) প্রবোধচন্দ্র সেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে বলেন প্রবহমান পয়ার ছন্দ। এ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের যুক্তিটি বুঝিয়ে দিন।
- ৬) পয়ার ও মহাপয়ারের মধ্যে পার্থক্যটি ৫টি বাক্যে আলোচনা করুন।
- ৭) অমিল ও সমিল প্রবহমান বলতে কী বোঝেন। এ দুটির বৈশিষ্ট্য ৫টি বাক্যে ব্যাখ্যা করুন।

### ৩৩.১২ সংক্ষিপ্তসার

মধুসূদন দত্ত যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রাজনারায়ণ, মা জাহ্নবী। সেখানে শৈশব অতিবাহিত করে, কৈশোরে কলকাতায় হিন্দু ও বিশপস্ কলেজে লেখাপড়া শেখেন। এ সময় থেকেই কাব্য রচনায় হাতেখড়ি। বিলাত যাওয়ার একান্ত আগ্রহ ও বাবা মার ঠিক করে দেওয়া বিয়ে এড়াতে আকস্মিকভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা ও সাংবিদিকাত সূত্রে মাদ্রাজ যান, সেখানেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী রেবেকা ম্যাঙ্কাভিসকে বিয়ে করেন। পরে হেনরিয়েটাকে বিয়ে করেন। ১৮৫৬ তে কলকাতা ফিরে কলকাতায় পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। ১৮৬২ তে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত যান, পাশ করে ফেরেন ১৮৬৭-তে। সাহিত্য রচনা শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), বীরাজানা (১৮৬২)। বিলাতে থাকাকালে চতুর্দশপদী কবিতাবলী, শেষে হেক্টর বধ ও মায়াকানন ছাড়াও কিছু অসম্পূর্ণ রচনা আছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ এই এককের মূল পাঠ বিষয়। লক্ষ্মণ কর্তৃক দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে বধ এই কাব্যের যে প্রধান উপজীব্য, তা-ই এ সর্গের বিষয়বস্তু। বীরবাহুর মৃত্যু ইন্দ্রজিৎের সৈন্যপত্নী গ্রহণ, স্বর্গে দেবতাদের চক্রান্ত, মহাদেবের আনুকূল্য আদায়, মায়া প্রভাবে দৈবাস্ত্র নিয়ে রামচন্দ্রের শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার পর লক্ষ্মণ কর্তৃক কাপুরুষের মত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হত্যা, এ সব দেবতাদের মায়ায় সম্ভব হয়েছে। মধ্যে তৃতীয় সর্গে প্রমীলা-ইন্দ্রজিৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করে ইন্দ্রজিৎের প্রতি মানবিক মহিমা আরোপ করে তাঁর মৃত্যুকে অধিকতর ট্রাজিক করা হয়েছে। চতুর্থ সর্গ সীতার মুখ দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের তথা রাক্ষসকুলের বিপর্যয়কে প্রাক্তনের রূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ তাই এ কাব্যের শীর্ষ, তার পরে তিনটি সর্গের সাহায্যে কাব্যের পরিণতি টানা হয়েছে।

এই সর্গটি পাঠের জন্যই মহাকাব্যের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সর্গটির মধ্যে মহাকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের যে সাধারণ পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। মহাকাব্যের উপস্থাপনায় বস্তুনিষ্ঠা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব আনা হয়—ষষ্ঠ সর্গের পরিকল্পনায় তা আছে। বিশেষত মেঘনাদনিধনের পূর্বমুহূর্তে এমন দৃশ্যের অবতারণা অন্যতম। মেঘনাদবধ যেহেতু এ সর্গের প্রধান বিষয়, তাই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে ‘বধঃ’। মহাকাব্যের বৈচিত্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানতঃ দুধরনের যথা যুগসঞ্চিত কাহিনীকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের প্রেরণায় সাহিত্যিক প্রয়াসে রচিত ‘সাহিত্যিক মহাকাব্য’ তৎসহ লঘু বিষয় নিয়ে বিদ্রুপাত্মক ব্যঙ্গ মহাকাব্য রচনা করা হয়েছে। মধুসূদনের সাহিত্য প্রয়াস জাত মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শে হেমচন্দ্র বৃন্দসংহার, নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস-ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। শেষে দুজনসহ পরবর্তী মহাকাব্য রচনাপ্রয়াস মধুসূদনের কাব্যকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মেঘনাদবধে কবির সহানুভূতি রাম লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের ওপরই সমধিক। হোমার-ভার্জিলের কাব্য ও তামিল কব্বন রামায়ণের এ ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব আছে। এ ছাড়াও কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র ও চিত্রকল্প ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে মিল্টন, শেলি, কালিদাস মাঘ-ভারবি ভবভূতির প্রভাব ইত্যন্ত আছে। এ কাব্যের অঞ্জীরস বীর হলেও অন্তঃসলিলা কবুণরসের প্রস্রবন আছে। অবশ্য এ সম্পর্কে অন্যমতও আছে। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ বধ হলেও দেবতাদের চক্রান্ত, লক্ষ্মণের কাপুরষতাকে ছাপিয়ে উঠেছে মেঘনাদের অসম সাহসিকতা ও প্রত্যক্ষকে বীরত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পরিচয়ে।

পাশ্চাত্য মতে মেঘনাদবধের রসপরিণতি ট্রাজিক। মেঘনাদ-এর বধ মানবিক বেদনায় ঋণ্ড। একটি বীরের অন্যায় মৃত্যু শোকের কারুণ্য সৃষ্টি করেছে। শোকবিধ্ব রাবণ দেখেছেন ‘একে একে নিভিছে দেউটি’। উপলব্ধি করেছেন লঙ্কার অনিবার্য ধ্বংস। রাবণের এই অসহায় বেদনা ব্যক্তি হৃদয়ের হাহাকার-ই ট্রাজেডির রসপরিণতি। মেঘনাদের মৃত্যু সেই পরপরিণতিকে রঞ্জিত করেছে।

নিয়তিবাদ এ কাব্যের অন্যতম উপাদান। রাবণ বলেছেন ‘বিধি বাম’ রাজলক্ষ্মী বলেছেন, ‘প্রাক্তনের ফল’। কিন্তু মেঘনাদের অন্যায়ভাবে অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, অন্ধ নিয়তি নির্মমতা ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শেষোক্তদেরই তিনি এ কাব্যের প্রধান আকর্ষণস্থল করেছেন। রামচন্দ্রের অনেক মহত্ব থাকা সত্ত্বেও মেঘনাদের প্রতি আত্যন্তিক মমতাবশত কালিমালিগুণ্ড করেছেন। অনুরূপে লক্ষ্মণের অপরিমেয় সাহস চরিত্রবল, ধৈর্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও দৈবাস্ত্রে শক্তিশালী হয়েও কাপুরুষের মতো মেঘনাদকে বধ করেছে। বীরধর্মের শুধু নয়, মনুষ্যধর্মের অবমাননা, মেঘনাদের বীরগৌরবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ মধুসূদনের Favourite Indrajit লক্ষ্মণের কাপুরুষোচিত আচরণের জন্যই ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার পঙ্কজরবি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

বিভীষণ শুধুমাত্র দেশদ্রোহী নয়, তারও যে একটি দুর্বল হৃদয় আছে সেটি ফুটেছে মেঘনাদের মৃত্যুর পর তার বিলাপে। বিভীষণের বিলাপ একটি স্নেহরসসিক্ত হৃদয়ের বিলাপ।



এ কাব্যের দেবদেবীর ঈর্ষ্যাধ্বষপরায়ণ। মেঘনাদবধ ও রাবণকে তিলে তিলে ধ্বংস করার জন্য হীন কুচক্রী মানুষের মত কোনো চক্রান্তকেই বাদ দেননি। তাঁরা দৈবাস্ত্র সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হননি। মায়ার সাহায্যে সবার চোখের আঁড়ালে, প্রতিপক্ষের শক্তিহরণ করে, অস্ত্রাঘাতে জর্জনীরত করে নিহত হয়েছে। কামনা-বাসনা-ঈর্ষ্যা-ক্রোধ নিয়ে দেবতা ও মানুষ এখানে একাকার হয়ে গেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা মহাকাব্যের ভাবরস ফুটিয়ে তোলার জন্য গুবুগুম্বীর তৎসম, যুক্ত ব্যঞ্জন, ধ্বনি সৌন্দর্যের জন্য অলঙ্কৃত। ছন্দ গতিশীল, প্রবহমান পয়ার অলংকার উপমার বাহুল্য ধ্বন্যুক্তি অনুপ্রাসের সঙ্গে উপমা হোমোরীয় উপমা রূপক প্রভৃতি শব্দালংকার ও অর্থালংকারে সমৃদ্ধ।

## ৩৩.১৩ উত্তরমালা

### অনুশীলনী—১

- ১। ক) কালাগ্নি, দাবাগ্নি, বনরাজি, বায়ুসখা।  
খ) বিভীষণ, বিভীষণ, পুষ্প, মঞ্জলবাজনা, অঙ্গরা, জয়রবে।  
গ) ২৫ জানুয়ারি, জুন ১৮৭৩।  
ঘ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রেবেকা, আত্মনিবেদন, হেনরিয়েটা।  
ঙ) ১৮৬০, 'একেই কি বলে সভ্যতা?' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌঁ', 'পদ্মাবতী'।
- ২। ক) ১৮৪৩, খ) ১৮৬২, গ) বিশপস্ কলেজ, ঘ) মায়াকানন।
- ৩। মহাসর্প, খাপে, সিন্ত করিল, মেঘাচ্ছন্ন, অগ্নি, অগ্নি, চয়ন করিয়া (তুলিয়া), সাপ, কর্কশ, সেনা, অলংকার, ধনুক।
- ৪। বাদিএ \_\_\_\_\_ বাজনা, কাদম্বিনী \_\_\_\_\_ মেঘমালা, স্কন্দ \_\_\_\_\_ কার্তিকেয়, দিবিন্দ্র \_\_\_\_\_ দেবরাজ ইন্দ্র, নক্র \_\_\_\_\_ কুমীর, আনায় \_\_\_\_\_ জাল, আহবে \_\_\_\_\_ সংগ্রামে, যুদ্ধে ; জীমুতেন্দ্র \_\_\_\_\_ মেঘরাজ ; আসার \_\_\_\_\_ বৃষ্টি, শব্দবাহক \_\_\_\_\_ আকাশ।
- ৫। ক) ৪৮.৬ অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অংশটি দেখুন।  
খ) বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর।  
গ) ঘ), ঙ) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অংশ দেখুন।

### অনুশীলনী—২

- ১। ক) রাজা, বাদশাহদের, সংস্কৃতে, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ।

- খ) বস্তুনিষ্ঠা, চমৎকারিত্ব, সৃষ্টির, অলৌকিকত্ব, কাব্যসম্মত।
- গ) সচেতন, শিল্পীর তীক্ষ্ণ, সুনির্দিষ্ট প্রভাব।
- ঘ) রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসির, কল্পনাকে, স্নিগ্ধতার, ইলিয়াডের, শৌর্যের।
- ২। ক) রামায়ণ, মহাভারত/ইলিয়াড, ওডিসি, মেঘনাদবধ কাব্য, বৃহৎসংহার/কুমারসম্ভব, রঘুবংশ/  
ইনিড, জেরুজালেম উদ্ধার, ছুহুন্দরীবধ কাব্য, ভেকমূষিক যুদ্ধ / রেপ অফ দি লক।
- খ) নবীনচন্দ্র সেন, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।
- গ) রৈবতক-এ সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্র-তে জটিলতা ও বিস্তার, প্রভাসে-পরিণতি।
- ৩। ক) বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।
- খ) ১৮-৭৫, গ) পোপ, ঘ) রঞ্জালাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৪-৭ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর করতে বর্তমান দুটি পাঠ একাধিকবার পড়ুন।

### অনুশীলনী—৩

- ১। ক) ইন্দ্রজিৎ, নিধন, তাৎপর্যমণ্ডিত, মেঘনাদবধে।
- খ) যজ্ঞগার, বটবৃক্ষতল, কৃতিবাস, ঐন্দ্রাস্ত্রে।
- গ) ভারতীয়, পাশ্চাত্য, অনুকরণে, গতিশীলতা।
- ঘ) বীর, করুণ, সম্মিলন।
- ঙ) বীরবাহুর, পিতা রাবণ, রাজা রাবণ, মনস্তাপে।
- ২। ক) বাঙ্গালীর প্রভাব আছে ; খ) ধ্বংসোন্মুখ চিত্রবিশেষ।
- গ) মেঘনাদবধ কাব্য, ঘ) মেঘনাদ
- ৩-৭ উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়।
- ৪৮.১১ এবং ৪৮.১২ মূলপাঠ অংশগুলি বারবার পড়ুন।

### অনুশীলনী—৪

- ১। ক) ওজস্বিতা, বিস্মৃতি, কল্পনায়, সমুন্নতি, ভাষায়।
- খ) কাব্যভাষার, Blank verse, চতুর্দশাক্ষর, কাঠামোয়, প্রবহমান পয়ার।
- গ) অ্যাকিলিস, হেক্টর, সুমহান, বিশালতার, উপমার, উপমাগৌরব, হোমারিক, সিমিলি।
- ঘ) মহাগীত, মধুচক্র, মধুপান, গৌড়জন, পরিতৃপ্ত।
- ২-৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য এককেরক বর্তমান মূলপাঠটি একাধিকবার পড়ুন—তাহলে উত্তর করা সহজ হবে।

---

### ৩৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

---

- ১) ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ সেন (সম্পাদিত)—মেঘনাদবধ কাব্য ।
- ২) অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত)—মেঘনাদবধ কাব্য ।
- ৩) ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র—মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য ।
- ৪) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প ।
- ৫) ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা কাব্য (১ম পর্ব) ।
- ৬) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—কাব্যতত্ত্ব বিচার ।
- ৭) ড. শুম্ভসত্ত্ব বসু—বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ ।

---

## একক ৩৪ □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুটি কবিতা

---

গঠন

৩৪.১ উদ্দেশ্য

৩৪.২ প্রস্তাবনা

৩৪.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত

৩৪.৪ মূলপাঠ — ১ সোনার তরী

৩৪.৫ সারাংশ — ১

৩৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৩৪.৭ মূলপাঠ — ২ শতাব্দীর সূর্য আজি

৩৪.৮ সারাংশ — ২

৩৪.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৩৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ৩৪.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সত্তর বৎসরের কাব্য জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। কবিতাগুলিতে কবির নিজের পরিবার, দেশ, সমাজ ও সমকাল থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিপুল ভাবসম্পদ নিয়ে তিনি অসামান্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তার পরিচয় পাবেন। তাই কবিতাগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি —

- ১৯ শতকের শেষার্ধ্বে রচিত আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম পর্যায়ের রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগ থেকে পরিণত কবিমানসের পরিচয় লাভ করবেন।
  - গীতিকবিতার বিশেষত রবীন্দ্র-গীতিকবিতার বিবর্তন ধারাটির সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত হবেন।
  - রবীন্দ্র-কবিতাপাঠের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আপনার মতামত গড়ে তুলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
  - গীতিকবিতার গঠন সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাঠ্য কবিতাগুলি থেকে অর্জন করা সম্ভব হবে।
- 

### ৩৪.২ প্রস্তাবনা

---

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন দুটি শতাব্দীকে স্পর্শ করে আছে। ১৯ শতকের পরার্ধ আর ২০ শতকের প্রথমার্ধ এ দুটি পর্বই নতুন যুগের ভাব আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে একটিতে নব নব সৃষ্টির উল্লাসে মাতোয়ারা, অপরটিতে

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও যুগযন্ত্রণার সংশয় ও আর্তিতে সমকালী শিল্পীমানস পুরাতনের ওপর দাঁড়িয়ে নতুনের স্থানে ব্যাকুল।

রবীন্দ্রনাথ আপন পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করে, তাঁর কবি-আত্মাকে সদা সতর্ক ও জাগত রেখেছেন। মহর্ষি পিতার সান্নিধ্য—তাঁর আবেগ ও মননে ঔপনিষদিক বোধ সঞ্চারিত করেছিল। পরিণত রবীন্দ্র হয়ে উঠেছেন ‘কবিমনীষী’। তিনি কবি হয়েও ছিলেন ‘ঋষি’ আর ‘ঋষি’ হয়েও জীবনশিল্পী। আচার্য সুকুমার সেনের কথায় “রবীন্দ্রনাথ সর্বভূমির, বিশ্বজীবনের কবি, “কবীনাং কবিতমঃ।” তাঁর মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে, দুঃখ-সুখে, জীবনে-মরণে সমদৃষ্টিমান, জীবন-ভাবক কবি মানুষের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গেছে। তিনি জগৎ জীবনকে, তার সৌন্দর্য-মাধুর্যকে নিজের চিন্তন ও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই মানবসম্পদকে তিনি অনবদ্য শিল্প-সাধনায় সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। মানবমনের এই ভাব-ঐশ্বর্যকে ব্যঞ্জনায় ঋষি ভাষায় নানা ধারায় ও রূপে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্র কবি-জীবনের এই কল্পনাসম্ভারকে স্পর্শ করবার একান্ত বাসনায় বর্তমান এককের পাঁচটি কবিতার পরিকল্পনা। এই কবিতা পঞ্চক কবির কাব্য জীবনের বিবর্তনের দুটি পর্বের পাঁচটি পর্ব থেকে নির্বাচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কবিমানস সম্পর্কে আপনার একটি সাধারণ বোধ জন্মাবে। এই উদ্দেশ্যেই ‘সোনার তরী’, ‘নৈবেদ্য’, ‘বলাকা’, ‘পত্রপুট’ ও ‘শ্যামলী’ থেকে একটি করে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এগুলি সবই গীতিকবিতা—কবির মনের একান্ত ভাবনার ফসল। গীতিকবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রথম এককে আছে। এখানে ‘মূলপাঠে’র পর সারসংক্ষেপে কবিতার বিষয়বস্তু ও কবিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কিছু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কবিতাকে সমগ্রত বোঝাবার জন্য। কবিতাগুলি পূর্বাপর পাঠে অনুশীলনীগুলি সাহায্য করবে।

### ৩৪.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (ইং ৭ই মে, ১৮৬১খ্রিঃ)। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মায়ের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। বাড়িতেই প্রথমে তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিনের জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়েছেন। শৈশবেই কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রকাশিত কবিতা “হিন্দু মেলায় উপহার” (১৪ ফাল্গুন, ১২৮১, ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। এটি দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ‘জ্ঞানাজ্জকুর’ ও ‘ভারতী’তে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। ‘কবিকাহিনী’ (১২৮৫, ইং ১৮৭৮) ও ‘বনফুল’ (১২৮৭, ইং ১৮৮০) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত গিয়ে, কিছুদিন ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে পড়ার পর, তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মাস তিনেক অধ্যাপক মর্লির কাছে পাঠ নেন। ১৮৮০-র ফেব্রুয়ারিতে কোনো পাঠক্রম শেষ না করেই দেশে ফেরেন। বাড়িতে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জোর গানের আসর বসছে। এই পরিবেশে গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ (১৮৮১) অভিনয়ের আয়োজন হয়। এরপর একের পর এক তাঁর কাব্য, নাটক ও উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে।

৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ কবির বিয়ে হয়। ১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৪ কবির কৈশোরের সাহিত্যসঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দেবেন্দ্রনাথের বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদের মৃত্যুতে জমিদারি দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ওপর বর্তায়। এ সময় তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। মাঘোৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত, ব্রাহ্মমতের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখা, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হিন্দুত্ব নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো নানা ঘটনা ঘটে। আর জমিদারি দেখার ফাঁকে ‘হিতবাদীর’ সাহিত্য সম্পাদকের দায়ে ওই পত্রিকায় পরপর ৬টি গল্প লেখেন—সার্থক বাংলা ছোটগল্পের সূচনাও এখানেই। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দ্রিরা দেবীকে এ সময় গ্রামবাংলার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ চিঠিগুলি লেখেন, তারই গ্রন্থনা ‘ছিন্নপত্র’ বা ‘ছিন্নপত্রাবলী’। ‘সোনার তরী’ (১৩০০ইং ১৮৯৪) এই পর্বেই লেখা। ১৯০১-এ ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। ওই বৎসরেই বোলপুরে ‘ব্রহ্মচার্যশ্রম’ বা ‘ব্রহ্মচার্য বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা, এটি ১৯২১-এ বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মচার্যশ্রম প্রতিষ্ঠার দু’বছরের মধ্যে স্ত্রীবিয়োগ ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যু। ১৯০৭ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত কবি ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) রচনা করেন। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনার স্মৃতিতে তিনি ‘স্মরণ’ (১৯১৪) রচনা করেন। ইতোমধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-এ দেশবাসী কবিকে সম্বর্ধনা জানায় (১৯১২, ২৮শে জানুয়ারি)। অক্টোবর, ১৯১৩ ইংরেজি ‘Song offerings’ কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে।

প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) “সবুজের আহ্বান” কবিতা প্রকাশ। এ সময়েই রচিত কবিতার নতুন বাণী, নতুন ছন্দ ‘বলাকা’ (১৯১৬) কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই নতুন ধারা বাংলা কাব্যে নতুন শৈলী ও ভাবনা নিয়ে এসেছে। ১৯১৯-র জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ করলেন। মে ১৯২০ থেকে জুলাই ১৯২১ বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ‘বিশ্বমৈত্রীর’ কথা প্রচার করে বেড়ালেন। এ সময়েই ‘বিশ্বভারতীর’ সূচনা। দেশে তখন চলে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন। নানা দেশর আমন্ত্রণে কবিকে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণে যেতে হয়। পেরুর স্বাধীনতা যুদ্ধে শতবর্ষ উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি বুয়েনোস এয়ারিসের শহরতলিতে কবিভক্ত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ করেন (১৯২৪)। তাঁকেই কবি বিজয়া নাম দিয়ে ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থ (১৯২৫) উৎসর্গ করেন। দেশে ফিরে গান্ধিজির চরকা ও খন্ডের নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এ প্যারিসে কবির প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়। তিনি অক্সফোর্ডে হির্বাট বক্তৃতাও দেন। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। ১৯৩২ গদ্যছন্দে কাব্য রচনার সূচনা করলেন, ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২) প্রকাশিত হল। ১৯৩৫ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ ওসমানিয়া, ১৯৪০-এ অক্সফোর্ড (শান্তিনিকেতনে এসে) কবিকে ডি.লিট. উপাধি দেন। এই বৎসর কবি প্রায় একমাস শয্যাগত থাকেন। এর মধ্যে লেখেন ‘রোগশয্যায়’ (১৯৪০) ‘আরোগ্য’ (১৯৪১) ও ‘জন্মদিনে’ (১৯৪১)। মাঝে একটু সেরে উঠলেও, আবার অসুস্থ হলে কলকাতায় এনে তাঁকে অস্ত্রোপচার করা হয় (৩০ শে জুলাই, ১৯৪১), সেদিনই করি শেষ রচনা ‘তোার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি’। অবশেষে ৭ই আগস্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

একাশি বছরের জীবনে প্রায় আটষট্টি বছর সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিতা-কাব্য রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রকাব্য বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। তিনি বাংলা কাব্যকে বাংলা ভাষার অন্তরশক্তি, ভাবমহিমা কল্পনালীলা ও ছন্দোগৌরবে, দেশকালের প্রেক্ষিতে মনন-চিন্তা-অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করে আধুনিক মনের উপযোগী করে

তুলেছেন। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর একটি বিবর্তনসূত্র আছে, সেগুলিকে কয়েকটি পর্বে চিহ্নিত করা যায়। ‘কবিকাহিনী’, ‘বনফুলে’ কবির কাব্যচর্চার হাতে খড়ি। প্রথমপর্ব বা শিল্পিত কাব্যধারার সূচনা ‘সম্বা-সংগীত’ (১৮৮২), ‘প্রভাত-সংগীত’ (১৮৮৩), ‘ছবি ও গান’ (১৮৮৪) এবং ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৮৬) থেকে ধরা হয়। এগুলির মধ্যে কবির কৈশোর-কল্পনা, ক্রমশ অস্পষ্ট কুহেলিকা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথসম্বানী বলা যায়। একটি অনির্দেশ্য প্রেমানুভূতি এসময় কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ-খোঁজায় ব্যাকুল দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্বে যার নিঃসন্দ্বিধ পরিচয় পাওয়া গেল ‘মানসী’ (১৮৯০) ‘সোনার তরী’ (১৮৯৪), ‘চিত্রা’ (১৮৯৬), ‘চেতালি’ (১৮৯৬) ও ‘কল্পনা’ (১৯০০) কাব্যে। কবি এ সময় লীলাচপল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যমাধুরীর সঙ্গে কালিদাসের তথা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সৌন্দর্য লোকে বিচরণ করে, দেশকালের আবহমানতায় নির্মিত স্বকীয় কবিসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে চিরন্তন সৌন্দর্য জগৎকে খুঁজে পেয়ে, নবতন আত্মোপলব্ধির আনন্দ হর্ষ-বিষাদ, কল্পজগৎ আর বাস্তবজগৎ একাকার হয়ে কবিতায় নতুন ভুবন রচনা করেছেন। চিত্রকল্পে, শব্দযোজনায়, কাব্যছন্দে, সে পরিচয় আছে। এই সময়ের ‘সোনার তরী’ শীর্ষক কবিতা দ্বিতীয় পর্বের ‘সোনারতরী’ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। সোনার তরী কাব্যে প্রথমে দেখি রহস্যময় সৌন্দর্য জগতের মধ্য থেকে উঠে আসা কতকগুলি প্রশ্ন কবি চিত্তকে পীড়িত করছে। বাস্তব পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, আর সৌন্দর্য জগতের উর্ধ্বগত আকাশে বিহারের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সৌন্দর্যের জগতে নিরুদ্দেশ যাত্রার অমোঘ আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেছেন। এই জিজ্ঞাসা থেকেই কবির ‘জীবন-দেবতা’ ধারণার সূচনা।

তৃতীয় পর্বে কবি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মভাবে জগতে বিচরণ করেছেন। জীবন দেবতা কল্পনা ও বিশ্বানুভূতি, ভগবৎ-ভক্তি, ব্যক্তিসত্তার অতীত রহস্যময়ী নিয়ন্ত্রী শক্তির পরিচয় পেয়ে এক সময় কবি মনে যে উৎকর্ষা সৃষ্টি করেছিল, তা-ই কবিতার প্রেরণা হয়ে দেখা দিল। প্রকাশিত হল — ‘নৈবেদ্য’ (১৯০১), ‘খেয়া’ (১৯০৬), ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০), ‘গীতিমাল্য’ (১৯১৪) ও ‘গীতালি’ (১৯১৪) কাব্য। শেষোক্ত কাব্যত্রয়ী গীতিধর্মী। উপরের সবকটি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতাও নির্বাচিত গানের কবির স্বয়ংকৃত ইংরেজি অনুবাদ W.B. Yeats-এর ভূমিকাসহ Gitanjali (Song Offerings) (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এখানে কবির বিশ্বানুভূতি থেকে অসীম বা ‘ভূমা’র ভাবনার সূত্রপাত। ভূমা কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণে নয়, প্রকৃতির সীমাহীন রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর লীলাচঞ্চল পরিক্রমা। এ পর্বের ভিন্নতর রসের একটি কবিতা নৈবেদ্যের ‘শতাব্দীর সূর্য’ মূল পাঠের বিষয়।

চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে সুস্পষ্ট দিক পরিবর্তন ঘটেছে। ‘বলাকা’ (১৯১৬), ‘পুরবী’ (১৯২৫) ও ‘মহুয়া’ (১৯২৯) এই তিনটি কাব্য নতুন জীবনদর্শনের পরিচয়বাহী। এতদিন ছিল বস্তু বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীত সত্যের সম্বান, প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় সীমা থেকে অসীমে যাত্রা এবার অসীম থেকে সীমাকে দেখা, বিশ্বজীবনের উপলব্ধি থেকে বস্তুজগৎকে দেখা—অর্থাৎ ভৌমচেতনা থেকে বিশ্বচেতনা, এবার বিশ্বচেতনা থেকে ভৌম জগৎকে দেখা। তাই কবি এ পর্বে অনেকটা প্রাজ্ঞ-দার্শনিক, মননশীল জীবনদ্রষ্টা। তিনি পুরাতনকে নতুনরূপে দেখেছেন, পুরাতন যৌবনোজ্জ্বল আবেগস্বাক্ষর প্রেমানুভূতির পরিবর্তে অনেক শাস্ত ও সংযত, আদর্শনিষ্ঠ। এই দার্শনিক ভাবানুভূতি তাঁর ছন্দ রীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বলাকার এই নতুন ভাবরাশি, নতুনতর ছন্দের অনিয়মিত, অসম ছত্রের মুক্তক ছন্দে অভিব্যক্তি পেয়েছে। ‘বলাকা’র ‘তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে’ (শঙ্খ) কবিতা এককের মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্য মুক্তকে রচিত নয়।

পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি — ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২), ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫) ‘পত্রপুট’ (১৯৩৬) ও ‘শ্যামলী’ (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থকে পুনশ্চবর্গের কাব্যগ্রন্থ বলা চলে। পুনশ্চতেই গদ্য কবিতার সূচনা, ‘শ্যামলী’ পর্যন্ত

এই গদ্য কবিতার বিস্তার এবং কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। রবীন্দ্রকাব্যধারার যে সামান্য পরিচয় ইতোমধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে এটি লক্ষণীয় যে তিনি সর্বদাই, তাঁর অতীত ও কীর্তিকে অতিক্রম করে নিত্য নতুন পথে অজানার সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। সত্তর অতিক্রান্ত কবি বিচিত্র ভাব ও রূপচর্চার মধ্য দিয়ে কাব্যশিল্পের চরমোৎকর্ষে পৌঁছেও তৃপ্ত নন। এই অতৃপ্তির বেদনা থেকেই ‘তিনি হঠাৎ ছন্দোহীন ও গদ্যছন্দে প্রসাধনবর্জিত, কল্পনার ঐশ্বর্যরিক্ত কবিতা রচনা’ করলেন। এ পর্বে তিনি ছন্দোমোহ সৃষ্টির পরিবর্তে, ‘অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও ব্যাকুলতায় কাব্যের নিগূঢ় আবেদন পাঠক চিত্তে’ সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ পর্বের কবিতায় কোনো বিশেষ জীবন দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রবণতা হলেও, কবিতা তার নিজস্ব ভাবগরিমা, বিষম-গৌরব ও কল্পনার মহনীয়তায় হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ এভাবে এ পর্বের কাব্যগ্রন্থে ন্যূনতম অলঙ্কার প্রয়োগে প্রধানত ভাবসৌন্দর্যের ওপর নির্ভর করে কাব্যরচনার পরীক্ষা করে যে ধারাটির সূচনা করেছেন, তা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের দ্বারা বহুচর্চিত হয়েছে। এককের ৪র্থ ও ৫ম মূলপাঠের জন্য নির্বাচিত দুটি কবিতা যথাক্রমে পত্রপুট ও শ্যামলী থেকে গৃহীত হয়েছে।

ষষ্ঠ বা শেষপর্বের কাব্য ‘প্রান্তিক’ (১৯৩৮), ‘আকাশ প্রদীপ’ (১৯৩৯), ‘নবজাতক’ এবং ‘সানাই’ (১৯৪০), ‘রোগশয্যায়’ (১৯৪০), ‘আরোগ্য’ (১৯৪১), ‘জন্মদিনে’ (১৯৪১)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ‘শেষলেখা’ (১৯৪১)। প্রথমোক্ত চারটি কাব্যগ্রন্থ কবি কল্পনার শিথিল, এলায়িত ভঙ্গি ; অসংবৃত বস্তুপুঞ্জের ভারে আপাতভাবে দুর্বল মনে হলেও পরবর্তী মুহূর্তে কাব্যের অন্তর্নিহিত রূপটিকে “গদ্যছন্দের স্মৃতিবাহী সহজ সরল ছন্দ প্রয়োগে” ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ‘রোগশয্যায়’ থেকে ‘জন্মদিনের’ কবিতাগুলিতে রোগজীর্ণ কবি যেন আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছেন এবং তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রূপাতীত সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত্যুকে স্বীকার করেও তিনি জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। শেষপর্বে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিশ্বাস, স্বার্থপর লোভীদের প্রতি ভৎসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। এ সময় শব্দচয়নে, চিত্ররচনায়, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কবি রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যাকুলতার পরিবর্তে, নিরাসক্ত, তির্যক, কুচিং বিবর্ণ, তীব্র বাগ্বিন্যাসে ভিন্নতর রূপ রীতির সৃষ্টি করেছেন। ‘রোগশয্যায়’ কাব্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দৃষ্টির মমতা নিয়ে দেখা জীবনের যে সূক্ষ্ম ও সত্যরূপ এবং বিভীষিকা ও অসংলগ্ন চিন্তা ভারাক্রান্ত মনের উদ্ভট দুঃস্বপ্ন-পীড়িত অনুভূতির এরকম আবেগময় শিল্পসম্মত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এরই সঙ্গে আছে ‘আরোগ্য’ রোগমুক্তির স্বপ্ন, আনন্দানুভূতি। ‘জন্মদিনে’ পৃথিবীর প্রতি কবির প্রসন্ন বিশ্বাসের কথা রূপায়িত হয়েছে।

কাব্যকথা প্রসঙ্গে ‘সন্ধ্যাসংগীত’ থেকে ‘জন্মদিনে’ পর্যন্ত কাব্য ও কবিমানসের এই পরিচয় থেকে এককের পাঁচটি কবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব হবে আশা রেখেই এই পরিক্রমা।

## ৩৪.৪ মূলপাঠ — ১ : সোনার তরী

### সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

রাশি রাশি ভারা ভার

ধান কাটা হল সারা,



ভরা নদী ক্ষুরধারা  
খরপরশা ।  
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—  
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে, খেলা ।  
পরপারে দেখি আঁকা  
তরুছায়মসী-মাখা  
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা  
প্রভাতবেলা-  
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা ॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—  
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে ।  
ভরা পালে চলে যায়,  
কোনো দিকে নাহি চায়,  
ঢেউগুলি নিরুপায়  
ভাঙে দু ধারে—  
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে ॥  
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে—  
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে ।  
যেয়ো যেথা যেতে চাও,  
যারে খুশি তারে দাও—  
শুধু তুমি নিয়ে যাও  
ক্ষণিক হেসে  
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥

যত চাও তত লও তরণী' পরে ।

আর আছে ?—আর নাই, দিয়েছি ভরে ।  
এত কাল নদীকূলে  
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে  
সকলি দিলাম তুলে  
থরে বিথরে—  
এখন আমারে লহো করুণা ক’রে ॥

ঠাই ঠাই, ঠাই নাই — ছোটো সে তরী  
আমারি সোনার ধানে গিয়েছ ভরি ।  
শ্রাবণগগন ঘিরে  
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,  
শূন্য নদীর তীরে  
রহিনু পড়ি—  
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

শিলাইদহ । বোট  
ফাল্গুন ১২৯৮

---

### ৩৪.৫ সারাংশ — ১

---

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অবিরাম বর্ষণ থেকে ক্ষণিক ক্ষান্তির মুহূর্ত । এরই মধ্যে এক কৃষক নদীর ধারে একাকী বসে আছে, কোনো ভরসা নেই । জলভরা খরস্রোতা নদী, দুর্বীর বেগে বহমান । তার চারিদিকে রাশি রাশি বোঝাই কাটা ধান ।

ছোটো খেতের ধারে একলা বসে, তখন পরপারের তরুছায়াচ্ছন্ন গ্রামটি আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছিল । দূর থেকে গান গাইতে গাইতে কে যেন আসছে, দেখে মনে হল সে যেন চেনা । কোনো দিকে না তাকিয়ে সে পালতোলা নৌকায় ঢেউ তুলে কোথায় চলেছে । কৃষক মাঝিকে কাতর কণ্ঠে কূলে নৌকা ভেরাবার জন্য অনুরোধ করল । তার কেটে রাখা সোনার ধান তুলে নিয়ে তারপর সে যেখানে ইচ্ছা যাক—এটাই একান্ত ইচ্ছা ।

অনুরোধ মত নৌকায় সমস্ত তুলে দিয়ে তাকে করুণা করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলায় উত্তরে ‘ঠাই নেই’ বলে সোনার ফসল নিয়ে গেলেও, কৃষক প্রবহমান নদীর তীরে নিঃসজ্জা ও অচল হয়ে বসে রইল ।

---

### ৩৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

---

‘সোনাতির তরী’ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা সোনার তরীর রচনা স্থান শিলাইদহ, কাল—ফাল্গুন ১২৯৮, ইং

ফেব্রুয়ারি ৪ মার্চ ১৮৯২। কবিতাটির নামকরণ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘সোনার তরী’ সোনা তৈরি তরী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি ব্যঞ্জনাগর্ভ। জীবনের সাধনায় যে স্বর্ণসম্ভার, তাই তো ফসল, সেই ফসল বহন করে যে তরী তা-ই সোনার তরী। কবিতার এই নামকরণটি আক্ষরিক-অর্থ-অতিরিক্ত অন্যতর অর্থে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। সংসার-তরণীতে কবি তাঁর সৃষ্টির সমস্ত সম্পদ তুলে দিলেও, সংসার কবিকে গ্রহণ করল না। মহাকালরূপী নেয়ে ইতিহাসরূপ সোনারতরী নিয়ে সোনার ধান রূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তুলে নিলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানুষের শিল্প, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সঞ্জিত থাকে। জগৎ স্রষ্টাকে চায় না, তার শিল্পকে সৃষ্টিকে চায়, এটাই চিরন্তন সত্য। মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যটি আলোচ্য কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে বলে কবি কবিতাটির নামকরণ করেছেন ‘সোনার তরী’। সোনার তরী মানব সংসারের তরী যাতে কবি বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে নিজের সৃষ্টি সম্ভারকে তুলে দিলেও “ঠাই নাই, ঠাই নাই—ছোট সে তরী”—তাই কবি স্বয়ং নির্জনতায় নির্বাসিত। এ সব বিচারে কবিতার নামকরণ তাই সার্থক ও সুন্দর। এ পর্বে কবি আত্মস্থ, তাঁর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ—রবি-রশ্মির মধ্যাহ্নদীপ্তি বিচ্ছুরিত। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে কবির দৃষ্টি কল্পলোকের আলোকচ্ছটা থেকে বাস্তব জগতের উদার আকাশ-বাতাসে স্থাপিত। এ সময় কবির সৌন্দর্যানুভূতি ও বিশ্বানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশিত। কবি-কল্পনায় কবিত্বে প্রকাশ-ভঙ্গির চমৎকারিত্বে, ভাষার ঐশ্বর্যে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে কবিতাগুলির দীপ্যমান। ‘সোনার তরী’ তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে যুক্ত হয়েছে, একটি তত্ত্ব যার ব্যাখ্যা নানা কবিতায় রূপে ভিন্ন, স্বরূপে এক।

কবিতাটি রচনার সময় কবি জমিদারি দেখাশোনার কাজে কখনো শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসরে বাস করেছেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর অনুভবে, রঙে, রূপে কল্পনায়, নিত্য নতুন হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। পল্লীর নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। এই পরিচয় সূত্রেই ‘সোনার তরী’ কাব্য। ‘সোনার তরী’ কবিতা এই অনুভবের সৃষ্টি। এখানেও প্রকৃতি ও মানুষ, কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। একে বলা যেতে পারে বিশ্বানুভূতি—এটি সম্ভব কবির সৃষ্টিপ্রেরণা বা অন্তর্দেবতার অন্তঃপ্রেরণায়, সম্ভবত কবির এই অন্তর্দেবতাই সোনারতরী কবিতার ‘নেয়ে’। অন্তর্দেবতা কোনো অলৌকিক শক্তিদর নন, কবির প্রকাশপ্রেরণা, যিনি কবির মনের মধ্যে বসে সমগ্র জগৎকে সাহিত্যে রূপদান করেছেন। প্রকৃতি—সোনার তরী কবিতার উৎস, চলমান নদীস্রোত, যার মধ্যে কবি জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক উপলব্ধি করেছেন, তাকে এখানে দেখেছেন সাংকেতিকতায়, রহস্যময়, রূপকের ব্যবহারে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী রূপে।

‘সোনার তরী’ কাব্যে কবি নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ, পদ্মার প্রবহমানতা, বিচিত্র খণ্ড খণ্ড রূপকল্প ও চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে, কখনও সাংকেতিক রহস্যময়তায়, কখনো বর্ষা প্রকৃতির বিষাদ উজ্জ্বলতায় প্রকাশিত হয়েছে। ‘সোনার তরী’ কবিতাটিও এরকমই এক ঘন বর্ষায় আবৃত নদীচরের নিসর্গচিত্র। কবির ভাষায় পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেটি এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

‘সোনার তরী’ কবিতা বহু-বিতর্কিত কবিতা। এর বস্তু সত্য ও ভাবসত্য নিয়ে নানা মত আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন— “.... ছিলাম পদ্মার বাটে। জলভরানত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরু শ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে ধেয়ে চলেছে.....। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাটা ধানে বোঝাই চাষীদের নৌকা..... ভেসে চলেছে। এই ..... ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত।” ..... ঐ বাদলদিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন

ও তার ছন্দে প্রকাশিত। কেউ কেউ এতে একটি রূপকের সম্বন্ধ পেয়েছেন। রূপক ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন — “সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। ..... মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে, জীবনের ক্ষেত্রটা দ্বীপের মত ... সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে। একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে..... আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে — তোমার জন্য জায়গা কোথায় ?” — মহাকাল মানুষের কর্মকীর্তি বহন করে রক্ষা করে, কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করে না। এ কবিতাকে কেউ কেউ বস্তুবিশ্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের রূপক হিসেবেও দেখেছেন। কবিতার মধ্যে যে সমস্ত প্রতীক বন্দন করেছেন, তা হল : সোনার তরী — বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য, মাঝি — সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নদী — অখণ্ড কালপ্রবাহ, খেত — জীবনের কর্মক্ষেত্র, ধান — সৌন্দর্যের সঞ্চার। ড. নীহার রঞ্জন রায় বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতা হিসেবেই ‘সোনার তরী’কে দেখেছেন। শ্রাবণের ঘনবর্ষা, দুকূলভরা খরশ্রোতা নদী প্রভৃতির অপার সৌন্দর্য স্পর্শকাতর কবিচিত্তে এক অপূর্ণ বেদনাপ্লুত রস ও সৌন্দর্যের অপূর্ণ রাগিণী সৃষ্টি করে। সেই রাগিণীই সোনার তরী কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। এর কাছে তত্ত্ব অবাস্তব। শূন্য নদীতীরে একা থাকার বেদনা, নিজেকে একান্ত করে দান করতে না পারায়, কোনো কোনো ভাব-মুহূর্তে প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণ বলে মনে হয়—এ তো কোন তত্ত্ব নয়, অনুভূত ভাব মাত্র। সুতরাং তত্ত্ব নিয়ে বিব্রত হওয়ার কারণ নেই।

কিছু কিছু সমালোচক কবিতাটির একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে ‘সোনার তরী’কে শুধুমাত্র প্রকৃতির কবিতা বলা ঠিক হবে না, তাঁরা এতে একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা মানুষের জীবন এক খণ্ড চাষের জমি বিশেষ। এ জীবন মহাকাল বেষ্টিত, জীবনের ছোটো খেতটুকুও খরশ্রোতা নদী ঘেরা। মানুষ তাঁর সারাজীবনের সম্পদ সংসার-তরণীতে বোঝাই করে দিলেও, সংসার তাকে গ্রহণ করলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না — ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই — ছোট সে তরী। মহাকালের কাছে ব্যক্তি নয়, তাঁর সৃষ্টিই প্রধান। সে সৃষ্টিকে রক্ষা করে। দেশ-কাল নিরপেক্ষ এই চিরন্তন দার্শনিক সত্যটি এই কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য— কিছু সমালোচকের এই বিশ্বাস।

সোনার তরী-র ছন্দ লক্ষণীয়। মিশ্রবৃত্তের পক্ষে অভূতপূর্ব (৮ + ৫) ১৩ মাত্রার ছত্র বিন্যাস স্তবক গঠনে ৮ + ৫, ৮ + ৫, ৮ + ৮ + ৮ + ৫ এবং ৮ + ৫ ভাবের উপযোগী একটি সুর যোগ করেছেন। প্রথম ৮ + ৫ মাত্রার দ্বিপার্বিক দুটি ছত্রের মাত্রা সমকত্র ও অন্তর্মিল যে ধ্বনিসৌকর্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী তিনটি ৮ মাত্রার সমধ্বন্যাত্মক তিনটি পর্ব বিন্যস্ত করে একটি সুরের ঐক্যতান নিয়ে আসা হয়েছে। তার সঙ্গে ৮ + ৫ মাত্রার শেষ ছত্রের মিলের সঙ্গে পূর্ববর্তী ৫ মাত্রার পর্বের অন্তর্মিল কাব্য সুখমা নিয়ে এসেছে। এভাবে দুটি স্তবক কবিতাতে অভিনব ও বিরল ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে কোনো যুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির প্রয়োগ না থাকায় অসামান্য সুরতরঙ্গিত রমণীয়তা সৃষ্টি করেছে। চিত্র সন্নিবেশের কৌশলেও কবিতাটি আকর্ষক। ভরা নদী, খরজল, মেঘমেদুর পরপার, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তরী, মাঝি এ সবার সঙ্গে কবি হৃদয়ের ব্যাকুলতা একটা করুণ রাগিণী সৃষ্টি করেছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ভরা নদী ক্ষুরধারা — বর্ষায় নদীজল ক্ষুরের মতো ধারালো অর্থাৎ খরশ্রোতা বোঝানো হয়েছে।

তরু ছায়া মসীমাখা (কালিমাখা) — আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় গাছের ছায়ায় ঘেরা গ্রাম অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে

মনে হচ্ছে।

বাঁকা জল করিছে খেলা — বাঁকা শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা যায়। একটি অর্থে নদী বেঁকে বেঁকন করে আছে, অপর ব্যঞ্জনগর্ভ অর্থ ‘কুটিল বা প্রতিকূল’।

কে আসে পারে — ‘কে’ এই শব্দটি ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে।

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে — বর্ষা সমাগমে কাটা ফসল নিয়ে তরীর অপেক্ষায় যখন আছেন এমনি সময় দূর থেকে দেখে কোন চেনা চেনা নেয়েকে যেন দেখা যাচ্ছে — এমনি সাধারণ অর্থ হলেও উদ্ভৃতিটি ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। যাকে দেখে ‘মনে হয় চিনি উহারে’ সে যে কবির হৃদয়গত অন্তর্যামী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনায় ব্যক্তি আমির অতিরিক্ত পৃথক এক অন্তঃপ্রেরণা বা অন্তর্শক্তি যাকে অনেকে অন্তর্দেবতা বা জীবনদেবতা বলেন তার কল্পনা করেছেন। ‘সোনার তরী’ কবিতায় এরা আভাস, চিত্রায় তার পরিণতি। ইনিই কবির প্রেরণা, তাঁর কাব্যার্থিষ্ঠাত্রী দেবী। কোন্ বিদেশে — এখানে বলতে কোনো অজানা জগতে।

শুধু তুমি নিয়ে যাও— সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠ সম্ভার, মহাকালের তরণীতে তুলে দেওয়ার মধ্যেই স্রষ্টার সার্থকতা। কিন্তু কালের মাঝি কোনোদিকে দৃকপাত না করে নিতান্ত নিরাসক্ত চিন্তে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে স্রষ্টার একান্ত অনুরোধ সে জীবনের যা কিছু অর্জিত ফল তাকে যেন নিয়ে যায়।

এখন আমারে লহো করুণা করে — একলা জনবেষ্টিত ছোটো খেতে বসে আছি। করুণা করে তোমার তরীতে তুলে নাও। এর আধ্যাত্মিক অর্থ হ’তে পারে, আমাকে সকল কর্মবন্দি থেকে মুক্ত করো। অথবা আমার শিল্পের সঙ্গে আমারও অস্তিত্বকে যুক্ত করো।

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী — আজীবন সঞ্চিত সোনার ফসল, সংসার তরণীতে তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ কবির সৃষ্টি সমাদৃত হওয়ায় তিনি আনন্দিত। কিন্তু সেখানে তাঁর স্থান না হওয়ায় — শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি — তিনি একাকিত্বের বেদনায় বিষণ্ণ।

## অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে এই এককে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ — ১ একাধিকবার পড়ুন, তাহলেই প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক) ছত্র পূরণ করুন

একখানি ছোট খেত, আমি একেলা —

.....

পরপারে দেখি আঁকা

.....

.....

প্রভাত বেলা

এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা ॥

খ) যেয়ো যেথা যেতে চাও

.....

.....

ক্ষমিক হেসে ।

গ) চতুর্থ পর্বে কবি অনেকটা প্রাজ্ঞ দার্শনিক \_\_\_\_\_ যিনি পুরাতনকে \_\_\_\_\_ দেখেছেন, পুরাতন \_\_\_\_\_ আবেগস্বাদ \_\_\_\_\_ পরিবর্তে অনেক শান্তি ও সংযত, \_\_\_\_\_ ।

ঘ) রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি হল—

পুনশ্চ \_\_\_\_\_

পত্রপুট \_\_\_\_\_

২) সঠিক উত্তরে ঠিক (☑) চিহ্ন দিন :

ক) ‘বলাকা’ কাব্যের প্রকাশ —

১) ১৯১৪ খ্রিঃ

২) ১৯১৬ খ্রিঃ

৩) ১৯১৩ খ্রিঃ

খ) ‘পত্রপুট’ কাব্য প্রকাশ —

১) ১৯৩৪ খ্রিঃ

২) ১৯৩৫ খ্রিঃ

৩) ১৯৩৬ খ্রিঃ

গ) ‘রোগশয্যা’ কাব্য প্রকাশ —

১) ১৯৪০ খ্রিঃ

২) ১৯৪১ খ্রিঃ

৩) ১৯৩৮ খ্রিঃ

ঘ) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্য —

১) জন্মদিন

২) শেষ লেখা

৩) শেষ সপ্তক

৩) ‘সোনার তরী’ কবিতা রচনা ও ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল লিখুন ।

৪) কোন্ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ‘গদ্য কবিতা’ রচনার সূচনা করেন ? কাব্যগ্রন্থটির রচনা কাল লিখুন ।

৫) রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন । আলোচনা ৫০টি

শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন।

- ৬) 'সোনার তরী' কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন (৩০টি শব্দ)।
- ৭) 'সোনার তরী' কাব্য রচনাকালের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার যতটুকু জানা আছে তা বর্ণনা করুন। (৫০টি শব্দ)।
- ৮) 'সোনার তরী' কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা বিস্তৃত করুন।
- ৯) 'সোনার তরী' কবিতায় কিছু সমালোচক দার্শনিক তত্ত্বের স্থান পেয়েছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

---

### ৩৪.৭ মূলপাঠ — ২ : শতাব্দীর সূর্য আজি

---

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে  
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বেজে  
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী  
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী  
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে  
গুপ্ত বিষদস্ত তার ভরি তীব্র বিষে।  
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে  
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষেপে  
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি  
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়োগি  
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়  
ধর্মেতে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।  
কবিদল চীৎকারিছে জগাইয়া ভীতি  
শ্মশানকুকুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

---

### ৩৪.৮ সারাংশ — ২

---

অস্ত্রে অস্ত্রে যখন রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে, তার মধ্য দিয়েই (উনবিংশ) শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্ত গেল। কুটিল ফণা তুলে নির্মম সভ্যতা নাগিনী তার বিষদাঁত নিয়ে উদ্যত। লোভী স্বার্থান্বেষীদের মুখোশ খসে গিয়ে বেধেছে সংঘাত। তারা জাতিপ্রেমের নামে, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে বর্বরতায় মেতে উঠেছে। শ্মশান কুকুরের মতো একদল কবি এর প্ররোচনা দিয়ে জয়গান গাইছে।

---

### ৩৪.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা , কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

---

‘শতাব্দীর সূর্য আজি’ রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য (প্রকাশ ১৩০৮, ইং ১৯০১) কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতা। কাব্যের মতো কবিতার রচনাকাল ১৩০৭ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ইং ১৯০০-১৯০১। কবি এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কোনো নাম দেননি। কবিতার প্রথম ছত্র বা সংকলনের সংখ্যায় এর পরিচয়। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতাই কবির ঈশ্বর বা জীবননাথের জন্য নিবেদিত। “পারিবারিক শিক্ষা”, ব্রাহ্ম-আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান, বিশেষত পিতা মহর্ষি দেবের সাহচর্যের ফলে কবির মনে কিছু ধর্মসংস্কার ও ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্যের পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, পৃথিবী ও মানুষ তাঁর ছিল প্রথম আশ্রয়; সংসারের অসংখ্য কাজের জন্য, দৈনন্দিন জীবনের নানা সংশয়-সংকট সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনা ও প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়েছে, ব্যাকুল করেছে, তারই প্রতিক্রিয়া কখনও কবিতায় প্রবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান কবিতা এমনই একটি ঘটনায় আশ্রয়ী যা মনুষ্যত্বের অবমাননার দ্বারা ধিক্কৃত। কবিকে এ সময়ে আমরা বিশেষভাবে বিশ্বমনস্ক দেখতে পাই। আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধ বা চীনের বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা তার স্বাক্ষর। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়—১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ৯০টি নৈবেদ্য লিখে ফেলেছেন। বর্তমান ৬৪ সংখ্যক কবিতা এই সময়ের মধ্যেই লেখা। নৈবেদ্যের কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিকে উৎসর্গ করেছেন। কাব্যের অধিকাংশ কবিতা প্রেম যৌবন সৌন্দর্য অথবা জীবন-প্রতি জয়গান থাকলেও এর আড়ালে একটি তত্ত্ব, চিন্তা কল্পনা কাজ করেছে। একটি বিশেষ তত্ত্বও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটি ব্রাহ্মমতের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে রসের পরিবর্তে অনেক সময় ধর্ম ও নীতিবোধ প্রধানতর কাজ করেছে। উচ্চভাব ও স্পষ্ট বক্তব্য কবিতার প্রাণ। অপর কয়েকটি কবিতা সমাজ ইতিহাস, দেশপ্রেম, মনুষ্যধর্ম ও মানবিক আবেদনে তীব্র। তীক্ষ্ণ বক্তব্যে ক্ষুরধার অথচ মার্জিত, মহত্বব্যঞ্জক ও ওজোগুণসম্পন্ন।

এ সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজরা বুয়রদের দেশ আক্রমণ (১২ অক্টোবর ১৮৯৯-৩১মে ১৯০২) করে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ও চীনে শোষণক্রিষ্ট চীনারা বিদেশী বিতাড়নের জন্য ‘বক্সার বিদ্রোহের’ (১৯০০ খ্রিঃ) সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সমাজভেদ’ প্রবন্ধে (‘স্বদেশ’) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন — “সম্প্রতি যুরোপে এক অশ্ব বিদ্রোহ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। .... সেই জন্যই বোয়ার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম প্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তি ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।”

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ৬৪ সংখ্যক কবিতা রচনা। কবি তখন শিলাইদহে। তিনি লক্ষ্য করেছেন নেশনতন্ত্রী ইউরোপ—অর্থ-বিত্ত-বৈভবের নেশায় মত্ত হয়ে হিংস্র আক্রমণে নেশন-এর ধূয়া তুলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য জাতিবৈরের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বার্থপর দেশপ্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কবি এইসব জাতিস্বার্থ প্রণোদিত যুদ্ধকে হিংসার উৎসব বলে গণ্য করেছেন, স্বার্থপরায়ণ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। নতুন শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের দেখা নেই, শতাব্দীর শেষ সূর্য ধ্বংসের মধ্য দিয়েই এভাবে অস্তমিত হল। এই বক্তব্যই পত্রপুটের ১৬ সংখ্যক কবিতায় (আফ্রিকা) ভিন্ন ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

\* **পাদটীকা** — বুয়র : দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু ওলন্দাজ ১৬৫২ খ্রিঃ প্রথম বসতি স্থাপন করে চাষবাস শুরু করে। এদেরই কিছু স্থানীয় অধিবাসী ‘হটেনটট’ মেয়েদের বিয়ে কবে স্থায়ী হয়। এই মিশ্র জাতি ‘বুয়র’ নামে পরিচিত। পরে ফরাসি, জার্মান, সুইডিসরা নানা ধরনের অত্যাচারে নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এখানে আসে। ইংরেজ



আসে ১৯শ শতকের গোড়ায়। বুয়ররা উত্তরে সরে এসে তখনকার অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং ট্রান্সভাল-এ নূতন বসতি করে। অরেঞ্জ নদীর ধারে হীরা, ট্রান্সভালে সোনা আবিষ্কার হলে, ভাগ্য্যেষী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপক আগমন শুরু হয়। স্বাতন্ত্র্যবাদী বুয়রদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, যার সূচনা ১৮৭৮-৭৯, পরিণতি ১৮৯৯-১৯০২ তে।

একই ধরনের শোষণের রাজনীতি চলেছিল চীনের ওপর। তাই বিদেশি বিতাড়নের জন্য ‘বক্সার বিদ্রোহ’ (১৯০০) শুরু হয়। দাজ্জা হাজ্জামায় বহু যুরোপীয় নিহত হলে, ইংরেজ-জার্মান-রুশের সম্মিলিত আক্রমণে চীনারা পর্যুদস্ত হয় (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১)। অতঃপর ১২ টি পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি অসমচুক্তিতে চীনকে আবদ্ধ করে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

চতুর্দশপদী এই কবিতার উপস্থাপনা বক্তব্যের সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ। মিশ্রবৃত্তের সাধারণ পর্বের ৮ + ৬ ছত্রেতে বিন্যস্ত। প্রথম আট ছত্রে প্রস্তাবনা, শেষের ছয় ছত্রে মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা। এখানে যেহেতু বক্তব্য বিষয় বড়ো, তাই প্রস্তাবনা অংশ প্রবহমান মিশ্রবৃত্তের কক, খখ, গগ, ষষ্ঠকের পর ঘঘ, ঙঙ, চচ, ছছ ছত্রগুচ্ছে উপস্থিত করেছেন। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতায় আত্মনিবেদনের ভাব, অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকৃতি, গভীর ধর্মবোধ প্রভৃতি মহর্ষির জীবনবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় অনেকটা শান্ত, সমাহিত ভাবপ্রকাশক নিরুত্তাপ, সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগে অভিব্যক্ত হয়েছে। আবার স্বদেশপ্রেমের কবিতায় ভাষা অপেক্ষা স্পষ্ট ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। বর্তমান কবিতায় ভাষা বক্তব্য বিষয়ের জন্য হয়ে উঠেছে তীব্র, তীক্ষ্ণ, দৃষ্ট। রক্তমেঘ, হিংসার উৎসব, গুপ্ত বিষদন্ত, প্রলয় মন্থন ক্ষোভ, শ্মশান কুকুর প্রভৃতি যুক্ত সংযুক্ত শব্দ যে ধ্বনি ও অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তা বক্তব্যকে তীব্রতর করেছে।

### কবিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা —

শতাব্দীর সূর্য আজি ইত্যাদি— উনিশ শতকের শেষ সূর্য রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অস্ত গেল। একথা বলার পিছনে যে ব্যঞ্জনা আছে সেটিকে এভাবে বলা যায়—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আফ্রিকার সাধারণ বুয়র কৃষকদের আক্রমণ করছে হীন স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য। রবীন্দ্রনাথকে এ ঘটনা একান্ত বিম্ব করেছিল বলেই নৈবেদ্যে ভগবৎভক্তিমূলক কাব্য রচনা করলেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি, তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট, ঋজু ওজস্বী ভাষায় বর্তমান কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী— যুরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে নির্দয় বিষধর সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কল্প আফ্রিকার অরণ্য সমাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, সভ্যতার হিংস্র আক্রমণে আতঁরবে চিৎকার করছে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত — সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্বগ্রাসী আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা আফ্রিকার জলু ও বুয়রদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণ। বুয়ররা নিজভূমে স্বাধিকার রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়তা দেখালে ছলে-বলে-কৌশলে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ইংরেজ শক্তিতে তাদের প্রতিহত করে। এর পিছনে যেমন ছিল জাতিগত স্বার্থ, তার পাশাপাশি ছিল তীব্র অর্থসম্পদ তৃষ্ণা। মানবতার পীড়নকারী অর্থলোভী সাম্রাজ্যবাদকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে।

প্রলয়মন্থন-ক্ষোভ — লোভ যখন হয় সীমাহীন, তখন লোভীর কোনো দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। স্বার্থপর মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এরই ফলে অনিবার্য ধ্বংস আসে। যুরোপী রাষ্ট্রশক্তির অপরিমেয় লোভ সেই

বর্বতার পরিচয় দিচ্ছে।

কবিদল চীৎকারিচ্ছে—উনিশ শতকের শেষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক কবিকুল উৎকট, সংকীর্ণ, জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ করছিল, তাঁদের কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সেই সম্পর্কে এই তির্যক মন্তব্য। এসব কবিরা হলেন প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। যেমন — ইংরেজ কবি হার্ডি, রার্ডিয়ার্ড কিপলিঙ, বুপাট ব্রুক, সিগফ্রিড স্যাসুন।

### অনুশীলনী — ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে এই এককে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলপাঠ — ২, প্রাসঙ্গিক আলোচনা সাহায্য নিয়ে উত্তর প্রস্তুত করুন।

#### ১) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক) দয়াহীন সভ্যতানাগিনী

তুলেছে ..... নিমিষে

..... তার ভরি .....।

খ) ....., লোভে লোভে

ঘটেছে সংগ্রাম .....

..... উঠিয়াছে জাগি

.....।

গ) রবীন্দ্রনাথ এক সময় \_\_\_\_\_ সম্পাদক ও \_\_\_\_\_ পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, \_\_\_\_\_ ও \_\_\_\_\_ তাঁর ছিল প্রথম \_\_\_\_\_।

ঘ) আফ্রিকার \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ বা চীনের \_\_\_\_\_ প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা।

#### ২) সঠিক উত্তরে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন :

ক) নৈবেদ্যে —

১) কবিতার নাম

২) কাব্যের নাম

১) কবিতাগুচ্ছের নাম

খ) নৈবেদ্যের কবিতা রচনা কাল —

১) ১৩০৭ সাল

২) ১৩০৮ সাল

১) ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ

- ৩) 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতাগুলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী পাঁচটি বাক্যে লিখুন।
- ৪) 'বুয়র' যুদ্ধ কী ও কেন সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৫০টি শব্দে)।
- ৫) 'শতাব্দীর সূর্য' বলতে কী বোঝান হয়েছে লিখুন।
- ৬) 'দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী' — সভ্যতাকে 'নাগিনী' এবং 'দয়াহীন' বলবার কারণ বুঝিয়ে লিখুন।
- ৭) 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত' — উদ্ভূত অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
- ৮) 'কবিদল চাঁৎকারিছে' — উদ্ভূতটির বক্তব্য বুঝিয়ে দিন এবং দুজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

---

### ৩৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

---

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের — সোনার তরী, নৈবেদ্য, বলাকা, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ।
- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (১-৪ খণ্ড)।
- ড. সুকুমার সেন — বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ম খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ)।
- ড. নীহাররঞ্জন রায় — রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।
- ড. খনা মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়।
- ড. বাসন্তী চক্রবর্তী — রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য।
- ড. পম্পা মজুমদার — রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস।
- ড. পবিত্র সরকার — ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ।
- ড. শিশিরকুমার ঘোষ — রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য।
- ড. ক্ষুদিরাম দাস — রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়।

---

## একক ৩৫ □ কাজী নজরুল ইসলাম : দুটি কবিতা

---

গঠন

৩৫.১ উদ্দেশ্য

৩৫.২ প্রস্তাবনা

৩৫.৩ নজরুল ইসলাম : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

৩৫.৪ মূলপাঠ—১ নারী (সর্বহারা)

৩৫.৫ সারাংশ—১

৩৫.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৩৫.৭ মূলপাঠ—২ : দারিদ্র্য (সিন্ধু হিল্লোল)

৩৫.৮ সারাংশ—২

৩৫.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৩৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ৩৫.১ উদ্দেশ্য

---

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র অনুরক্ত অথচ স্বাতন্ত্র্য সম্বানী কবিদের অন্যতম কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে নজরুলের সমকাল ও তাঁর কবিমানস সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। নজরুলের কাব্যজীবনের শুরু হয় ১৯১৯ সালে আর শেষ হয় ১৯৪২-এ। যদিও তার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু কাব্য বা কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল না। সুতরাং বলা যায় প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর কাব্যচর্চার আরম্ভ আর তার শেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে। এই এককটি পড়ে এই দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে যে সমস্যা ও শংকা দেখা দিয়েছিল, নজরুলের কবিতা তারই পরিণত ফল—এটি বুঝতে পারবেন।

এইসব ধারণা, বোঝা ও পড়া থেকে যে জ্ঞান আহরণ করবেন, সেটি থেকে প্রয়োজনে পরে প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা সমালোচনা করতে পারবেন।

- নজরুলের কাল ও কবিমানস সম্পর্কে ধারণা।
  - নজরুলের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয়।
  - নজরুল সম্পর্কে প্রয়োজনে আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন।
- 

### ৩৫.২ প্রস্তাবনা

---

বাংলা কাব্যে আধুনিকতা : ২০ শতক পর্যায়ে এ সময়ের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ইতিহাসের

পটভূমিকায় তার যুগ লক্ষণ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের শেষে কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর কাব্য রচনা করলেও (তাঁর নিজস্ব কাব্য ধর্ম সূত্রে) তিনি রবীন্দ্র-উত্তর কবি হিসেবে চিহ্নিত।

উনিশ শতকে ঘটে গেছে বাংলার নবজাগরণ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশি, অসহযোগ, সত্যগ্রহের মতো নানা ঘটনা। দেশের জনমানসে স্বাধীনতার স্পৃহা। ইংরেজি শিক্ষার আনুষাঙ্গিক ফল একদিকে যেমন বিশ্বকে চিনতে শিখিয়েছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, অপরদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যাপক পণ্য-উৎপাদনের জন্য কলকারখানা স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত সীমাহীন শোষণের ফলে প্রতিবাদী কণ্ঠ ভিন্নতর পথে সংগঠিত হয়েছে। নব্য শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার গুণে, মেকলের নির্দিষ্ট পথ অর্থাৎ চাকুরি ছাড়া আর কোনো কাজকেই কাজ মনে করছে না। ফলে বেকারি জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ বাড়ছে। এমনই সময় এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯১৮)। এর ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভারসাম্য আরও বিপর্যস্ত হয়েছে। যুদ্ধান্তে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে এক ধরনের রাজনৈতিক হতাশা জালিয়ানওয়ালাবাগের সমাবেশ ঘটেছিল, সেই নৃশংস হত্যালীলায় উদ্ভত শাসকশক্তির হটকারী আচরণে, দেশ জোড়া মানুষ বিশ্বাসঘাতকদের আচরণে হতচকিত হয়ে পড়ে। এ সময় থাকেই শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় বিক্ষোভ উদ্দাম হয়ে ওঠে। শিক্ষিত যুবকের জীবনের সমস্যা যত বেড়েছে, ততই দৃঢ় হয়েছে শাসক ইংরেজের প্রতি অভিশ্বাস। শতগুণে বেড়েছে তার পরাধীনতার গ্লানি। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা তার জীবন আরও জটিল ও আবর্ত সংকুল করেছে। ফলত তরুণ মনে যেমন অবিশ্বাস, হতাশা জাগে, তেমনই সমস্ত প্রচলিত ও প্রথাগত ধারণা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিক্ষোভ উদ্ভাল হয়ে ওঠে। এ সবই সমকালীন কবিদের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক কবিতার ভূমিকায় এই যুগ লক্ষণকে ব্যাখ্যা করেছেন — “একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের।” আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানের নতুনতর আলোকদীপ্তি। ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। এতদিন রাজা-বাদশা, জমিদার, বিত্তবান, মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে সাহিত্য বৃত্তের চলন ছিল, তারই মধ্যে বিপ্লবের নতুন আলো নতুন জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করল। আবহমান কাল থেকে সাহিত্যে গ্রামবাংলার কৃষক-শ্রমিক কৃচিৎ স্থান পেলেও প্রাণমন জুড়ে কোনো সময়েই সে প্রাধান্য বিস্তার করেনি — তাঁরা তাঁদের বৃহৎ জীবন স্পন্দন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সুচিহ্নিত ও স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিল। এরই ফলে ঘটল হয়তো বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন, ‘বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিন্তাবৃত্তি।’

বাংলাকাব্যে নতুন মূল্যবোধ ও কাব্যচেতনার সূচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮০-১৯৫২)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে বেশ শক্তিশালী, বৈচিত্র্যের সাধনায় নানা দিক থেকে অনন্য। তিনি রবীন্দ্রপ্রীতির জন্য খ্যাত হলেও, বিবিধ বিষয় ও ছন্দ নিয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা ও তাতে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ‘চরকার গান’, ‘পালকির গান’, ‘ঝরনার গান’ ইত্যাদি বিষয়ের দিক থেকে যেমন তেমন ছন্দ ও রূপবন্ধেও অভিনব। ফলে তাঁর কল্পনা ও প্রকাশ—দুইই বিচিত্রসঞ্জারী। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসে যে একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যলিপ্সা ছিল, তা তাঁর কবিতার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ছত্রসজ্জায় ধরা পড়ে, কিন্তু সেটি অনেক সময়ই চাপা পড়েছে

তার চেষ্টাকৃত তথ্য ও জ্ঞানবৈভব প্রদর্শন ও ছন্দোসৌকর্যের সচেতন চর্চায়। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাময়িক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু কবিতা রচনা ছাড়াও বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রচুর দেশি-বিদেশি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এসব রচনার মধ্যে অন্যতর স্বাদ পাওয়া গেলেও, গুণগত মান সর্বত্র উল্লেখযোগ্য নয়। অনুবাদ ভাবানুবাদ অনেকক্ষেত্রেই মূলের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ হয়নি। দেশপ্ৰীতিমূলক কবিতায় উচ্ছ্বাস থাকলেও, ভাব-গভীরতা ছিল না। অতীত গৌরবের প্রশস্তি থাকলেও, দেশের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা ছিল না। রচনাগুলি তাই ক্ষেত্রবিশেষে কবির কলমে লেখা না হয়ে অগভীর সাংবাদিক সুলভ পদ্যরচনায় পরিণতি পেয়েছে। বস্তুত “কবিতা যখন প্রকাশের বেদনায় কম্পমান, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, সেখানেই সত্যেন্দ্রনাথের চির নির্বাসন” কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : ‘বেণু ও বীণা’ (১৯০৬), ‘তীর্থসলিল’ (১৯০৮—অনুবাদ), ‘তীর্থরেণু’ (১৯১০—অনুবাদ), ‘কুহু ও কেকা’ (১৯১২) প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথ বৃত্তিতে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। জেলা বোর্ডে কর্মসূত্রে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। গ্রামের শস্য শ্যামলতার মধ্যেও অগণিত মানুষের নীরস্ত্র দারিদ্র্য, হতচ্ছড়া কৃশ মূর্তি তাঁর অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মধ্যে তিনি এই বাস্তবের সন্ধান পাননি। এ সময় তরুণ কবিরা যখন আত্মবন্দন কল্পনায় রবীন্দ্রপ্রভাব নির্গমের পথ খুঁজছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথের দেশ ও জগৎ, তাঁর কবিতার খেদ-পরিতাপ ও নৈরাশ্য তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুজগৎ, তাঁর রোমান্টিক অনুভূতিকে আড়াল করে বস্তুতন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তাঁর মরুকাব্যত্রয়ী—‘মরীচিকা’ (১৯২৩), ‘মরুশিখা’ (১৯২৭) এবং ‘মরুমায়ী’ (১৯৩০) বাংলার শ্যামল আবহাওয়ার উষ্ম, রুদ্ধ নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে। তিনি ব্যঙ্গো, তীক্ষ্ণ শ্লেষে, কাব্যের প্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নিপুণ যুক্তি শৃঙ্খলায় আক্রমণ করেছেন। সমস্ত মোহজাল, এমন কী মঞ্জালময় ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ প্রত্যয়কেও তিনি বর্জন করেছেন, বলেছেন ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ বা সুবিচারক নন, তিনি মঞ্জালময়ও নন ; বরং এক ছদ্মবেশী নিষ্ঠুর সত্তা যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের সুখদুঃখে শুধু উদাসীন থাকেন না, তাদের দুঃখের ভার বৃদ্ধিতেই যেন বেশি সচেতন থাকেন।

তাঁর কবিতার কলাকর্মেও এই নেতিবাদ শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দপ্রকরণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরিণত শ্রৌত্বে পৌঁছে কবির ‘সায়ম’, ‘ত্রিয়ামা’, ‘নিশাস্তিকা’-য় বিপরীতে সুর বেজেছে। এর আভাস অবশ্য প্রথম পর্বে তাঁর মনের গভীরে মানুষ সম্পর্কে যে প্রত্যয় ছিল তা থেকেই, অর্থাৎ মানুষের প্রতি অন্যায়ে ও অবিচারের বেদনা থেকেই এসেছে মনে হয়। তাই শেষ পর্বের কবিতায় সন্ধ্যার রক্তিম দিগন্তে প্রতিবাদ নয়, অনুতাপজ্ঞান বিশ্বাসে করুণার যে সুর বেজেছে তা কবির রবীন্দ্রঅনুরক্তির আভাস নির্মাণ করে। এদিক থেকে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও স্বতন্ত্র কবিপ্রতিভায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

প্রথম জীবনে মোহিতলালও রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন, তাঁর ‘স্বপনবসারী’ সে সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য ভোগকামনায়, দেহবাদে। প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির মতোই ধ্যানী, উদাসীন। মোহিতলালের কবিতায় যেখানে উগ্র দেহাত্মবাদ, তীব্র যৌবন কামনা ও সন্তোষ পিপাসা মুখ্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথে দেহান্তরণের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। মোহিতলালের কবিতার কাব্যনির্মিত

অনেকটা মধুসূদনের, শৈলীর স্মারক, ক্লাসিক্যাল বা ঐতিহ্যপন্থী। সেখানে কোথাও শিথিলতার অবকাশ নেই। ছত্র, স্তবকবিন্যাসে একটি সদাসচেতন কবিমনের পরিচয় আছে।

মোহিতলালের মনোভঙ্গিতে লঘুতার কোনো স্থান নেই। তিনি সততই গুরুগম্ভীর মনন-কল্পনার বর্মে ক্লাসিক্যাল সংযম, বাহুল্যবর্জিত উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে ‘সনেট’ রচনায় মোহিতলাল বিশেষ সফল। সনেটে পদবিন্যাসে তিনি দক্ষ শিল্পী। কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, ‘স্বপনপসারী’ (১৯২২), ‘বিস্মরণী’ (১৯২৭), ‘স্মরণরল’ (১৯৩৬), ‘হেমন্ত গোধূলী’ (১৯৪১), ‘ছন্দ চতুর্দশী’ (১৯৫১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯—১৯৭৬) আবির্ভাব। কবি খ্যাতিতে এ সময়ের কবিকুলে নজরুল সর্বাতিক্রমী। তিনি অনেকটা স্বভাবকবি ছিলেন। প্রাণের একান্ত আবেগের তাড়নায়, নিজেকে প্রকাশের আশ্রয় চেষ্টা করেছেন। সেই স্বতঃস্ফূর্ত সূত্রেই তাঁর কবিতা ও গান রচিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই তা নতুন বক্তব্য, ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আলোচ্য কবিতা ত্রয়ীতে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

### ৩৫.৩ কাজী নজরুল ইসলাম : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ; ২৪শে মে ১৮৯৯ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। বাবা কাজী ফকির আহমদ ও মা জাহেদা খাতুন। শৈশবেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। দশ বছর বয়সে তিনি গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক পরীক্ষা দেন। সংসারের চাপে সেখানে একবছর শিক্ষকতার সঙ্গে মোল্লাগিরিও করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমে শিয়ারসোল হাই স্কুল ও পরে মাথরুন স্কুলে ভর্তি হন, পরের বছর পড়াশুনা ছেড়ে লেটো ও কবি দলে যোগ দেন। দারিদ্র্যের চাপে ১৯১৬তে প্রথমে বাবুটির ও পরে রুটির দোকানে কাজ নেন। মাকের এক বছর ময়মনসিংহের একটি স্কুলে পড়ে, বাৎসরিক পরীক্ষার পর ১৯১৫ শিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। এক্ষণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এবং বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের সান্নিধ্যে তাঁর প্রাণে বিপ্লবী চিন্তাধারার সঞ্চার হয়। এখান থেকেই তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথমে লাহোর হয়ে নৌসেরাতে প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে যান।

কৈশোরে কিছু গান বা রচনা থাকলেও, নজরুলের যথার্থ সাহিত্য রচনার সূচনা করাচির সেনানিবাসে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে লেখা প্রথম গল্প ‘বাউলুলের আত্মকাহিনী’ (সত্তগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫), প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬) এবং প্রথম প্রবন্ধ ‘তুর্ক মহিলার যোমটা খোলা’ (সত্তগাত, কার্তিক ১৩২৬)-এ প্রকাশিত হয়। মার্চ ১৯২০ বেঙ্গাল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়ায় কর্মহীন নজরুল কলকাতায় ফিরে শৈলজানন্দের মেসে আশ্রয় নিলে, সেখানে তাঁর ধর্মমত অন্তরায় হওয়ায় ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে মুজফর আহমেদের সঙ্গে বাস করতে শুরু করেন। এপ্রিলে একবার চুরুলিয়া যান। এ সময় কবির কিছু রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়, কিন্তু খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছান সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে (৬ই জানুয়ারি, ১৯২২) ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

ইতোমধ্যে জীবিকার তাগিদে অস্থিরচিত্ত নজরুলকে কয়েকটি কাগজে কাজ করতে দেখা যায়। ১২ জুলাই, ১৯২০ দৈনিক ‘নবযুগ’ পত্রিকায় ৬০ টাকা বেতনে কাজ নেন, ওই বছরই ডিসেম্বরে ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকার সঙ্গে ১০০ টাকার বিনিময়ে লিখতে চুক্তিবন্ধ হন। ১৯২১ ফেব্রুয়ারিতে আবার ‘নবযুগে’ যোগ দিলেও মার্চ-

এ ইস্তফা দেন। ১৯২২ জুন এ 'দৈনিক সেবক' কাগজে ১০০ টাকা বেতনে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে রচিত সম্পাদকীয় লেখা নিয়ে মতবিরোধ হলে সে কাজ ছেড়ে দেন। ১১ই আগস্ট নিজেই সপ্তাহে দুবার প্রকাশে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ধূমকেতু' কবিতা নিয়ে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানেই পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা ও অক্টোবরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে 'ধূমকেতুর পথ' সম্পাদকীয় লেখেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে নভেম্বরে নজরুলের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়, আর ২৩শে নভেম্বর তিনি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট হয়ে ১৭ই জানুয়ারি ১৯২৩ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। এ সময় স্নেহভাজন নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি উৎসর্গ করেন। হুগলি জেলে, জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায আচরণের প্রতিবাদে ৩৯ দিন অনশন করার পরে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে বহরমপুর জেলে বদলি করা হয়। সেখান থেকে এক বছর তিন সপ্তাহ পরে মুক্তি পান। ১৯২৪, ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ। ওই বছর অক্টোবরে 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ এবং নভেম্বরে 'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯২৫ মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে কবির ফরিদপুর কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সাক্ষাৎ ঘটে। নভেম্বরে 'শ্রমিক কৃষক প্রজা পার্টির ইস্তাহার এবং ডিসেম্বরে তাঁর লাঙল' পত্রিকায় 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন। ১৯২৬ এ নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনে 'শ্রমিকের গান', ছাত্র-যুবা সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' রচনা করেন ও গিয়ে শোনান। ১৯২৭-এ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম ও ১৯২৮-এ দ্বিতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে 'চল চল চল' গানটি রচিত হয়। ১৯২৯-এ জাতির পক্ষে কবিকে সংবর্ধিত করা হ। ১৯৩০-এ কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয় শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু' যথাক্রমে বাজেয়াপ্ত হয়ে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। এই বছরই ২৫শে নভেম্বর কবির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে ৬ই নভেম্বর গ্রেপ্তার ও ১১ ডিসেম্বর কারাদন্ড দেওয়া হয়।

এদিকে ১৯২২, ১০ই নভেম্বর 'ধূমকেতু' ১ম বর্ষের ২১শে সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে, কবি 'নওরোজ' (১৯২৭) পত্রিকায় স্বল্পকালের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এ ফজলুল হক তাঁর দলের মুখপাত্ররূপে নবপর্যায়ের 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশ করলে নজরুল প্রধান সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৪১ কলকাতায় সমারোহসহকারে নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রবিহার' কবিতা আবৃত্তি করেন। ১৯৪২, ১০ই জুলাই নজরুল আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবিপত্নী প্রমীলা ১৯৪০ সালেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রথমে লুইসিনী পার্ক ও রাঁচিতে চিকিৎসার পরে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' এবং পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্যে ছয় মাস লন্ডনে, পরে ভিয়েনায় চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই তাঁর চেতনা ও সৃষ্টিশক্তি ফিরে আসেনি। ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে নজরুল ঢাকায় যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট ; বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাহিত্য পুরস্কার '২১শে পদক' ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত হন। ২৭শে আগস্ট ১৯৭৬ তারিখে ব্রজ্জকা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে ২৯শে কবির জীবনাবসান হয়।

কাব্যকথা : নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' ১৩২৯ সালের কার্তিক (অক্টোবর, ১৯২২) প্রকাশিত হয়। বইটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে বিদ্রোহী, আগমনী, ধূমকেতু প্রভৃতি কবিতা আছে। অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় প্রচ্ছদ ঠেকেছেন শিল্পী বীরেশ্বর জৈন। 'দোলন চাঁপা (আশ্বিন



১৩৩০, ইং ১৯২৩) কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ‘ধূমকেতু’ প্রকাশের দায়ে করাদণ্ডে দণ্ডিত কবি যখন জেলে, সেইসময় কবিতাগুলি লেখা। জেলের ওয়ার্ডারদের সাহায্যে পবিত্র গঞ্জোপাধ্যায় বাইরে এনে সেগুলি কাব্যাকারে প্রকাশ করেন। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ এ কাব্যের মুখ্য আবেগ প্রমীলা বা দোলন দেবীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক। ‘বিষের বাঁশী’ (আগস্ট, ১৯২৪) বইটির সূচনায় জানিয়েছেন ‘অগ্নিবীণা’র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে যেটি প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল সেটি ‘বিষের বাঁশী’ নামে প্রকাশিত হল। এই সব স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও নজরুল ‘ছায়ানট’ (১৯২৫), দেশবন্ধুর মৃত্যুশোকে উদ্বেল কবির চিত্তরঞ্জনের জীবনকাহিনী বর্ণনা করে ‘চিত্তনামা’ (আগস্ট, ১৯২৫) রচনা ও প্রকাশের পর কবির উল্লেখযোগ্য কাব্য ‘সর্বহারা’ (১৯২৬), যার অন্যতম কবিতা নারী এবং ‘ফণিমনসা’ (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সঞ্জিতা (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথের চয়নিকার আদর্শে সে সময়ে প্রকাশিত সকল কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতার সংকলন—রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি নজরুলের কিছু গল্পগ্রন্থ—ব্যাথার দান (১৯২২), শিউলিমালা (১৯২৮), এবং উপন্যাস ‘বাঁধনহারা’ (১৯২০), কুহেলিকা (১৯২৭), মৃত্যুকুণ্ডা (১৯৩০) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীত সংকলন ‘চোখের চাতক’ (১৯২৯) প্রতিভা সোম (বসু)-কে উৎসর্গীকৃত, চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১), গুলবাগিচা (১৯৩৩), গানের মালা (১৯৩৪), গীতিশতদল (১৯৩৪) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কবির কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ছোটদের উপযোগী নাটক যেমন রচনা করেছেন তেমনই ওমর খৈয়াম ও হাফিজের কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এসমস্ত গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা যেমন প্রাণের টানে লেখা, আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা কর্ম বা অর্থে প্রয়োজনে কলম ধরা রচনাও আছে।

## ৩৫.৪ মূলপাঠ—১ : নারী (সর্বহারা)

### নারী

সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।  
 বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর  
 অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।  
 বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি  
 অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।  
 নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা, করে নারী হয়-জ্ঞান ?  
 তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।  
 অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,  
 ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে !  
 এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,

নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল ।  
 তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?  
 অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান !  
 জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,  
 সুযমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি ।  
 পুরুষ এনেছে দিবসের জালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,  
 কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ ।  
 দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধু,  
 পুরুষ এসেছে মরুতৃষ্ণা ল'য়ে—নারী যোগায়েছে মধু ।  
 শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল ;  
 নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল ।  
 নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে  
 ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে ।

#### স্বর্ণ-রৌপ্যভার

নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হ'য়েছে অলঙ্কার ।  
 নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,  
 যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান ।  
 নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে  
 জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে ।  
 জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,  
 মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্ ।  
 কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,  
 কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে !  
 কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি', কত বোন দিল সেবা,  
 বীরের স্মৃতি-স্মরণে গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?  
 কোনো কালে একা হয় নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী  
 প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী ।  
 রাজা করিয়াছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিল রাণী,  
 রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি ।

পুরুষ হৃদয়-হীন,  
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।  
ধরায় যাঁদের যশ ধনে না ক' অমর মহামানব,  
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,  
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।  
লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।  
নারী সে শিক্ষার শিশু-পুরুষের স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,  
দীপ্ত নয়নে পরাণ কাজল বেদনার ঘন ছায়া।  
অদ্ভুতরূপে পুরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,  
বুকে ক'রে তারে চুমিল যে, তারে কলি সে অবরোধ।

তিনি নর-অবতার—

পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি' কুঠার !  
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,  
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর !

সে যুগ হ'য়েছে বাসি,

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক' নারীরা আছিল দাসী !  
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,  
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি,  
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে  
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে !

যুগের ধর্ম এই—

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই

শোনো মর্ত্যের জীব !

অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব !  
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী,  
করিল তোমায় বন্দিনী, বলো কোন সে অত্যাচারী ?  
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,  
আজ তুমি ভীরা আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা !  
চোখে চোখে আজি চাহিতে পার না ; হাতে রুলি, পায়ে মল,  
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল !

যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীৰু ওড়াও সে আবরণ !

দুর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ !

ধরার দুলালী মেয়ে !

ফিরনা ত আর গিরিদরীবনে শাখী-সনে গান গেয়ে !

কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজা নিশীথ পাখায় উ'ড়ে,

ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে ।

সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হ'তে আছ মরি ।

মরণের পুরে ; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী ।

ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুড়ি' !

আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি !

পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে

লুটায় পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে !

এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে

যে-হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কুট বিষ দিতে হবে ।

সে-দিন সুদূর নয়—

যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয় !

---

## ৩৫.৫ সারাংশ—১

---

সাম্যের গান গাওয়া কবির কাছে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। বিশ্বের সমস্ত কল্যাণ অকল্যাণ সবেতেই নারী পুরুষের ভূমিকা আছে। খ্রিস্টীয় আদি পাপের পিছনে যে শয়তানের (Satan) কথা ভাবা হয় সেই অমঙ্গলের শক্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকা সম্ভব। তাই নারীকে এজন্য হেয় করা ঠিক নয়। বরং পৃথিবীর যা কিছু ভালো সেই সব সৃষ্টি—যা মঙ্গলময়—সম্পদ, জ্ঞান, গুণ সৌন্দর্য সমস্তই নারীর অবদান আছে। দিনের শেষে তপ্ত দেহ মন নিয়ে পুরুষ ঘরে ফিরে নারীর কল্যাণস্পর্শে স্বস্তি শান্তি পেয়েছে। নারী বাইরে কঠোর জোগায়, ঘরে সে-ই কল্যাণী। দুয়ের শক্তিতেই সৃষ্টি রয়েছে সচল।

অলঙ্কার সে তো নারীদেহ স্পর্শেই সুন্দর। নারীর মিলন-বিরহে কাব্যসৃষ্টি। ক্ষুধা-সুধার মধ্য দিয়ে নিত্য নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অনেক বিজয় অভিযান, মানুষের সমস্ত কীর্তির পিছনে নারীর অবদান সীমাহীন।

নারীর উৎসাহ ও প্রেরণাতেই পৃথিবীতে অমর মনীষীরা মহান সব প্রয়াস করেছেন। নারীর কোমল হৃদয়ের স্পর্শেই শিশু-পুরুষ নির্বিশেষে স্নেহ প্রেম-প্রীতি দয়ামায়ায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে।

নারীর প্রেরণায়, শক্তিতে এতদিন যাঁরা আশ্রয় পেয়েছে, তারাই আজ নারীর মর্যাদাকে স্বীকার করছে না,

এ বড়ো বিস্ময়। আজ সাম্যবাদের যুগ—নারী পুরুষের সমানাধিকার। পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার বা তাকে বন্দী করতে চাইলে, তাকেই এক সময়, তারই সৃষ্ট কারাগারে বন্দী হতে হবে। কেননা এটাই যুগধর্ম—পীড়ন করলে নিজেকেই পীড়িত হতে হবে। সেই সঙ্গে নারীকেও আর স্বর্ণ-রৌপ্যের অশ্বকারে বন্দি থাকা চলবে না ; হাতের রুবি, পায়ের মল-শিকল, মাথার ঘোমটা ফেলে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা একসময় পদনত করে রেখেছিল, তাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, প্রয়োজনে পরাভূত করে, নারীকে বিশ্বজয় করতে হবে। আর তা হলেই অনাগত ভবিষ্যতে পুরুষের সঙ্গে নারীর জয় ঘোষিত হবে।

### ৩৫.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

‘নারী’ কবিতাটি কবির ‘সাম্যবাদী’ কবিতা গুচ্ছের অন্যতম। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয় ‘লাঙল’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫)। পরে ‘সর্বহার’ (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থে ‘সাম্যবাদী’র অন্যান্য কবিতার সঙ্গে ‘নারী’-ও সংকলিত হয়। কবিতাটিকে প্রকাশকালের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

‘নারী’ কবিতাটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনার শুরুতেই, ভারতীয় জনজীবনে সাধারণভাবে নারীর কি স্থান ছিল এবং শতাব্দীর সূচনাকালের পরিস্থিতিটিও জানা দরকার। তাহলেই ঐতিহাসিক পশ্চাদ্ভূমিতে সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের নারী কবিতার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

এমন একটি কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই নারীর স্থান উঁচুতে ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম অধিকারের পর নারীর মর্যাদার অবনমন ঘটে। ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।<sup>১</sup> তিনি দেখিয়েছেন বৈদিক সমাজ যখন ক্রমশ গোষ্ঠীযুদ্ধ, যুথবন্দ সমাজ ভেঙে পরিবার আশ্রিত বা কুলবন্দ সমাজে পরিণত হচ্ছে, তখন থেকেই পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রাধান্যের কারণেই পুরুষের একাধিক পত্নী-উপপত্নী বা গণিকা সম্ভোগ ; পত্নীর সামান্য ত্রুটিও কুলে বা সমাজে ক্ষমা পেত না। তখন লক্ষ্য এক পুত্র সন্তান বৃদ্ধির দ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি। পুরাণের কালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।<sup>২</sup> ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসময় বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি সৃষ্টি হয়। তাদের স্বার্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য পরিবারের বৈধ সন্তানের জন্য সঙ্কল্প রেখে যাওয়া। এজন্য পুরুষ স্ত্রীকে অন্য সমস্ত পুরুষের সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হলে। মহাভারতে এর চরম উদাহরণ দেখা যায়—যে নারী স্বামী ব্যতীত কোন পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট (নামের বস্তু) চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ ও দর্শন করেনা সে-ই ধর্মচারিণী। (১২/১৪৬/৮৮)। এ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশের অনুপাতের সঙ্গে নারী তার স্বাধীনতা হারায়। এজন্য মধ্যযুগ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। মধ্যযুগে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্নতর ঐতিহাসিক পটভূমিতে এরই কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে মাত্র।

বর্তমান আলোচনায় এ প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত না করে, তাঁর উপসংহারটি উদ্ধৃত করা যাক—“বৈদিক ভারতবর্ষে

১ ও ২ বৈদিক সমাজে নারীর স্থান। নারীর স্থান—রামায়ণে ও মহাভারতে। দ্রষ্টব্য : প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য

নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাঁদের উত্তর পুরুষেরা এখন স্বীকার করে সে কথা ; বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকার সচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিবন্দী ছিল।” শুধু আমরাই বলবার চেষ্টা করি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। “এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্য অতীতের যে বিষ সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিবেশ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়।”

১৯২০র জানুয়ারিতে নজরুল করাচির সেনানিবাস থেকে এসে কলকাতার বন্ধু শৈলজানন্দ ও মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যান। ঐ বছরই মার্চে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে কর্মহীন কবি প্রথমে শৈলজানন্দ পরে মুজফ্ফর আহমেদের আশ্রয়ে বাস শুরু করেন। ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালেই সোভিয়েত বিপ্লব ঘটেছে (১৯১৭), ১৯১৯-এ প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হয়েছে। দেশে দেশে ‘সাম্যবাদে’ আস্থাবান যুবসমাজ একটি সংগঠনের মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ‘নবযুগ’ (জুলাই ১৯২০) পত্রিকা পর্বে নজরুলের বিদ্রোহী<sup>৪</sup> ভূমিকার পর, ‘ধূমকেতু’ (আগস্ট ১৯২২) পর্বে বিপ্লবী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। এরপর ‘লাঙল’-এ কবিকে সাম্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে দেখা যাচ্ছে।

নজরুলের কাছে সাম্যবাদ / সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুত দেশের মুক্তি সংগ্রামের একটি পথ মাত্র। সাম্যবাদের আদর্শে তাঁর কোনো তাত্ত্বিক শিক্ষা ছিল না। মুজফ্ফরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য তাঁর আবেগপ্রবণ মনোধর্মে মানবপ্রেমের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, নিজের জীবনের দুঃখযন্ত্রণার যে পীড়ন ছিল, তাই, তাঁকে এই মতবাদের মৌনতন্ত্র নয়, বাহ্য উদ্দীপনা তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছে। ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে বিশেষ দশক থেকে প্রাক্ স্বাধীনতাপর্ব পর্যন্ত এটি ছিল এক সংশয়াতীত সংগ্রামী চেতনা।

কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফরের সঙ্গে কিছু কাল সমবাসী হলেও উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও রোমান্টিক কবির মনে মানব হিতৈষণা যতটা জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, সাম্যবাদী তত্ত্বের দ্বারা ততটা নয়। তাই নবযুগ বা ধূমকেতুতে জাতীয়তাবাদ ‘মোসলেম ভারতে’ ধর্মভাব যতটা সক্রিয় ছিল, মার্কসীয় তত্ত্ব ততটা প্রবল ছিল না। ‘লাঙল’র প্রধান পরিচালক, নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ সেটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হল।

একসময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮শ শতকের ইংরেজ ‘বার্নস’-এর প্রভাবে ‘সাম্যসাম’ কবিতায় রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ এনেছিলেন, আর মুজফ্ফরের প্রভাবে এর প্রায় দু দশক পরে নজরুল সর্বহারার মুক্তির জন্য সাম্যবাদী চেতনামূলক একগুচ্ছ কবিতা রচনা করেন। এতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা থাকলেও, কমিউনিস্ট মতবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এই গুচ্ছের ‘সাম্যবাদী’ কবিতা—অর্থনৈতিক বা শ্রেণিচেতনার কবিতা নয়—মরমি সাধনার কবিতা, ‘মানুষ’, মানুষের চেয়ে বড়ো বা মহীয়ান কিছু নেই। কিন্তু এখানে অস্বীকার কার হয়নি। পুরোহিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে জেহাত ঘোষণা করা হয়েছে। ‘চোর-ডাকাত’ কবিতায় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষণের এবং মানবসব্যতার এক দেউলিয়া রূপ তুলে ধরা হয়েছে—দেখান হয়েছে ছোটোদের

৩ ডিসেম্বর, ১৯২১ কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ-এর নেতৃত্বে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার উদ্যোগ হয়েছে।

৪ বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯২২।

সব চুরি করেই বড়োরা বড়ো হয়েছে ; ‘নারী’ কবিতায় নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কবিতায় কবির নারী জাতিকে পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন দেবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে—এজন্য তিনি অনেক যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে স্বমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছেন। এদিক থেকে কবিতাটিকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ-বিরোধী কবিতা বলা যায় বটে, সেই সঙ্গে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে কবির দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—কারণ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। আবার নারী পুরুষের জীবনে উভয়ের স্নেহ ও প্রেম এক পরম সম্পদ—সঞ্জীবনী সুখ। উভয়ের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায় গড়ে ওঠে মানব সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হৃদয়হীন পুরুষের কাছে নারী পায় অমর্যাদা ও আঘাত। পুরুষের এঅই অনুদার মনোভাবের কঠোর সমালোচনা আছে এ কবিতায়। নারী কবিতায় কবি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। নজরুলের নারী-সম্পর্কিত সাম্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে—

‘বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি  
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।  
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে  
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।  
যুগের ধর্ম এই  
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

‘সাম্যের যুগ আজি’ এই বোধ থেকে এ কবিতা রচনার প্রেরণা বলেই নারী-পুরুষে কোন ভেদ নেই। বিশ্বের রিস্তুর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা। কিন্তু নারীই প্রধানত তার ভার বহন করে। পুরুষের দ্বারা সংসার চলে না, নারীর জন্যই সংস্কার স্বর্গলোকে পরিণত হয়—

“এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে, যত ফল,  
নারী দিল তাহে রূপ রস মধু-গন্ধ-সুনির্মল।”

পুরুষের জীবনের যত দাবদাহ নারীর স্নেহ-প্রেমে তা স্নিগ্ধ হয়। এই নারী-ই যুগ যুগ ধরে কবির সৃষ্টিশীল রচনার প্রেরণা জুগিয়ে আসছে—

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,  
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

নজরুল এই কবিতাটিতে বক্তব্যবিষয়কে তার কবিস্বভাবের উচ্ছ্বাসময়তার কারণে আকারে অনেকটা বড়ো করেছেন। বক্তব্যকে দীর্ঘায়ত করায় কাব্য সৌন্দর্য বিচারে কবিতাটির রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়ে তা বাক্ সর্বস্ব ও বক্তৃত্যধর্মী হয়েছে। তিনি এখানে নরনারীর পাপ-পুণ্যের কথা, কল্যাণ-অকল্যাণ, পুরুষ-নারীর পারস্পরিক ভূমিকার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার অভাব নেই যেমন কৃষি নির্ভর বাংলার গ্রাম সমাজে নরনারীর যৌথ পারিবারিক জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকল্প—

নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে  
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

আবার, পুরুষ শাসিত সমাজে নারী যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত, নারী জাতির বেদনা ও ট্রাজেডি এ কবিতায়  
অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—

কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে  
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।

সামন্ত সমাজে নারী নানা আবরণে, আভরণে বাঁধা পড়ে থাকে, তাকেই সাম্যবাদের টানে কবি নজরুলের  
নারীমুক্তির কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে আহ্বান হিসেবে ফুটে উঠেছে—

হাতে রুলি, পায়ে মল,  
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল।  
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীру ওড়াও সে আবরণ!  
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ “সে যুগ হয়েছে বাসি, যে যুগে...নারীর আছিল দাসী।” সেই বেদনার যুগ পার হয়ে  
আজ “মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজি”, তাই “অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।”  
আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নারী সঙ্গী, সাথী বন্ধু। নজরুলের ‘নারী’ কবিতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব  
বলা যায়।

নারী কবিতাটি ছয়মাত্রার সরল কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছত্রে তিনটি ষন্মাত্রিক পর্ব, একটি দু-মাত্রায় অপূর্ণ  
পর্ব।

বিশ্বে যা কিছু । মহান সৃষ্টি । চির কল্যান । কর  
অর্ধেক তার । রচিয়াছে নারী । অর্ধেক তার । নর ।

পূর্বাঙ্গের দ্বিপদী অন্তর্মিল যুক্ত পদবন্ধে রচিত। কয়েকটি ছত্রে একই যুক্তাক্ষরের পুনরাবৃত্তিতে সার্থক  
শব্দালঙ্কারের ও ধ্বনি বাঙ্কারের মাধ্যমে সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে—

‘জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,  
সুখমা লক্ষ্মী, নারী-ই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।’

### প্রসঙ্গ কথা :

নরককুন্ড বলিয়া কে তোমা—বৈদিক ভারতে নারীকে অশুচি, স্বাভাবত পাপিষ্ঠা ও অমঙ্গলের হেতু গণ্য  
করা হয়েছে। মৈত্রায়নী সংহিতা বলেছে ‘নারী অশুভ।’ শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—যজ্ঞ কালে, শূদ্র ও নারীর  
দিকে তাকাবে না। তাঁদের সংজ্ঞায় নারী পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীতেও  
যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে গাভী-স্বর্ণ-শস্যের সঙ্গে অগণ্য নারী দান করা হচ্ছে। খ্রিস্টীয়শাস্ত্র বাইবেলেও নারীকে  
‘নরকের দ্বার’ বলা হয়েছে। নারীর এই অবমাননার অবসান আধুনিক কালের ঘটনা। সাম্যবাদী কবিতার



‘নারী’তে নজরুলের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ এই ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য নারী যদি অশুচি-অপবিত্র সে তো পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরই দান। সুতরাং এর জন্য তো মূল অপরাধী পুরুষ। নারীকে নরককুন্ড বলে ঘণা করা কেন? কামনার অগ্নিদহনের জন্য দায়ী পুরুষ তাই ঘন্য সে তো পুরুষ। সুতরাং নারীকে কোনক্রমেই হেয় জ্ঞান করা যায় না।

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল—নারীর স্নেহপ্রেম প্রীতি রসে আর্দ্র ও তার সযত্ন লালনে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি আজও সচল ও সক্রিয়। বিশ্বসৃষ্টির যে নেপথ্যবিধানে প্রাণের প্রকাশ সে ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী যেমন ধারণ ও লালন করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণাও নারী—এই সত্যটিকে নজরুল পংক্তিগুলিতে তুলে ধরেছেন।

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই—সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠার সময় থেকে পুরুষের যে শক্তি, প্রাধান্য ও অধিকারদণ্ড ক্রমশ নানারূপে ও বাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তা বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক যুগ বাহিত হয়ে সামন্ত শাসন পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আধুনিক মননে ও সমাজ-রাষ্ট্র ধারণায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে নিপীড়িত মানুষের যে জাগরণ বাস্তবায়িত হল, তা নারীকেও তাঁর আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই যে কোনো ধরনের পীড়নের সঙ্গে প্রতিরোধ-শক্তি ও বৈজ্ঞানিক নিয়মেই গড়ে ওঠে—এই সত্যটি কবি এখান উচ্চারণ করেছেন।

এতদিন শুধু বিলালে অমৃত—একদিন যে নারী অন্দরের অন্ধকারে কারাবুন্ধ ছিল, তাকে সেই আদিম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে আসতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হবে। কারণ বন্ধন থেকে মুক্তি কেউ দেয় না, নিজ অধিকারে অর্জন করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো ইউরোপের পুরুষকেন্দ্রিক সমাজেও ব্যতিক্রম ছিল না। বিশ্বের যা কিছু মহান, ‘অর্ধেক তার করিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী। নারীকে সেই সমানাধিকার থেকে সামাজিক ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে নারীমুক্তি আন্দোলন তার শোধনের কাজ করেছে। সাম্যবাদী চিন্তাধারা নারী পুরুষের সমান অধিকারকে মানে। তাই প্রয়োজনে নারীকে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী প্রয়াস নিতে হবে। ‘আজ প্রয়োজন যবে, যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।’ কবির আশা ‘সে দিন সুদূর নয়’ বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ‘ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়’।

### অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা কয়েকবার পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) রাজা করিয়াছে \_\_\_\_\_, রাজার \_\_\_\_\_।

রাণীর দরদে \_\_\_\_\_ গিয়াছে \_\_\_\_\_ যত \_\_\_\_\_।

খ) মাথার \_\_\_\_\_, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও \_\_\_\_\_।

যে \_\_\_\_\_ তোমা করিয়াছে \_\_\_\_\_ সে।

দূর করে দাও \_\_\_\_\_ চিহ্ন আছে যত \_\_\_\_\_।

- ২) কোন্ রচনা প্রকাশের জন্য কাজী নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় ?
- ৩) “১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।” নতুন সম্ভাবনার কথাগুলি কী, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- ৪) “তাঁর (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) মরুকাব্যত্রয়ী বাংলার শ্যামল আবহাওয়ায় উষর, বুদ্ধ, নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে।”—কাব্যত্রয়ীর নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।
- ৫) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।
- ক) কবিতায় তীব্র যৌবন-কামনা প্রকাশ পেয়েছে— (১) রবীন্দ্রনাথ-এ।  
(২) সত্যেন্দ্রনাথ-এ।  
(৩) মোহিতলাল-এ।
- খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য— (১) হেমন্ত গোখলি।  
(২) সায়ম্।  
(৩) ব্যথার দান
- গ) কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন— (১) চরকার গান।  
(২) ভাঙার গান।  
(৪) পালকির গান।
- ঘ) ‘চিন্তনামা’ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা— (১) নজরুল ইসলাম।  
(২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।  
(৩) মোহিতলাল মজুমদার।
- ঙ) কাজী নজরুল ইসামের বিদ্রোহী কবিতার প্রথম প্রকাশ— (১) ১৯২২-বিজলীতে  
(২) ১৯২০-সওগাতে-এ  
(২) ১৯২০-মোসলেম ভারত পত্রিকায়।
- ৬) নজরুল ইসলাম সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এরকম যে কোনো তিনটি পত্রিকার নাম করুন।
- ৭) ক) ‘এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল’—ইত্যাদি অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।  
খ) “এতদিন শুধু বিলালে অমৃত”—এই উদ্ভৃতিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন বুঝিয়ে দিন।

---

## ৩৫.৭ মূলপাঠ—২ — দারিদ্র্য

---

### দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান !  
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান  
কণ্টক-মুকুট শোভা ! দিয়াছ, তাপস,  
অসঙ্কেচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;  
উদ্ভত উলঙ্গা দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,  
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার !

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,  
অজ্ঞান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,  
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !  
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান  
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি  
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি  
হেরি মম কল্পলোক । আমার নয়ন  
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !

বেদনাহলুদ-বৃন্দ কামনা আমার  
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার  
বিকশি উঠিতে চাহি, তুমি হে নির্মম  
দলবৃত্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম !  
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল  
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল !

টলটল ধরণীর মত করুণায় !  
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়  
করুণা নীহার বিন্দু ! জ্ঞান হ'য়ে উঠি  
ধরণীর ছায়াপ্ফলে ! স্বপ্ন যায় টুটি

সুন্দরের, কল্যাণের ! তরল গরল  
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল !

জ্বালা নাই নেশা নাই উন্মাদনা,—  
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা  
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে !  
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে ।  
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,  
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার 'টীকা' !....  
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,  
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা ।....

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের, দ্বারে দ্বারে ঋষি  
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা ! যাপিতেছে নিশি  
সুখে বর-বধু যথা—সেখানে কখন  
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক, 'মুঢ়, শোন,  
ধরণী বিলাস কুঞ্জ নহে নহে কারো,  
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো  
আছে কাঁটা শয্যাতে বাহুতে প্রিয়ার,  
তাই এবে কর ভোগ !'—পড়ে হাহাকার  
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,  
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি !

চল পথে অনশন ক্লিষ্ট ক্ষীণ তুন,  
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভূ-ধনু,  
দু'নয়ন ভরি বুদ্ধ হান অগ্নি বাণ,  
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,  
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অটালিকা,—  
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা ।

বিনয়ের ব্যাভিচার নাহি তব পাশ,  
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।

সঙ্কেচ শরম বলি জান না কো কিছু  
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।  
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঞ্জিতে  
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে !  
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বলাইয়া বুক  
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে !

লক্ষ্মীর কিরীটা ধরি ফেলিতেছ টানি  
ধুলিতলে ! বীণ-তারে করাঘাত হানি  
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী ?  
যত সুর আত্ননাদ হ'য়ে ওঠে শূনি !

প্রভাতে উঠিয়া কালি শূনি, সানাই  
বাজিছে করুণ সুরে ! যেন আসে নাই  
আজো কাঁরা ঘরি ফিরে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
ডাকিছে তাদের যেন ঘরে 'সানাইয়া' !  
বধূদের প্রাণ আজ সানাইয়ের সুরে  
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে  
আসি আসি করিতেছে ! সখী বলে, 'বল  
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল ?'

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই  
'আয় আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই !  
স্নানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি  
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি !  
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়  
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্ভায়  
'চুম্বনে বিবশ করি' ! ভোমোরোর পাখা  
পরাগে হলুদ আজি, আজো মধু মাখা।

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ !  
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান  
আগমনী আনন্দের ! অকারণে আঁখি  
পু'রে আসে অশ্রু-জলে ! মিলনের রাখী  
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে !  
পুষ্পাঞ্জলি ভরি দুটি মাটি মাখা হাতে  
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার ।  
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার !  
সহসা চমকি উঠি ! হয়ে মোর শিশু  
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাও নি ক' কিছু  
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,  
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর !

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,  
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে !—মোর অধিকার  
আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ  
পুত্র হয়ে জয়া হয়ে কাঁদে অহরহ  
আমার দুয়ার ধরি ! কে বাজাবে বাঁশী ?  
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?  
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা গেলাস  
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস ।...

আজো শূনি আগমনী গাহিছে সানাই,  
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই ।  
[সিন্ধু-হিন্দোল]

২৪ আশ্বিন, ১৩৩৩ ।

---

## ৩৫.৮ সারাংশ—২

---

দারিদ্র্য মানুষকে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে । মানুষের প্রকৃত সভা, তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকৃত চেহারা এ সময়েই ফুটে ওঠে । ভারতীয় জীবনবোধের মধ্যে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় আছে, তা কখনই ঐশ্বর্য

বিকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে না। তাই দারিদ্র্যই মানুষকে মহতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই যথার্থ শক্তির তীব্রতা প্রকাশ পায়।

দুঃখের দহন তাপে জীবনের সমস্ত রস যখন শুকিয়ে যায় তখন দু চোখে শুধু আগুন জ্বলে। ফুলের সৌরভ আর তেমন ছড়ায় না। পৃথিবীর সমস্ত করুণা ধারা যখন সূর্যের খরতাপে শুষ্ক হয় তখন আর জীবনের স্বপ্ন, তার সুন্দর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বেদনার ভার নিয়ে যে গান রচনা হয় তা তো বেদনারই গান। তখন মনে হয় দারিদ্র্য ছাড়া জীবনের কোনো কিছুই আর সত্য নয়। মহা দারিদ্র্যের প্রলয়ঙ্কর শক্তি সর্বস্ব গ্রাস করতে উদ্যত।

এরই মধ্যে পৃথিবী যখন অপরূপ সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়, আগমনীর আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়, তখন আশা জাগে, স্নানমুখী শেফালিকাও ঝরে পড়বার আগে গন্ধ বিলিয়ে যায়। প্রজাপতি নেচে বেড়ায় পুষ্প থেকে পুষ্পে চঞ্চল পাখায়। এর মধ্যে কবি-প্রাণে বেদনার করুণ সুর বেজে ওঠে। আগমনী গানের মধ্যে যেন শুনতে পাওয়া যায়, নাই, কিছু নাই।

## ৩৫.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

‘দারিদ্র্য’ কবিতাটির রচনাকাল ২৪শে আইশ্বন ১৩৩৩ (ইং অক্টোবর ১৯২৬)। এসময় কবি বন্ধু হেমন্ত কুমার সরকারের ব্যবস্থাপনায় কল্লনগর বাস করছিলেন। সেখানে নজরুল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন ও ছাত্র-যুব সম্মেলনে শ্রমিকের গান ও ছাত্রদের গান রচনা করে গেয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল-এর জন্ম। এসময় কবি সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য লড়াই করেছেন। ‘দারিদ্র্য’ কবিতা প্রত্যক্ষত এই নিষ্করুণ দুর্দিনের প্রেক্ষাপটে রচিত। কবিতাটি প্রথম ‘কল্লোল’ পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ এ, পরে ‘সত্তাগাত’-এ মার্চ ১৩৩৩-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে কবির সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ ‘সিন্দু হিল্লোল’ (১৩৩৪)-এ সংকলিত হয়। ‘সিন্দু-হিল্লোল’ প্রেমের কবিতা সংগ্রহ।

‘দারিদ্র্য’ কবিতা রচনার ও প্রকাশের প্রেক্ষাপট কবির অপর সহযোগী বন্ধু মুজফ্ফর আহমদ-এর বর্ণনায়—“নজরুল ইসলাম তখন কল্লনগরে থাকত, আমি আরও কজনের সঙ্গে থাকতাম ওয়ার্কাস এন্ড পেজান্টস পার্টির অফিসে...। আমাদের অফিস হতে পটুয়াটোলা লেনে ‘কল্লোলে’র অফিস নিকটে ছিল। একদিন কি কারণে নজরুল কলকাতায় এসে ফিরে যাচ্ছিল। ....যাওয়ার আগে আমার হাতে সে ‘দারিদ্র্য’র পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে বলল, ‘এটা ভাই তুমি কল্লোল অফিসে পৌঁছে দিও। .....দিনেশ রঞ্জন দাশ মনিঅর্ডার যোগে দশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। একটি কবিতাও চেয়েছিলেন সেই সঙ্গে। এই কবিতাটি লিখেছি বড় দুঃখে।’

নজরুল গবেষক ড. মিলন দত্ত এ সময়ের কিছু তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন। ড. দত্ত লিখেছেন—“ঘরে দারিদ্র্যে শতমুখী আক্রমণ। যে আক্রমণে প্রমীলা ও গিরিবালা জর্জরিত। .... অক্টোবর মাসে ৯ তারিখে প্রমীলা একটি পুত্র সন্তান (বুলবুল) প্রসব করলেন। ...ঘরে টাকা নেই। টাকার প্রচণ্ড দরকার। চিঠি লিখলেন প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মনকে—‘টাকার বড় দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠাও। ব্রজবিহারী পনেরো টাকা পাঠিয়েছিলেন। টাকা পেয়ে তাকে জানালেন—‘চিন্তার মধ্যে অর্থ চিন্তাটাই

সবচেয়ে বড়।’ অপর এক চিঠিতে বন্ধু মুরলীধর বসুকে লিখেছেন—“নিত্য অভাবের চিত্ত ক্ষোভ আমায়... দুর্বল করে তুলছে।...” মুরলীধরকে কয়েকটি কবিতা পাঠিয়ে ‘বঙ্গাবানী’ থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। আক্ষেপ করেছেন, “আর মান ইজ্জত রইল না... অর্থাভাবে বুঝি মনুষ্যত্বটাকে কেড়ে নেয় শেষে।”—এরই মধ্যে কবির দারিদ্র্য কবিতা—

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান ...।

জৈনিক সমালোচক কবিতায় মর্মসত্যটি তুলে ধরেছেন—১৩৩৩ সালের শরৎকালে কৃষ্ণনগরে আগমনীর কল্প সানাইয়ে যেন কবির জীবনের ব্যথা-বেদনার কান্না বারে পড়ছিল, সেই মুহূর্তের অমর সৃষ্টি ‘দারিদ্র্য’।

এ কবিতায় কবি জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ বশত যে চিত্তক্ষোভ, বেদনাভার মনকে বিচলিত করেছে সে তো জীবনকে একান্ত করে ভালবাসার কারণেই। এদিক থেকে সিঁধু হিল্লোলের গভীর জীবনরসরসিকতা বা প্রেমভাবনার কোনো বিরোধ নেই।

এ কবিতায় ‘দারিদ্র্য’ দুঃসহ দহনে প্রাণের রূপরসসৌগন্দ্য শুষে নিয়ে জীবনকে বিবর্ণ করলেও, কবির জীবনানুরাগ বেদনায় স্রিয়মাণ হলেও তা শেফালির শূভ্র সুরভি ছড়াতে পরাঙ্ঘু হযনি। আশাহীন ভরসাহীন বিশুদ্ধ দিনগুলিতেও কবি দেখেন, ‘নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়, দুরন্ত নেশায়, পুষ্প প্রগলভায় চুম্বনে বিবশ করি।’ শত হতাশার মধ্যেও এই আশার কথা, ভরসার কথা কবি নজরুলের পক্ষেই বলা সম্ভব।

এ কবিতায় কবি আবেগের তীব্রতা নিয়ে বক্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ় সংবন্ধভাবে প্রকাশ করেছেন। কবিতার প্রথম স্তবকটিতে যে কথা বলেছেন, তা কোন মহৎ শিল্পীর পক্ষেই বলা সম্ভব। দারিদ্র্য কবিকে মহান করেছে, খ্রিস্টের সম্মান দান করেছে—এ কথার মধ্য দিয়ে দীনহীন আস্তাবলে মাতা মেরির সন্তানের জন্মের বার্তা যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, তা স্মরণাতীত কালের জ্যোতিমন্ডিত এক অল্পান ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিও যেন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে এক মহত্তর জীবনের সম্মান পেয়েছেন। পার্থিব সম্পদ রিক্ততার মধ্যে জীবনের পরীক্ষা দিয়ে, মহত্তর জীবনের বাণীকে লাভ করেছেন, আর সেই প্রাণ-শক্তিতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে জীবনকে ভালোবেসে তার প্রেমসৌন্দর্যকে কাব্যে সংগীতে তুলে ধরেছেন। সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই কবি সৌন্দর্যকে যেমন দেখেছেন, তেমনই দেখেছেন রিক্ত জীবন ব্যথিতের অশ্রু। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই কবি অর্জন করেছেন সেই শক্তি যা মোহমুক্ত দৃষ্টিতে ‘সত্যকে’ দুরন্ত সাহস ভরে অসংকোচে, স্পষ্ট ও ক্ষুরধার ভাষায় প্রকাশ করেছে। কবির শিল্পী সত্তা, তাঁর সৌন্দর্য চেতনা, সৃষ্টিশীল আবেগ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে দারিদ্র্যরূপী নিয়তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে। তার পরিচয় পাওয়া যায়—

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,

অল্পান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস—পংক্তিদ্বয়ে।

সুন্দরের দান গ্রহণ করবার জন্য কবির মন যখনই উন্মুখ হয়েছে, তখনই দারিদ্র্য, ভয়ংকর ক্ষুধারূপে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্যসাধনাকে ব্যর্থ করেছে। কল্পনার জগৎ হয়েছে যেন শূন্য মরুভূমি, এ যেন নিয়তির সঙ্গে কবির সৌন্দর্য কল্পনার সংঘাত।

১ রফিকুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা। পৃষ্ঠা : ৩৫৭



কবিতাটির রচনাকাল আশ্বিন, শরৎকাল,—শারদীয়া উৎসবের কাল, আগমনীর সানাই, শেফালির শুভ্রতা ও তার প্রাণমাতানো সুবাস বাঙালির গৃহ জীবনকে বর্ণগন্ধময় করে তোলে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে কবির সৌন্দর্যচেতনায় কল্পণ পরিণতি ফুটে উঠেছে—

বেদনা-হলুদ-বৃত্ত কামনা আমার  
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার  
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম  
দলবৃত্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম।”

এই ছত্রগুলিতে এক মর্মান্তিক বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ আঁকা হয়েছে। তবুও কবি হতোদ্যম হননি। তিনি কণ্ঠে জ্বালা নিয়েও গান গেয়ে মালা গাঁথে চলেছেন। ‘ক্ষমাহীন দুর্বাসা’র মতো ক্ষুধার্ত সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরছে। সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—দুর্বাসার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতেই পৃথিবীতে মহামারি দুর্ভিক্ষ, তুফান দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে—

ধরনী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো  
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,  
আছে কাঁটা শয্যাতে, বাহুতে প্রিয়ার  
তাই এবে কর্ ভোগ।

এসব সত্য বটে, কিন্তু আরও সত্য এরই মধ্যে আছে শরতের আনন্দময়ীর আগমনে সানাই-এর সুরে আগমনী গান—এ যেন প্রবাসী প্রিয়তমের প্রতীক্ষার কাল শেষের গান—

বধূদের প্রাণ আজ সানায়ের সুরে  
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে  
আসি আসি করিতেছে।

আর প্রিয় সখী বলে, “বল্ মুছিলি কেন না আঁখি, মুছিলি কাজল।”—এখানেই ফুটে উঠেছে শত বেদনায়, শত হতাশায়—আশার প্রদীপ জ্বালবার সংবাদ।

জীবনের এই বিচিত্র রূপে স্বর্ঘ্যে কবিপ্রাণ যখন সুরে তালে লয়ে উদ্বেলে হয়ে ওঠে তখনই ‘ধরিত্রী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার। ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।’—এই অনুভব যখন জাগে, তখনই ‘সহসা চমকি’ উঠে মনে পড়ে যায় দারিদ্র্যের নির্মম যন্ত্রণার কথা। তাঁর ক্ষুধাতুর শিশু দুদিন না খেয়ে জেগে উঠে কাঁদছে। দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে না পারায় বেদনাহত কবিপ্রাণ আত্মগ্লানিতে বলেন আগমনীর আগমনে তাঁর আনন্দের নেই অধিকার।

‘দারিদ্র্য’ নজরুলের একটি অনবদ্য কবিতা। দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মানবজীবনের রস ও সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে। তবে জীবনে দারিদ্র্যের সুতীর জ্বালা কবিতাটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তা অবনমিত হয় নি। পবিত্রে উপহার দিয়েছে এক সংগ্রামী চেতনা।

কবিতাটি সমিল প্রবহমান মিশ্রকলা বৃত্ত ছন্দে রচিত।  
 শীর্ণ করপুট ভরি / সুন্দরের দান।।  
 যতবার নিতে যাই/—হে বুভুক্ষু তুমি।।  
 অগ্রে আসি কর পান।\*\*/শূন্য মরুভূমি।।  
 হেরি মম কল্পলোক।\*\*/আমার নয়ন।।  
 আমারি সুন্দরে করে/অগ্নি বরিষণ।\*\*।।

স্বাসযতি ও অর্থযতির বিযুক্তি ও পরস্পর দুটি ছন্দে অন্ত্যমিল বা মিত্রাক্ষর। ছত্রের দ্বিপর্বিক মাত্রাবিন্যাস যথাক্রমে ৮ + ৬ মাত্রার।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস যথা : উদ্ভত উলঙ্গা দৃষ্টি, তরল গরল, অমরার অমৃত-সাধনা।  
 অর্থালঙ্কার—যথা উৎপেক্ষা—“উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ,” “ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার/ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।”

উপমা : শেফালির মতো শুব্র সুরভি বিথার,  
 সমসৌক্তি : শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই  
 ‘আয় আয়’ কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

উদ্ভূত অলংকারগুলি কবিতার বিশেষ তাৎপর্য বাড়িয়েছে শুধু নয় কাব্যকেও ব্যঞ্জনাৎ সমৃদ্ধ করেছে।

**শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা—**

দানিয়াছে খ্রিস্টের সম্মান—যীশু জাতিতে ছিলেন ইহুদি। তিনি পরমেশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত দূত। খ্রিস্ট একজন মুক্তিদাতারূপে গণ্য হল। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত খ্রিস্ট ধর্ম নামে পরিচিত। যীশুর প্রথম শিষ্যরাও ইহুদি ছিলেন। তিনি তাঁর বাণী প্রচার এবং নানা অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করলে ইহুদিরা তাঁকে খ্রিস্ট বলে মেনে নেন। যীশুর এই কার্যাবলি ইহুদি ব্যতিরিক্ত অন্যদের মধ্যে প্রচার করলে, নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যীশুর বিশ্বজনীন ও আধ্যাত্মিক বাণী অনেক ইহুদি নেতা ও যাজকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। তারা মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগে যীশুকে বিদেশি শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করে এবং শেষে কাঁটার মুকুট পরিয়ে বহু অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশু বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং মানুষের পাপ ও অপরাধের জন্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন।

যীশু যেমন বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ ও মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তেমনি কবিও যেন বিনা দোষে সীমাহীন দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে কাল যাপন করেছেন। এই জীবন-যন্ত্রণা কবির মনে যে ভাবানুভূতি সৃষ্টি করেছে, তা-ই ‘দারিদ্র্য কবিতার উৎস’ যীশু যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন, কবিও এই জীবন-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনের মহত্তর সত্যকে আবিষ্কার করেছেন।

ঋষি ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা—কোপন স্বভাবের জন্য খ্যাত পৌরাণিক ঋষি। এ থেকে প্রচলিত কথায় ক্রোধী ব্যক্তিকে ‘দুর্বাসা’ বলা যায়। তাঁর উগ্র স্বভাবের পরিচয় নানা কাহিনির মধ্যে পাওয়া যায়। কালিদাস ‘অভিজ্ঞান

শকুন্তলম্ নাটকে পতিচিন্তায় নিমগ্না অনন্যমনা শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার কঠোর অভিশাপের বিবরণ দিয়েছেন। এই অভিশাপের ফলে পতি দুঃখস্ত শকুন্তলার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন এবং তাঁকে দীর্ঘকাল পতিবিরহ বেদনা সহ্য করতে হয়।

(সূত্র : ভারতকোষ, খণ্ড—৪)

কবি নজরুল ইসলামের ‘দারিদ্র্য’ কবিতায় দারিদ্র্যের সীমাহীন নিপীড়ন কবি চিত্তকে বিহ্বল করেছে। তিনি এর কোনো কারণই খুঁজে পান নি। যখনই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রেরণায় সত্য সুন্দরের সাধনায় নিরত হয়েছেন তখনই কোনো অজ্ঞাত পথে ক্ষুধা, দুঃখ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তাঁর স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে। আর ক্ষুধার তাড়নায় অর্থের প্রয়োজনে দ্বারে দ্বারে আবেদন জানাচ্ছেন—“টাকার বড্ড দরকার....অস্ত্র পঁচিশটি টাকা পাঠাও” বা দুটি গান পাঠিয়ে প্রত্যাশা করেছেন যদি গুঁরা টাকাটা দেয় তা হলে খুব উপকার হয় অথবা ভাবছেন, “অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয় শেষে।”—এই অর্থাচিন্তার প্রেক্ষাপটে এই ‘দারিদ্র্য’ কবিতা, তাই ‘দুর্বাসার’ শাপের মত ‘ক্ষুধা, দারিদ্র্য’ কবিকে যন্ত্রণা বিম্ব করেছিল একথা বলেছেন।

লক্ষ্মীর কিরীটা—ইত্যাদি—লক্ষ্মীর স্বর্ণমুকুট, সরস্বতীর বীণা ঐশ্বর্য ও সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য কল্পনার প্রতিভূ—এ তো ধরণীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বসম্পদের বিচিত্র বৈভব যে গুণীজন সৃষ্টি করেন, তাঁদের উপর দারিদ্র্যের অমোঘ আক্রমণ সে সৃষ্টিকে অকালে বিনষ্ট করে, বিরূপ প্রতিকূলতায় সমস্ত ‘সুর’ যেন আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

## অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ুন। তাহলেই, যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) \_\_\_\_\_ দৃষ্টি, বাণী \_\_\_\_\_

বীণা মোর \_\_\_\_\_ তব হল \_\_\_\_\_।

খ) তুই নাগ, \_\_\_\_\_ তোর \_\_\_\_\_ দহে।

\_\_\_\_\_ বসি তুই গাঁথিবি \_\_\_\_\_,

গ) বীণা-তারে \_\_\_\_\_ হানি

\_\_\_\_\_, কী সুর বাজাতে চাহ \_\_\_\_\_ ?

যত সুর \_\_\_\_\_ হয়ে ওঠে শুনি।

২) ‘দারিদ্র্য’ কবিতার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

৩) ‘দারিদ্র্য’ কবিতার ছন্দ-রীতি সম্পর্কে আপনার অভিমত চারটি ছত্র উদ্ধৃত করে আলোচনা করুন।

৪) ‘দারিদ্র্য’ কবিতা থেকে একটি করে অনুপ্রাস, উপমা, ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ দিন।

- ৫) ক) ‘দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান কন্টক মুকুট শোভা’—উদ্ভূতির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।  
খ) ‘দুর্ভাসা’ কে? তাকে ক্ষমাহীন বলবার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

---

### ৩৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

---

- ১) কাজী নজরুল ইসলাম সাধিত্তা সাহারা, সিন্দুহিল্লোল, চৰবাবঙ্গ
- ২) ড. রফিকুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্যঙ্গ
- ৩) ড. মিলন দত্ত নজরুল জীবন-চরিতঙ্গ
- ৪) অধ্যাপক আতভির রহমান নজরুল কাব্য-সমীক্ষাঙ্গ
- ৫) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত নজরুলের কবিতা : অসংযমের শিল্পঙ্গ
- ৬) পশ্চিমব। : কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা ১৪০৬ঙ্গ
- ৭) পশ্চিমব। বাংলা আকাদেমি : নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারক-গ্র\*ঙ্গ

---

## একক ৩৬ □ জীবনানন্দ দাশ : একটি কবিতা

---

গঠন

৩৬.১ উদ্দেশ্য

৩৬.২ প্রস্তাবনা

৩৬.৩ জীবনানন্দ দাশ : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

৩৬.৪ মূলপাঠ—১ : বনলতা সেন

৩৬.৫ সারাংশ—১

৩৬.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

৩৬.৭ গ্রন্থপাণ্ডি

---

### ৩৬.১ উদ্দেশ্য

---

প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষত বিশ ও তিরিশের দশকে এক তরুণ কবি-গোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র ধরনের নতুনতর কাব্যসৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বব্যাপ্ত প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে, শুধু তাঁর প্রতিধ্বনি হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়। কল্লোল-কালিকলমের যে কবিকুল সমকালের প্রেক্ষাপটে নতুন পথের সন্ধান করছিলেন জীবনানন্দ বোধ করি তাঁদের মধ্যে ভাব স্বাতন্ত্র্য ও কাব্যভঙ্গিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। এ হেন কবির কাব্য ও কৃতি সম্পর্কে আপনার বিশেষভাবে জানবার সুযোগ ঘটবে তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। আপনি কবির—

- কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যনির্মাণে অভিনবত্ব,
- প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ-এর পরিচয়
- কাব্যের উপমা ও চিত্রকল্পের অনন্যতা
- কালচেতনা ও ইতিহাসবোধ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা বক্তব্য প্রধান নয়
- ইতিহাস ও সমাজচেতনা এক তীক্ষ্ণ ও নতুন বেদনাবোধের সঞ্চার ঘটায়
- রচনায় বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণে শূন্যতা ও নির্জনতার একটি পরিমণ্ডল ফুটে উঠেছে
- রোমান্টিক মেজাজ ও মহৎ প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা অন্তরাশ্রয়ী হওয়ায় বিষণ্ণতা তাঁর কবিতার অন্তর্লগ্ন হয়েছে
- কাব্য প্রকরণে অচিন্তিতপূর্ব বৈচিত্র্য—প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। আর এই ধারণা থেকে জীবনানন্দ ও তাঁর সমকালের কবিদের রচনা বিশ্লেষণ করে তাঁদের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আপনি আলোচনা করতে পারবেন।

## ৩৬.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় এককে আপনি আধুনিক বাংলাকাব্যে ১৯শ ও ২০ শতকে দেশকালগত পার্থক্য জনিত কারণে কবি ধর্ম ও কবিকৃতির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণ ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনেছেন। সেই পরিচয় সূত্রে তৃতীয় এককে ১৯শ শতকের কবি মধুসূদন ও তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য ষষ্ঠ সর্গ পাঠ ও চতুর্থ এককে ১৯শ-এর উত্তরার্ধ ও ২০শ শতকের প্রথমার্ধের কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম এককে একান্তভাবে প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কবি নজরুল ইসলামের কবিতার মধ্য দিয়ে যুগলক্ষণগুলি সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা জন্মেছে। বর্তমান এককের কবি প্রথম যুদ্ধোত্তরকালের দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু সমসাময়িক সকল কবির চেয়ে কল্পনা ও প্রকাশে বিশেষ স্বতন্ত্র।

জীবনানন্দের প্রথম কবিতা ('বর্ষ আবাহন'—ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩২৬) প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯১৯ সেই সময় থেকে আমৃত্যু (মৃত্যু ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪) তিনি কাব্যরচনা করে গেছেন। সুতরাং তাঁর কাব্যরচনার পরিসর প্রায় ৩৫ বছর। এ সময়টি থেকে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য রচনারও সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর সংখ্যাও অগনিত। সেই সঙ্গে অনুসারীও কম ছিল না। বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো হতে গিয়ে তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দ অনুসরণ করেও—যেহেতু দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ হওয়া অসম্ভব,—তাই লোকদৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছেন। প্রমথনাথ ও ভুজঙ্গাধর রায়চৌধুরী, রমনীমোহন ঘোষ ইত্যাদি তাই বিস্মৃত নাম। কিন্তু করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্র ভাবানুভূতির পরিচয় সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র কবি ব্যক্তিত্ব থাকায় এঁরা রবিরশ্মিকে শুধু প্রতিফলিত করেননি। স্বকীয় ধ্যানধারণা নিয়ে স্বতন্ত্র একটি কাব্যাদর্শক তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। এটিও ছিল অনেকাংশে রবীন্দ্র ছায়াছন্ন। এঁরা লোকায়ত সংস্কার ও রোমান্টিক ভাবনার সন্মিলনের অনেকটা চেষ্টা করেছিলেন, ফলে এঁরা বাংলাকাব্যে অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছর কয়েকজন কবিকে আমরা পেয়েছি যাঁদের কবিতা সে সময় পাঠক সমাজকে সচকিত করে তুলেছিল। নজরুলের বিদ্রোহ, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক আবহ নিয়ে আসে। রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত ও রবীন্দ্র ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় ছন্দের দোলা, বাঙালির সমাজ ও প্রতিবেশের নানা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন—রচিত হয়েছে 'পান্ধীর গান', 'দূরের পাল্লা', 'ইলশে গুঁড়ি', এবং 'গান্ধিজী', 'নফর কুণ্ডু', 'জাতির পাঁতি', 'মেথরের' মতো কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ দেশি বিদেশি কাব্যের অনুবাদ করে বাংলা কাব্যে দেশ বিদেশের মনোভূমিকে কাছে নিয়ে এসেছেন। তিনিই প্রথম গাড়োয়াল ধর্মঘট এবং ১৩১৩ সালে কিংবা তারো আগে 'সাম্যসাম' রচনা করে অসামান্য ঘটনা ঘটিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

“মানিনা গির্জা, মঠ, মন্দির, কঙ্কি, পেগম্বর

দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তার ঘর।”—

একথা তিনি প্রথম বলেছেন যেমন সত্য, তেমনি সত্য যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও শ্লেষমিশ্রিত উচ্চারণ ও

নজরুলের বিদ্রোহদীপ্ত ঘোষণা। এঁদের কবিতায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আধিক্য অনিবার্যভাবেই বাংলা কবিতার সে সময়ের পাঠককুলকে আকৃষ্ট করেছিল। এসব থেকে এই ধারণা জন্মানো সম্ভব হল যে, রবীন্দ্র কাব্যধারার সর্বত্রসঞ্চারী প্রভাবের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রকাশ সম্ভব। এঁরা বাংলা কবিতায় আমদানি করলেন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার ও জীবনাদর্শের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন ‘মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ নেই’। তিনি মেথরকে বশু বলে সম্বোধন করলেন। যতীন্দ্রনাথ চাষিকে ভাই বলে কাছে টেনে নিলেন, নজরুল আরও একধাপ এগিয়ে ‘বারাঙ্গনাকে’ মাতৃসম্বোধন করলেন। ওদিকে মোহিতলাল কাব্যের রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছেন। তাঁর কবিতার ভাবসংহতি ও অনমনীয় পৌরুষ তরুণতর কবিদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর ‘মৌবনবন্দনা’, তাঁর তন্ত্রধর্মী দেহবাদ—‘ভুলেছি আত্মার কথা মানি শুধু দেহের সীমানা’—সে যুগের তরুণতর আধুনিক কবিদের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কবিতার Eternal Passion ও Eternal Pain—জীবন, মৃত্যু, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তুলে ধরেছিলেন। কল্লোলের কবিরা এতে মুগ্ধ হলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, ‘মোহিতলালের জীবনবোধে যে তীব্রতা “অক্ষম হাতে শুধু উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসে অপব্যয়িক হতে পারত”, তা তাঁর হাতে “সুতীর অখচ শাসিত স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে।” “ইন্দ্রিয়গোচর মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ” তাঁর মতো সুনিপুণভাবে কেউ পরিবেশন করতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে সোভিয়েত সমাজ বিপ্লব। এর ফলে মানুষ ও মানব সমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটেছে। যুদ্ধোত্তর যুরোপীয় লেখকদের রচনাবলি তরুণ লেখকদের মনে ভাঙাচোরা পরিবার সমাজজীবনে নানা দুর্যোগ দুর্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। জনসমাজ জনজীবন তরুণ কবি সাহিত্যিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করছিল। কল্লোল-কালিকলম উত্তরা-প্রগতির কবি গোষ্ঠী এই সমস্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই তাঁদের রচনা প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়েছিল। জীবনানন্দের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র অনেক কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘প্রথমা’ ও বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দীর বন্দনা’র কবিতাগুলি এই সময়ের রচনা। ওদিকে ‘পরিচয়’ পত্রিকার আবহাওয়ার লালিত সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে প্রভৃতি সকলেই ১৯০০—১৯১০-এর মধ্যে জন্মেছেন। প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব-এর প্রবণতাগুলিকে যদি সূত্রায়িত করা যায় তবে বলা যেতে পারে প্রথমোক্ত জন যদি হন হুইটম্যানীয় আদর্শে সমাজচেতন, দ্বিতীয় নির্জন, নিঃসঙ্গা, প্রেম ও প্রকৃতিচেতন আর বন্দীর বন্দনায় কবি দেহজ প্রেমের তীব্র আকুলতায় কাতল। ‘পরিচয়ের’ কবিরা এদিক থেকে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র চরিত্রলক্ষণযুক্ত এবং অনেক অংশেই মননশীল মার্জিত বৌদ্ধিক।

কল্লোলের প্রথম পর্যায়ে (১৯২৩-১৯৩০) প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪—১৯৮৮) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ‘প্রথমা’র (১৯৩২) কবিতায় তিনি কখনো বহুলোকের মিলিত অনুভবকে, কখনো বা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবকে সঞ্চারিত করেছেন। এখানে কবির স্বপ্নভাঙা প্রাণের পরম বেদনা বোধের পরিচয় আছে। তাঁর ব্যক্তিমানস যেমন দুর্গম পথ সন্ধান করেছে, তেমনি সভ্যতার বিবর্তনেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কবিকণ্ঠ ছিল অব্যর্থ।

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি। প্রেমের কবিতাতেই তাঁর কবিত্ব শক্তির পূর্ণ পরিচয়। তাঁর কাব্য সাধনার শুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে।

‘মর্মবাণী’ (১৩৩১) কাব্যগ্রন্থে সে পরিচয় আছে। তিনি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রানুসরণে নতুন যুগ ভাবনার প্রকাশ সম্ভব নয়, তাঁদের কবি মানসেরও মুক্তি নেই। অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের “কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক। সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।” বুদ্ধদেব প্রেমের কবি। এ প্রেম মূর্ত, শরীরী ‘প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী, দেহজ কামনার শাপে নিরস্তুর দগ্ধ।’ কিন্তু বুদ্ধদেব শুধু তাতেই নিমজ্জিত থাকেননি। ইন্দ্রিয় তাঁর কাছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করবার উপায় মাত্র।

বুদ্ধদেবের নায়িকা রক্ত-মাংসের নারী। দেহী বলে তার নামরূপ দিয়েছেন—মৈত্রয়ী, কঙ্কাবতী। রবীন্দ্রনাথ ‘মহুয়া’য় বর্ণিতব্য নারী প্রকৃতিকে ধরিয়ে দিতে নাম ব্যবহার করেছেন, তার কোনো শরীরী রূপ দিতে চাননি। ‘মানসী’, মানসসুন্দরী তো ভাবলোকবিহারিণী। বুদ্ধদেব ও আধুনিক কবিরোম্যান্টিক অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকাকে দেহী রূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে তাদের আরও স্পষ্ট করে তুলতে পদবী যোগ করেছেন—বনলতা সেন, শেফালিকা বোস, অরুণিমা সান্যাল।

পরে শ্রৌচ পরিণত বুদ্ধদেবকে দেখেছি তিনি জীবনের অমোঘ সত্যটিকে উপলব্ধি করেছেন—জীবনে যেমন সত্য যৌবনের ঐশ্বর্য, তেমনি সত্য যৌবন-কামনা-মুক্ত পরিণত শ্রৌচত্বের নিরাভরণ রূপ। মোহ ও মোহমুক্তি এই দুই নিয়েই মানুষের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। তাঁর শেষ পর্যায়ী কাব্যে—‘দ্রৌপদীর শাড়ি’ (১৯৪৮) ; ‘শীতের প্রার্থনা’, বসন্তের উত্তর’, (১৯৫২) ; ‘যে আধার আলোর অধিক’ (১৯৫৮)-এ সে পরিচয় আছে।

(১৯০১—১৯৮৬) পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকেই সুধীন্দ্রনাথ (১৯০১—১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮০), ও অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—১৯৮৬) কাব্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কবিরো একই সামাজিক পটভূমিকায় বাস করেও স্বতন্ত্র ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাহী হলেও তাঁর কাব্যে ব্যাপক আত্মানুসন্ধানের পরিচয় আছে। একসময় নিজেকে পূর্বগামী কবিদের অনুসারী বললেও, পরে, তাঁর কবিতায় আধুনিক কালের সংহত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রবহমান ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে কবিতার রূপান্তর ঘটান। তিনি তাঁর স্বকীয়তাকে অর্জন করেছিলেন নিখুঁত কারুকৃতির সহায়তার। সাবলীল রচনাকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। সাধারণ পাঠকের কাছে যা স্বচ্ছন্দ, তাকে তিনি চর্চিতচর্চণের নিদর্শন মনে করতেন। একান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সুধীন্দ্রনাথ মানতেন নিরাসক্তি সংসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ, তাকে আয়ত্ত করাই কাব্যচর্চার হেতু। মননপ্রধান কবি বহু ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন বলেই আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বিষ্ণুদের কবিতা এ কালের পাঠকের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ। ইনিও একসময় রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দরের সাধনায় আগ্রহী ছিলেন। চেয়েছিলেন ‘আনন্দ, আনন্দ, শুধু আনন্দ-নিষ্যন্দন আকাশ’ কিন্তু বিরোধী পারিপার্শ্বিকতা সম্ভব ছিল না। উর্বশী ও আর্টেমিশ-এ ‘ছেদ’ কবিতায় বলেছেন,—‘হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।’ ফলে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনাজনিত সমষ্টির অঙ্গীকার তাঁর কবিতায় অসামান্য মর্যাদা পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, শান্তির জন্য সংগ্রাম—এ সবার মধ্যেও তিনি কখনো বিশ্বাস হারাননি। তাঁর কাব্য স্বপ্নবাক, ভাবগম্ভীর, দেশি প্রতীক ও চিত্রকল্পের পাশাপাশি বিদেশি প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে সমৃদ্ধ। তাঁর



কবিতার ভাষা বিন্যাস ও প্রয়োগ কৌশল অনেক সময় একটু জটিল কদাচিৎ তাঁর কবিতার বিষয় ও ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে একটু দুরূহ বলে মনে হতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিক চিন্তাভাবনা, নতুনতর আঞ্জিকে ও ভঞ্জিকে রচিত কবিতা প্রথম থেকেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। তাঁর কবিতা আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা সহজ মনে হলেও, সেটি ঠিক নয়। বরং বলা যায় তাঁর কবিমানস অনেকটা জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত। তাঁকে মনে হতে পারে অনেকটা আধ্যাত্মিক বা মিস্টিক বা মরমিয়া চেতনার উত্তরাধিকারী, বস্তুত এটি তাঁর এক ধরনের ছদ্মবেশ। “নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তলায় যেমন লুকিয়ে থাকে মগ্ন শৈল ও ঘন অরণ্য, ঘূর্ণাবর্ত ও জলচর জীবের বিক্ষোভ, তেমনি ধ্যানগম্বীর ‘সজ্জাতি’র কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্ব জর্জর আধুনিক মানস—সময় যার কাম্য” অথচ যাকে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিমানসের বিবর্তনের প্রথম স্তরে বস্তু ও চেতনার মধ্যে ঐক্যকে দেখেছেন, পরে উপলব্ধি করেছেন বিজ্ঞান ও বস্তু চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল রহস্যকে উপলব্ধি করা যায় না। “বাহিরের সকল ঘটনার তাৎপর্য, সকল বিরোধের সজ্জাতি, সকল বৈষম্যের ঐক্য নিহিত আছে কবির ধ্যানে।” তাই যা দেখা যায়, তাই সব নয়—অর্থাৎ “দৃষ্টির দর্শন” সব কথা নয়। কাব্যেরও একটি শ্রেয়তা আছে, তা সমাজ-নিরপেক্ষ, সংসারের সুখ দুঃখ থেকে ভিন্ন—তাকে ধ্যানে উপলব্ধি করতে হয়। কাব্য এভাবে অমিয় চক্রবর্তীকে সমাজ থেকে দর্শনে পৌঁছে দিয়েছে। ফলত তাঁর কবিতায় দৃষ্টির জগৎ ধ্যানের জগতের বিরোধ বেধেছে—কবির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আছে তাঁর কবিতায় বিশ্বপথিক কবির এক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পরিচয়। উপসংহারে বলা যায় অমিয় চক্রবর্তী বস্তুবিশ্ব-সমাজদর্শন-বিশ্বদর্শন-এ নিয়ত পারাপার করে যে প্রঞ্জার অধিকারী হয়েছেন, তা তাঁর কবিতাতে জটিল করেছে। কবিতার ভাষাকে আপাত বিশৃঙ্খল, ব্যাকরণকে ভেঙেচুরে তাতে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছেন। বলা যায় তাঁর রচনারীতিতে সৃষ্টিশীল বিশৃঙ্খলার—(Creative violence)-এর সুস্পষ্ট ছাপ আছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা চেতনাসমৃদ্ধ সৃষ্টিশীল প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দের আবির্ভাব। জীবৎকালে বৃন্দদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কিছুটা সমাদর পেলেও তাঁর কবিমণীষা মৃত্যুর পর যেভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, প্রথম শ্রেণির কবি প্রতিভার মর্যাদা পেয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পাননি। জীবনানন্দের জীবনবৃত্ত ও কাব্যকথা প্রসঙ্গে সেটি আলোচ্য।

---

### ৩৬.৩ জীবনানন্দ দাশ : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

---

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, বরিশাল শহরে। তাঁর পূর্বপুরুষরা এক সময় ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ‘গাউপাড়া’ গ্রামে বাস করতেন। সেটি পরে পদ্মার ভাঙনে লুপ্ত হয়েছে। পিতামহ সর্বানন্দ প্রথমে পড়াশুনা পরে চাকরিসূত্রে বরিশালে স্থায়ী হন। সর্বানন্দ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যানন্দ বাবার ইচ্ছায় কলকাতার সিটি কলেজে পড়ে প্রথমে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সত্যানন্দের স্ত্রী কুসুমকুমারী ব্রাহ্ম চন্দনাথ দাসের মেয়ে। বেথুন স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়বার সময় তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরেও তিনি কাজের ফাঁকে লেখাপড়া

করতেন, কবিতা লিখতেন। দুই ছেলে—জ্যেষ্ঠ জীবনানন্দ, কনিষ্ঠ অশোকানন্দ, বোন সুচরিতা দাশ। শৈশবে ভোরে উঠে বাবার উপনিষদ আবৃত্তি, মায়ের গান শুনতেন। পরিচারক-পরিচারিকাদের কাছে গল্প-গাথা-ছড়া শুনতেন ; গাছ, পাখি লতা পাতা এদের কাছে চেনা। ১৯১৫ তে ব্রজমোহন স্কুলে থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ব্রজমোহন কলেজে আই.এ. (১৯১৭), পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক ইংরেজি সহ বি. এ. (১৯১৯) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১-এ এম.এ. পাশ করে সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু (১৯২২), কলেজের অর্থ-সঙ্কটে কনিষ্ঠ অধ্যাপক জীবনানন্দের কর্মচ্যুতি (১৯২৮)। বৎসরাধিককাল টুইশন নির্ভর বেকার থাকার পর ১৯২৯-এ মাস তিনেক খুলনার বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে পড়ান। ওই বছরের ডিসেম্বরে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে বরিশালের অশ্বিনী দত্ত-র ভাইপো সুকুমার দত্ত কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩০-এর ৯ই মে খুলনার সেনহাটি গ্রামের রোহিণী গুপ্তের কন্যা লাভণ্য দেবীকে বিয়ে করেন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে। শোনা যায়, রামযশ কলেজ বিয়ের জন্য ছুটি দিতে চায়নি, তাই তাঁর আর ফিরে যাওয়া হয়নি। প্রায় বছর পাঁচেক বেকার ছিলেন। মাঝে কিছুদিন জীবন বিমার এজেন্ট-এর কাজ করেছেন। কিছুদিন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসাও করেছেন। জীবনধারণের একমাত্র উপায় গৃহ শিক্ষকতা—এই সুদীর্ঘ অস্থকারের দিনের পরিচয় পাওয়া যায় এ সময় রচিত কবির কতকগুলি গল্প ও তিনটি উপন্যাসে। যার স্থান কবির জীবৎকালে মেলেনি। অবশেষে কবি ১৯৩৫-এ বরিশাল-এ ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির স্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। টানা এগারো বছর সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। মাঝে ১৯৪৩-এ একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসে বেড়িয়ে গেছেন। ১৯৪৬-এ দেশ বিভাগের বেশ কিছুদিন আগে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন, আর ফিরে যাননি। বছর দুয়েকের জন্য আবার বেকার। মধ্যে কয়েকমাস সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চেষ্ঠায় ‘দৈনিক স্বরাজ’ পত্রিকার রবিবারের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনা ভার পান। সে বছরের শারদ সংখ্যাও সম্পাদনা করেন। এরই মধ্যে স্পষ্ট হল সাংবাদিকতা তাঁর ধাতে নেই। ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি ছেড়ে দেন। এরপর বিজ্ঞাপন দেখে চাকুরি দরখাস্ত, বন্ধুদের কাছে আরজি জানানো। প্রায় আড়াই বছর বেকারিতির পর ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে খড়্গপুর কলেজে চাকরি পান। সেখানে হোস্টেলে থাকতেন আর সুযোগ পেলেই চলে আসতেন কলকাতায়। নানা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত জীবনানন্দ এ সময় দুশ্চিন্তাপ্রবণ হয়ে পড়েন। স্ত্রী বি. টি. তে ভর্তি হয়েছেন। বলা যায় সংসার তাঁরই ঘাড়ে- তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবিও প্রায়ই ছুটি নিয়ে কলকাতায় থাকেন, অবশেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে চাকরি ছাড়েন। আবার বেকারি, আবার চাকরি খোঁজা। ১৯৫১ তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রিসার্চ এসিস্টেন্টের জন্য এবং চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা, অস্থায়ী ব্যবসা, আর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সুপারিশে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে চাকরির চেষ্ঠা করে ব্যর্থ হন। ১৯৫২ তে লাভণ্য দাস বি.টি. পাশ করে স্কুলে চাকরি পেলে প্রাথমিক সমস্যা মেটে বটে কিন্তু উদ্বেগ কমেনি।

১৯৫২-র নভেম্বর থেকে ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার মাস বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে লিভ ভ্যাকেশিতে অধ্যাপনা করেন। কাগজ দেখে আবেদন পত্র পাঠিয়ে ১৯৫৩ মার্চে ফকিরচাঁদে কলেজ, ডায়মন্ডহারবারে, গোপাল রায়ের সুপারিশে চাকরি হলেও সাংসারিক অসুবিধার কারণে যোগ দিতে পারেননি, ফলে টুইশন নির্ভরই জীবনই চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৩-র মাঝামাঝি উক্ত শ্রীরায়ের চেষ্ঠাতেই অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা পেলেন, সেখানেই আমৃত্যু চাকরি করেছেন। ইত্যবসরে অধ্যাপক

হুমায়ূন কবীরের তৎপরতায় ডি. পি. আই পরিমল রায়ের সাহায্যে এবং রাজ্য সরকারের এবং দিল্লির একটি কলেজে চাকরির সুযোগ এসেছিল, জীবনানন্দ যেতে চাননি। কলকাতায় এসময় কবি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সহকর্মী ও ছাত্রীদের কাছ থেকে যেমন তেমনি কবি হিসেবেও ব্যাপক প্রীতি সমাদর ও মর্যাদা লাভ করছেন। কবিমহল ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত ‘বনলতা সেন’ ১৯৫২ তে সিগনেট প্রেস প্রকাশ করে। গ্রন্থটি নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ১৯৫৪ জানুয়ারিতে সিগনেট হলের কবি সম্মেলনে কবি স্মরণিত পড়ে শোনালেন। এ বছরই ১৩ই অক্টোবর বেতারকেন্দ্রের কবি-সম্মিলনে কবিতা পড়লেন। ১৪ই অক্টোবর বিকেলে অন্যান্য কবি রাসবিহারী ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে ট্রামে চাপা পড়ে শঙ্কুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি হলেন। সেভাবেই কয়েকদিন কাটল, শেষে সেপটিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪র ২২শে অক্টোবর রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাব্যকথা—জীবনানন্দ শৈশবের মায়ের কাছে কাব্যচর্চার প্রেরণা পেয়েছেন। মা কুসুমকুমারী সংসারের কাজের ফাঁকে কাব্যচর্চা করতেন। স্বভাবকবির নৈপুণ্যে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। ‘ব্রহ্মবাদী’, ‘মুকুল’, ও ‘প্রবাসী’তে তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বাবা সত্যানন্দ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ‘ব্রহ্মবাদী’ সম্পাদনা করেন। এখানেই জীবনানন্দের ‘বর্ষা আবাহন’ শীর্ষক কবিতা এপ্রিল ১৯১৯ (বেশাখ ১৩২৬) প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সদ্য বি. এ. পাশ করেছেন। কবিতাটির কোন অসামান্যতা ছিল না। পরে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে “দেশবন্ধু প্রয়াণে” বঙ্গবাণীতে, এবং অন্যান্য কবিতা কল্লোলে, প্রবাসী, ধূপছায়া, বিজলী, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা ৫৯৯টি (দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ কাব্যসংগ্রহ)।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ : ‘ঝরা পালক’ (১৩৩৪), পুণর্মুদ্রণ (১৩৭৯),

২. ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৩৪৩), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ;

৩. ‘বনলতা সেন’ (১৩৪৯), কবিতা ভবন সংস্করণ ; দ্বিতীয় সংস্করণ সিগনেট, (১৩৫৯) ;

৪. ‘মহাপৃথিবী’ (১৩৫১), পূর্বাশা সিগনেট সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৫. ‘সাতটি তারার তিমির’ (১৩৫৫), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৬. ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (১৩৬১), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ; তৃতীয় সংস্করণ (১৩৬৭), চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭০), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৩) দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ (১৩৯০),

তারপর এ পর্যন্ত প্রকাশিত—

৭. ‘রূপসী বাংলা’ (১৯৫৭), দেবেশ রায় সম্পাদিত সং (১৯৮৪) ;

৮. ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (১৩৬৮) ;

৯. ‘সুদর্শনা’ (১৩৮০), ইং (১৯৭৩) ;

১০. 'মন বিহঙ্গাম' (১৩৮৬), ইং (১৯৭৫) ;

১১. 'আলো পৃথিবী' (১৩৮৮), ইং ১৯৮১ প্রভৃতি।

প্রকাশক : শ্রী গোপাল রায়, সাহিত্য সদন। এই গ্রন্থত্রয়ী তালিকাবন্ধ হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা) 'জীবনানন্দ' পুস্তকে।

---

## ৩৬.৪ মূলপাঠ — ১ : বনলতা সেন

---

### বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,  
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে  
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিক্ষিসার অশোকের ধূসর জগতে  
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;  
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,  
আমারে দু-দণ্ড শাস্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,  
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকায় ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর  
হাল ভেঙে যে নাবিক হায়ায়েছে দিশা  
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,  
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'  
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন  
সম্ভ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;  
পৃথিবীর সব রং নিভে গেল পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন  
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;  
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;  
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

---

## ৩৬.৫ সারাংশ — ১

---

অনেক আবেগ আকাঙ্ক্ষা আকুলতা নিয়ে অন্বেষণ স্বপ্ন যখন ক্লান্ত, পথকে মনে হয়েছে দূরপ্রসারী, জীবনের চারিদিকে সফেন সমুদ্র উদবেল হয়ে উঠছে কিন্তু হাঁটার শেষ হয়নি — সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগর পর্যন্ত — বিহিসার অশোকের ধূসর জগৎ পেরিয়ে সুদূর বিদর্ভ নগরে হালভাঙা দিশেহারা নাবিকের কল্প জগতের স্থানে, এমনই সময় মিলেছে দুদণ্ডের শান্তি —

‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলেছে সে

এতদিন কোথায় ছিলেন?’

আতপ্ত হৃদয় অবশেষে দিনের শেষে, সন্ধ্যা নামে জোনাকি জ্বলে, সেই অন্ধকারে সব কাজ সেরে মুখোমুখি বসবার অবকাশ পায়।

---

## ৩৬.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

---

‘বনলতা সেন’ কবিতার প্রথম প্রকাশ ‘কবিতা’ পত্রিকায় (পৌষ ১৩৪২ এ) মোট ১২ টি কবিতা নিয়ে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে এটি সংকলিত হয়। ‘কবিতা ভবন’ প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রকাশ পৌষ ১৩৪৯ ইং ডিসেম্বর ১৯৪২। গ্রন্থটি প্রকাশমাত্র নামকবিতা সহ কাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করেন। ‘কবিতায়’ বুদ্ধদেব বসু ও ‘চতুরঞ্জি’ আবুল হোসেন চৈত্র, ১৩৪৯ ; ‘একক’-এ শুম্ভসত্ত্ব বসু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ‘নিরুত্ত’, আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায় কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে ‘বনলতা সেন’ কবিতা সম্পর্কে তাঁর কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ‘জীবনানন্দের কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্তি। দূর দেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশ-বিহারী, কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত। জীবনানন্দের জগৎ সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে ‘চিত্ররূপময়’ আখ্যা দিয়েছিলেন। ..... তাঁর কাব্য বর্ণনা বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল। তাঁর কবিতা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তবে, প্রথমে দৃষ্টি, পরে স্পর্শ। তাঁর মন স্বভাবতই দৃশ্যবিলাসী ও স্পর্শ পিপাসু। ..... জীবনানন্দ লিখেছিলেন, “উপমাই কবিত্ব।” তাঁর কবিতায় উপমার ছড়াছড়ি। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দুরবগাহ। — কোন অভিনব বিশেষণ, কিংবা পুরানো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্য পদের রূপক প্রয়োগ — এ সমস্তই তো উপমা। — জীবনানন্দ যখন বলেন — বলেছে সে, “এতদিন কোথায় ছিলেন?”

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। — তখন বোঝা যায় কবির মন কীভাবে কাজ করেছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ এ সমস্তই যে কোনো সর্বদেশ কালব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি করে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

আবুল হোসেনের বক্তব্য — জীবনানন্দ একান্তভাবেই বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক। রবীন্দ্র ঐতিহ্যমুক্ত হয়েও, তিনি একান্তরূপেই রোমান্টিক। ভাবকে তিনি কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি কি চিত্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

..... কবির কাব্যের প্রাণ হল অদ্ভুত মিশ্রণে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। পুরোনোর সঙ্গে নতুনের। অসম্ভবে-সম্ভবে এসে দেখেন নাটোরের বনলতা সেনকে সে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলে “এতদিন কোথায় ছিলেন?” আকস্মিক বিস্ময়ের বিদ্যুৎ স্পর্শের শিহরণ সঞ্চারিত হয়। এটাই জীবনানন্দের টেকনিক। শূন্যসত্ত্ব বসুর মতে ‘বনলতা সেন’ বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অমর সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের পর এত সুন্দর ও সার্থক রোমান্টিক কবিতা আর সৃষ্টি হয়নি বলা যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন জীবনানন্দ ইয়েটস-এর মতো অতীত জগতে আর স্বপ্নের বস্তুতে সৌন্দর্য খুঁজে পান। বনলতা সেন-এ এমন একটি জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে যেখানে হৃদয়ের ইচ্ছা আর অনুভূতির ও কল্পনার উল্লাস তৃপ্তি পেতে পারে। কবির প্রেম কাতর হৃদয় অতীতের সমস্ত মোহ যেন এখানে প্রকাশ পেয়েছে— তাঁর অন্তহীন প্রেমানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে ‘বনলতা সেন’-এ—

“চুল তার কবেকার অশ্কার বিদিশার নিশা

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য .....।” — নাটোরের একটি সাধারণ নারীকে — কবির প্রেমানুভূতি

কারুকার্যখচিত করে তুলেছে। কবির আবেগের যেন কাব্যময় প্রতীক সে। বনলতা সেন’ প্রেমের নিবিড়তায় মূর্ত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। যে রূপ জীবনানন্দ সৃষ্টি করেন আবেগের তাড়নায় তা শূন্য দৃশ্যের বিষয়ীভূত নয়, তা উপলব্ধিরও—এখানেই জীবনানন্দের স্বচেতন স্বকীয়তা।

‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পর্বে কবিও কবিতা পত্রিকার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হল। তিরিশের দশকে যে কবির কাব্যযাত্রা শুরু প্রায় এক দশক পরে তার প্রাথমিক স্বীকৃতি লাভ ঘটল। এই বিলম্বিত স্বীকৃতির কারণও যে স্বয়ং জীবনানন্দের—তাঁর অন্তর্মুখী গহন মন, গভীরতর ভাবানুভূতি, তাঁর অভাবনীয় কল্পনার ঐশ্বর্য, শব্দ নির্বাচন ও চিত্র রচনার বিস্ময়কর ক্ষমতা। তাই ‘বনলতা সেন’ কবিতাটির বিচার বিশ্লেষণে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি এক সময় কাব্যালোচনার আসরে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেউ কেউ একে কবির শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন।

তিন স্তবকে ১৮ ছন্দে রচিত কবিতাটি কতকগুলি অপ্রত্যাশিত শব্দযোজনায় এমন একটি অসামান্য কাব্য শিল্প সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটির আরম্ভ ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’—যেন কোন দূরগত কল্পনার জগতে জীবনের আভাস নিয়ে এসেছে—এই নিরন্তর চলার মধ্যে ইতিহাস-ভূগোল ছাড়িয়ে কিছু আছে। কিন্তু কবিতা কবির অনুভব থেকে সৃষ্টি—এর উৎস, আদি-অন্ত্য সন্ধান দূরবগাহ। তাই সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর বিস্তার অশোকের বস্তু জগৎ থেকে কল্পনা ব্যঞ্জনার্থ সন্ধানই স্বাভাবিক। এ থেকে একটি দেশে ও কালে ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ জগতের যখন আভাস আসছে, তার মধ্যে অকস্মাৎ কোনো পরিচয়হীনা নাটোরের বনলতা সেন, যার প্রসঙ্গ টেনে তারই কাছে জীবনের সফন সমুদ্রে ভাসমান নিদারুণ অস্তিত্বের ভারে ক্লান্ত প্রাণের দুদণ্ড শান্তি পাওয়ায় সংবাদ—বস্তুত, সেই রমণীয় অসামান্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপস্থাপনার অভিনবত্বে নাটোরের বনলতা সেন কাব্য রসিকের কাছে হেলেন বা বিয়াক্রিচের মতো চিরকালের একটি স্মরণীয় প্রতিমা হয়ে আছে।

কবিমানসী সম্পর্কে আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা মনোলোকের বাসিন্দা, অদেহী—প্রকৃতির বিচিত্র মহিমায়—সম্মার রক্তিম বর্ণে, উষার কনক স্বর্ণে, নীল আকাশের

নীলিমায়-স্বপনচারিণী। বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-বিষ্মদের কাছে তারা শরীরী রক্তমাংসের নারী—তাই তাদের নাম রূপ আছে—এমনকী জীবনানন্দে গাঁই গোত্রটি পর্যন্ত—নাটোরের বনলতা সেন। রোমান্টিক প্রেমের অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকা এখানে দেহী এবং ভৌগোলিকতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই পরবর্তী স্তবকেই তাঁর একটি বর্ণনা পাই। বনলতার উপস্থাপনা পর্বে—তাঁর দুদণ্ডের শান্তি দেওয়ার জন্য যে প্রশান্ত মার্ধ্য পাঠক উপলব্ধি করেছে, তাতেই অনুভব করা গিয়েছে তার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের আকর্ষক ও পরম রমণীয়তা। কবির দেওয়া বর্ণনায় জানা যায় কবি কী করে তিলে তিলে তাকে সৃষ্টি করেছেন—শব্দকে কত সহজে ব্যবহার করে একটি অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করা যায়। চুল তার কবেকার অশ্কার বিদিশার নিশা। মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকর্ম। কালিদাসের কল্পনা সৃষ্টি সৌন্দর্য জগতের সেই অস্পষ্ট কল্প জগতের বিদিশার অশ্কার রাত্রির থেকেও কালো যাঁর চুল, মুখ যাঁর প্রাচীন ভাস্কর্যকলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শ্রাবস্তীর কারুকর্মের মতো—এমনই একজন বনলতা সেন। এই উল্লেখই পাঠক কবির সঙ্গে কবি অনুভূত সৌন্দর্য জগতে বিচরণ করে এমন কোনো এক রমণীয় রূপকে কল্পনা করেছেন যা ইতোপূর্বে কেউ করেনি। জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে যেন এক অপ্রত্যাশিত জগতের আরও এক অপ্রত্যাশিত নারীর সম্মান দিলেন, যা ছিল এতদিন একেবারেই অভাবনীয়। বনলতা সেন, তাই এক সচকতি-করা কবিতা। আজও বনলতার চোখের বর্ণনা—‘পাখির নীড়ের মতো চোখ’—শুধু একটি চিত্রকল্প নয়, তা যেন গভীরতর ব্যঞ্জনায় সঞ্চার করে অন্তর্লোককে আচ্ছন্ন করে। এদিক থেকে পাখির নীড় শুধু নীড় নয়, পাখিদের ক্লাস্তি অপনোদন ও শান্তির নীড়। সেই বিশ্রান্তি ও শান্তির আশ্বাস আছে বনলতার চোখে—সে চোখ আশ্রয় দেয়, ক্লাস্তি অপনোদন করে, শান্তি দেয়। উপমাটি এদিক থেকে সার্থক। কবিতাটি এখানেই শেষ হয়নি। এরপর জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে আপাত বিষাদময় গোধূলির এক নিঃসঙ্গ জগতে নিয়ে গেছেন—“সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী”—এই প্রত্যাবর্তনের বার্তা মাত্র দুটি শব্দে বিধৃত হলেও, এর গভীরতা সুদূর প্রসারী। কবি কবিতার প্রথমেই কাল স্রোতের প্রবহমানতার ইঞ্জিতের (হাজার বছর ধরে পথ হারায়) সঙ্গে চিরন্তন নিঃসঙ্গতার সহজ সত্যের আভাস দিয়েছেন, তা দ্বিতীয় একটি ঘটনার পটভূমি রচনা করেছে। ‘সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন’—জীবনের দুকূল বেয়ে চলার নদী বা কালপ্রবাহের পরেও অবশিষ্ট থেকে যেটুকু সময়, সেটিই তো কবির কল্পজগৎবাসিনী কবি মানসীকে একান্ত আপন করে পাবার মুহূর্ত — “মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন”—বনলতা সেন তারই মূর্ত প্রতীক। বনের লতা যেমন চির শ্যামলতার প্রতীক তেমনি বনলতা সেনও মানবীয় সৌন্দর্যের দীপ্তিময় প্রকাশ—সে ক্লাস্তিহারী শান্তির নিশ্চিত আশ্রয়। এদিক থেকে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু কবিতাটির কোথাও বনলতাকে প্রিয়া সম্বোধন বা কল্পনা করা হয়নি—কবির আচরণেও তার আভাস নেই। তাই কবিতাটিকে বলা যায় নির্বিশেষে প্রেমের কবিতা—নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নয়, পারস্পরিক আকর্ষণ এই কবিতাটিকে অনেকটা রহস্যময় করেছে।

কোনো কোনো সমালোচক এজন্য বনলতা সেন কবিতায় মহাসময়ের সঙ্গে মহাজীবনের অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জীবনকে দেখেছেন। তাঁদের মতে কবি যেমন বর্তমান সময়গ্রন্থিতে নিবিষ্ট, নাটোরের বনলতা সেন তেমনি আছেন। এতে যেমন অশ্কার অতীত ও অশ্কার ভবিষ্যৎ মাঝে দুদণ্ডের শান্তির বর্তমান—কিন্তু সেও অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই মিলন মুহূর্তেই বলেছে—‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’ ইতিহাসের অতীতের জীবনবোধের যে কল্পছবি কবির মনে ধরা পড়েছে, তা-ই তিনি দেখতে পেয়েছেন নাটোরের

বনলতা সেন ও যাঁর ‘চুল .... কবেকার অশ্বকার বিদিশার নিশার’ মতো, তাঁর মুখ যেন “শ্রাবস্তীর কারুকায়”। কালপ্রবাহে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একাকার হওয়ার কথাই এ কবিতার কথা — মনে করেছেন কিছু সমালোচক। এভাবে কবিতাটিকে চিরন্তনের সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছে বনলতা সেন। অপর সমালোচক ড. শুম্ভসত্ত্ব বসু এই কালচেতনার মধ্যে ইতিহাসবোধ, ইতিহাস চেতনাকে অধিকার করেছেন। তাঁর ভাষায়—“কবি তাঁর মানসপরিমণ্ডলে প্রেম হোক আর প্রকৃতি হোক, কিম্বা জীবনের বিবিধ বোধের ব্যাপারই হোক, কালজ্ঞান এবং ইতিহাস চেতনার বেধ ও পরিধিতেই তিনি তার রূপদান করতেন।”

তাঁর প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও ইতিহাসচেতনার সঙ্গে ভৌগোলিক পরিসরের ব্যাপ্তিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘বনলতা সেন’ কবিতায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে—“এমন কি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষ জীবন-সংগ্রামে নিরত থেকেও নারীর প্রতি ভালোবাসা থেকে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকেনি। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ হাঁটার প্রতীকতায় সেই চেতনাই উদ্ভাসিত হয়েছে। অতীতের শ্রাবস্তীপুরীর শিল্পী নিজ অন্তরের সংবেদনশীলতায় যে প্রতিমা নির্মাণ করেছেন—সেই মমতার প্রতিচ্ছবি বনলতা সেনের মুখে। একবার সিংহল সমুদ্র, পরমুহূর্তেই মালয়-সাগর, বিস্মিসার-অশোকের ধূসর জগৎ থেকে অবশেষে বর্তমানে নাটোরের বনলতা সেনকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে কালচেতনার কথা বলেছেন—“কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা এবং মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।” এই ইতিহাস চেতনাও কালজ্ঞান কবির মনোলোককে উদ্বেল করলেই, তিনি ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই “অপরিহার্য সত্যটি” তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই কারণেই তিনি তাঁর নায়ক নায়িকার নামের সঙ্গে উপাধি বসিয়ে বাস্তববোধ সঞ্চার করে তাঁদের প্রত্যক্ষগম্য করে তুলেছেন। এজন্যই তিনি অনায়াসে অতীতের শ্রাবস্তী থেকে বর্তমানের নাটোরের মুহূর্তে পাড়ি জমাতে পেরেছেন। জীবনানন্দের কল্পনার এই অভাবনীয় ব্যাপ্তি প্রসূত সময়সীমা ও ভূগোলচেতনার এই বিস্ময়কর ও অভিনব সমীভবনের জন্যই তাঁর পাঠকদের চমকিত করেছে।

জীবনানন্দের কবিতায় শুধু কাল-ইতিহাস-কল্পনার কথাই বা বলি কেন, তাঁর প্রকৃতিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখবার, উপভোগ করবার ও পাঠককে সেই অনুভূতির অংশীদার করবার জন্য অসাধারণ সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু চোখ দিয়ে প্রকৃতির রূপ মাধুরী দেখেননি, কান দিয়ে তার ধ্বনি মাধুর্য শুনছেন, মন দিয়ে তিনি ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুকে অনুভব করেছেন। এভাবে তাঁর রোমান্টিক অনুভূতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়ের বস্তু অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। যেমন, আলোচ্য বনলতা সেন কবিতার তৃতীয় স্তবকে ‘শিশিরের শব্দ’ ‘ডানার রৌদ্রের গন্ধ’। সাধারণ অভিজ্ঞতায় ভাবা যায় না। রৌদ্রের বর্ণ নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয় হলেও, গন্ধ তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের। কিন্তু কবি তাঁর তীব্র ও গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে রৌদ্রের ঘ্রাণ উপলব্ধিগম্য করে নিয়েছেন। এখানেই ফুটে উঠেছে কবির ইন্দ্রিয় সচেতনতা—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় sensuousness বা ইন্দ্রিয়ঘনত্ব। এরকম আরও অনেক উদাহরণ জীবনানন্দের কবিতায় পাওয়া যায়—‘ঘুমের ঘ্রাণ’, ‘বাতাসে ঝাঁঝের গন্ধ’।



জীবনানন্দ কাব্য শরীর সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কৌশল, পদবিন্যাস, উপমা ব্যবহার বাকপ্রতিমার রূপনির্মিতিতে তিনি একক ও অনন্য। নিজের ভাষা বলয়ে তিনি বার বার আবৃত হয়েছে। তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের পাশাপাশি অপ্রচলিত শব্দ, গ্রাম্যশব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। কাব্যের কায়াগঠনে এরা দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এক আশ্চর্য মায়াময় জাদু সৃষ্টি করেছে। শেষের দিকে জীবনানন্দের সমাজ সচেতনতা এবং বাস্তববোধ সম্পর্কিত কিছু কবিতায় বিক্ষিপ্ত চিত্তার ভাবজনিত কারণে অতি দ্রুততায় চিত্র থেকে চিত্রান্তরে গিয়েছেন। ফলে কোথাও কোথাও কিষ্কিৎ অসংগতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। ‘বনলতা সেন’ এদিক থেকে একটি নিটোল শিল্পরূপময় কবিতা। এ কবিতার কোন শব্দই দুরূহ বা নতুন নয়। কোথাও কোনো শব্দকে নিয়ে কষ্ট কল্পনার অবকাশ নেই। চিত্ররচনায় অনন্য ও অসামান্য এক শিল্পিত মননের পরিচয় আছে। ‘বিস্মিসার অশোকের ধূসর জগৎ’, ‘সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দাবুচিনি দ্বীপের ভিতর’, ‘জোনাকির রঙে ঝিলমিল’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ যে চিত্র তুলে ধরেছে। তা শব্দার্থকে অতিক্রম করে নতুনতর ব্যঞ্জনা, অন্যতর ভিন্নতর অর্থ দ্যোতনা করে। এবং সেটি মন ও অনুভূতি নিয়ে বোঝবার বিষয়। এ না হলে নিছক অভিধানের শব্দার্থ দিয়ে এর মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। জীবনানন্দের ছত্র—‘শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে’ বা ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা’—ধ্বনি সুযমা তাঁর রোমান্টিক মনটিকে তুলে ধরবার সজ্জা, পাঠকের চৈতন্যের গভীরে সাড়া দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

ছন্দ ব্যবহার জীবনানন্দ মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেই অনেকটা স্বচ্ছন্দ। ‘বনলতা সেন’ কবিতায় তিনি ৮ + ৮ + ৬ মাত্রার তিনটি পর্বে ২২ মাত্রার ছত্রে বিন্যস্ত করেছেন।

হাজার বছর ধরে / আমি পথ হাঁটিতেছি / পৃথিবীর পথে,  
সিংহল সমুদ্র থেকে / নিশীথের অন্ধকারে / মালয় সাগরে  
অনেক ঘুরেছি আমি ;/

এর মিলের ক্ষেত্রেও কিছু অভিনবত্ব আছে। মিলবিন্যাস মূলত একান্তরিক, অর্থাৎ প্রথম স্তবকে প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠে দ্বিপদী মিল। দ্বিতীয় স্তবকে অনুরূপ মিল থাকলেও ছত্রের মাত্রা বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। তৃতীয় স্তবকেও মিল একই রকম তবে ছত্রের মাত্রাবিন্যাস ভিন্নতর।

অলঙ্কার প্রয়োগে উপমা কালিদাসস্য-র পর বোধ কবি জীবনানন্দের কথা বলতে হয়। “উপমাই কবিত্ব”—এ কথার কথক-এর কয়েকটি উদাহরণ ‘বনলতা সেন’ থেকেই দেওয়া হল :

- \* “ডানায় রৌদ্রের গন্ধ”
- \* “চুল তার কাব্যের অন্ধকার বিদিশার নিশা”
- \* “বলেছে সে — এতদিন কোথায় ছিলেন ?

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।”

দুটিই লুপ্তোপমার উদাহরণ। দুটিতেই উপমান ও উপমেয় থাকলেও সামান্য ধর্ম অনুপস্থিত। দ্বিতীয়টিতে চোখ উপমেয়, পাখির নীড় উপমান, মত সাদৃশ্যবাচক শব্দ কিন্তু সামান্য বা সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই। পাখির নীড় যেমন স্নিগ্ধ ও শান্ত, বনলতা সেনের চোখও তেমনি স্নিগ্ধ ও শান্ত—এটি পাঠককে ধরে নিতে হয়েছে।

যে কোনো মহৎ কবির মতো জীবনানন্দের কবিতার উৎস তাঁর মনে, তাঁর অনুভবে—অন্তর্লোকের রহস্যময় পথে তার জন্ম। এই জন্মের সঙ্গে সহজাত তার শব্দ-ছন্দ-ধ্বনি-অলংকার। এ সবই ভাব ভাবনাকে রঙ, রূপে, রসে প্রকাশের জন্য—অর্থে ও ব্যঞ্জনায়ে। তিনি জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেছিলেন—প্রকৃতি ও প্রেম হাত ধরাধরি করে তাঁর কবিতায় নানা উপমায় প্রতীকিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কালে কালোত্তরে। ‘বনলতা সেন’ এ যুগের কবিতা পাঠককে ‘প্রথম পাঠ’ হিসেবে নতুনতর পথ দেখিয়েছে।

**প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা :**

হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি — হাজার বছর ধরে কোনো মানুষের পক্ষে পথ হাঁটা সম্ভব নয়, তথাপি এ শব্দ গুচ্ছের ব্যঞ্জনায়ে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাপ্ত অন্তহীন পরিক্রমা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বাস্তবের সত্য নয়, কবির অনুভবের সত্য। জীবনের সফেন সমুদ্র মগ্নন করতে করতে এই অনন্ত যাত্রার জন্যই ক্লাস্ত প্রাণ দুদণ্ডের শান্তি প্রত্যাশা করে। অস্বিষ্ট সেই অধরা ভাবের যদি মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ হয় বনলতা সেন, তার পক্ষেই সে শান্তির আশ্রয় দেওয়া সম্ভব।

আমি ক্লাস্ত প্রাণ এক — ক্লাস্তি ও মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দের মতো এ যুগের অনেক আধুনিক কবির অন্যতম প্রধান সুর। এই চেতনা অবশ্য সব সময় দৈহিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়নি। যুগের বন্ধ্যা রূপ, অচরিতার্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর উৎসার। রবীন্দ্র-কবিভাবনায় রোমান্টিক হৃদয়াবেগ মানসী, মানসসুন্দরীর ভাব ব্যঞ্জনায়ে প্রকাশিত হত। আধুনিক কবিরা বস্তুবিশ্বে, ভাব ব্যঞ্জনার পরিবর্তে সব কিছুকেই শরীরী করতে চেয়েছেন, তাই জীবনানন্দও তাঁর কাব্যে প্রধানত বাস্তব সূত্রকে অবলম্বন করে তাকে প্রকাশ করেছেন। অন্তহীন পথ চলার শেষ নেই, তথাপি ক্লাস্ত দেহমন-এর ভারাক্রান্ত রূপটি এ ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছেন নাটোরের বনলতা সেন—

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—“বিশেষ লক্ষ্য করতে হবে ‘দু-দণ্ড’ শব্দ বন্ধ্য। এই শান্তি ক্ষণকালীন, কারণ মানুষের যাত্রাপথে আশ্রয়, শান্তি ও স্থিতির ধ্রুব আশ্বাস নিয়ে কোনো বনলতা সেনের আবির্ভাব ঘটেনি। ইতিহাসের কোনো কোনো সিদ্ধ লগ্নে চকিত-উজ্জ্বলে হঠাৎ কখনও দেখা যায় তাকে, যেমন কবি দেখেছিলেন তাঁর বিশ্বাসী কৈশোরে, নাটোরের কোনো এক বসন্তের ভোরে।”

সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী ফুরায় — এ-জীবনের সব লেনদেন— ‘সব নদী’ শব্দ যুগ্মের সংকেত একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। দিনান্তে পাখির ঘরে ফেরা, তার শান্তি নীড়ে ফেরা। নদী ফুরায় জীবনের লেনদেন — অংশটির তাৎপর্য হল নদী ও মানুষের জীবন বস্তুত একটি প্রবহমান ধারা — জীবনের লেনদেন মিটিয়ে যেমন মানুষের জীবনাবসান, নদীও তার উৎস থেকে নিরন্তর চলার পর সে মহাসমুদ্রে তার চলার অবসান হয় অর্থাৎ সমুদ্রে লীন হয়ে নদী তার নিজস্বতা হারায়। মানুষও তার জীবনের সমস্ত কর্ম অবসানে, জীবনের সমস্ত দেনাপাওনা সেরে, নীল মৃত্যু উজাগর অন্ধকারে বিলীন হয়।

## অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অংশগুলি ভালো করে পড়ুন।  
উত্তর করতে পারবেন।

- ১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।
  - ক) অনেক ঘুরেছি আমি ; \_\_\_\_\_ ধূসর জগতে  
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে \_\_\_\_\_,
  - খ) সমস্ত দিনের শেষে \_\_\_\_\_ মতন  
\_\_\_\_\_ আসে ; ডানার \_\_\_\_\_ মুছে ফেলে ছিল ;
  - গ) জীবনানন্দের প্রথম কবিতা \_\_\_\_\_ প্রকাশ \_\_\_\_\_ পত্রিকায়, বৈশাখে \_\_\_\_\_।
  - ঘ) জীবনানন্দের জন্ম \_\_\_\_\_ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু \_\_\_\_\_ খ্রিস্টাব্দে।
  - ঙ) নজরুলের \_\_\_\_\_, যতীন্দ্রনাথের \_\_\_\_\_ এবং মোহিতলালের \_\_\_\_\_  
উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক \_\_\_\_\_ নিয়ে আসে।
- ২) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- ৩) কবি মোহিতলাল মজুমদারের কবিকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- ৪) ‘কল্লোল’-‘কালিকলম’ পত্রিকার সমসাময়িক দুটি পত্রিকার নাম করুন।
- ৫) ‘পরিচয়’ পত্রিকার আবহাওয়ায় লালিত তিনজন কবির নাম উল্লেখ করুন।
- ৬) বুদ্ধদেব বসুর শেষের দিকের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।
- ৭) জীবনানন্দ স্বল্প সময়ের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেছেন। পত্রিকাটির নাম কী ?
- ৮) জীবনানন্দের এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা কত ?
- ৯) ‘উপমাই কবিত্ব’ কে বলেছেন ?
- ১০) ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থটি ‘কবিতা ভবন’ প্রকাশিত সংস্করণ করে প্রকাশিত হয়েছে ?
- ১১) জীবনানন্দ কথিত ‘কালচেতনা’ বিষয়টি একটু বুঝিয়ে লিখুন।

---

## ৩৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

---

- ১) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)—জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ।
- ২) অম্বুজ বসু—একটি নক্ষত্র আসে।

- ৩) ড. শুম্বাসত্ত্ব বসু—কবি জীবনানন্দ ।
- ৪) সঞ্জয় ভট্টাচার্য—কবি জীবনানন্দ দাশ ।
- ৫) অরুণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ : আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ ।
- ৬) ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ।
- ৭) প্রভাতকুমার দাস—জীবনানন্দ দাশ ।
- ৮। পবিত্র মুখোপাধ্যায়—সূর্যকরোজ্জ্বল কবি জীবনানন্দ ।
- ৯। অনুষ্টিপ : জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা—১৪০৫ ।